নং ৭৪৫

সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বসুমতী-কার্য্যালয়।

কলিকাতা

১১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকট্রো-ষ্টীম-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২

সূচিপত্র।

মাধবীলতা

উপন্যাস

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মাধবীলতা

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

একদা সিংহশত গ্রামে একজন ধনবান রাজা বাস করিতেন। এক্ষণে সে গ্রাম নাই, সে রাজাও নাই, কেবল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দুই একটী ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ—প্রস্তরখণ্ড বা ইষ্টকস্তূপ। উপযুক্ত পরিণাম! বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশ মাত্র আছে। কিন্তু গরিব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নবপ্রস্ফুটিত কাননকুসুমের ন্যায় সদ্যস্ক; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী। মূর্খের নিকট শকুন্তলা বৃথা। অন্ধের নিকট চন্দ্রও মিথ্যা। বিক্রমাদিত্য স্বর্ণসিংহাসনে, আর কালিদাস নিম্নে, যোড়হস্ত। ভুল।

সিংহশত গ্রামের শেষ রাজা ইন্দ্রভূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না, সামান্য লোকের ন্যায় শান্ত ও সরল ছিলেন। সেই সরলতা তাঁহার অনর্থের মূল হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল অবধি বংশের এই নিয়ম ছিল যে, জ্যেষ্ঠপুত্র বিষয়-অধিকারী হইবেন, কনিষ্ঠেরা কেবল কিঞ্চিৎ মাসিক পাইবেন এই নিয়ম সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, রাজবংশের মধ্যে দুইটী নূতন বৈষম্য ঘটাইয়াছিল; একটী প্রকৃতিগত, অপরটী আকৃতিগত। এক শাখা সদা সন্তুষ্ট, সরল, শান্ত ও উদার; অপর শাখা সদা ঈর্ষাপরবশ ও কুটিল; এক শাখা রূপবান, অপর শাখা কুৎসিত। এক বংশের মধ্যে পরস্পর এতাদৃশ প্রভেদ বিস্ময়জনক; কিন্তু ঘটিয়াছিল। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন তাঁহার অসন্তোষের কোন কারণ ছিল না. সকলেই তাঁহার আশৈশব সন্তোষবিধান করিত কিন্তু যিনি পিতৃবৈভব কিছু পাইবেন না, তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, "পিতার এত ঐশ্বর্য্য! কি অপরাধে আমি তাহাতে বঞ্চিত? সামান্য প্রজার সন্তানেরা পিতৃ-বৈভবে তুল্যাংশী, আমি রাজপুত্র অথচ আমার ভাগ্যে কিছুই নাই!" তাঁহার মনে সতত এই আলোচনা, সর্ব্বদা তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত, সর্ব্বদা তাঁহার তির্য্যগ দৃষ্টি, সর্ব্বদা তাঁহার দন্ত রুগ্ন, সর্ব্বদা তাঁহার মুখ বিকট। মুখের উপর মনের আধিপত্য অতি চমৎকার; মনোবৃত্তিমাত্রেই মুখে আসিয়া উদিত হয়। কোন মনোবৃত্তির স্থান ভ্রূযুগ, কোনটীর বা ভ্রূযুগ ও নেত্র। কোন মনোবৃত্তির স্থান ওষ্ঠ, কোনটীর বা ওষ্ঠপার্শ্ব ও নাসা। এইরূপ রাগ, ঈর্ষা, শোক, আহ্লাদ প্রভৃতি যে কোন মনোবৃত্তি হউক, মুখের কোন অংশ না কোন অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যে মনোবৃত্তির সর্ব্বদা উদয় হয়, তাহার অধিকার-স্থল ক্রমে পুষ্টিলাভ করে। মুখের সেই অংশ ক্রমে এত স্পষ্ট হয় যে, প্রথমেই সেই অংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে মনোবৃত্তি তৎকালে মনে উপস্থিত থাক্ বা না থাক, মুখে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এই জন্য দেখিবামাত্র জানা যায় যে, কাহার মুখে কোন বৃত্তির পাত্রাধি অধিক। এই লোক স্বভাবতঃ উগ্র, এই লোক স্বভাবতঃ শান্ত, এই লোক স্বভাবতঃ দয়ালু যে অনুভব হয়, তাহার কারণ অপর কিছুই নহে।

কুপ্রবৃত্তি কুৎসিত। মনের যে অংশ কুপ্রবৃত্তির অধিকারস্থল, তাহা পুষ্ট হইলে মুখ কুৎসিত হয়। এই জন্য সিংহশত রাজবংশের এক শাখা কুৎসিত ছিলেন। ঈর্ষা, বিরক্তি, অসন্তোষ প্রভৃতি বৃত্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে জাগরিত

সজ্জন ব্যক্তিরা সুশ্রী সৎপ্রবৃত্তি মনে প্রবল থাকিলে মুখ সুশ্রী হয়। যাঁহারা অসজ্জনকে সুশ্রী দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। শ্রী কখন মুখের অংশ নহে, অন্তরের অংশ। অবস্থানুসারে প্রকৃতি হইতে আকৃতি

ইন্দ্রভূপ স্বয়ং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ; সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, কেবল জ্ঞাতিদের পারেন না। তিনি তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লইয়াছেন, কেন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন ? জ্ঞাতিদের নিকট ইন্দ্রভূপ অধার্ম্মিক, অবিবেচক, অত্যাচারী ; কেবল একজন জ্ঞাতি ইন্দ্রভূপের প্রশংসা করিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকিতেন। তাঁহার নাম চূড়াধন বাবু। তিনি যৎপরোনাস্তি মিষ্টভাষী, নম্র, শান্ত এবং নির্ব্বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকে ইন্দ্রভূপ বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি কাহাকেই বা ভাল না বাসিতেন?

চূড়াধন বাবু বড় সাবধানী ছিলেন। আপনি কখন রাজসম্মুখে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। মহারাজ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সসম্মানে নতশিরে কেবল সেই কথারই উত্তর দিতেন, কখন নিজের মত জানাইতেন না। সাধারণের মত, অন্যের মত কি, দেওয়ান মহাশয়ের মত কি, আবশ্যক হইলে কেবল তাহাই জানাইতেন। ইন্দ্রভূপ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন ; ভাবিতেন, চূড়াধন বড় বিজ্ঞ।

রাজা ইন্দ্রভূপ আহার করিবার সময় নিত্য বহুজন-পরিবেষ্টিত হইয়া আহার করিতেন। অতি উপাদেয় সামগ্রী নানা দেশ হইতে সংগৃহীত হইত ; কিন্তু পরিচারকাগণ দেখিত, চূড়াধন বাবু সে সকল কিছুই স্পর্শ করিতেন না, বাছিয়া বাছিয়া কেবল অপকৃষ্ট সামগ্রী আহার করিতেন।

আহারান্তে ইন্দ্রভূপ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কোন না কোন সংস্কৃত মূলগ্রন্থ শ্রবণ করিতেন। রাজসভায় কখন ভগবদ্গীতা, কখন যোগবাশিষ্ঠ, কখন রামায়ণ, কখন মহাভারত পাঠ হইত। শ্রোতারা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ ; ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হইত না। এই সময়ে যে কথাবার্ত্তা আবশ্যক হইত, তাহা সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় হইত। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ইচ্ছা হইলেও বড় কেহ কথা কহিতে পাইতেন না, কাজেই নির্ব্বিঘ্নে পাঠ হইত। কিন্তু রামায়ণ কি মহাভারত পাঠকালে এ নিয়ম বড় খাটিত না। অন্ধমুনির বিলাপ, সীতার বিলাপ, দশরথের বিলাপ বা তদ্বৎ কোন অংশ পাঠ হইতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে সকলেই নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেন ; ক্রমে সকলেরই হৃদয় যখন পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন হয় ত কোন শ্রোতা আর শোকসংবরণ করিতে সমর্থ না হইয়া কুণ্ঠিতভাবে নিশ্বাস ফেলিতেন, অমনি নিকটেই সজোরে নস্যগ্রহণের দুই একটী শব্দ হইত, তাহার পরেই চারিদিকে উপর্য্যুপরি নস্যগ্রহণের তুমুল শব্দ হইয়া উঠিত। কোন নাসার দীর্ঘ শব্দ। এই একরূপ ক্রন্দন। অধ্যাপকের ক্রন্দন শেষ হইতে না হইতে ইন্দ্রভূপ স্বয়ং কম্পিত কণ্ঠে শোক প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তাহার পর কথা কহিবার আর বাধা থাকিত না ; প্রথম দুই একটী সংস্কৃত, পরেই বাঙ্গালা চলিত। তখন সকলেই কথা কহিতেন, কেবল চূড়াধন বাবু নিস্তব্ধ থাকিতেন। রামায়ণ, মহাভারত তাঁহার ভাল লাগিত না ; লোকের কেন ভাল লাগে, তাহাও তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। একদিন তিনি দেওয়ান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কোন দিন রামায়ণ শুনিতে বসেন না কেন ?" দেওয়ান উত্তর করিলেন, "রামায়ণ কর্ম্মনাশা, একদিন শুনিলে দুই দিন কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না।" চূড়াধন একটু হাসিলেন, তাঁহার বিকট দন্ত দেখা গেল। তাহা দেখিয়া দেওয়ান মহাশয়ের একজন পরিচারক ভাবিল, "দাঁত ছড়ান যদি হাসি হয়, তাহা হইলে শৃগালেরও হাসি আছে।" বাস্তব সকল হাসি হাসি নহে। সকলে হাসিতে পারে না ; অনেকে আবার হাসিবার অধিকারীও নহে। অথচ সকলেই হাসিতে যান ; হাসিতে কাহার না সাধ ? হাসি দেখিলে হাসি পায় ; কিন্তু যে ব্যক্তি হাসিতে অনধিকারী, তাহার হাসি দেখিলে কেহ হাসে না, বরং ভয় পায়। সুখীরা হাসিতে জানে, সরল ও উদার ব্যক্তিরা বিলক্ষণ হাসিতে পারে, প্রণয়ীরা চমৎকার হাসে, শোকাকুল ব্যক্তিরা ম্লান হাসি হাসে, যেন অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টিতে দীপালোক পড়ে ; কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা হাসিতে পারে না ; তাহাতেই পরিচারক চূড়াধন বাবুর হাসিকে "দাঁত ছড়ান" বিবেচনা করিয়াছিল।

চূড়াধন বাবু প্রায় রাজবাটীতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। কোন কার্য্যের বিশেষ ভার ছিল না, তথাপি তিনি প্রত্যূষে আসিয়া রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, ইন্দ্রভূপ বহির্গত হইলে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেন, নিতান্ত নিকটে যাইতেন না ; অথচ এমত দূরে থাকিতেন যে, অন্যের কথা যদিও একান্ত না শুনিতে পান, তথাপি রাজার উত্তর শুনিতে পাইবেন। যিনিই যত মৃদুস্বরে কথা বলুন, রাজা উচ্চৈঃস্বরে তাহার উত্তর দিতেন। ইন্দ্রভূপ কখন মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারিতেন না। যিনি মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারেন না, তিনি আবার প্রায় কোন

কথা গোপন করিতেও পারেন না; কথা আপনারই হউক, পরেরই হউক, সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে তাহা আলোচনা করা তাঁহার অভ্যাস হয়।

পুষ্পোদ্যান হইতে ইন্দ্রভূপ যখন বিষয়কার্য করিতে যাইতেন, চূড়াধন বাবু সেই অবকাশে রাজভৃত্য ও পরিচারকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন কখন বা অধ্যাপকদের সহিত শাস্ত্রীয় কথা লইয়া তর্ক করিতেন। নানাশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। পণ্ডিতেরা তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন; অপর সকলে তাঁহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন, কেবল একা দেওয়ান মহাশয় ও বিষয়ে নিস্তব্ধ থাকিতেন।

রাজা সর্ব্বদাই চূড়াধনকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেন, সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিতেন। ইন্দ্রভূপ ভাবিতেন যে, চূড়াধন বাবুর পিতা রাজ্যাধিকারী হইলে চূড়াধন বাবু কতই সুখ ভোগ করিত।

অতএব যাহাতে সে অভাব চূড়াধন অনুভব করিতে না পান, রাজা সতত সেই চেষ্টায় থাকিতেন, কিন্তু অর্থানুকূল্যের দ্বারা সে অভাব পূরণ করিতে পারিতেন না। দেওয়ান তাহাতে কোন গতিকে না কোন গতিকে ব্যাঘাত ঘটাইতেন। দেওয়ানের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, চূড়াধন বাবুর অর্থাভাব রাজার পক্ষে মঙ্গল।

দেওয়ানের বৈরিত্ব চূড়াধন বাবু জানিতেন; কিন্তু সেজন্য দেওয়ানের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন না বরং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সকলে দেখিত, স্বয়ং ইন্দ্রভূপও দেখিতেন যে, চূড়াধন বাবু দেওয়ানের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। একদিন অকস্মাৎ দেওয়ানের গৃহদাহ হয়, চূড়াধন বাবু তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে যাইয়া দেওয়ানকে উদ্ধার করেন। সকলেই চূড়াধন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছিল, কিন্তু দেওয়ান দেন নাই। সেইজন্য সকলেই দেওয়ানের নিন্দা করিত; দেওয়ান তাহা শুনিয়া কোন উত্তর করিতেন না, কেবল একবার পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "গৃহদাহ বিস্মরণ হইও না।"

পুত্র। কেন?

দেও। তাহা হইলে যে দাহ করিয়াছে, তাঁহাকে ভুলিবে।

পুত্র। কে দাহ করিয়াছেন?

দেও। চূড়াধন বাবু।

পুত্র। তিনি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

দেও। উদ্ধার করিবেন বলিয়াই বিপদ ঘটাইয়াছিলেন।

পুত্র আর কোন উত্তর না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেওয়ান রাজবাড়ীতে গেলেন; তথায় যাইয়া দেখেন, চূড়াধন বাবু কয়েক জন অধ্যাপক পরিবেষ্টিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। চূড়াধন বাবু স্বভাবতঃ অল্প কথা কহেন, তাহাও মৃদুস্বরে; এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখিয়া দেওয়ান মহাশয় সেই দিকে গেলেন। অন্য কর্ম্মচ্ছলে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। দেওয়ানের সমাগমে চূড়াধন বাবুর স্বর ঈষৎ উচ্চ হইল, দেওয়ান তাহা বুঝিলেন। চূড়াধন বাবু বলিতে লাগিলেন, "পুত্রের কুচরিত্র কেবল পিতার দোষে ঘটে, নির্ব্বোধ পিতারা সকল কথাই পুত্রকে বলে, পুত্রকে সাবধান করিতে গিয়া আপনারা অসাবধান হয়। বিজ্ঞতা শিখাইবে মনে করিয়া কুটিলতা শিখায়। উপকার করিলে যাহারা উপকৃত বোধ করে না, তাহারা আপনারা অপকার করিতে না পারিয়া সন্তানের উপর ভার দিয়া যায়।"

দেওয়ান আর শুনিলেন না কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একবার একজন পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শিবিকার সহিত কে আসিয়াছিল?"

পদা। আমি আসিয়াছিলাম।

দেও। আমার পাল্কীর পূর্ব্বে আর কেহ রাজবাটীর দিকে দৌড়িয়া আসিয়াছিল?

পদা। কৈ, কাহাকেও দেখি নাই।

দেও। আশ্চর্য্য!

দেওয়ান মহাশয় মুখে "আশ্চর্য্য" শব্দটী মাত্র উচ্চারণ করিলেন; কিন্তু অন্তরে অনেক কথা আলোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই দিন চূড়াধন বাবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজবাটীতে ছিলেন। অন্যদিন প্রায়ই সন্ধ্যার পর বাটী যাইতেন। যাইবার সময় কিঞ্চিৎ দ্রুতপদবিক্ষেপে যাইতেন; লোকে বলিত, "ঐ চূড়াধন বাবু প্রদীপ নিবাইতে যাইতেছেন।" বাস্তবিক সে কথা কতক অংশে সত্য। গৃহে তাঁহার প্রতীক্ষায় অনর্থক প্রদীপ না জ্বলে, অনর্থক তৈল নষ্ট না হয়, ইহা তাঁহার

সাংসারিক বন্দোবস্তের কথা বটে। তাঁহার যে নিতান্ত দৈন্যদশা ছিল, এমত নহে। গৃহে দাস-দাসী ছিল, দ্বারপালও ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া অনর্থক তৈল নষ্ট কেন হইবে? এইজন্য গৃহে প্রদীপ বড় জ্বলিত না।

তাঁহার গৃহ দেখিলে কোন ধনবান্ বা রাজ-গোষ্ঠী কাহারও বাসস্থান বলিয়া বোধ হইত না। গৃহটী ইষ্টকনির্ম্মিত বটে, কিন্তু বড় ক্ষুদ্র ও ভগ্নো-ন্মুখ; অথচ জাঁকজমক আছে। চারিদিকে কার্ণি-সের নিম্নে বিবিধ প্রকার পক্ষী, অশ্ব, গজ, সেপাই, শাস্ত্রী চূণকামে অঙ্কিত রহিয়াছে—দেখিলে ঢাকাই শাটী মনে আইসে। গৃহাভ্যন্তরে বায়ুপ্রবেশের পথ বড় ছিল না; তৎকালে গবাক্ষের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ঝরকা প্রচলিত হইয়াছিল; চূড়াধন বাবুর বাটীতে তাহার দুই তিনটী মাত্র ছিল। বাটীর মধ্যে বা পার্শ্বে কোথাও পুষ্পোদ্যান ছিল না; তৎকালে গৃহস্থের পক্ষে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা হইত। একবার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে আসিয়া "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দ্বারে দাঁড়াইল. পরে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া দেখিল যে, গৃহে কোন পুষ্পবৃক্ষ নাই, অতএব তৎ-ক্ষণাৎ ফিরিল। গৃহিণী স্বয়ং ভিক্ষা লইয়া আসি-লেন, ভিক্ষুক তাহা গ্রহণ করিল না; বলিল, "মাতঃ. তোমার ভিক্ষা আমি লইব না. পুষ্পোদ্যান নাই দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, তোমার গৃহে নারায়ণ নাই।"

ভিক্ষুক যদি আর কিঞ্চিৎ দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহা হইলে বলিত. "তোমার গৃহে কোন পালিত পক্ষী নাই; বোধ হয়,তোমার কোন সন্তান-সন্ততি নাই; আমি ভিক্ষা লইব না, নিঃসন্তানের ভিক্ষা অশুচি।" চূড়াধন বাবু বাস্তবিক নিঃসন্তান; গৃহে আপনি আর গৃহিণী বাস করেন। পুত্রবতী হইলে স্ত্রীজাতির যে কোমলতা জন্মে, সর্ব্বলোকে যে স্নেহ বা দয়া জন্মে, তাহা তাহার গৃহিণীর এক-বারও জন্মে নাই। চূড়াধন বাবু জানিতেন যে, তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দয়াময়ী, স্নেহময়ী এবং এক-বারে স্বার্থপরতাশূন্য। চূড়াধন বাবু এ সকল বিশেষ দোষ জ্ঞান করিতেন; এবং এই জন্য মধ্যে মধ্যে গৃহিণীকে তিরস্কার করিতেন; তথাপি গৃহিণী রাত্রিকালে স্বামীর ভোজনপাত্রের নিকট পা ছড়া-ইয়া বসিয়া নিজের স্নেহ দয়ার নানা পরিচয় দিতেন। তাঁহার একটী কথাও প্রকৃত নহে, কিন্তু চূড়াধন বাবু সকলগুলিই প্রকৃত মনে করিতেন। চূড়াধন বাবু এদিকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সকলের অন্ত-স্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন; কিন্তু আপনার স্ত্রীর নিকট অন্ধ হইতেন, তাঁহার চাতুরীকৌশল কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। গৃহিণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন না। প্রতিবাসিদিগের অভিসন্ধি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি চূড়া-ধন বাবুর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন, বুঝি-তেও পারিতেন।

যে রাত্রে চূড়াধন বাবু দ্রুতপদবিক্ষেপে বাটী আসিতেছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার বাটীতে দুই জন লোক বসিয়া তাঁহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছিল। চূড়াধন বাবু তাহাদের দেখিয়া মহা-আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর একত্রে বসিয়া অতি নিম্নস্বরে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষ উঠিবার সময় চূড়া-ধন বলিলেন, "এইবার বুঝিব, তোমরা কেমন জাল ফেলিতে পার।" তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "জেলে ত আপনি, আমরা মাত্র জেলের হাঁড়ি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।" এই দুই জনের মধ্যে একজনের নাম জনার্দ্দন, আর একজনের নাম কালীপ্রসাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের নাম পীতাম্বর ছিল, লোকে তাহাকে পিতম-পাগলা বলিত। পীতাম্বরের কোথা জন্ম, সে কাহার সন্তান, তাহা কেহ জানে না। প্রবাদ ছিল যে, যখন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন পিতম ছেলেধরার ভয়ে পলাইয়া সিংহশত গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লয়। কে পিতা ছিল, জিজ্ঞাসা করিলে পিতম নতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিত, "জানি না।" কে মাতা ছিল, জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরভাবে রাজার একটী বড় হাতী দেখাইয়া দিত।

পিতম প্রায় সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিত,পথে বালক-দের খেলিতে দেখিলে আর সেরূপ থাকিত না। তখন পিতম অনবরত কথা কহিত, অন্যকে না পাইলে একাই কথা কহিত, কখন কখন গীত পর্য্যন্ত গাইত। লোকে বলিত, পিতমের গীতগুলি অতি আশ্চর্য্য কিন্তু গাইতে বলিলে পিতম বড় গোলে পড়িত, একটী গীতও আর তাহার স্মরণ হইত না।

প্রথম অবস্থায় পিতমের স্মরণশক্তি একবারে ছিল না। লোকে যে তাহাকে পাগল ভাবিত, তাহার এই এক বিশেষ কারণ ছিল। ভাষা স্মরণ হইত না বলিয়া অনেক সময় পিতম কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিত না। লোকে ভাবিত—পাগল, এইজন্য উত্তর দেয় না। আবার, কথা কহিলে এক শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ মুখে আসিত। পিতম মনে করিত, প্রকৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু লোকে হাসিত দেখিয়া পিতম আশ্চর্য্যান্বিত হইত। পিপাসা পাইয়াছে, পিতম বলিবে "জল খাব," কিন্তু জল শব্দের পরিবর্ত্তে "হাতী" শব্দ মুখে আসিল, পিতম বলিল "হাতী খাব।" লোকে হাসিয়া উঠিল। জলের পরিবর্ত্তে হাতী খাইতে চাহিয়াছে, ইহা পিতম কোনমতে বুঝিতে পারিত না; পুনঃ পুনঃ সেই ভুল করিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "কি খাবে ?" পিতম আবার বলিত, "হাতী খাব," লোকে আবার হাসিত; আবার জিজ্ঞাসা করিত, আবার হাসিত।

সাধারণে পিতমের প্রকৃত অবস্থা জানিত না। পিতমের স্মরণশক্তি নাই; তাহারা ভাবিত, পিতমের জ্ঞান নাই। পিতম ভুলিত, লোকেরাও ভুলিত। পিতমের ভুলে লোকের রহস্য বাড়িত, লোকের ভুলে পিতমের রাগ বাড়িত। পাগলের রাগ বাড়িলে লোকের আহ্লাদ বাড়ে। দুর্ভাগ্য পিতম জ্বালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থান ত্যাগ করিত, কিন্তু কিছু দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। এ সকল প্রথম অবস্থার কথা।

একদিন অপরাহ্নে রাজা ইন্দ্রভূপ কয়েক জন অমাত্য সমভিব্যাহারে পশুশালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষিদের কলহ শুনিতেছেন, বানরকে কদলী দিতেছেন, ভল্লুককে তিরস্কার করিতেছেন, বনমানুষকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্যাঘ্রকে বনের সংবাদ দিতেছেন, এমত সময় একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "বন অপেক্ষা আপনার এ গৃহ ভাল; আমি গৃহস্থ হইব, আর বনে বনে বেড়াইতে পারি না; এই গৃহে আমায় স্থান দান করুন, আমি বাস করি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ ব্যক্তি ?" একজন সঙ্গী বলিল, "পিতম পাগলা।" রাজা কখন পিতমকে দেখেন নাই, দেখিবামাত্র তাঁহার দয়া হইল। পিতমের অঙ্গে বহুতর বেত্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে; কোন কোনটী রক্তোন্মুখ। রাজা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিহ্ন কিরূপে হইল ?" পিতম চিহ্নগুলি একবার দেখিল, হাসিল, কোন উত্তর করিল না। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতম বলিল, "মহারাজ, যে দিনে আমি পেটে না খাই, সে দিন আমি পিঠে খাই।" সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজা গম্ভীর হইলেন; বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিলাম না। স্পষ্ট করিয়া বল।" পিতম বলিল, "পেট আমার, পিঠ পরের। হাতীরও তাই, ঘোড়ারও তাই, গোরুরও তাই, গাধারও তাই; পেট আপনার, পিঠ পরের। না না, ঠিক তা নয়, ভুলেছি; আমার সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। গোরু আর মানুষ সমান নয়। গোরুকে যে আহার দেয়, সেই তার পিঠ দখল করে। আমায় যে আহার দেয় না, সেই আমার পিঠ দখল করে; যে আহার দেয়, সে আদর করে। এই প্রভেদ, বুঝেছেন ? এখন আমি গৃহস্থ হব।"

একজন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "গৃহস্থ হইতে গেলে বিবাহ করা চাই, এক্ষণে ত বিবাহ করিতে হয়।"

পিতম। বিবাহ আমি অনেক দিন হইল করিয়াছি।

রাজা। কোথায় বিবাহ করিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী ?

পিতম। জগন্নাথক্ষেত্রে বিবাহ করিয়াছি। তথায় গিয়া এক আশ্চর্য্য সুন্দরী দেখি। পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা সুন্দরী। সমুদ্রের তুলনা নাই। আমি থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বিবাহ করে ফেলি।

রাজা। সমুদ্র কি বড় সুন্দরী ?

পিতম। চমৎকার সুন্দরী! রামধনুকে শ্যামাঙ্গীর কটিবন্ধন। এই জন্য তাহার যে বাহার, তা আর কি বলিব ? সুন্দরী অনবরত হেলিতেছে, দুলিতেছে আর খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

রাজা। কিন্তু তোমার স্ত্রীর কুল নাই ?

পিতম। কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে। যে তার কাছে স্থান পায়, সেই বড় হয়। দেখুন, চন্দ্র-সূর্য্য এখানে ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন আমার স্ত্রীর পার্শ্বে উদয় হয়, তখন আর এক মূর্ত্তি! তখন সূর্য্য কত প্রকাণ্ড, কত মহৎ, কত সুন্দর দেখায়; সে সকল কিছু চন্দ্র-সূর্য্যের গুণ নহে, সকলই আমার সুন্দরীর গুণ। আহা, তাহার কত রূপ, সে কত নির্ম্মল,

কত গম্ভীর! তাহার কি দয়া, কি স্নেহ! সকলকে বুকে করে বহিতেছে।

রাজা। তোমার স্ত্রীকে ফেলে কেন এলে?

পিতম। সে অনেক কথা। আমি তার রূপে ভুলিলাম, একে একে আমার সর্ব্বস্ব দিলাম, আমার ত কা কলিকাটী পর্য্যন্ত তারে দিলাম। কত আদর করিলাম, কত কথা কহিলাম। প্রেমোন্মত্ত হইয়া শেষে একদিন ঝাঁপ দিলাম, কিন্তু সে আমায় নিলে না। যতবার আমি তার অঙ্গে পড়িলাম, ততবার সে আমায় ছুঁড়ে দূর-বালিতে ফেলিয়া দিল। আর আমি কত সহ্য করি বল। আমি উঠে গালি দিলাম, ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিলাম। সে অতি পাজি, স্বার্থপর; কেবল লোকের সর্ব্বস্ব লবে আর লুকাইয়া রাখিবে। রত্ন বল, পান্না বল, আপনি একদিনও পরিবে না। তবে লোকের সর্ব্বস্ব লয় কেন? তোমাদের স্ত্রীর হাতে পার আছে, কিন্তু এর কাছে আর পার নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে বড় জোর ঘর ভাঙ্গে, এ পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গে। আর অন্তরের ভিতর তাহার যে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে? উপরে হাসিতেছে, খিল খিল করে হাসিতেছে, কিন্তু তাহার ভিতরে যাহা আছে, তাহা আমিই জানি। তাই একবার একবার দয়া হয়; বলি আমি যদি কাছে থাকিতাম, তাহা হইলে হয় ত যন্ত্রণা পান হত না। হাজার হউক, আমি পুরুষ।

একজন পারিষদ এই সময় পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে রাগ করিয়া আসিলে, সমুদ্র তোমায় সাধিল না?"

পিতম। না, তবে যখন আমি একান্ত ফিরিলাম না দেখিল, তখন হা-হুতাশ করিতে লাগিল, আমি কত দূর পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে শুনিতে আসিলাম। লোকে বলে, বিরহযন্ত্রণায় সমুদ্র অদ্যাপি হু হু করিতেছে।

পারিষদ। আবার ফিরে যাও।

পিতম। আর না। আমার আর যাইবার শক্তি নাই, বুড়া হইয়াছি, আমি এইখানে এই বাঘের পাশের ঘরে থাকিব। মহারাজের অনুমতি হইলেই হয়।

রাজা। না, আমার অতিথিশালায় চল, তথায় তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব, সকলে যত্ন করিবে। কোন কষ্ট হবে না।

পিতম। অতিথিশালা দরিদ্রের নিমিত্ত, আমি সেখানে যাইব না। আমায় এইখানে স্থান দিন ব্যাঘ্র-সিংহের সঙ্গে থাকিলে আমার সম্মান বাড়িবে। আর কেহ তাড়না করিবে না।

রাজা। সম্মান চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস, যাহাতে লোকে তোমাকে সম্মান করে, তাহা আমি করিব। এখানে তুমি স্থান পাইবে না।

পিতম তাহাতে অসম্মত হইল, শেষে অতি মিনতি করিয়া ব্যাঘ্রের পার্শ্বে স্থান লইল।

পশুশালা হইতে রাজা ইন্দ্রভূপ বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাগলটার নাম কি ভুলিয়া গিয়াছি?" একজন পারিষদ উত্তর করিলেন, "পীতাম্বর।" রাজা অন্যমনস্কে কতক দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গিদিগের প্রতি চাহিয়া কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য পাগল!" সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" কেবল চূড়াধন বাবু কোন কথাই বলিলেন না। রাজা আবার কত দূর যাইতে যাইতে দাঁড়াইলেন। সঙ্গিগণের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে চাহে, তাহার অপেক্ষা পাগল কে; এ পাগল কেন বাঘকে এত ভালবাসে?" এই সময় একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "পিতম একা নহে, মহারাজও বাঘ ভালবাসেন। দেখুন, আপনার লাঠির মাথায় কার মুখ?—বাঘের।" ইন্দ্রভূপ আগন্তুকের প্রতি না চাহিয়া প্রথমে লাঠির প্রতি চাহিলেন। আগন্তুক বলিতে লাগিল, "মহারাজ! মুখখানি সোণার। বাঘ আপনার নিকট সোণামুখী।"

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, পিতম পাগলা আসিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি? তুমি পলাইয়া আসিলে যে?"

পিতম বলিল, "আমি পালাই নাই, তাড়িত হইয়াছি। রক্ষকেরা আমার নিকট পয়সা চাহিল। আমি বাঘের মত তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া আঁচড়-কামড় দিলাম, তাহারা আমাকে মেরে তাড়াইয়া দিল।"

রাজা। বল দেখি, তুমি কি সত্যই পাগল?

পিতম। হাঁ, আমি পাগল, আমি পিতম পাগল।

রাজা। তুমি জান, কাহাকে পাগল বলে?

পিতম। জানি—আমাকে বলে।

রাজা। পাগলের অর্থ কি?

পিতম। অর্থ পিতম—অর্থাৎ আমি

একজন ভট্টাচার্য্য। পশুশালায় আর যাইবে না?

পিতম। না, ওখানে মারে।

রাজা ফিরিলেন। পশুশালায় যাইয়া দুই তিন জন রক্ষককে পদচ্যুত করিলেন, তত্ত্বাবধায়ককে বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন। পিতম আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে সকলেই মনে মনে পিতম পাগলের কথা অনুশীলন করিতেছিলেন। চূড়াধন বাবু ভাবিতেছিলেন যে,"পিতম নির্ব্বোধ নহে, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছে। পিতম ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ ভাল সদুপায় করিয়াছে। আশ্রয় ও আহার ভিন্ন পাগলের আর কি প্রয়োজন হইতে পারে? যে আপনার প্রয়োজনসাধন করিতে পারে, তাহারে পাগল কেন বলি? সে নির্ব্বোধ কিসে? পিতম আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান; আমি এ পর্য্যন্ত আপনার কার্য্য-সাধন করিতে পারি নাই। পাগল হইয়াও পিতম্ আপনার কাজ হাসিল করিল। আমার নিজের দোষে আমি সকল হারাইতেছি।"

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ভাবিতেছিলেন, "পিতম কি ...দ! এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস ...িতে গেল। মহারাজ অতিথিশালায় স্থান দিতে ...লেন, আপনার নিকট রাখিতে চাহিলেন. তাহা ... লাগিল না। যে মনে করে, আমি সমুদ্রকে ...ঙ্ঘ করিয়াছি, সে এরূপ করিবে, তাহার আর ...র্য্য কি?"

দারবান্ রামদীন দোবে ভাবিতেছিল, 'পাগল ...কি আহার করিবে? রোটি বা ভাত তাহাকে কেহ দি... না; আহারের বন্দোবস্ত রাজা ত কিছু করিয়া দি...ন না। বোধ হয়, পাগলা চানা খাবে, তাহা ম...কি! ভোরপেট যদি চানা পাওয়া যায় আর ...র সঙ্গে দুই চারি সের দুগ্ধ দেয়, তবে আমিও ...রী ছাড়িয়া ওখানে থাকিতে পারি।"

...জা ইন্দ্রভূপও পিতম পাগ্লার কথা ভাবিতে-ছিলেন। পিতম-সম্বন্ধে তাঁহার কি ঈষৎ মনে আসি-তেছিল, অথচ আসিল না। মনের একাংশে যেন পিত...র ছায়া রহিয়াছে, তাহা দেখিতে গেলেই মিলিয়া যায়। রাজা ভাবিলেন,"পিতম কে? আর কি কখন ...কে দেখিয়াছি? কবে দেখিয়াছি? বাল্য-কালে না যৌবনকালে? আমি কত লোক দেখিয়াছি, তাহাদের দেখিলে এরূপ স্মরণ করিবার ত আকাঙ্ক্ষা হয় না; স্মরণ না হইলে ত এরূপ যন্ত্রণা হয় না। পিতম সীতাসর! ইহার আর কি কোন নাম ছিল? কি নাম ছিল? কে এ ব্যক্তি? সত্যই কি পাগল? পিতমের কথাবার্ত্তা অসঙ্গত, কিন্তু অসংলগ্ন নহে। পাগলের কথা এরূপ হয় না। পিতমের জ্ঞান আছে, বোধ হয়, পিতম পাগল নহে।"

জ্ঞান থাকিলে যে পাগল বলা যায় না, এমত নহে। বরং অনেক সময় পাগল শব্দে কতক অংশে জ্ঞান-সম্পন্ন বুঝায়। সাধু ভিক্ষা করে, পাক করে, আহার করে, ভয় করে, অথচ সাধুকে লোকে পাগল বলে। যে ভয় করে, তাহার পরিণামের বোধ আছে, সে একবারে জ্ঞানশূন্য নহে। অভক্ত পুষ্প চয়ন করে, পূজা করে, সতরঞ্চি খেলে, অথচ তাহাকে লোকে পাগল বলে। নিতাই খাজনা আদায় করে, দেনা পাওনা হিসাব করে, তর্ক করে, অথচ লোকে তাহাকে পাগল বলে। ইহাদের সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান আছে, তবে কেন লোকে পাগল বলে?

সাধারণতঃ সকল বিষয়ে যাহার যে পরিমাণে জ্ঞান দেখা যায়, কোন বিষয়ে তাহার সেই পরিমাণে জ্ঞান না দেখিতে পাইলে লোকে হয়ত তাহাকে পাগল বলে। অর্থাৎ জ্ঞানের সমাঞ্জস্য না দেখিলে লোকে পাগল বলে। অন্ততঃ, সকলে না বলুক, কেহ কেহ বলে। বালকে উলঙ্গ থাকে, কেহ তাহাকে পাগল বলে না। অন্যান্য বিষয়ে বালকের যেরূপ জ্ঞান, এ বিষয়েও তাহার সেইরূপ জ্ঞান; কাজেই কেহ তাহাকে পাগল বলে না। অভক্ত পাগল সতরঞ্চি খেলে, সাংসারিক সকল কার্য্য করে; কিন্তু "জল পাব কোথায়" এই কথা কেহ তাহার শ্রুতিগোচর করিলেই সে গালি দিয়া উঠে আর চীৎকার করিতে থাকে। সতরঞ্চি-ক্রীড়ায় বা সাংসারিক বিষয়ে তাহার জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এ স্থলে তাহার জ্ঞানের সে পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই তাহার জ্ঞান-সম্বন্ধে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া লোকে তাহাকে পাগল বলে।

দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়ত একেবারে জ্ঞানের সামঞ্জস্য ছিল না। তাৎকালিক সেই অসামঞ্জস্য কেহ আপনাদের মধ্যে জানিতে পারিত না। কেহ কাহাকেও পাগল বলিত না। "পাগল" নূতন গালি। সামঞ্জস্যের পরে আরম্ভ হইয়াছে। সেই আদিম কালে এতই গুরুতর অসামঞ্জস্য ছিল যে, এক্ষণে আমরা সে সময়ের লোক দেখিলে, তাহাকে পাগল

ভাবিষ্যৎ সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমাদের আশ্চর্য্য হইবার সম্ভাবনা।

এই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের যেরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়,তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। যে ব্যক্তিরা বাষ্পীয় যন্ত্র গঠন করিতেছে, চন্দ্র-সূর্য্যের গতি গণনা করিতেছে, বাষ্প হইতে জলের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারাই হয় ত বৃষ্টির নিমিত্ত দেব চেষ্টা করিতেছে। মড়ক নিবারণ করিতে হইলে তাহারাই হয় ত বলিবে, "চল, ধর্ম্ম-মন্দিরে চল, বা অন্য আড়ডায় চল, প্রার্থনা গাই গিয়া, মড়ক অবশ্য নিবারিত হইবে।" বুদ্ধির এইরূপ বৈষম্য দেখিলে কেহ এক্ষণে অসঙ্গত বিবেচনা করে না, কিন্তু পরে করিবে, হয় ত তখন এরূপ বুদ্ধিমানকে লোকে পাগল বলিবে।

এরূপ অর্থে পাগল এক্ষণে আমরা সকলেই। বুদ্ধির বৈষম্য বা জ্ঞানের অসামঞ্জস্য সকলেরই আছে। কিন্তু কেহ তাহাকে পাগল বলি না। পাগল কটু কথা তবে নির্ব্বোধ বলি, স্বার্থপর বলি, দাম্ভিক বলি, কৃপণ বলি, নিষ্ঠুর বলি, হিংসুক বলি, একই কথা সকলগুলিই বুদ্ধির বিকৃতিবাচক, পাগলের পরিচায়ক। পাগলের সম্পূর্ণ নামকরণ অদ্যাপি বাকী আছে।

পিতম—পাগল, তাহা সে জানে না। বুদ্ধিতে অন্য লোক যেপ্রকার, আপনিও সেই প্রকার—এই পিতমের বিশ্বাস ; কোন অংশে যে ব্যতিক্রম আছে, তাহা পিতম বুঝিতে পারে না। কিন্তু পিতমের বোধ আছে যে পাগল শব্দ তাহার নামের অংশ, এইজন্য লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া ডাকে।

পশুশালায় লৌহ-পিঞ্জরে স্থান পাইয়া পিতম শয়ন করিল। শয়ন অনেক সময় তৃপ্তিবাচক।

ইন্দ্রভূপ দেখিলেন যে, পিতম আর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। রাজা হাসিলেন, পিতমও হাসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে আর তোমার মনে থাকিবে ?"

পিতম। আজ মহারাজের পশুশালা সম্পূর্ণ হইল।

রাজা। কেন ?

পিতম। আমারই নিমিত্ত ; আমি মানুষ-পশু, একপ্রকার নরসিংহ, নৃসিংহ দেব। সে রাজা নৃসিংহকে পারদে পাঠাইতে পারে নাই, আপনি তাহা পারিলেন। আপনার জয়। মহারাজকি জয়। এ অবতারে আমি বড় সুখী। ভক্তকে রক্ষা করিতে হয় না। ভক্তেরাই আমায় রক্ষা করে। বরং রাজা বর লও। তথাস্তু। এখন ঘরে যাও। আমি নিদ্রা যাই।

রাজা। নৃসিংহ দেব! তোমার প্রহ্লাদ কই ?

পিতম। তুমিই আমার প্রহ্লাদ, তুমিই আমার ভক্ত।

রাজা। আর তোমার রাজা হিরণ্যকশিপু কই ?

পিতম। (চূড়াধন বাবুকে দেখাইয়া) ঐ আমার হিরণ্যকশিপু।

রাজা। চূড়াধন ত রাজা নহে।

পিতম। শীঘ্র হবেন।

হঠাৎ রাজা ও চূড়াধন উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। কেমন একটা ভয়ে রাজার হৃৎকম্প হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল। একবার তাঁহার মনে হইল, পাগল কেন অশুভ কথা হঠাৎ মুখে আনিল ? পরক্ষণেই মনে হইল, পাগলের কথা মাত্র। আমার সন্তান থাকিতে চূড়াধন কেন রাজা হইবে ? চূড়াধনের মঙ্গল হউক, আমার সোণার চাঁদও চিরজীবী হউক।

চূড়াধন বাবুর চাঞ্চল্য কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার নয়ন চকিতের ন্যায় বিস্ফারিত হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমত ক্ষুদ্র হইয়া শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পশু-শালা হইতে বহির্গত হইয়া রাজা ইন্দ্রভূপ অন্যমনস্কে অতিথি-শালার দিকে চলিলেন। প্রথমে দুইজন ভোজপুরী পালোয়ান বুক ফুলাইয়া, মাথা হেলাইয়া, ঢাল-তরোয়াল লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের প্রায় বিংশতি হস্ত ব্যবধানে রাজা স্বয়ং, তাঁহার পশ্চাতে দ্বাদশজন অধ্যাপক, রাজপুরোহিত এবং চূড়াধন বাবু। তৎপরে রাজচিকিৎসক, জাতিতে বৈদ্য ; পরে খাজনাখানার একজন মুহুরি, জাতিতে কায়স্থ ; তৎপরে একজন আচার্য্য ডম্বুরাকৃতি ঘটিকাযন্ত্র দুই হস্তে ধরিয়া একাগ্রচিত্তে বালুকাক্ষরণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। আচার্য্যের পশ্চাতে পরিচারকগণ, কাহার হস্তে ক্ষুদ্র ছত্র, কাহার হস্তে পিকদানি, কাহারও হস্তে পানের বাটা। সর্ব্বপশ্চাতে একখানি সুন্দর শিবিকা, বাহক-স্কন্ধে হেলিতেছে দুলিতেছে। আর তাহার দুই পার্শ্বে চারি পাঁচ জন রক্ষক লাঠি-শড়কি

লইয়া শূন্য শিবিকা রক্ষা করিতে করিতে চলিতেছে।

রাজার বেশ-ভূষা অতি সামান্য; মণি-মুক্তা নাই, জরি-জবরজং নাই, অধ্যাপকের ন্যায় একখানি সামান্য পট্টবস্ত্র ত্রিকচ্ছ করিয়া পরিধান; গলায় উত্তরীয়, পদদ্বয়ে পাদুকা, হস্তে একটী যষ্টি। এক্ষণকার ব্যবহার দেখিয়া বিচার করিলে দণ্ডটী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে—অন্যন অর্দ্ধহস্ত-পরিমাণ দীর্ঘ অনুভব হইবে। রাজার লাঠি বলিয়া যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, এমত নহে। ভদ্রলোক মাত্রের যষ্টি এইরূপ দীর্ঘ হইত। তৎকালে চৌকিদারের লাঠি মস্তক-পরিমাণ হইত, বাহকের লাঠি স্কন্ধ-পরিমাণ হইত, ভদ্রলোকের যষ্টি প্রায় বক্ষ-পরিমাণ হইত।

রাজা দণ্ডটী মুষ্টি-বদ্ধ করে ধরিয়া চলিতেছেন; তৎকালের প্রথাই এইরূপ ছিল, সকল দ্রব্যই মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া ধরিতে হইত, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কার্য্য করিতে হইত। তৎকালে অঙ্গুলীর ব্যবহার বড় ছিল না। কারণ, শিল্প বড় প্রচলিত হয় নাই, শিল্পের পূর্ব্বে কৃষি-অবস্থায় সমাজের সকল কার্য্য মুষ্টিতেই চলিত, ভূমিখনন হইতে ঘণ্টাবাদন পর্য্যন্ত সকলই মুষ্টির কার্য্য। প্রহার মুষ্টি দ্বারা, ভিক্ষা-দান মুষ্টিদ্বারা, লেখা (মুটকলম) মুষ্টি দ্বারা। কাজেই যষ্টিধরণও মুষ্টি দ্বারা।

রাজা ইন্দ্রভূপ গৌরাঙ্গ ছিলেন। দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূলকায়। তাঁহাকে দেখিবামাত্রেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নাসার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। নাসা বিশেষ উন্নত নহে, কিন্তু দীর্ঘ; ক্রমে উন্নত হয় নাই, ভ্রূযুগ হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভ্রূযুগল যুক্ত। অঙ্গে কোথাও চন্দন নাই, কিন্তু অনবরত সেই সদ্‌গন্ধ। বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

রাজা অতি মৃদু-পাদবিক্ষেপে চলিতেছেন, দুই একবার মস্তক নাড়িতেছেন, আপনার মনের সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছেন। রাজপথ দিয়া যে চলিতেছেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কিয়দ্দূর গিয়া একস্থলে দাঁড়াইলেন। চারিদিকে নগরবাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে, রাজা তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রহাচার্য্য কৈ?" গ্রহাচার্য্য অগ্রসর হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি যোগ?"

গ্রহাচার্য্য। ব্যতীপাত যোগ।

রাজা এই বলিয়া আবার পূর্ব্বমত চলিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার বিমর্ষ-ভাব স্পষ্ট হইতে লাগিল।

রাজা যখন পশু-শালায় ছিলেন, তখনই দিবাবসান হইয়াছিল। এক্ষণে শয়নকাল উপস্থিত। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল। শঙ্খ প্রথমে একটী দুইটী, এখানে সেখানে, ভগ্ন স্বরে, নিম্ন স্বরে, কম্পিত স্বরে, পরে একেবারে প্রতিগৃহে গম্ভীরস্বরে বাজিয়া উঠিল, শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। রাজা আরও বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন, মরণোন্মুখ কোন ভীষণ অসুর হতাশ-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাঁহার কর্ণে শঙ্খধ্বনি অমঙ্গল-ধ্বনি বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা আবার দাঁড়াইলেন; চূড়াধন বাবুকে ডাকিলেন। চূড়াধন বাবু সঙ্কুচিত ভাবে অগ্রসর হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমার নিকটে আইস, আরও নিকটে আইস। তুমি আমার পিতামহের প্রপৌত্র, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইচ্ছা করে তোমায় আমি বুকে করি।" শেষ কথাগুলি ভগ্ন-স্বরে বলিয়া চূড়াধন বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া রাজা চলিলেন। কতক দূর গিয়া রাজা চূড়াধনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন,—"তুমি অরোগী হও, তুমি চিরজীবী হও।" চূড়াধন বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, নম্রমুখে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এমন সময় দেব-মন্দিরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল; রাম-সীতার আরতি আরম্ভ হইল। নগরবাসীরা ঠাকুর দর্শন করিতে বাহির হইল।

নহবৎ, সানাই, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, সকল একেবারে বাজিতে লাগিল; বালকদিগের অন্তর নাচিয়া উঠিল, সকলে সেই দিকে ছুটিল; যে ছুটিতে পারিল না, সে কাঁদিতে লাগিল। এক কুটীর-সম্মুখে একটী বালিকা একা বসিয়া কাঁদিতে-ছিল, তাহার সহোদর তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। বাদ্যোদ্যম হইবামাত্র ঠাকুর দর্শনে সে ছুটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে লইয়া গেল না বলিয়া বালিকা কাঁদিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় এক বৎসর; দরিদ্র-সন্তান, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট, দেখিলেই বোধ হয়, বড় স্নেহের ধন, অঙ্গে কোথাও ধূলার লেশমাত্রও নাই, নয়নে কজ্জল, ভ্রূযুগলের মধ্য-স্থানে একটী কজ্জল টীপ, মুখখানি অতি যত্নে মার্জ্জিত।

বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা সেইখানে দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবু রাজার ইচ্ছা অনুভব করিয়া বালিকাকে ভুলাইতে গেলেন, করতালি দিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে আহ্বান করিলেন। বালিকা ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল, কুটীরে যাইবার নিমিত্ত পৈঠায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ব্যাকুলিত-স্বরে আরও কাঁদিতে লাগিল। রাজা তখন চূড়াধন বাবুকে সরিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইলেন, দুই একবার ডাকিলেন; বালিকা ফিরিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র দুই বাহু বিস্তার করিয়া হাসিল। একজন অধ্যাপক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিলেন, "কন্যাটী ব্রাহ্মণের সন্তান।" রাজা অতি আদরে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কন্যাটী তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া একবার পথের দিকে হস্ত বাড়াইয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল। রাজা বালিকার মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর দর্শন করিবে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করিব, অনেক দিন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করি নাই, তোমার দ্বারা তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন। চল, তোমায় আমি বুকে করিয়া লইয়া যাই।" বালিকা আনন্দে হাসিতে লাগিল।

বালিকার গর্ভধারিণী জল আনিতে গিয়াছিল। কুটীর-সম্মুখে অনেকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম দেখিয়া কলস-কক্ষে অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সকলে চলিয়া গেলে, ব্রাহ্মণী প্রতিবাসীদের নিকট সকল শুনিয়া মনে করিলেন, তাহার সন্তানকে রাজা আর ফিরিয়া দিবেন না, অতএব রীতিমত কাঁদিতে বসিলেন।

রাজা কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া রামসীতার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সিংহদ্বারে নহবৎ বাজিতেছিল, বালিকা ঊর্দ্ধমুখে রাজাকে সেই বাদ্যস্থান দেখাইতে লাগিল। রাজা ক্রমে মন্দিরে উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা বালিকাকে বুক হইতে নামাইয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। বালিকাটীও তাঁহার পার্শ্বে এক প্রকার শয়ন করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে করিতে রাজার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। রাজা উঠিলেন দেখিয়া বালিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল, স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত দেবমূর্ত্তি দেখিয়া "ঐ ঐ" বলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিল। আবার পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল, এই সময় বাদ্যোদ্যম স্থগিত হইল। বালিকা "যা—যা" বলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। শেষে রাজার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে যাবে?" কন্যাটী আবার দেবমূর্ত্তির দিকে ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারিত করিয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল।

মন্দিরে একটী ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! সন্তানটী কি রাজকন্যা?" রাজা বলিলেন, "না"। এই বলিয়া বালিকাকে আবার পূর্ব্বমত বুকে তুলিলেন। বালিকা বুকে উঠিয়া একবার রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর রাজস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া স্থিরভাবে রহিল। রাজা তখন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "বালিকাটী কাহার কন্যা, আমি তাহা এ পর্য্যন্ত জানি না, পথে কন্যাটী কাঁদিতেছিল, আমাকে দেখিয়া আমার ক্রোড়ে আসিল, কোনমতে আর কাহার ক্রোড়ে গেল না।"

ব্রহ্ম। আশ্চর্য্য! শিশুদের ত এরূপ কখন দেখা যায় নাই; কখন অপরিচিত লোকের নিকট যায় না।

রাজা। বুঝি সন্তানটী নিদ্রা গেল। ইহার আত্মীয় কেহ আসিয়াছে?

"আসিয়াছে" বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ যোড়করে সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কন্যাটীর কে হন?"

ব্রাহ্মণ। পিতা।

রাজা। আপনি বড় ভাগ্যধর। এ কন্যা আমার হইলে আমিও আপনাকে ভাগ্যধর মনে করিতাম, বুক হইতে নামাইতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু আপনার কন্যা আমি কি বলিয়া রাখিব, নতুবা আমার ইচ্ছা করে, আমি কন্যাটীর লালনপালন করি।

এই কথায় ব্রাহ্মণ ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া একজন প্রতিবেশী বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এ প্রদেশের রাজা, আমরা সকলেই আপনার সন্তান-স্বরূপ। আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারেন। আপনি যদি কন্যাটী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? দরিদ্রের কন্যা আপনি ক্রোড়ে করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা সকলে চরিতার্থ হইয়াছি। দরিদ্রের প্রতি যে দেশের রাজার ঘৃণা নাই, সে দেশের প্রজা অপেক্ষা সুখী কে?"

রাজার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চূড়াধন বলিলেন, "শিশু-সম্বন্ধে রাজা-প্রজা নাই, ধনবান্-দরিদ্র নাই। সন্তানমাত্রেই পবিত্র। যে শিশুকে ক্রোড়ে করে, সেই পবিত্র হয়, সেই চরিতার্থ হয়, সন্তানের কিছু গৌরব-বৃদ্ধি হয় না।"

রাজা বলিলেন, "তথাপি আমি কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিয়াছি। আমার ক্রোড়ে করা ব্যর্থ হইবে না। কন্যাটী রাজকন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইবে। আমি তাহার বন্দোবস্ত আগামী প্রাতে করিয়া দিব। আমার বড় যন্ত্রণা হইয়াছিল, আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কন্যাটীকে ক্রোড়ে করিয়া অবধি আমার সকল দুর্ভাবনা গিয়াছে। আবার স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছি। কন্যাটী বড় চমৎকার, আমি আন্তরিক ভালবাসিয়াছি। কন্যাটী যাহাতে সুখে থাকে, আমি তাহা অবশ্য করিব। এক্ষণে আপনার কন্যা আপনি লইয়া যান।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দয়া! আশ্চর্য্য দয়া!"

দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজার ক্রোড় হইতে কন্যাকে গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। চূড়াধন বাবু কন্যাকে লইয়া ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন। কন্যা নিদ্রা গিয়াছিল, চূড়াধন বাবুর হস্তে জাগরিত হইয়া পিতৃক্রোড়ে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতা ভুলাইবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় "ও আয়, আয় রে" বলিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। কন্যাটী তাহাতে শান্ত হইল না। রাজা তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার ক্রোড়ে আসিবে? আইস।" কন্যাটী এই আহ্বানে মাথা তুলিয়া রাজাকে দেখিল। দেখিয়াই হস্ত প্রসারণ করিয়া রাজ-ক্রোড়ে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইলেন। বালিকা আবার পূর্ব্বমত রাজস্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল, রাজাও আশ্চর্য্য হইলেন।

নিদ্রা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে, রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যাটী প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় করিলেন। যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটীর নাম কি?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "মাধবীলতা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরতি শেষ হইলে সকলেই প্রণাম করিয়াছিল, কেবল ব্রহ্মচারী বক্ষে বাহুবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রণাম করেন নাই। তিনি দেবমূর্ত্তিকে কখন প্রণাম করেন নাই, এ কথা সকলে জানিত, অথচ সেজন্য কেহ তাঁহাকে অভক্তি করিত না, বরং সকলেই বলিত, ব্রহ্মচারী জ্ঞানী, তাহাতেই তিনি রামসীতার মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন না।

ব্রহ্মচারী মাসে মাসে একবার করিয়া সন্ধ্যার সময় রামসীতার আরতি দর্শন করিতে আসিতেন। যাঁহারা এই সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, সকলের সহিত তিনি অতি স্নেহে কথাবার্ত্তা কহিতেন। অনেকের নাম জানিতেন; তাহাদের সাংসারিক অবস্থাও জানিতেন; নাম ধরিয়া তাহাদের ডাকিতেন এবং সংসারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু কেহ সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর করিতেন না; কখন কখন বলিতেন, "আমি সংসারী নহি, এ সকল বিষয়ের মন্ত্রণা আমা অপেক্ষা অন্যে ভাল দিবে।"

সিংহগড় গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক প্রান্তরমধ্যে একটী ভগ্ন মন্দিরে ব্রহ্মচারী একাকী বাস করিতেন। মন্দিরটী কোন দেবমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় মন্দিরে কোন মূর্ত্তি ছিল না। প্রবাদ আছে যে, এক কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত তথায় আনীত হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রিকালে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতকগুলি নিরীহ শান্ত লোক আসিয়া প্রতিমাকে নিকটস্থ দীর্ঘিকায় নিক্ষেপ করে এবং কালীমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া, সেই রাত্রিকালে তাহারা অবগাহন-স্নান করে। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, দীর্ঘিকার নাম কালীদহ।

ব্রহ্মচারীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সাক্ষাৎ হয় না। মন্দিরের দ্বার সর্ব্বদাই খোলা থাকে, অথচ প্রবেশ করিলে কখন ব্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া যায় না। মন্দিরের তিনদিকে প্রান্তর, এক দিকে কালীদহ। তথায় একটী বকুলবৃক্ষ, দুইটী বেলবৃক্ষ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ কি লতা নাই। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোথাও ব্রহ্মচারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখনই অনুসন্ধান করা যায়, তখনই এইরূপ। অথচ লোকে

বলে, ব্রহ্মচারী এই স্থানে বাস করেন ; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেই কথা বলেন। মাসান্তরে কেবল রামসীতার মন্দিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের শ্রদ্ধা তাঁহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য। দেবভক্তি তাঁহার একবারে ছিল না। তিনি কখন দেবতাকে প্রণাম বা পূজা করেন নাই, কেহ কখন তাঁহাকে সন্ধ্যা-পাঠ করিতে শুনে নাই, অথচ সকলেই তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। তিনি কখন কোন ভবিষ্যৎ কথা বলেন নাই, অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া রাষ্ট্র ছিল। তিনি কখন কাহাকে ঔষধ দেন নাই, কিন্তু লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মনে করিলে সকল রোগই আরাম করিতে পারেন। লোকের এরূপ বিশ্বাস, এরূপ শ্রদ্ধা কেন হইল, তাহা অনুভব করা কঠিন ; কিন্তু চূড়াধন বাবু মনে মনে তাহা একপ্রকার অনুভব করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেওয়ানপুত্র নবকুমারকে তিনি একদিন এই কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী হয় জুয়াচোর, নতুবা অদৃষ্টবান পুরুষ। নবকুমার তাহাতেই মত দেন।

রামসীতার মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মচারী আপন আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কতক দূর যাইতে যাইতে কয়েকজন গ্রাম্য লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কার্য্য উপলক্ষে প্রাতে সিংহশত গ্রামে আসিয়াছিল, এক্ষণে কার্য্যসমাধানান্তে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাগমন করিতেছে। ব্রহ্মচারী তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন নানা কথার পর বলিল, ঠাকুর, আজ এই মাত্র আমরা একটা বড় কুসংবাদ শুনিয়াছি। রাজা আমাদের দেবতাস্বরূপ, রাজার ধর্ম্মে প্রজার ধর্ম্ম, রাজা যদি এরূপ হন, ত আমাদের কি দশা হইবে? শুনিলাম, রাজা নাকি এই মাত্র সন্ধ্যার সময় লোকজন লইয়া স্বয়ং একটী ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যুবতী কত চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ তাহার রক্ষার্থে আসিল না ; যে রক্ষক, সেই যদি ভক্ষক হয়, তবে আর কে কথা কহিবে? ভয়ে তাহার পিতা পলায়ন করিয়াছিল, স্বামী বাটী নাই, নতুবা সে রাজা বলিয়া বড় ভয় করিত না। তা সে যাহাই হউক, পৃথিবীর দশা হল কি? এ যে ঘোর কলি উপস্থিত, রাজা হইয়া প্রজার কন্যা-হরণ? কি সর্ব্বনাশ! আর বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই দুর্ম্মতি, ইহা অপেক্ষা দেশের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে?"

বৃদ্ধ চুপ করিল দেখিয়া একজন সঙ্গী বালক বলিল, "পিতম পাগ্‌লার কথা বল। রাজা তাহাকে পিঁজরায় পুরিয়াছেন।"

বৃদ্ধ বলিল, "ভাল কথা মনে! ঠাকুর, দুঃখের কথা কি বলিব? একটা পাগল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, কাহারও অনিষ্ট করিত না, তাহাকে ধরিয়া না কি বাঘের মুখে দিবার হুকুম হইয়াছিল। শেষে কে চূড়াধন বাবু আছেন, তিনিই না কি তাহাকে রক্ষা করেন। তথাপি দেওয়ানজীর পরামর্শে রাজা তাহাকে পিঁজরায় বন্ধ করিয়াছেন ; বাঘের পার্শ্বে রাখিয়াছেন, সে একপ্রকার বাঘের মুখেই দেওয়া! এতক্ষণ হয় ত বাঘ তাহাকে উদরে পুরিয়াছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, বাঘ তাহাকে দেখিয়া লাফাইতেছে, ঝাঁপাইতেছে, এক একবার গারদের উপর দুই পা দিয়া দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে আর হাঁ করিতেছে।"

বালক বলিল, "একপাশে বাঘ আর একপাশে ভালুক।"

বৃদ্ধ। কি আপশোষ, কি আপশোষ! এত পাপ! পৃথিবী আর বহিতে পারিবেন কেন? রাজ্য আর থাকে না!

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর দিলেন না। কতক দূর অন্যমনস্কে চলিলেন ; পরে যখন উত্তর দিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, গ্রাম্য লোকেরা অন্যপথে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী কতক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে কি মনে করিয়া সিংহশত গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইলে পর ব্রহ্মচারী দেওয়ানজীর অতিথিশালায় প্রবেশ করিলেন। তৎসংবাদ শুনিয়া দেওয়ানজী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া বসিলে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত কুশল?"

দেওয়ান। মহাশয়ের শ্রীচরণ-প্রসাদে সকলই কুশল বলিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী। তাহা শুনিলেই আমাদের সুখ। অনেকদিন দেখি নাই, কোন সংবাদও লইতে পারি নাই, তাহাতেই একবার আসিলাম।

দেওয়ান। অনুগ্রহ আপনার।

ব্রহ্মচারী। রাজার কুশল?

দেওয়ান। শ ক কুশল বটেই, মানসিক মঙ্গল বলিয়াও বোধ হয় না।

ব্রহ্মচারী। রাজকার্য্য-সম্বন্ধে কিরূপ ?

দেওয়ান। তাহাও মন্দ নহে। তবে বোধ হয়, ইদানীং সকলেই তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহে।

ব্রহ্মচারী। আমি তাহা কতক বুঝিয়াছি। তবে সবিশেষ জানি না, এক্ষণে শুনিতেও বড় ইচ্ছা করি না; মনে জানি যে, যখন আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজার পরামর্শদাতা, তখন তাঁহার মঙ্গলই সম্ভব, সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবেন। তবে বোধ হয়, বিপক্ষদল কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়া থাকিবে, অথবা তাহাদের কার্য্যকারিতা-শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে

দেওয়ান। তাহা সত্য, এইমাত্র তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী। কিরূপ ?

দেওয়ান। রাজার প্রতি যাহাতে প্রজার শ্রদ্ধা কমে, এরূপ অপবাদ রটান হইতেছে। তাহা হউক, এরূপ হইয়াই থাকে, তাহার নিমিত্ত আমি বড় ব্যস্ত নহি, কিন্তু এক কথার নিমিত্ত আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় রাজা ব্রাহ্মণকন্যাকে ক্রোড়ে করিয়াছেন, কিন্তু রাত্রি এক প্রহর হইতে না হইতেই সে কথা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া দশ রাষ্ট্র হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী। যখন আপনি এ সকল বুঝিয়াছেন, তখন আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই। এক্ষণে আমি আশ্রমে যাই।

দেওয়ানজী প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারীকে বিদায় দিলেন; অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে একজন চোপদার রামসীতার পাড়ায় রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্তে মুসলমানী গঠনের এক দীর্ঘ শূল ছিল, তাহা সজোরে মৃত্তিকায় প্রহার করায় শূল প্রোথিত হইয়া রহিল। তখন চোপদার তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন চোপদার অতি গম্ভীরভাবে সেই স্থানে পাদচারণ করিতে আরম্ভ করিল। পল্লীস্থ অধিবাসীরা একে একে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে অনেকগুলি লোক আসিয়া জমিল। চোপদারের এ সময়ে এ স্থানে একা আসা অসম্ভব বলিয়া দুই একজন হেতু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলে, চোপদার কেবলমাত্র প্রশ্নকারীর মুখ প্রতি একবার কটাক্ষ করিল, কোন উত্তর দিল না। চোপদার হিন্দুস্থানী, কাজেই দ্বিতীয়বার তাহাকে প্রশ্ন করিতে আর কেহ সাহস করিল না। কিছু বিলম্বে বৃত্তান্ত অবশ্য জানা যাইবে, এই বিবেচনায় সকলে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চোপদার পূর্ব্বমত পাদচারণ করিতে লাগিল।

বালকেরা রৌপ্য-শূলের চাক্‌চক্য পরস্পর পরস্পরকে দেখাইতে লাগিল। যুবকেরা আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি নানা তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল। কেহ বলিল যে, এখানে কোথাও একটী মন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাহাতেই চোপদার আসিয়াছে। কেহ বলিল যে, তাহা নহে, এখানে অতিথিশালা হইবে। আবার কেহ বলিল, ইট-কাঠের ব্যাপার নহে, কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে, ইহার পর জানিতে পারিবে। চতুর্থ আর এক ব্যক্তি বলিল, ব্যাপার আর কিছুই নহে, এখানে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে, যেখানে চোপদার শূল গাড়িয়াছে, ঠিক ঐ স্থানে হইবে। এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া হাসিল। মুখভঙ্গী দেখিয়া হাসির অর্থ অনেকের মনে পড়িল, "ঠিক বলিয়াছ, ঠিক বলিয়াছ" বলিয়া প্রকাশ্য হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে একজন বলিল, "স্তম্ভ তবে আর একটু সরিয়া হইবে," এই বলিয়া নিকটস্থ একটী বাটীর প্রতি কটাক্ষ করিল, আবার হাসিয়া উঠিল।

যে বাটীর উদ্দেশে এই হাসি হইল, সেই বাটীর দ্বার খোলা ছিল। এক বৃদ্ধা বিধবা, গলায় ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, দ্বারে আসিয়া অতি তীব্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বহু লোকের সমাগম স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিল, "বিপদ্ দেখ, কার জঞ্জাল কোথায় আসিল।" পরে বৃদ্ধা পুত্রবধূর উদ্দেশে বলিল, "আজ আর জল আনিতে কি অন্য কার্য্যে যাইবার প্রয়োজন নাই, জলের আবশ্যক হয়, আমি আনিয়া দিব।" পুত্রবধূ গৃহমার্জ্জন করিতেছিল, কোন উত্তর করিল না, সস্নেহে কন্যার প্রতি চাহিয়া মাথা আন্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "জল আনিতে হয়, পুটু আনিয়া দিবে, কেমন পুটু ?" পুটু ধূলায় বসিয়া এক একটী করিয়া খৈ খাইতেছিল, গর্ভধারিণীর স্বর শুনিয়া তাঁহার প্রতি চাহিল। মাতা আবার

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন পুটু?" পুটু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ক্ষুদ্র হস্তে একটী খৈ তুলিয়া মাকে দেখাইতে লাগিল—"এ এ"। মা বলিলেন, "খাও, খাও. দেখ মা, যেন কাকে লয় না।" কাকের নাম হইবামাত্র এই ভাতভাবে পুটু চারিদিকে দেখিতে লাগিল। পুটু যদিও এক বৎসরের বালিকা, নিজে কথা কহিতে পারে না, কিন্তু দুই একটী কথা বুঝিতে পারে। কাকের নামমাত্রেই হয় ত আপনার বিপদ বুঝিতে পারিল। প্রাতে উঠিয়া কেবল গুটীকতক খৈ পাইয়াছিল, তাহা এখনি কাকে লইয়া যাইবে, এই ভয়ে চারিদিক্ দেখিতে লাগিল।

বাস্তবিকই তৎকালে কাক আসিয়া চালে বসিয়াছিল। পুটু তাহাকে দেখিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিলে তাহার গর্ভধারিণী আসিয়া কাক তাড়াইয়া দিল। পুটু আহ্লাদে হাসিয়া উঠিল, "য় যা" বলিয়া দুই হাত নাড়িতে লাগিল। মাতা যত্নে পুটুর ক্ষুদ্র মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, "খাও মা. এইখানে বসিয়া খাও। খৈ ধুলায় ফেল না, ধামিতে রেখে খাও, কাল তোমার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হবে, তখন তুমি সোণার ধামিতে খৈ খাবে. কেমন পুটু?" পুটু আবার হাসিয়া দুই হাত বাড়াইল। মা মুখ-চুম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবামাত্র আবার কাক আসিল। এবার চালে না বসিয়া পুটুর নিকট বসিল। পুটু ভয়ে চক্ষু বুজিল। কাক ক্রমে খৈগুলি সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া গেল। তখন পুটু চাহিয়া ধামি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দন শুনিয়া পুটুর মা দৌড়িয়া আসিলেন, ধামি শূন্য দেখিয়া প্রথমে কাককে, পরে আপনার অদৃষ্টকে গালি দিতে লাগিলেন। শেষে পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন, "কেন মা, এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে? আবার এখন খৈ আমি কোথায় পাব?"

পুটু শীঘ্রই কান্না ভুলিয়া গেল, আপনিই চক্ষের জল মুছিল, কিন্তু মুছিতে গালে, নাকে, হাতে চক্ষের অঞ্জন লাগিয়া গেল। "ঐ কি করিল" বলিয়া গর্ভধারিণী গাত্রমার্জ্জনী আনিয়া কালি মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন, "পুটু আমার কেমন সুন্দর মেয়ে, পুটু আমার আজ আসার রাজার কোলে উঠিবে—রাজা আবার আজ কোলে লইতে আসিবেন, না পুটু?" মাধবীলতার আদরের নাম পুটু।

গৃহমধ্যে এইরূপে যখন গর্ভধারিণী মাধবীলতাকে লইয়া আদর করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজপথে একজন কারকুন আসিয়া নিকটস্থ গৃহস্থদিগের নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইতেছিল। কাহার কাহার বাটীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাণ করিতেছিল। গৃহস্বামীদের আর ইহা দেখিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না। এক্ষণে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইল। গৃহস্থের পক্ষে ইহাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? পূর্ব্বের হাস্যরহস্য কাজেই লোপ পাইল। সকলেই গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া মনে মনে মাধবীলতার পিতা রামসেবককে তিরস্কার করিতে লাগিল। রামসেবক তৎকালে বাটী ছিলেন না, প্রাতেই আহার্য্য সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বস্ত্রাগ্রে কতকগুলি শাক, কদলী, বিল্বপত্র; হস্তে একটী বার্ত্তাকু। তাঁহাকে চিনিবামাত্র চোপদার আসিয়া প্রণাম করিল এবং যোড়করে বলিল যে, "আপনার সেবায় যে সকল দাসদাসী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা আগতপ্রায়, বস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছে। আপাততঃ চারিজন দারবান্ উপস্থিত আছে, আপনার যেরূপ অনুমতি হয়।" রামসেবক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, চোপদার আর কাহাকে নিবেদন করিতেছে মনে করিয়া, পশ্চাতে দেখিলেন; সে দিকে কেহই নাই, হতবুদ্ধি হইয়া শাক-বার্ত্তাকু ফেলিয়া চোপদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অগত্যা একজন প্রতিবেশী বলিয়া উঠিল, "আমাদের দেশত্যাগী করিবার নিমিত্ত তোমার যদি ইচ্ছা ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিলেই আমরা আপনারাই চলিয়া যাইতাম, এ সকল যোগাযোগ করিবার আর তোমার আবশ্যক হইত না।" আর একজন বলিয়া উঠিল, "তুমি বড়লোক, আমাদের মত সামান্য লোকের উপর এ সকল অত্যাচার করা উচিত হয় নাই।" রামসেবক কাতর-নয়নে সকলের মুখ প্রতি চাহিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজবাটী হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলেই অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে সকলের মুখ ভার হইল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে গোপনে উপহাস আরম্ভ হইল, কেহ কটাক্ষ দ্বারা, কেহ বা অঙ্গস্পর্শ দ্বারা উপহাস করিতে লাগিল। গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তাহাদের রহস্যপ্রবৃত্তি ক্ষান্ত হইল না। ধনাঢ্যের প্রতি উপহাস, দরিদ্রের প্রতি

উপহাস, বৃদ্ধের প্রতি উপহাস, যুবতীর প্রতি উপহাস, সতীত্বের প্রতি উপহাস স্বরে স্বরে আরম্ভ হইল

তাহাদের গৃহিণীরাও ঈর্ষাপরবশ হইয়া নানা কথা আরম্ভ করিল। অনেকেই স্থির করিল যে, "গহনা পরার গলায় দড়ি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে যখন রাজা ইন্দ্রভূপ আত্মীয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছিলেন, একখানি শিবিকা তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। একজন পরিচারক আসিয়া যোড়হস্তে বলিল যে, পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। রাজা ইঙ্গিত দ্বারা সংবাদ গ্রহণ করিলেন; পুরাণপাঠ পূর্ব্বমত চলিল।

অন্তঃপুরে শিবিকা রক্ষিত হইল, তিন চারিজন পরিচারিকা আসিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিল। "যা যা" বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া উঠিল, পরে পাল্কী হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনৈক পরিচারিকা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল; ক্রোড় হইতে বালিকা মাকে ডাকিতে লাগিল। পাল্কীতে একটী যুবতী ছিলেন, তিনিই বালিকার মা। পরিচারিকার তাহার সসম্মানে আহ্বান করিলে, তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন। তাহার পরিধান মুরসিদাবাদী পট্টবস্ত্র, আপাদমস্তক নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। কিন্তু সকলগুলি অঙ্গোপযোগী নহে, অনেকগুলি অঙ্গ হইতে স্খলিতোন্মুখ। পাল্কীর নিকট দাঁড়াইয়া যুবতী সেগুলি অঙ্গে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিতেছেন না দেখিয়া জনৈক পরিচারিকা সাহায্য করিল। অলঙ্কারের দৌরাত্ম্য শেষ হইলে যুবতী আবার দেখিল, বস্ত্র আয়ত্ত করিয়া রাখা ভার হইল। পরিচারিকারা তাহা বুঝিতে পারিয়া যত্ন জানাইবার উপলক্ষে সবস্ত্র তাহার অঙ্গ ধরিয়া রাণীর নিকট লইয়া চলিল।

রাণী তৎকালে কিঞ্চিৎ দূরে বারান্দায় ব্যজনহস্তে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বামে মস্তক হেলাইয়া দেখিতেছিলেন। যুবতী অতি কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাণী আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক যুবতীকে তুলিলেন এবং নিকটে উপবেশন করিতে দিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া পরিচারিকার ক্রোড় হইতে বালিকাকে লইলেন। পরিচারিকার ক্রোড়ে বালিকা ম্লানভাবে থাকিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছিল, ক্রোড়পরিবর্ত্তন হওয়াতে সে ভাব কতক গেল। রাণীর ক্রোড়ে গিয়া বালিকা প্রথমে স্বর্ণখচিত বস্ত্রাঞ্চল দেখিতে লাগিল, তাহার পর একবার মুখ তুলিয়া রাণীর প্রতি চাহিল। কপালে হীরক জ্বলিতেছে দেখিয়া, তাহা স্পর্শ করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিল, হস্ত সে পর্য্যন্ত গেল না। এই সময় কণ্ঠের হীরকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বালিকা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া বলিতে লাগিল, "এ এ।" রাণী বালিকার মুখচুম্বন করিয়া শয্যার উপর বসিলেন, বালিকাকে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন, তাহার গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটীর নাম কি?" গর্ভধারিণী বলিলেন, "পুটু।" রাণী বলিলেন, "কল্য মহারাজ বলিয়াছিলেন, নাম মাধবীলতা। তা হউক। মাধবীলতা অপেক্ষা পুটু নাম ভাল। পুরুষেরা মাধবীলতা বলুন, আমরা পুটু বলিব।"

এই সময় মাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় পুটু রাণীর ক্রোড় হইতে মাতার ক্রোড়ে গেল, আবার মার ক্রোড় হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া রাণীর ক্রোড়ে বসিয়া মার প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "আয়" বলিয়া মা হাত বাড়াইলে পুটু হাসিয়া রাণীর বস্ত্রান্তরালে মুখ লুকাইল, আবার অল্পে অল্পে মুখ বাহির করিয়া মাকে দেখিতে লাগিল। তাহার প্রতি মার দৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার হাসিয়া মুখ লুকাইল।

রাণী একজন পরিচারিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "রাজকুমার আমার এরূপ খেলা জানে না। রাজকুমার কোথায়? একবার এইখানে আনিয়া পুটুর কাছে বসাইয়া দেও, দুইজনে কি করে দেখি।" পরিচারিকা উঠিয়া গেল।

আর একজন পরিচারিকা আসিয়া পুটুর হাতে মিষ্টান্ন দিল। পুটু তাহা খাদ্য বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না, খেলিবার দ্রব্য মনে করিয়া ভাঙ্গিল; স্তন-দুগ্ধ, খৈ আর গুড় ভিন্ন পুটু অন্য দ্রব্য কখন খায় নাই, মোণ্ডা মিঠাই কখন দেখেও নাই, কাজেই ফেলিয়া দিল

এই সময় অন্তঃপুরের দ্বারে নাগরা বাজিয়া উঠিল। রাণী বলিলেন, "রাজা আসিতেছেন।" একজন পরিচারিকা পুটুর মাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল, রাজা হাসিতে হাসিতে আসিলেন। রাজাকে দেখিবামাত্র পুটু হাত বাড়াইয়া দিল, রাজা পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া রাণীর নিকট বসিলেন। রাণীকে

বলিলেন "আমি রাত্রে যে বলিয়াছিলাম, মেয়েটী চমৎকার, বাস্তবিক তাহা নয় ?"

রাণী। মেয়েটীকে কোলে করে যেন আমার কোল জুড়াল।

রাজা। শরীর চমৎকার নরম।

রাণী। আমি তা বলিতেছি না, ছেলেদের শরীর এইরূপ নরম হয়। রাজকুমারের শরীর বরং আরও নরম।

রাজা। তবে কি বলিতেছিলে ?

রাণী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "অন্য ছেলে কোলে করে এত সুখ হয় না। এই খুদে মেয়ে যেন কিছু মন্ত্র জানে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তাহা কিছুই নয়। আমি বড় ভালবাসিয়াছি বলিয়া তোমারও ভাল লাগিয়াছে।"

রাণী। তাই হবে, মেয়েটীর ত কোন খুঁত নাই, সকলই গুণ; অন্য ছেলে হলে এতক্ষণ কত কাঁদিত, পুটু এসে অবধি কেবলই হাসিতেছে। আর দেখুন, পুটুর হাসি যতবার দেখিলাম, ততবারই আপনাকে মনে পড়িল, কেন বলুন দেখি।

রাজা। মাধবীর হাসি বুঝি কতক আমার মত।

রাণী। তা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, কিন্তু এর হাতের গড়ন দেখুন, ঠিক আপনার মত।

রাজা। আবার দেখ, এর চোখ দুটী নিশ্চয় তোমার মত। প্রথমে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

রাণী। কি আশ্চর্য্য! মানুষের মত ত মানুষ হয় ?

রাজা। এ জগতে কিছুই বিচিত্র নহে। রাম-সীতার মত যদি কোন ঘটনা আমাদের হইত, তবে বলিতাম, এ আমারই লব। কিন্তু সেরূপ আমাদের কোন ঘটনা ত নাই।

রাণী। বালাই! বালাই! তাঁরা দেবতা, মাথার উপর থাকুন।

রাজা। প্রায় সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্মণকন্যাকে আর অধিকক্ষণ রাখা না হয়। আমি এখন যাই।

রাজা চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুর অতিক্রম করিলে আবার পূর্ব্বমত বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। বাদ্যোদ্যম শুনিবামাত্র রাজপ্রাঙ্গণে স্বর্ণ-মুষল হস্তে নকিব হিন্দীভাষায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া রাজার বহির্গমনবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। অমনি নহবৎ বাজিয়া উঠিল। দ্বারে সুসজ্জিত হস্তী উপস্থিত ছিল, বৃংহিত নাদ করিয়া উঠিল। অমাত্য-গণ অগ্রসর হইলেন, পরিচারিকাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রাজা পুষ্পোদ্যানে গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রভূপ উঠিয়া গেলে পুটুর মা রাণীর নিকটে আসিয়া বিদায় চাহিলেন। রাণী হাসিয়া বলিলেন, "পুটুকে রাজকুমারের সহিত আলাপ করিয়া দিই, আর একটু থাক।" এই সময় পরিচারিকা রাজ-কুমারকে আনিয়া পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিল। উভয়ের একই বয়স, দেখিতে প্রায় একইরূপ। রাজকুমার কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল মাত্র। পুটু তখন মৃত্তিকায় বসিয়া অন্যমনস্কে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। রাণী যখন প্রথমে পুটুকে ক্রোড়ে লন, কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা তাহার হস্তে দিয়াছিলেন। জনৈক দাসী তাহা পুটুর হস্ত হইতে লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়াছিল, এক্ষণে বিদায়ের সময় উপস্থিত দেখিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি আবার পুটুর হস্তে দিল, পুটু তাহা লইয়া আপন মনে খেলা করিতে-ছিল। রাজকুমারকে পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিলে পুটু ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি রাজকুমারের অঙ্গে দিল, আবার সভয়ে হাত সরাইয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিল। রাজ-কুমার কাঁদিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুটু একটী স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া "ন্না ন্না" বলিয়া রাজকুমারের সম্মুখে ধরিল। রাজকুমার প্রথমে শান্ত হইয়া পুটুর হস্তস্থিত স্বর্ণমুদ্রার প্রতি চাহিল, পরে পুটুর হাত হইতে তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রাণী বলিলেন, "ও পোড়া কপাল!" একজন সখী রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিল।

পুটুর মা রাণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। বিদায় দিবার সময় রাণী আর কোন কথা কহিলেন না, কেবলমাত্র একজনকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিয়া আসিল। পাল্কীতে প্রবেশ করিবার সময় পুটুর মা সঙ্গিনীর দুটী হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যে-শ্বরী কি আমার উপর রাগ করিলেন ?" সঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, "সে কি কথা!" বাহকগণ আসিয়া

পাল্কী তুলিল। সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিতে গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে অন্ত এক মহলে প্রবেশ করিল। রাজার কনিষ্ঠা ভগিনী বিধবা, নিঃসন্তান, তথায় বাস করেন। তাঁহার পরিচারিকারা সকলেই বিধবা, বৃদ্ধা, অধিকাংশ ব্রাহ্মণকন্তা। তাহাদের মধ্যে একজন পঞ্জিকা দেখিতে এবং গ্রন্থপাঠ করিতে পারিত। সেই ব্রাহ্মণী প্রত্যহ অপরাহ্নে রাজভগিনীকে কালী-কীর্ত্তন শুনাইত।

রাণীর সঙ্গিনী যখন প্রবেশ করিল, তখন কীর্ত্তন-পাঠ সমাধা হইয়াছে, সকলে তুলা চরকা তুলিতেছে। নিত্যই ব্রাহ্মণী পরিচারিকারা অপরাহ্নে সূতা কাটে বা পৈতা তোলে। রাজভগিনীর ব্রতে পৈতার সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়।

রাণীর পরিচারিকাকে দেখিয়া রাজ-ভগিনী বলিলেন, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে, আমি রাজার জন্ম স্বহস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়াছি," এই বলিয়া তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন; রৌপ্য-পাত্রে করিয়া দুই তিন প্রকার মিষ্টান্ন দিলেন। সঙ্গিনী তাহা হস্তে লইয়া বলিল, "একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম।"

রাজ-ভ। কি?

সঙ্গিনী। আজি সেই মেয়ে দেখিলাম।

রাজ-ভ। কোন্ মেয়ে?

সঙ্গিনী। আপনি সকল ভুলে গেছেন।

রাজ-ভ। আমার ত কই কিছুই মনে হয় না।

সঙ্গিনী। সেই হতভাগিনী।

রাজ-ভ। কোন্ হতভাগিনী?

সঙ্গিনী। আপনি কি সেই বিপদের রাত্রি ভুলিয়া গিয়াছেন?

রাজ-ভ। এখন বুঝিলাম। কোথায় দেখিলে?

সঙ্গিনী। এই রাজবাটীতে, এই মাত্র।

রাজ-ভ। সে কি? কে আনিল? চল, আমি দেখি গে।

সঙ্গিনী। এক্ষণে আর দেখিতে পাইবেন না, তারে লয়ে গিয়েছে।

রাজ-ভ। আহা! আমি দেখিতে পেলেম না। কে আনিয়াছিল?

সঙ্গিনী। তার মা।

রাজ-ভ। রাণী কি বলিলেন?

সঙ্গিনী। দরিদ্রের কন্তা বলিয়া কয়েক খান মোহর দিলেন। মেয়েটীকে রাজা বড় ভালবেসে-ছেন। আপনি কোলে নিলেন, মুখ চুমো খেলেন।

রাজভগিনী চক্ষের জল অন্তমনস্কে বসিয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে পুটুর মা গৃহকার্য্য করিতে গেলেন। প্রথমে মার্জ্জনী লইয়া গৃহমার্জ্জনা আরম্ভ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমত সময় একজন পরিচারিকা তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁটা লইল। পুটুর মা পাকশালায় চুল্লী সংস্কার করিবার নিমিত্ত গেলেন, আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! এ সকল আমাদের কার্য্য।" পুটুর মার উত্তর অপেক্ষা না করিয়া পরিচারিকা চুল্লী সংস্করণ করিতে বসিল। পুটুর মা উঠিয়া অঞ্চলে হস্ত মুছিতে লাগিলেন। এমন সময় একটী মৃৎ-কলসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পুটুর মা অমনি কলসটী কক্ষে লইয়া জল আনিতে চলি-লেন। এই সময় তৃতীয় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া কক্ষ হইতে কলস লইয়া জল আনিতে ছুটিল। পুটুর মা কোন কার্য্য করিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে অভিমান জন্মিল। খড়কি-দ্বারে দাঁড়াইয়া নখ দ্বারা কপাটের এক স্থান খুঁটিতে খুঁটিতে অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি তবে সংসারের কোন কার্য্য করিতে পাব না? আমি কি আর সংসারে কেহই নই? আমার তবে আর কাজ কি?"

বহির্ব্বাটীতে তাঁহার স্বামীও এই দশাপন্ন। তথায় চারিজন দ্বারবান বসিয়াছিল। রামসেবককে দেখিবামাত্র তাহারা উঠিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। রামসেবক অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শয়নঘর হইতে সযত্নে তামাক সাজিয়া তাহাদের নিমিত্ত লইয়া গেলেন। তাঁহার অনু-পস্থিতিতে তাহারা বসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র আবার ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল। রামসেবক তাহা-দের নিকট কলিকা রাখিয়া "আপনারা তামাক খান" বলিয়া চলিয়া আসিলেন। রামসেবক যখনই বহি-র্ব্বাটীতে যান, তখনই তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে দাঁড়ায়, কাজেই রামসেবক তাহাদের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে স্থান নাই, বিশেষতঃ তথায় তিন চারি জন দাসী রহিয়াছে; সদরে

দ্বারবানেরা। রামসেবক বড়ই কষ্টে পড়িলেন। কোথা যান? পূর্ব্বে তাঁহার যতই কষ্ট থাকুক, তিনি আপনার গৃহে নির্বিঘ্নে থাকিতে পারিতেন, এক্ষণে সে সুখ গেল। তখনকার প্রচলিত কথা ছিল যে, "পরভাতি ভাল, ও পরঘরি কিছু নয়।" রামসেবক এক্ষণে প্রকারান্তরে "পরিঘরি" হইলেন। আপনার ঘরে পরের নিমিত্ত তাঁহাকে কুণ্ঠিত থাকিতে হইল। কেন হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া রামসেবক সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহাদের দাসদাসী আছে, তাহারা সকলেই এইরূপ "পরঘরি।"

রামসেবক খড়কিদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। পথে একজন প্রতিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রতিবাসী একটু ঈষৎ হাসিলেন; রামসেবক বলিলেন, "চল ভাই, তোমার বাটীতে যাই।" প্রতিবাসী বলিল, "আমার কাজ আছে।" পরে সে অন্য পথে চলিয়া গেল। রামসেবক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে খড়কির দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আহারান্তে আবার খড়কিদ্বার দিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে পুটুর মাতা একাকিনী শয়নঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনই তাঁহাকে এরূপ বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘকাল একাকিনী থাকিতে হইত না; অপরাহ্নে সমবয়স্কারা আসিয়া জুটিত। অল্পবয়স্কারা একত্র হইয়া যদি কেবল বসিয়া থাকে—কথা কব না, কবই না, বলিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের মধ্যে আহ্লাদের তরঙ্গ উছলিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত দাসদাসী তাঁহার বাটীতে আসিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত প্রতিবাসীদের গতিবিধি রহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে সকল সময়েই কেহ না কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "আজ এখন রাঁধ্‌চ? আজ কি রান্না হয়েছিল? বেগুন কে দিলে? তেল আর কেনা যায় না, ছয় পয়সা করে সের, পরে কি যে হবে, তাহা বলা যায় না।" এক্ষণে এ সকল আলাপ করিতে কেহ আর আইসে না। কিন্তু সকলেই আপন আপন বাটীতে বসিয়া সর্ব্বদাই পুটুর মার কথা আন্দোলন করিতেছে। কেহ বলিতেছে, পুটুর মার কি অদৃষ্ট! কেহ উত্তর করিতেছে, পোড়াকপাল অমন অদৃষ্টের। কেহ বলিতেছে, রাজা না কি পুটুর মাকে সোণায় মুড়েছে। কেহ বলিতেছে, তাহার কাপড়ে নাকি মুখ দেখা যায়। কেহ বলিতেছে, এই দুই দিনে পুটুর মার শ্রী ফিরেছে, রঙ ফেটে পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে, "পুটুর মার গলায় দড়ি, আবার লোকের নিকট মুখ দেখাবে কেমন করে?"

যিনিই মুখে যাহা বলুন, পুটুর মাকে দেখিতে সাধ সকলের অতি প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু যাবার উপায় নাই, পুটুর মার কলঙ্ক রটিয়াছে, এক্ষণে তাহার বাটী যাইতে গৃহস্থেরা আপন আপন কন্যাদের নিষেধ করিয়াছেন। পুটুর মা এ সকল কথা কিছুই জানেন না, একাকিনী বসিয়া আছেন, এমত সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া কেশবিন্যাস করিতে আহ্বান করিল। পুটুর মা সকল বিষয়েই পরিচারিকাদের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই কোন উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র স্থানে গিয়া বসিলেন। তথায় নানাপ্রকার পাত্রে নানাপ্রকার উপকরণ প্রস্তুত ছিল, পুটুর মা মনে করিলেন, তাহাদের একটী একটী করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

তখনকার বঙ্গযুবতীরা এক্ষণকার ন্যায় খর্ব্বকেশা হন নাই, তখন সিন্দূরে বিষ মিশে নাই, চিনেম্যানের যুবতীর ন্যায় চুল টানিয়া বাঁধা ফ্যাসান হয় নাই, কাজেই তখন এক্ষণকার মত কেবল টাক ঢাকিতে ঘোমটার প্রয়োজন হইত না। পরিচারিকা পুটুর মার পশ্চাতে বসিল, মেঘের ন্যায় পুটুর মার কেশরাশি এলাইয়া পড়িল। পরিচারিকা তাহার মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "ঠাকুরাণীর কি চুল, আমাদের মহারাণীরও এরূপ নয়।" পুটুর মা দর্পণ তুলিয়া প্রসন্ন-বদনে আপনার চুল দেখিতে লাগিলেন। কেশরাশি অঙ্গুলিতে আন্দোলিত হইয়া আসনে খেলিতেছে। পুটুর মা ঈষৎ হাসিমুখে আপনার কেশের প্রতি কটাক্ষ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীর কেশ কি আরও ছোট?" পরিচারিকা বলিল, "আহা, সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? এবার প্রসব হওয়ার পর তাঁহার অর্দ্ধেক চুল গিয়াছে, যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল আমাদের গুণে। কেবল চুল কেন? দেখেছেন ত রাণীর বর্ণ, যেন কাঁচা সোণা, তাহাও আমাদের ফলান। রাজা যে এতটা রাণীকে ভালবাসিতেন, তাহাও আমাদের চেষ্টায়।"

পুটুর মা। রাজা কি এখন আর রাণীকে তত ভালবাসেন না?

পরি। "কই আর," এই বলিয়া পরিচারিকা

চক্ষুভঙ্গী করিয়া হাসিল। পুটুর মা তাহা দেখিতে পাইলে আর এ কথা প্রসঙ্গ করিতেন না।

পুটুর মা। রাণীর ভালবাসা গেল কেন?

পরি। তা কি জানি মা? রাণী বলে, আর সোহাগ-তেল রাণী মাখেন না বলিয়া ভালবাসা গেল।

পুটুর মা। সোহাগতৈল কি?

পরি। সে একটা তৈল।

পুটুর মা। তা আর মাখেন না কেন?

পরি। কোথায় পাবেন? আমি ছাড়িয়া গেলেম, আর তেল তাঁরে কে করে দিবে? সোহাগ-তেল সকলের হাতে হয় না। আমার স্বামী আমাকে এত ভালবাসিত যে, আমার জন্য প্রাণ ধা'র করেছিল। তাই আমি সোহাগ-তেল করে থাকি, অন্যে করিলে ফলে না; আর কাহারও স্বামী ত স্ত্রীর জন্য মরে নি।

পুটুর মা। তোমার স্বামী কি তোমার জন্য মরেছিলেন?

পরি। সে আমায় একদণ্ড চক্ষুর আড় করিত না। সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আমি স্নান করিতে যেতেম, অমনি সে গামছা-কাঁদে ছুটিত। জল আনিতে গেলে পথে পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। যেখানে যাব, সেখানে যাবে। একদিন রাত্রে আমি না বলে যাত্রা শুনিতে গিয়েছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিলে আমাকে না দেখিতে পাইয়া গলায় দড়ি দেয়। সকলে বলিতে লাগিল, "কি ভালবাসা।" ব্রহ্মচারী এ কথা শুনিয়া একদিন আমায় বলিলেন "তোমার হাতে সোহাগ-তৈল ফলিবে।" তাই আমায় তিনি সোহাগ-তৈল শিখাইয়া দিলেন; লোকে আমায় সেই অবধি সোহাগী বলে ডাকে। স্বামীর সোহাগী ছিলাম বলে সোহাগী। সোহাগ-তেল করে সোহাগী নই।

পুটুর মা। তুমি যাত্রা শুনে এসে কি করিলে?

সোহাগী। কি আর করিব? একটু কাঁদ্‌লাম, বলি তুমি কোথা গেলে, ফিরে এস, আর আমি কখন যাত্রা শুনিতে যাব না। তা মা আমরা দুঃখী লোক, আমাদের কাঁদা-কাটার সময় কই? পাঁচ জনে বারণ করিলে আর কি করি; সকলেই বলিল যে, আর কেঁদে কি হবে।

পুটুর মা আর মাথা বাঁধিলেন না, হয়েছে বলিয়া উঠিলেন। সোহাগী বলিল, "আর একটু বসুন, গা মুছাইয়া দিই সিন্দুর পরাইয়া দিই।" সিন্দুরের নাম শুনিবামাত্র পুটুর মা আবার বসিলেন। বেশ-বিন্যাস সমাপ্ত হইলে পুটুর মা উঠিয়া আপনার আপাদ-মস্তক দর্পণে দেখিলেন। রক্তবর্ণ ই তখন-কার ফ্যাশন ছিল, পায়ে আল্‌তা, পরিধানে রাঙ্গা শাটী, ওষ্ঠ তাম্বুলরাগে রাঙ্গা, কপালে সিন্দুর, অলঙ্কার রাঙ্গা সূতায় গাঁথা, তখন সকলেই রাঙ্গা ভালবাসিত। শাক্তেরা রক্তচন্দন মাখিত, জবা-ফুলে পুজা করিত। পরে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণেরও কিছু মান কমিয়াছিল। কৃষ্ণ-উপাসনা প্রবল হইলে রক্তবর্ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণের আদর বৃদ্ধি হইল; সেই সময় অবধি কালাপেড়ে ধুতি পরিচ্ছদ, দাঁতে মিশি, পিঞ্জরে কোকিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বেশবিন্যাস সমাধাত্তে পুটুর মা পুটুকে ক্রোড়ে করিয়া খড়কি-দ্বারে আসিলেন। ইচ্ছা যে, কোন প্রতিবাসীর গৃহে গিয়া দুই দণ্ড বসেন, অথচ যাইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কেন মনে এরূপ সঙ্কোচ জন্মিতেছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। বোধ হয়, অলঙ্কারাদি পরিয়াছেন বলিয়া লজ্জা হইতেছে, অথচ অলঙ্কার দেখাইতেও সাধ জন্মিয়াছে। যাওয়া উচিত কি না ভাবিতেছেন, এমত সময় তাঁহার স্বামী খড়কি-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামসেবক স্ত্রীকে দেখিয়া হঠাৎ বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পুটুর মা' বর্ণ পরিষ্কার হইয়াছে, অল্প বয়সের চাকচক্য প্রকাশ পাইয়াছে, সুন্দরী বলিয়া যেন নিজেরও প্রতীতি জন্মিয়াছে, আর পূর্ব্বের শরীরের সঙ্কোচ নাই। পুটুর মা অঞ্চলাগ্র বামকক্ষে পুটুকে লইয়া ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পুটু সর্ব্বভয়নিবারক মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া অঙ্গুলি চুষিতেছে। রামসেবক যেন একখানি প্রতিমা দেখিলেন। গৃহিণী সুন্দরী দেখা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না, ধনবান্‌দের ত কথাই নাই, স্ত্রী অপেক্ষা চতুষ্পদের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি অধিক। দরিদ্রের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্ত্রী সুন্দরী কি কুৎসিতা, তাহা রামসেবক এ পর্য্যন্ত একবারও অনুভব করেন নাই।

রামসেবক পুটুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতেছ?"

পুটুর মা। পদ্মদের বাড়ী বেড়াইতে।

রাম। গিয়া কাজ নাই।

পুটুর মা। কেন? আমি যাই না বলিয়া তারা কেহ আসে না। পন্ন আমায় ভালবাসে, আমার ছেঁড়া কাপড় দেখে কত দুঃখ করিত, এখন আমার গহনা দেখে কত সুখী হবে।

পুটুর মা অল্পবয়স্কা, অদ্যাপি জানেন নাই যে, যাহারা ছিন্নবস্ত্র দেখিয়া আহা বলে, পরে তাহারা অলঙ্কার দেখিলে মুখ ভার করে। যত দিন আমার অপেক্ষায় তুমি দীনদশাপন্ন থাক, তত দিন আমি তোমায় ভালবাসি। তাহার পর স্বতন্ত্র ব্যবহার।

রামসেবক পুটুর মাকে ঘরে লইয়া গেলেন। পুটুর মা আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পাইলে বেড়াইতে যাইতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু রামসেবক তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়ায় যাওয়া হইল না মনে করিয়া অভিমান করিলেন, মুখ ভার করিয়া রহিলেন। রামসেবক তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি পুটুকে আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া পুটু "বাবা" শব্দ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, কিন্তু কোন্ স্থানটী বাবা, তাহা ঠিক সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, কখন চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল, "এই বাবা"; কখন ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল, "এই বাবা"। পুটুর এই ভ্রম দেখিয়া তাহার মা হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার আর অভিমান থাকিল না, তিনি পুটুকে তখন আপন ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠিক কথা, পুটু! ওরে প্রভেদ করা যায় না।" পুটুকে তাহার পর বুকে তুলিয়া মখোলের উপর গাল টিপিয়া নিশ্বাস টানিয়া পুটুর মা পর্য্যায় বলিতে লাগিলেন, "পুটু পুটু, আমার পুটু।"

রামসেবক। ও কি! তুমি যে করে পুটুকে টেপ, দেখে আমার ভয় করে।

পুটুর মা। আমার পুটুর গায়ে কেমন ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ।

রামসেবক। আজ তোমার গায়েও সদ্গন্ধ বেরিয়েছে।

পুটুর মা একটু লজ্জিত হইলেন; লজ্জায় হাসিয়া বলিলেন, "সোহাগী কি কতকগুলা মাখাইয়া দিয়াছে। আমি কাল সোহাগ-তেল মাখিব।"

রামসেবক। সোহাগ-তেল মাখিলে কি হবে?

পুটুর মা। তুমি আমায় ভালবাসিবে।

রামসেবক। আমি কি তোমায় ভালবাসি না?

পুটুর মা। কই ভালবাস?

রামসেবক। তবে ভালবাসা কারে বলে?

পুটুর মা। ভালবাসা কারে বলে, তুমি কি তা জান না? তুমি কি কাহারেও কখন ভালবাস নাই?

রামসেবক। ভালবেসেছি, এক সময় মাকে ভালবেসেছি, এখন হয় ত সেইরূপ তোমায় ভালবাসি।

পুটুর মা। হয় ত?

রামসেবক। তা বই কি, আমি কেমন করে বুঝিব?

পুটুর মা। ও পোড়া কপাল! ভালবাসা কি বুঝে দেখিতে হয়? না পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করে জানিতে হয় যে, ওগো, তোমরা বলে দাও, আমি কারে ভালবাসি। তুমি ভালবাস অথচ তুমি জান না যে কারে ভালবাস?

রামসেবক। জানি বই কি? তবে দুজনের মধ্যে ঠিক করে বলিতে গেলে একটু সন্দেহ হয়, তাই বলিতেছিলাম, তোমায় হয় ত মার মতই ভালবাসি।

পুটুর মা। ও কি আবার কথার শ্রী!

রামসেবক। তা নয়, তা নয়, বলি তোমাদের দুজনকেই সমান ভালবাসি, হয় ত তোমায় কিছু বেশী ভালবাসি।

পুটুর মা। আমায় যে তুমি ভালবাস, তা আমি কেমন করে বুঝ্‌ব? তুমি মনে করে দেখ দেখি, কখন কি আমায় ভালবাসার দুটা কথা বলেছ?

রামসেবক। সত্য কথা, বলিনে। ভালবাসার কথা কারে বলে, আমি তা ঠিক জানি না; জানিলে অবশ্য বলিতাম। আমি ত কখন স্ত্রীপুরুষের একত্রে কথাবার্ত্তা শুনি নাই, শুনিলে শিখিতাম। (তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন) একবার গল্প শুনেছিলাম যে, একজন ভট্টাচার্য্য আপনার স্ত্রীর গাল ধরিয়া আদর করিয়াছিল, "তুমি আমার ভুজ্জির চা'ল, তুমি আমার বিদায়ের ঘড়া।" যদি এরূপ ভালবাসার কথা চাও, তা সময়ে সময়ে দুই একটা বলিতে পারি।

পুটুর মা হাসিয়া বলিলেন, "না, তবে আমায় তোমার ভালবাসার কথা বলে কাজ নাই।

রামসেবক। ভাল, বল দেখি, স্ত্রীকে ভালবাসে না, এমন লোক কি জগতে আছে?

পুটুর মা। আছে।

রামসেবক। কে?

পুটুর মা। রাজা।

রামসেবক। সে কি? রাজা কি রা কে

ভালবাসেন না, তবে তাঁহার সংসার চলে কেমন করে? না না; এ মিছে কথা।

পুটুর মা। আমি নিশ্চয় জানি, আমার অপেক্ষা রাজবাড়ীর খবর কে জানে, আমি রাজার সকল কথা জানি। রাজা রাণীকে একেবারে ভালবাসেন না।

রামসেবক। কেন ভালবাসেন না?

পুটুর মা। কারণ আছে।

রামসেবক। কি বল না।

পুটুর মা। তা আমি বলিব না। সে কথা থাক, এখন আমায় ভালবাসিবে বল?

রামসেবক। কারে ভালবাসা বলে, আমায় শিখাইয়া দাও। কে স্ত্রীকে বিশেষ ভালবাসে বল, আমি তার দেখে শিখি।

পুটুর মা হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বলিব, বলিব? একজন স্ত্রীর জন্য আপনার প্রাণ—"

পুটুর মা এই কথা বলিতে বলিতেই শিহরিয়া উঠিলেন, "ওমা, কেন এমন পোড়া কথা মুখ দিয়া বাহির হইল?" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন। সে বৃত্তান্ত কি, রামসেবক তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া পুটুর মাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "পুটুকে আজ রাজবাটীতে লয়ে যাবে না?"

পুটুর মা। কই, তার কোন কথা ত নাই।

রামসেবক। তুমি কাল যখন গিয়াছিলে, তখন ত দেখি নাই। তুমি কি এই বেশে গিয়াছিলে?

পুটুর মা। না।

রামসেবক। আজ তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুটুর মা প্রথমে অলঙ্কারের প্রতি, পরে বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি যদি সুন্দর, তবে তুমি এখন আমায় ভালবাসিবে বল?"

রামসেবক। কই, পূর্ব্বে ত তুমি ভালবাসার নিমিত্ত কখন অনুরোধ কর নাই, আজ কেন ভালবাসার এত চেষ্টা হয়েছে?

পুটুর মা। আগে আমার গহনাও ছিল না, বস্ত্রও ছিল না। মনে করিতাম যে, আমার কি আছে যে, তুমি ভালবাসিবে। এখন আমার সে সব হয়েছে, এখন বলিলে বলিতে পারি যে, আমায় ভালবাস।

রামসেবক। লোকে কি বস্ত্র অলঙ্কারের নিমিত্ত স্ত্রীকে ভালবাসে? তাহা না থাকিলে কি ভালবাসে না?

পুটুর মা। তা বই কি? বস্ত্র অলঙ্কার থাকিলে লোকে সুন্দর হয়। একদিন আমার বস্ত্রালঙ্কার ছিল না, তুমি ত একদিন আমায় সুন্দর বল নাই। আজ আমায় সুন্দর দেখেছ, আমিও ভালবাসার দাবি করেছি, অন্যায় হয়েছে? বল?

রামসেবক। পুটুর বস্ত্র অলঙ্কার নাই, তাই বলে কি পুটুকে তুমি সুন্দর দেখ নাই, না ভালবাস নাই? আসল কথা, বস্ত্র অলঙ্কারে লোকে সুন্দর হয় না।

পুটুর মা। তা যদি না হয়, তবে লোকে বস্ত্র অলঙ্কারের জন্য এত করে মরে কেন? তোমার ও কথা শুনি না। অলঙ্কারে নাকি লোককে সুন্দর দেখায় না?

রামসেবক। অলঙ্কারে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ায় সত্য, কিন্তু আবার কুৎসিতের কুরূপ আরও বাড়ায়। তোমরা আপনারাই ত বলে থাক "মাগীর ঐ ত রূপ, তার উপর আবার গহনা পরেছে।"

পুটুর মা। মিথ্যা নয়। কুরূপীরা গহনা পরিলে বড় কুৎসিত দেখায়। তারা কি জানে যে, এতে তাদের আরও কুৎসিত দেখায়? আমায় ত কুৎসিত দেখাচ্ছে না? বল?

রামসেবক। তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুটুর মা। তবে আমি একবার পদ্মার কাছে যাই।

রামসেবক হাসিয়া বলিলেন, "যাও"। অথচ যাইতে দিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যখন রামসেবক স্ত্রীপুরুষে একত্রে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, তখন রাজা ইন্দ্রভূপ পারিষদ-সমভিব্যাহারে বায়ু-সেবনে যাইতেছিলেন। রামসেবকের বাটীর নিকট আসিয়া একবার দাঁড়াইলেন; কিন্তু কিছুই না বলিয়া আবার পূর্ব্বমত মন্দপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা, একবার মাধবীলতাকে দেখেন। তাঁহাকে আনিতে বলিলেই তৎক্ষণাৎ দেখিতে পান, কিন্তু কি ভাবিয়া আনিতে বলিলেন না; অথচ তাহাকে দেখিবার সাধও জন্মিয়াছে। পথে হয় ত মাধবীকে কাহার ক্রোড়ে দেখিতে পাইবেন, এই মনে করিয়া উৎসুক-লোচনে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, আর

একটী বালিকা এক বৃদ্ধের জানু ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। পড়িয়া যাইতেছে, আবার উঠিয়া জানু ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইতেছে; ইচ্ছা যে ক্রোড়ে উঠে। বৃদ্ধ সে দিকে একেবারে দৃষ্টি না করিয়া অবাক্ হইয়া রাজদর্শন করিতেছে। রাজা হাসিয়া বলিলেন, "এ দিকে কি দেখিতেছ? নাগরী যে তোমার পাদমূলে।" বৃদ্ধ অপ্রতিভ হইয়া বালিকাকে ক্রোড়ে লইল, মুখচুম্বন করিল, বালিকাও হাসিয়া বৃদ্ধের মুখচুম্বন করিল। রাজা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন; হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। কতক দূরে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, হাসিতে হাসিতে একজন বৃদ্ধ পারিষদ্‌কে বলিলেন, "বৃদ্ধেরা প্রেম-পীরিতে একেবারে বঞ্চিত নহে।" পরে কতক দূর গিয়া আবার ফিরিয়া বলিলেন, "এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই।"

এই সময় বৃদ্ধ পারিষদ্ বলিলেন, "যথার্থই আজ্ঞা করেছেন, এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই। আবার দেখুন, এ প্রেমে বৃদ্ধ যুবা সকলেই অধিকারী।"

"না, সকলে অধিকারী নয়, চূড়াধন বাবুকে তাহা জিজ্ঞাসা করুন" এই কথা পশ্চাৎ হইতে একজন বলিয়া উঠিল। সকলে ফিরিয়া দেখিলেন যে, পিতম পাগলা এক বৃক্ষতলে বসিয়া মাটীতে কি লিখিতেছিল, রাজাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পিতম, এখানে যে? আমি তোমাকে দেখিবার জন্য পশুশালায় যাইতে-ছিলাম।"

পিতম। মহারাজ! আমি পশু নই যে, পশু-শালায় আমায় দেখিতে পাইবেন। যখন লোকে পশুর ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল, তখন তথায় গিয়াছিলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম না, সেখানে বাঘের সঙ্গে আমার বড় বিরোধ হইল। তা ভাবিলাম যে, আমি যেখানেই যাব, সেইখানেই বিরোধ, তবে আর কেন এখানে থাকি, তাই চলিয়া আসিলাম।

রাজা। বিরোধ হল কেন?

পিতম। বাঘ কাহারেও ভালবাসে না, নিজের ব্রাহ্মণীকেও ভালবাসে না, দাঁত খিঁচিয়া যে প্রেমালাপ করে, তার সঙ্গে কেমন করে বাস করি?

রাজা। বাঘ কি তোমায় ধরেছিল?

পিতম। ধরে নাই, বরং আমিই ধরেছিলাম, তার ন্যাজ ধরে টানিয়াছিলাম, তাই তার রাগ। ইতি পূর্ব্বে আমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল।

রাজা। কি কথা হয়েছিল?

পিতম। বাঘ বলে যে, তোমরা বড় কাপুরুষ, তোমাদের একেবারে সাহস নাই। তাহাতে আমি উত্তর করি যে, বটে বটে, তোমার এ নগরে আসাই তাহার প্রমাণ। বাঘ বলিল, আমায় পিঞ্জরবদ্ধ করে রাখা তোমাদের কৌশলের পরিচয় মাত্র, তোমা-দের বলবীর্য্যের পরিচয় নহে। তোমরা দুর্ব্বল, একত্রে থাকাই তাহার পরিচয়। যদি তোমরা আমাদের মত বলিষ্ঠ হইতে, তাহা হইলে তোমাদের সমাজ কখন গঠিত হইত না, তোমরা কখন একত্রে বাস করিতে না, সে প্রবৃত্তিই হইত না, সকলে আমাদের ন্যায় পরস্পর একা থাকিতে। আমরা পরস্পর সকলেই বীর, কেহ কাহার সাহায্য চাই না। এই জন্য আমাদের সমাজ নাই। জান ত দুর্ব্বলের বল সমাজ।

রাজা। তুমি এখন মাটীতে কি লিখিতে-ছিলে?

পিতম। ও আপনাদের ঠিকুজি গণনা করিতেছিলাম।

রাজা। জ্যোতিষশাস্ত্র পড়া আছে তবে?

পিতম। বিলক্ষণ পড়া আছে।

রাজা। ভাল, কি গণনা করেছ?

পিতম। আপনার সময় বড় মন্দ। গ্রহ আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। আপাততঃ আপ-নার জলভীতি।

এই কথা বলিবামাত্র চূড়াধন বাবু চঞ্চল হইয়া প্রখর-দৃষ্টিতে পিতমের প্রতি চাহিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আমার? আমার কি ভীতি?"

পিতম। আপনার সময় বড় ভাল, ইচ্ছা হয়, এই সময় আপনার পোষ্যপুত্র হই। আমায় পোষ্যপুত্র লইবেন? "পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং" আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে পারিব।

রাজা বিরক্ত হইলেন, পিতম গীত গাইতে গাইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

এই দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় চূড়াধন বাবুর দ্বারে দুই জন খর্ব্বাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল। রাত্রি অন্ধকার, কেহ তাহাদের দেখিতে পায় নাই, দেখিলে লোকে ভয় পাইত। উভয়ের হস্তে গুপ্তি, কটিদেশে ক্ষুদ্র ভোজালি, ওষ্ঠে লোম। শেষ পরিচয়টী সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

তৎকালে বাঙ্গালি গোঁফ বা শ্মশ্রু রাখিত না। বাঙ্গালী তখন নম্র, শান্ত, ধর্ম্মভীত। তখন গোঁপ রাখিলে বিপরীত বুঝাইত। যে গোঁপ রাখিল,সে প্রকাশ্যরূপে জানাইল যে, আমি রাজা মানি না, সমাজ মানি না, কিছুই মানি না। এই জন্য এক সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজারা গোঁপ দেখিলেই কঠিন দণ্ড দিতেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত গোঁপ সাহসের পরিচায়ক ছিল। এই জন্য প্রথমে লাঠিয়ালেরা গোঁপ রাখিত। পরে গৃহরক্ষকেরা রাখে। তাহার পর সাহসিক যুবারা সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে। এখন সকলেই রাখে। গোঁপ আর সাহসব্যঞ্জক নহে।

ক্ষণেক বিলম্বে চূড়াধন বাবু ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন। আগন্তুকের মধ্যে একজন বলিল, "এতক্ষণ ধরে দাঁড়াইয়া থাকিতে গেলে ত চলে না, চারিদিকে লোক লাগিয়াছে।" চূড়াধন বাবু কোন উত্তর না করিয়া তাহাদের লইয়া বৈঠকখানায় গেলেন। তথায় প্রদীপ ছিল না, অন্ধকারে তিন জনে বসিলেন। চূড়াধন বাবু প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রাত্রে কেন আস নাই ?"

প্রথম বক্তা। কাল চারিদিকে বড় পাহারা ছিল। সন্দেহ করে দুই চারি জনকে ধরে কয়েদ করেছে।

চূড়াধন। তবে কি দেওয়ান সন্দেহ করেছে ?

প্র, বক্তা। বিলক্ষণ সন্দেহ করেছে, কিন্তু সুবিধা এই যে, আমাদের কেহ চেনে না। চেনে না বলিয়াই নতন লোক দেখিলেই ধরিতেছে।

চূড়াধন। দেওয়ানের সন্দেহ হল কেন ? অবশ্য তোমরা অসাবধান হয়েছিলে।

প্র, বক্তা। কিছুমাত্র নহে। তবে কি জান, আগুন লেগেছে, এখন ঘুমন্তরও ঘুম ভাঙ্গিবে। নগরের সকল লোকই রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, সকলেই সর্ব্বদা রাজার অধর্ম্মাচরণের কথা কহিতেছে। জানিতে কি আর বাকি থাকে ?

ইহার পর তিন জনে বহু তর্ক-বিতর্ক হইল। অনেকক্ষণ পরে সকলেই উঠিলেন। বিদায় হইবার সময় চূড়াধন বাবু বলিলেন যে, "তোমরা পিতম পাগলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সে পাগল বলিয়া আর আমার বোধ হয় না, ছদ্মবেশী কোন দুষ্ট লোক বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছে, তোমাদের সংবাদ রাখে।"

প্র, বক্তা। আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি তাকে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে নরবলি দিয়ে আপনাকে সংবাদ দিব।

চূড়াধন। তাহা হইলেই অর্দ্ধেক কণ্টক ঘুচিবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। পিতমকে আমি বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি, কোন ছদ্মবেশী বলিয়া আমার বোধ হয় না, পিতম পাগল সত্যই, তবে এক এক সময় বোধ হয়, তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। সেই সময় তাহার বুদ্ধি বড় প্রখর হইয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা তাহার আন্তরিক কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা দেখিলে শত্রুরও দয়া হয়। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমি পিতমের উপর দয়া করি না; আমাকে যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

সকলে উঠিবার সময় চূড়াধন বাবু প্রথম অপরিচিত ব্যক্তিকে গোপনে বলিলেন, "তোমার সঙ্গীর প্রতি আমার সন্দেহ হয়। বুঝি, এ ব্যক্তি পিতমের পক্ষ, অতএব সতর্ক হইবে"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যে নির্জ্জন মন্দিরে ব্রহ্মচারী বাস করিতেন, চন্দ্রালোকে তাহার গাম্ভীর্য্য বিশেষ বাড়িত। প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির, সম্মুখে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। পিতম পাগলা যখনই রাত্রে দেখিত, তখনই বড় বিমর্ষ হইত। ইহা অসম্ভব নহে। স্থান-মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য, এই জন্যই তীর্থ। ভয়, ভক্তি, বিলাস, বৈরাগ্য এ সকলই স্থানের গুণে আপনিই মনে উদয় হয়। এই জন্য অনেকে বলে, স্থানানুযায়ী মনুষ্যের প্রকৃতি। বাঙ্গালায় পাহাড়-পর্ব্বত কিছুই নাই, একখানি কঠিন প্রস্তরও নাই, বাঙ্গালায় যাহা কিছু আছে, সকলই কোমল; মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কোমল, অল্প তাপে শুষ্ক হয়, অল্প রসে গলিয়া যায়, অল্প ভরে আহত হয়। আমরাও ঠিক সেই মত কোমল, তাহাতেই পূর্ব্বে চটি পরিতাম, ধীরে ধীরে পা ফেলিতাম, পাছে মৃত্তিকার অঙ্গে আঘাত করি। আমরা এক্ষণে বিলাতি জুতা পরিতেছি, দম্ভ করিয়া পা ফেলিতেছি, কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হয় নাই, আমরা যাহা ছিলাম, তাহাই আছি। অনুকরণ অনুরোধে মৃত্তিকায় জুতার পেরেক ফুটাইতেছি, কিন্তু পরে হয় ত বাঙ্গালার অঙ্গে জুতার দাগ দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিব। জুতায় বা মোজায় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, যদি কখন বাঙ্গালায় পর্ব্বত জন্মে, মৃত্তিকা কঠিন হয়, আমরাও কঠিন হইব, নতুবা যে জাতিই

আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করুক, সেই জাতিই ক্রমে আমাদের ন্যায় কোমলস্বভাবই হইবে।

একদিন গভীর রাত্রে কালীদহের কূলে বিমর্ষ-ভাবে পিতম একা বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে। দূরে প্রান্তর-কূলে ধূমরাশি মেঘবৎ জমিয়াছে, পিতম তাহাই দেখিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি কি বলিতেছিল, এমত সময় ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে আসিয়া পশ্চাৎ বসিলেন। পিতম তাঁহাকে কোন কথায় সম্ভাষণ করিল না, অন্যমনস্কে যাহা দেখিতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম, কেমন আছ?" পিতম মুখ না ফিরাইয়া বলিল, "ভাল আছি।" ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম, তোমার মনের অবস্থা কেমন?" কোন উত্তর না দিয়া পিতম প্রান্তরকূলের ধূমরাশি অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিল।

ব্রহ্ম। বোধ হয়, তুমি এক্ষণে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছ।

এই শেষ কথায় পিতম ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া বসিল, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া ব্রহ্মচারী ব্যথিত হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "কি জন্য ইহার এ ম্লানতা? সংসার-আশ্রম যাহার নাই, কাতর হইবার তাহার ত কোন কারণই নাই। মায়াই দুঃখের হেতু।"

ব্রহ্মচারী একদৃষ্টিতে পিতমের দিকে চাহিয়া রহিলেন, উরু হইতে উরু নামাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "চমৎকার লোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ বৃদ্ধ অথচ যুবার ন্যায় ইহার সুখ-দুঃখের অনুভব রহিয়াছে, না জানি, অল্প বয়সে কতই ছিল।"

এই সময় পিতম বলিল, "কল্য রাজকুমারের জন্মদিন, আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আপনার হইয়াছে?"

ব্রহ্ম। তোমায় কে নিমন্ত্রণ করিল?

পিতম। রাজাবাহাদুর খোদ। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। আপনার দ্বারা রাজার কোন উপকার হবে না জানি। লোকের উপকার করা আপনাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরোপকার গৃহীর ধর্ম্ম, আত্ম-উপকার উদাসীনের ধর্ম্ম, তথাপি একবার যাবেন।

ব্রহ্ম। রাজার কি বিপদ্?

পিতম। রাজার অপেক্ষা আমার বিপদ্ অধিক, কল্য বিস্তর আহার করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে নিদ্রা যাই।

এই বলিয়া পিতম কালীদহের একটী সোপানে অবতরণ করিয়া শয়ন করিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আইস পিতম, মন্দিরে শয়ন করিবে চল।"

পিতম। ঘরের ভিতর শয়ন বড় বিপদ্, ইট-কাঠে আমার বড় ভয় হয়। আচ্ছা, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, বলুন দেখি, মানুষের আকৃতি আর প্রকৃতির কিরূপে সংশোধন হয়, বিশেষতঃ উদরের ভাগটা?

ব্রহ্ম। কিছু আহার করিবে? বোধ হয়, আজ কিছু জুটে নাই।

পিতম। ঠিক বলেছেন। কিন্তু কল্য পোষাইয়া লওয়া যাইবে, আজ আর কিছু নয়। কিন্তু গঠনের দোষ না গেলে— এই বলিয়া পিতম চুপ করিল।

ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে, পিতম ঘুমাইল, অতএব ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর পিতম রাজবাটীর দিকে চলিল। দূর হইতে নহবৎ শুনিয়া ভাবিল, আমার বিলম্ব হইয়াছে, হয় ত উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রাজপুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, সকল মন্দিরে রক্তপতাকা উড়িতেছে। ছাদের উপর শত শত শ্বেত কপোত একত্রে উড়িতেছে, একত্রে বসিতেছে, আবার একত্রে উড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশে হীরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিতম কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, রাজদ্বারে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছে, নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতেছে, নহবৎখানার বিশেষ শোভা হইয়াছে, রূপার নাগারার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। দশবারটী হস্তী সুসজ্জীভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পিতম আসিয়া মহানন্দে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কত কথা কহিতে লাগিল। একটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "ছি! মা! তুমি কেন সিঁথি পরিয়াছ? তোমার যে বয়স গিয়াছে।" আর একটীর পশ্চাতে গিয়া বলিল, "তোমার চন্দ্রহার কই?" তৃতীয়কে বলিল, "তুমি গলায় যে মালা পরিয়াছ, তাহা কয় নরী গণা যাইতেছে না। সালঙ্কারা যুবতীর ন্যায়

মাথা তুলিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াও, পাঁচনরী কি সাতনরী, ভাল করে দেখাও। নতুবা পাড়ার মেয়েদের কাছে তোমার মান থাকিবে না।"

এই সময় দেওয়ানপুত্র নবকুমার রাজবাটী প্রবেশ করিতেছিলেন, পিতমের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পিতম, পাড়ার মেয়েদের কাছে হাতীর মান কিসে ?"

পিতম। অলঙ্কারে—নচেৎ আর কিসে ? আচ্ছা, বলুন দেখি, ধনীরা হাতীকে স্ত্রীর ন্যায় সাজায় কেন ? আর একইজাতীয় অলঙ্কার পরায় কেন ? স্ত্রীর কপালে সিঁথি, হাতীর মাথায়ও সিঁথি ; স্ত্রীর গালে অলকা-তিলকা, হাতীর গালেও তাহাই ; শিকল, শিকলি, ঘণ্টা আর কিঙ্কিণী এই প্রভেদ। আপনার চক্ষে হস্তিনী আর গৃহিণী কি একরূপ বোধ হয় ?

নবকুমার। বড় নয়, তবে গৃহিণী অন্দরের শোভা, আর হস্তিনী সদরের শোভা। বশতাপন্ন উভয়েই সমান, উভয়েই বন্দিনী। শিকলের রূপান্তর পায়ের মল।

পিতম। কিন্তু এই মল ক্রমে ক্রমে সরু হবে, তাহার পর ভাঙ্গিয়া যাবে, মল ভাঙ্গিলে পুরুষের কপালও ভাঙ্গিবে

নব। এত দূরদর্শিতা যদি তোমার আছে, তবে লোকে তোমায় পাগল বলে কেন ?

পিতম কোন উত্তর না করিয়া হস্তীর সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। শেষ পিতম রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরের কোলাহল শুনিতে লাগিল। বাঁধতরুদ্ধ জল-কল্লোলের ন্যায় তাহা অতি মধুর বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল। পিতম দ্বারে প্রবেশ করিলে দ্বারপালেরা নিষেধ করিল না ; পাগলকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। একজন পিতমকে নিকটে ডাকিয়া আপন অদৃষ্ট গণনা করিতে বলিল। পিতম মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি বড় ব্যস্ত।" শেষ মুষ্টি সিদ্ধি বাহির করিয়া তাহাকে দিল। নবকুমার তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিতম, তুমি সিদ্ধি খাও থাক ?"

পিতম এক বৃদ্ধ দ্বারপালের দিকে চাহিয়া বলিল, "এক বড় আজব ঘটনাক্রমে আমি এই সিদ্ধি পাইয়াছি। কয়েক দিন হইল, আমি কৈলাস-পর্ব্বতের নিকটে গিয়াছিলাম। তখন সূর্য্যদেব হেলিয়া পড়িয়াছেন। দূর হইতে কৈলাস দেখিতে লাগিলাম ; একদিকে রুদ্রাক্ষবন। মেঘের কোলে সেই রুদ্রাক্ষবনের কত বাহার ! আমি তাহা দেখিতেছি, এমত সময় মহামায়া জগজ্জননী গণপতিকে গদিতে লইয়া এক আশ্চর্য্য সিংহের উপর আসওয়ার হয়ে বন হইতে বাহির হইলেন। সে সিংহের যে দেমাক্, তাহা আর কি বলিব। তাহাতে আসওয়ার হয়ে ছোকরা গণপতি কতই খুসী, মার গদি হইতে হেলিয়া পড়িয়া সিংহের জটা ধরিয়া টানিবেন চেষ্টা করিতেছেন। সতর্ক সিংহ মাথা নামাইয়া চলিতেছে। মহামায়া বলিতেছেন, 'ছি ! বৎস, সিংহকে লাগিবে।' গণপতি আরও হেলিয়া পড়িয়া জটা ধরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সিংহ ভয় দেখাইবার নিমিত্ত হুঙ্কার ছাড়িল, কৈলাসপর্ব্বত অমনি কাঁপিয়া উঠিল ; গণপতি আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা ছুড়িতে লাগিলেন, সকল অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল। গণেশজননী সন্তানের শুঁড় ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এ দিকে কার্ত্তিকেয়, মার সঙ্গে সিংহে চড়িতে পান নাই বলিয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিলেন, ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, উঠিতে পারিল না, আর একজন গিয়া মহাদেবকে ডাকিয়া আনিল। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া কার্ত্তিকেয় আরও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাদেব পুত্রকে তুলিতে চাহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আইস বৎস, আমরা দুইজনে বৃষবাহনে যাই। বৃষ কেমন মণিমাণিক্যে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সিংহের ত কোন অলঙ্কার নাই।' এই বলিয়া ষাঁড়ের শৃঙ্গের গায়ে ত্রিশূল হেলাইয়া আস্তরণ ঝাড়িতে লাগিলেন। ছোক্‌রা কার্ত্তিকেয় মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া বজ্রবেগে গিয়া বৃষকে এক ধাক্কা মারিলেন, তাহার সকল কিঙ্কিণী ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল। কিন্তু বৃষ একটুও টলিল না, কেবল মস্তক নত করিয়া দিল। কার্ত্তিকেয় ষাঁড়ের কপাল হইতে হীরার ধুক্‌ধুকী ছিঁড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর নন্দীর ঘরে পিতার নিত্যসেবার যে সিদ্ধির ছালা ছিল, তাহা পর্ব্বতের নিম্নে ফেলিয়া দিলেন, তাহা হইতে আমি কতক কুড়াইয়া লইয়া এই ঝুলিতে রাখিয়াছিলাম।" এই বলিয়া পিতম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানেরা জানিত, পিতম সিদ্ধপুরুষ ; সুতরাং এরূপ ঘটনা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে বলিয়া স্বীকার করিল। নবকুমার ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরার ধুক্‌ধুকীখানা কি হইল ?

আনিয়াছ কি? যদি আনিয়া থাক, ত কোথায় রাখিয়াছ?"

পিতম। আপনার ঘরে রাখিয়াছি।

নবকুমার। তোমার ঘর কোথায়?

পিতম। জানি না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীর প্রথম প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, দুই একজন এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। একদিকে অধ্যাপকেরা বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তৎকালে কেবল স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের বাচালতা বড় জন্মে নাই; এইজন্য শাস্ত্রালাপের চীৎকার বড় অধিক শুনা যাইতেছিল না। বিশেষতঃ রাজা তখন সভায় আইসেন নাই।

আর একদিকে শতাধিক ভাট, সেরেস্তাদার পেস্কারের ন্যায় পাগড়ি-মাথায় বসিয়া আপন আপন প্রাপ্তির কথা কহিতেছিল, মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া একত্রে রাজার স্তুতিপাঠ করিতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়িয়া আপন আপন ঘরের কথা কহিতেছিল।

রাজভৃত্যেরা নবাবী কায়দার পরিচ্ছদ পরিয়া চারিদিকে বেড়াইতেছিল, সকলেই নম্র, সকলেই যোড়হস্ত, সকলের মুখেই সম্মানসূচক বাক্য। এক্ষণকার ভৃত্যেরা স্বাধীন হইয়াছে, তাহাদের মাথায় আর পাগড়ি বাঁধিতে হয় না, যোড়হস্তে আর কথা কহিতে হয় না। তখন নাপিত পর্য্যন্ত পাগড়ি বাঁধিত, দাড়ি ধরিবার পূর্ব্বে তাহারা প্রণাম করিত।

এক্ষণে প্রভুরাও স্বাধীন হইয়াছেন, তাঁহারা আপন ইচ্ছামত পরিচ্ছদ পরিতে পারেন। অদ্য ধুতি, কল্য পায়জামা বা পেন্টুলন, আজ বাঁকা সিঁথি, কাল সোজা সিঁথি; তাহার নিমিত্ত কাহাকেও এক্ষণে কৈফিয়ত দিতে হয় না। আহারও ইচ্ছানুরূপ, লোকের ভয়ে কিছু বর্জ্জন করিতে হয় না। ব্যবহারও তাহাই, লোকের ভয়ে কন্যাকে অপাত্রে দিতে হয় না, লোকের ভয়ে দীনদশাপন্ন হইয়া থাকিতে হয় না, অথবা প্রথার ভয়ে পৈতৃক মুর্খতা রক্ষা করিতে হয় না।

পিতম ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশ করিল, অতি কুণ্ঠিতভাবে একপ্রান্তে গিয়া বসিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নতশিরে থাকিয়া মস্তক তুলিল। এ সময় পিতমের মলিন বেশ, রাজভগিনী চিকের অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণ পরে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঙ্গিনি, তুই এই দুঃখী—এই দরিদ্রকে চিনিস্?"

মাতঙ্গিনী। চিনি মা, ও পাগল। ও আজন্ম পাগল। পথে পথে বেড়ায়, ভিক্ষা করে খায়, রাত্রে গাছতলায় পড়ে থাকে। ওর নাম পিতম পাগ্লা, এই জানি, এইখানে ঘুরে বেড়ায়, এই দেখেছি।

জ্যোৎস্না। (স্বগত) পিতম!

এই সময় বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল, রাজা আসিতেছেন বলিয়া সভাসদ্ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতমও উঠিল। রাজা আসিয়া প্রধান প্রধান সকলের সহিত দুই একটী কথা কহিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বসিবামাত্র ভাটেরা মনোহর স্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল, এই অবকাশে রাজা ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পিতমের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু রাজা কোন সম্ভাষণ করিলেন না।

জ্যোৎস্না। ইনি এখানে কতদিন এসেছেন?

মাতঙ্গি। অনেককাল, আমাদের ত জ্ঞান-ভোর দেখিতেছি। তা আমাদের বয়স ত অধিক নয়, কিন্তু সকলেই বলে, পিতম অনেক কাল অবধি এখানে আছে।

জ্যোৎস্না। তুই কখন এই কাঙ্গালের সঙ্গে কথা কয়েছিস্?

মাতঙ্গি। না মা, আমার ভয় করে। কি জানি, পাগল যদি কিছু বলে।

এই সময় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত রাণীঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিতেছেন।" জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

রাণীমহলে এক বিস্তৃত শয্যায় রাণী নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত পুত্রকে লইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে আত্মীয়-স্বজনেরা বসিয়া রাজকুমারের গুণব্যাখ্যা করিতেছে, সম্মুখে এক স্বর্ণপাত্রে ধান্য দূর্ব্বা প্রভৃতি আশীর্ব্বাদের উপকরণ রহিয়াছে। জ্যোৎস্নাবতী আসিবামাত্র রাণী বলিলেন, "তুমি আশীর্ব্বাদ না করিলে আর কেহ আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেছেন না। এখানে সকলের আশীর্ব্বাদ করা হইলে বাহিরে ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিবেন। রাজা সভায় গিয়াছেন।"

এই সময় চূড়াধন বাবুর স্ত্রী রাজভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি, আজকার দিনে তোমার চোখে জল পড়িতেছে কেন?" রাণী একবার জ্যোৎস্নাবতীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। রাজভগিনী অপ্রতিভ হইয়া স্বর্ণথাল হস্তে তুলিয়া রাজকুমারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকুমার তাহার অভিসন্ধি অনুভব করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতী ধান্যদূর্ব্বা হস্তে তুলিবামাত্র শিশু মাথা সরাইয়া লইল। পুটুর মা একজনকে চুপি চুপি বলিলেন, "বরের গায়ে হরিদ্রা দিতে গেলে বর যেমন করে, রাজকুমার আজ ঠিক তাই করিতেছেন।"

জ্যোৎস্নাবতী আশীর্ব্বাদ করিলে একে একে সকলেই ফুল লইয়া আসিলেন, রাজকুমার তাহা দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ তাহাকে ছাড়িলেন না; সকলেই মাথায় ফুল দিতে লাগিল। মাধবীলতা মার ক্রোড় হইতে নামিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাণীর নিকটে আসিল. একবার স্বর্ণপাত্রের দিকে চাহিল, আবার রাণীর মুখপ্রতি দেখিল। তাহার পর একটী ফুল কুড়াইয়া রাজকুমারের নিকট সরিয়া গেল। ক্রমে ক্ষুদ্র হাতখানি তুলিয়া ফুলটী ছাড়িয়া দিল। ফুলটী রাজকুমারের মাথা কি অঙ্গ স্পর্শ করিল না, শয্যায় পড়িয়া গেল। মাধবী আবার সেই ফুলটী কুড়াইয়া হাতখানি তুলিল। রাজকুমারের কান পর্য্যন্ত হাতখানি পৌঁছিল। সেবার ফুলটী ফেলিয়া দিয়া দুটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা রাজকুমারের চুল স্পর্শ করিল; স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া রাণীর মুখপ্রতি চাহিল। রাণী আর একটী ভাল ফুল হাতে দিয়া বলিলেন, "কর, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, তোমারই আশীর্ব্বাদ সত্যের।" এই কথায় রাজভগিনী একবার রাণীর দিকে চাহিলেন, এবার রাণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মাধবীলতা ফুলটী তুলিয়া একবার দৃষ্টে দেখিতে লাগিল, বাম হস্তে তাহার দুই একটী পাপড়ি ছিঁড়িল, তাহার পর রাজকুমারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। মাথা স্পর্শ হইল না বলিয়া সেই দিকে সরিয়া গেল। আবার হাত বাড়াইয়া দেখিল, আবার সরিয়া গেল। শেষ মাথায় ফুল দেওয়া হইল। মাধবী আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া আহ্লাদে ছুটিয়া মার ক্রোড়ে গিয়া উঠিল। মাতা পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন

এই সময় চূড়াধন বাবুর স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন যে, "কই, রাজভগিনী এর মধ্যে আবার কোথায় চলিয়া গেলেন?" রাণী অমনি তীব্রদৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিলেন, তাহার পর পরিচারিকাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে রাজকুমারকে রাজসভায় লইয়া যাইবে আইস। একজন তৎক্ষণাৎ আসিয়া রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইল, সকলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার পর্য্যন্ত চলিল। রাণী কতকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে আর আর সকলেও ফিরিয়া আসিয়া রাজসভা দেখিবার জন্য রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

রাজকুমার সভাস্থ হইবামাত্র ব্রাহ্মণেরা সকলেই উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেন। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজা স্বয়ং রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বাহির হইলেন। রাজদ্বারে গিয়া দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিবার আদেশ করিলেন। মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। চারিদিকের বাদ্যোদ্যম ছাড়াইয়া দরিদ্রের চীৎকার উঠিল।

রাজসভার প্রায় অধিকাংশ লোকেই কাঙ্গালীবিদায় দেখিতে বাহির হইলেন, কেবল দশ বার জন অধ্যাপক একত্রে বসিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে পিতম পাগলা একা বসিয়া থাকিল। পূর্ব্বমত ম্লান ও অন্যমনস্ক।

একজন ভাট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে এখানে? বাহিরে কাঙ্গালীবিদায় হইতেছে, এখানে বসিয়া কেন ঠকিতেছ?" পিতম তাহার প্রতি চাহিল, কোন উত্তর করিল না। ক্ষণকাল পরে নবকুমার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি পিতম, বাদ্য অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক?"

পিতম। বুঝি দরিদ্রের।

নবকুমার। আচ্ছা, দরিদ্রের চীৎকার অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক?

পিতম। বুঝি পুত্রশোকের।

একজন অধ্যাপক বলিলেন, "শুনিলেন, পাগল কি বলিতেছে? পাগলের যে জ্ঞান আছে, আপনাদের তাহা নাই। আপনারা কোন্ বুদ্ধিতে আমাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছেন? আমি অনেক সহ্য করিয়াছি। এখন সকল শুনিয়াছি; আর কেন সহ্য করিব? এতকালের কষ্ট হইতে আজ মুক্ত হইব।"

এই সময় রাজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও আসিল। রাজা আসিবামাত্র সেই অধৈর্য্য অধ্যাপক অগ্রসর হইয়া

বলিলেন, "পুত্রকে আমায় অর্পণ করুন, এ সন্তান আমার।"

রাজা। আপনি কি চান?

অধ্যাপক। আমার পুত্র চাই।

রাজা। আপনার পুত্র কোথা?

অধ্যাপক। সে এই আপনার ক্রোড়ে। রাজ-ক্রোড়ে আমার সোণার চাঁদ, একবার দিন, বুকে করি। বোধ হয়, আমার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমায় পাগল ভাবিতেছেন। আমি পাগল হইয়াছিলাম সত্য কথা, কেন হব না? আমার ঘরে ছেলে শুয়ে, প্রাতে সে ছেলে আর কোথাও নাই। পাড়া-সিড়া নয়, মাতৃক্রোড় হইতে ছেলে গেল। এতে কে না পাগল হয়? লোকে বলিল, ভৌতিক ব্যাপার; আবার কেহ বলিল, জাতহারির কার্য্য। আমি তখন জানি না যে, রাজার কার্য্য। এখন প্রমাণ পাইয়াছি যে, আমাদের মৃতবৎসা রাণী মৃত-কন্যা প্রসব করিয়া এ হতভাগার কপাল পোড়া-ইয়াছেন। তাহা যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলাম, এক্ষণে আমার হারাধন সমর্পণ করুন।

"এ কি ব্যাপার" বলিয়া রাজা পুত্রকে বুকের ভিতর করিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিলে, সকলে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন, কেহ কেহ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সকল অধর্ম্ম অপেক্ষা পুত্রহরণ অতি গুরুতর, অতএব সাবধান, সাবধান।"

এই সময় দেওয়ান অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়কে পুত্রশোকাকুল দেখিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, কে আপনার এই সময় যন্ত্রণা বাড়াইয়াছে, তাহা শুনি। কিরূপ প্রমাণের দ্বারা আপনার এ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে, তাহা বলিবেন চলুন।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া পরিচয় দিতে দিতে দেওয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেওয়ানখানায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিজন ভট্টাচার্য্য; নব-কুমার আর পিতম পাগলা গিয়া তথায় বসিল। দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

ব্রাহ্মণ। দশরথ শর্ম্মা, নিবাস এই নিকোম্-পাড়া। এক্ষণে পরিচয়ের কি প্রয়োজন? আমার পুত্র চুরি গিয়াছে, আমি তাহার বিচার চাই। আমি কোথা ঘর করি, কোন্ শাস্ত্রব্যবসায়ী, সে পরিচয়ের এ সময় নহে, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসি নাই। এক্ষণে রাজাকে বলিয়া আমার পুত্র আমায় সমর্পণ করুন। নতুবা আপনারা সকলেই ব্রহ্মকোপে পড়িবেন, আমি রামরাম বিদ্যালঙ্কারের পৌত্র, আমার অভিসম্পাত বৃথা হইবে না, নিশ্চয় জানিবেন; ব্রহ্মশাপ অব্যর্থ।

দেওয়ান। অভিসম্পাত এক্ষণে থাক্, মূল বৃত্তান্ত কি বলুন।

দশরথ শর্ম্মা। বৃত্তান্ত আর কি বলিব, এ কথা কে না জানে, আপনার সন্তান যদি আর একজন লয়, ত বুকের ভিতর কি হয় বলুন দেখি?

দেওয়ান। আমি জিজ্ঞাসা করি, রাজকুমারকে আপনার সন্তান বলিয়া কি হেতু সন্দেহ জন্মিয়াছে?

দশ। সন্দেহ? আবার সন্দেহ কি? নিশ্চয় আমার সন্তান। সন্তান চুরি গেলে তাহার পিতা কি জানিতে পারে না?

দেওয়ান। তাহা সত্য, কিন্তু আপনার যে সন্তান চুরি গিয়াছিল, সেই সন্তান যে আমাদের রাজকুমার, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়া-ছেন, এই কথা আমি শুনিতে চাই।

দশ। সে কথা ত পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণী দশ মাস দশ দিন সন্তান গর্ভে ধরেন, তাহার পর ফাল্গুন মাসের ১৬ই তারিখে রাত্রি একপ্রহরের সময় এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন; আমি নিজে গিয়া ধাই ডাকি, সে রাত্রে কোনমতে ধাই পাই না, শেষ বালা বেদিনী নগদ এক টাকা হাতের উপর লয়, তবে এসে নাড়ীচ্ছেদ করে। আমরা শেষ আহারান্তে মহা-আহ্লাদিত অন্তঃকরণে বাটীর মধ্যে শয়ন করিলাম; নবকুমার, তাহার প্রসূতি আর বালা বেদিনী বাহিরে সূতিকাগারে থাকিল। প্রাতে উঠিয়া শুনি যে, সন্তান চুরি গিয়াছে; ব্রাহ্মণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন কি সহ্য করা যায়? আমি বন-জঙ্গল সকল অনু-সন্ধান করিতে লাগিলাম, প্রতিবাসীরা সকলেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইল, বালা বেদিনী ষষ্ঠী-তলায় গিয়া দেখিয়া আসিল, কোন অনুসন্ধান হইল না। কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল; কেহ

বলিল যে, জাতহারিণীর কার্য্য, কেহ বলিল যে, শৃগালের কার্য্য; আমি তখন জানিতাম না যে, ইহা রাজার কার্য্য!

দেওয়ান। রূঢ় বলিবেন না, রূঢ় বাক্যে কার্য্য উদ্ধার হয় না; যদি এরূপ আপনার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে এখানে না আসিয়া আদালতে নালিশ উপস্থিত করিলে ভাল হইত।

এই সময় আর একজন অধ্যাপক বলিলেন, "বাচস্পতি ভায়া শোকে কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। যদি আমার প্রতি অনুমতি হয়, তাহা হইলে মূল কথা আমি সংক্ষেপে নিবেদন করিতে সাহসী হই; আমি আদ্যোপান্ত সকল অবগত আছি, এবং অভয় দিলে তাহা বলিতে পারি। আপনি ধর্ম্মাধিকারিস্বরূপ, আপনার নিকট যদি আমাদের মর্ম্মবেদনা বলিতে পাই, তাহা অপেক্ষা আমাদের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

দেওয়ান। ভাল, বৃত্তান্ত কি, আপনিই বলুন।

অধ্যাপক। যে আজ্ঞা; বৃত্তান্ত এই যে, বাচস্পতি ভায়ায় সন্তান-হরণের কথা সত্য। পূর্ব্বে আমরা স্থির করি যে, সূতিকাগার হইতে শৃগালে সন্তান লইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ সেই দিবস গ্রামের প্রান্তে একটী সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধভুক্ত সন্তানের অবশিষ্ট পাওয়া যায়—

দশরথ। মিথ্যা কথা, কবে কোথায় কাহার অবশিষ্ট দেখিয়াছিলে? তখনই আমি জানি যে, এই শত্রু সঙ্গে থাকিলে সকল চেষ্টা বৃথা হইবে।

অধ্যাপক। বাচস্পতি ভায়া, ক্ষান্ত হও, তোমার জ্ঞাতি আমি বটে, কিন্তু শত্রু নহি; তোমার বংশ থাকিলে আমি এক গণ্ডূষ জল পাইতে পারিব। আমি তোমার স্বপক্ষ কথাই বলিতেছি। তুমি নিজে আপনার কথা বলিতে পার না, তাহাতেই আমি বলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি।

দশ। কেন? আমি আপনার কথা আপনি বলিতে পারি না? তুমি নূতন টোল করিয়াছ বলিয়া মনে করিয়াছ, আমা অপেক্ষা তুমি পণ্ডিত হইয়াছ? এ অহঙ্কার ভাল নহে, অধিক দিন থাকিবে না, "শা[illegible]কারাং পরো রিপুঃ।"

অধ্যাপক আর কোনও উত্তর না করিয়া দেওয়ান মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন, "মূল কথা, বালা বেদিনী সন্তানটী রামী ধাইকে দেয়, রামী ধাই সেই সন্তান লইয়া রাণীর সূতিকাগারে রাখিয়া আইসে। সেই রাত্রে রাণী এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, অর্থলোভে রামী ধাই আর পরিচারিকা একপরামর্শী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিল। রাজা কিংবা রাণী বোধ হয় ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুমাত্র জানেন না। এক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া অনুসন্ধান করিলে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

দেওয়ান। রাজা কিংবা রাণী এ কথা জানেন না, অথচ আপনারা জানিয়াছেন, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনারা কাহার নিকট শুনিয়াছেন?

অধ্যাপক। আমরা যাহার নিকট শুনিয়াছি, তাহার নাম প্রকাশ্যে এক্ষণে বলিতে পারি না। যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি আপনার এতই দয়া হয়, তবে তদন্ত করিবার সময় আমাদের স্মরণ করিবেন, আমরা আসিয়া তাহার নাম বলিয়া দিব; এক্ষণে বলিলে রাজপরিচারকেরা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে।

দেওয়ান। এইমাত্র ত তাহাদের মধ্যে রামী ধাই আর বালা বেদিনী এই দুইজনের নাম করিয়াছেন, বাকি লোকের নাম করিবার আর আপত্তি কি?

অধ্যাপক। বালা বেদিনী কয়েক মাস হইল লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে; রামী ধাইয়ের কথা স্বতন্ত্র; উহারই প্রস্তাবমত এই কার্য্য হয়, কাজেই তাহাকে আর সতর্ক করিতে হইবে না; সে কখনই স্বীকার করিবে না যে, তাহার অর্থলালসায় এই গরীব ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হইয়াছে।

দেওয়ান। ভাল কথা, সময়মত আমি আপনাদের সংবাদ পাঠাইব। এক্ষণে আপনারা সভায় চলুন।

এই সময় চূড়াধন বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দশরথ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনার অনুপস্থিতিতে আমি সকল কথাই দেওয়ান মহাশয়কে জানাইলাম, এক্ষণে আপনাদের ধর্ম্মে যাহা হয়।" পিতম হাসিয়া বলিল, "আপনি সকল কথা দেওয়ান মহাশয়কে জানান নাই। প্রধান কথাই ছাড়িয়া গিয়াছেন।"

দশরথ। কি কথা?

পিতম। স্মরণ করুন।

দশরথ। কৈ, আর কোন কথাত স্মরণ হয় না।

পিতম। তবে চূড়াধন বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

এই কথায় চূড়াধন বাবু কিঞ্চিৎ সভয়ে পিতমের দিকে কটাক্ষ করিলেন; তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কথা পিতম?"

পিতম। আমার মনে নাই; রাত্রের কথা, অন্ধকারের কথা আমার বড় মনে থাকে না। কথা

যদি আলোতে হয়, তবে আমি ভাল করে মনে রাখিতে পারি।

চূড়াধন বাবু অতি তীব্র-দৃষ্টিতে একবার পিতমের প্রতি, একবার দশরথের প্রতি চাহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "পাগলের কথা যাক্; মূল কথা, রাজকুমার যে আপনার সন্তান, তাহার কোন প্রমাণ দিয়াছেন ?"

দশরথ। পরে দিব।

চূড়াধন। তবে পরে বিচার হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

'এই কথায় দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম ! পূর্ব্বে আর কখন ত তোমায় রাজবাটীতে দেখি নাই।"

বাস্তবিক দেওয়ান মহাশয়ের কথা সত্য, পিতম কখন কাহার গৃহে প্রবেশ করে নাই; রাজা কতবার পিতমকে ডাকিয়াছেন, পিতম কখন যায় নাই; রাজসমভিব্যাহারে রাজদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার পর হাসিয়া বিদায় লইয়াছে। অপর সকলে যাহারা পিতমকে ভালবাসিত, মধ্যে মধ্যে তাহারা আদর করিয়া পিতমকে আহারের নিমন্ত্রণ করিত, কিন্তু পিতম বাটীর সম্মুখে কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া আহার করিত; কদাচ গৃহপ্রবেশ করিত না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "গৃহমধ্যে কাক যায় না।" পিতম আহার করিতে বসিলে, সেখানে বিস্তর কাক জমিত, অৰ্দ্ধেক অন্ন পিতম তাহাদের বণ্টন করিয়া দিত; তাহার পর আহার করিতে বসিত। কাকেরা মহাদৌরাত্ম্য আরম্ভ করিত, পিতম হাসিত, আবার অন্ন ছড়াইত, কাকেরা তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত, পিতম কখন বিমর্ষভাবে, কখন আনন্দিতমনে তাহাদের বিরোধ দেখিত।

অনেকে ভাবিত, কাকের অনুরোধে পিতম গৃহে বসিয়া আহার করে না। কিন্তু অন্যসময় পিতম গৃহপ্রবেশ করিত কি না, তাহা কেহ অনুধাবন করিয়া দেখিত না। দেওয়ান মহাশয় তাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আর কখন ত তোমায় গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই। পিতম দেওয়ানের কথায় কিছু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ বলিল, "ভুল হয়েছে, তবে আমি এক্ষণে চলিলাম।" অথচ পিতম না গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় চূড়াধন বাবু দশরথ বাচস্পতিকে বলিলেন যে, "যদি আপনার স্থিরবিশ্বাস হইয়াই থাকে যে, রাজকুমার আপনার সন্তান, তথাপি তাহা আপনার প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। আপনি সন্তানকে বড় জোর একখানি টোল করিয়া দিতে পারিতেন; এখানে আপনার সন্তান নিশ্চয় রাজা হইবেন, আপনি কেন তাহার ব্যাঘাত দিতে বসিয়াছেন ?" এই কথা শেষ করিয়া চূড়াধনবাবু একবার দেওয়ান মহাশয়ের দিকে অতি গোপনে কটাক্ষ করিলেন। দেওয়ান তাহা দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতের ন্যায় একটু হাসি দেখাইলেন; বুঝাইলেন, আমি সকল কথাই জানি।

দশরথ বাচস্পতি চূড়াধন বাবুকে বলিলেন, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা সকলই বুঝি, কিন্তু ব্রাহ্মণী তাহা বুঝেন না। তিনি বলেন, 'আমার সন্তান আমি আপনি লালনপালন করিব; যে সন্তান আমি বুকে করিতে না পাইলাম, সে সন্তান আমার কেমন করে ? সে সন্তান রাজাই হউক, আর দরিদ্রই হউক, তাহাতে আমার কি ? সন্তান বুকে করিব, তবে ত বুঝিব যে, সন্তান আমার; আমার ক্রোড় কাঁদিবে, আর আমি মুখে বলিব, পুত্র রাজা হচ্ছে' !"

চূড়াধন। আপনার ব্রাহ্মণী বড় স্বার্থপর; তিনি আপনার সুখ, আপনার তৃপ্তি বুঝেন, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিলেন না। কেমন যে সময় মন্দ পড়েছে, ক্রমে সকলেই স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে !

দশরথ। আপনার সন্তান বুকে করিলে অথবা আপনার সম্পত্তি ভোগ করিলে যদি লোক স্বার্থপর হয়, তবে আর আমি কি বলিব। এক্ষণে আপনি আছেন, দেওয়ান মহাশয়ও উপস্থিত; আপনারা উভয়ে পরামর্শ করে যাহাতে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণের হয়, তাহা করিয়া দিন; আমাকে যেন শূন্যক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হয় না। আমি আসিবার সময় ব্রাহ্মণীকে বলিয়া আসিয়াছি যে, তাঁহার হারাধন আমি অদ্যই আনিয়া দিব। তিনি এতক্ষণ পথ চেয়ে আছেন; আমি যদি খালি হাতে যাই, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন দেখি, তাঁহার কত কষ্ট হইবে। আপনারা ত সকলই বুঝিতে পারেন।

চূড়াধন বাবু। আপনার ব্রাহ্মণী কেবল একা স্বার্থপর নন; আপনিও কেবল ব্রাহ্মণীর আহ্লাদ ভাবিতেছেন, কিন্তু রাজা বা রাণীর কষ্ট ত একবারও মনে আনিতেছেন না। তাঁহারা সন্তান ত্যাগ

করিবেন, এ কি সহজ কথা। আর তাঁহারা সন্তানই বা ত্যাগ করিবেন কেন আপনি কি কোন প্রমাণ দিয়াছেন? আপনি বলিলেন, রাজকুমার আমার, আর অমনি রাজকুমার আপনার হইবে, অমনি তাঁহারা আপনার হাতে রাজকুমারকে আনিয়া দিবেন? আপনার কি প্রমাণ আছে বলুন।

দেওয়ানজী পূর্ব্বমত হাসিয়া বলিলেন যে, "সে সকল কথা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকলে চলুন, ব্রাহ্মণভোজন দেখা যাউক।" সকলে দেওয়ান মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া গেলে, পিতম প্রায় একা দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণবিলম্বে মস্তক হইতে রুদ্রাক্ষমালা খুলিয়া দুই একবার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল, তাহার পর বসিয়া তাহা ছিঁড়িল কটী একটী করিয়া তাহা গণিল, গণন সমাপ্ত করিয়া গাঁথিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার দেওয়ানখানায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে পিতম?"

পিতম। মালা গাঁথিতেছি।

নব। কাহার জন্য? আমি জানি, রাধাই মালা গাঁথিতেন, কৃষ্ণও যে দেখি মালা গাঁথেন

পিতম। মালা গাঁথা বড় ভাল, মন স্থির করিবার এমত উপায় আর নাই, মাথা নামাইলে অপর আর কিছু দেখা যায় না। সে সময় ভ্রমর চীৎকার ব্যতীত আর কোন শব্দ শুনা যায় না, পুষ্পের গন্ধ ভিন্ন আর কোন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, তখন দেহের সকল কপাট বন্ধ, কেবল মন খোলা, মনকে তখন একা পাওয়া যায়। তাহাতেই বৈরাগীরা মালা গাঁথে। যোগীর ধ্যান আর বৈরাগীর মালা গাঁথা একই জিনিস। মোকদ্দমার কথা ক্ষান্ত হইয়াছে?

নবকুমার। না, এখনো তাহারা বসে আছে।

পিতম, তুমি আহার করিলে না?

পিতম। সত্য কথা, তবে আমি চলিলাম ও ঘরে ছবি আছে?

নব। খাসখানায়, কেন? ছবি থাবে?

পিতম। না, দেখিব; তুমি সকলের ছবি চেন?

নব। চিনি, কিন্তু তোমায় ত সে ঘরে যাইতে দিবে না, তথায় কেবল নিতান্ত আপনার জন যাইতে পায়।

এই সময় দেওয়ান ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্যেরা আসিল। দেওয়ান কতকটা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আপনারা অনর্থক জেদ করিতেছেন। আপনারা সাক্ষীদিগের নাম করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তদন্ত করিতে পারিব। তদন্ত করিলে পর আপনারা আসিবেন, আমার কি রাজা বাহাদুরের যাহা বলিবার থাকে, তখন বলিব। এ সময় অনর্থক আপনারা কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আর যদিই এই সকল লোকে বলে যে, সন্তানটী আপনার, তাহা হইলেই বা কেন আপনি সন্তান পাইবেন? দুই জন দাসীর কথায় যদি একজন রাজার বংশ-লোপ হইত, তাহা হইলে দিন-রাত্রি হইত না। আপনি সে দিবসও আত্মীয়দের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আর কখন সূতিকাগার পাতা-লতায় বাঁধিব না। অতএব সে দিবস পর্য্যন্ত আপনি জানিতেন যে, বেড়ার দোষে আপনার সন্তান মরিয়াছে; আপনি চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সূতিকাগারের পশ্চাৎ জঙ্গলের ভিতর সন্তানের দেহাবশিষ্ট রহিয়াছে. আপনি স্বয়ং তাহার সৎকার করিয়াছিলেন; সে সকল ভুলিয়া এখন একেবারে ফিরিয়া বসিয়াছেন। যাহারা আপনাকে নাচাইয়াছে, তাহারা কেবল রাজার শত্রু নহে, আপনারও পরম শত্রু; অনর্থক আশা-সঞ্চার করাইয়া আপনার এই মনস্তাপ বাড়াইয়াছে। অতএব বাটী যান, এ সকল কথা আর মনে স্থান দিবেন না।"

এই বলিয়া দেওয়ান আবার চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাহার পর একজন বলিলেন, "চলুন, সমুদায় প্রধান লোকের নিকট গিয়া পরামর্শ করি, আর কথায় কিছু হইবে না, সকলই ত শুনা গেল।"

সায়ংকাল পর্য্যন্ত পিতম দেওয়ানখানায় বসিয়াছিল, তাহার পর অতি সঙ্কুচিতভাবে নতশিরে বাহির হইল। পাছে তাহারে কেহ দেখিতে পায়, পিতম যেন প্রতিপদার্পণে এই আশঙ্কা করিয়া চলিতে লাগিল। দেখিতে পাইলে কেহ আহারের অনুরোধ করিবে, এ আশঙ্কা পিতম একেবারে করে নাই; ধনবানের বাটীতে "দীয়তাং" না বলিলে, "ভুজ্যতাং" বলে না, এ কথা পিতম বিশেষরূপে জানিত; তথাপি পিতম যে কেন কুণ্ঠিতপদ, তাহা আপাততঃ অনুভব করা কঠিন।

পিতম রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। কাঙ্গালীদের শিশুরা পিতু পিতু পিতুমণি বলিয়া আহ্লাদে কত ডাকিতে লাগিল, পিতম তাহাতে কর্ণপাতও করিল না;

উচ্ছিষ্টপত্রাবশিষ্ট ত্যাগ করিয়া কুক্কুরগণ কতকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, পিতম তাহা ফিরিয়াও দেখিল না। শেষ এক নির্জ্জন দীর্ঘিকায় উপস্থিত হইয়া ব্যস্তভাবে জলে ঝাঁপ দিল, সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "আঃ!" বলিয়া এক চীৎকার করিল। তাহার পর জ্যোৎস্না পিতমের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, তখন অর্দ্ধনিমজ্জিতশরীরে পিতম স্থিরভাবে চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। একবার আপনার কথা মনে হইল, তখন অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিল, "ভগবান্! আবার এ বিড়ম্বনা কেন? অন্ধকারে আর আলোক কেন?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সায়ংকাল অতীত হইলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজা বহির্ব্বাটীতে পুনরাগমন করিলেন। দেওয়ানের সমভিব্যাহারে নানা কথার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতকগুলি ভট্টাচার্য্য আমার কুমারকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলেন কেন? আমি তাঁহাদের ভাব ঠিক বুঝিতে পারি নাই; ব্যাপারখানা কি? সত্য সত্যই কি তাঁহারা আমার ক্রোড় হইতে আমার সন্তান কাড়িয়া লইতে গিয়াছিলেন?"

দেও। এক প্রকার তাহাই বটে। দশরথ নামে একজন ভট্টাচার্য্য শুনিয়াছেন যে, রাজকুমার তাঁহার সন্তান, তাহাতেই তিনি মহারাজের নিকট সন্তান চাহিয়াছিলেন।

রাজা। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দিবসেই চক্রে বসিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা কিরূপে ক্ষান্ত হইলেন?

দেও। ক্ষান্ত তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে হন নাই, বোধ হয়, তাঁহারা এই দাবি আবার মধ্যে মধ্যে করিতে আসিবেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছি।

রাজা। তবে কি তাঁহাদের সত্য সত্যই এই ধারণা?

দেওয়ান এই সময় সংক্ষেপে ব্রাহ্মণদের সমুদায় কথার পরিচয় দিলেন। রাজা দুই একবার সজোরে নস্য টানিলেন। প্রকাশ্যে চিন্তা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক—শাস্ত্রব্যবসায়ী—একজন নয় দুইজন নয়, অনেকগুলি—সকলেই ত পাগল নহে—আমার সঙ্গে তাঁহাদের কাহার ত শক্রতা নাই—তাঁহারা কেন মিথ্যা বলিবেন? অবশ্য তাঁহাদের কথার কোন বিশেষ হেতু থাকিতে পারে—তাঁহারা বলিয়াছেন, 'রাণীর দুইজন সখী এ কথা জানে,' সখীরা ত আমার লোক, ব্রাহ্মণেরা যখন তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ইহার মূলে কিছু আছে। যাহাই হউক, আমার ভগিনীও এ কথার অবশ্য কিছু জানেন, আমার ভগিনী—রাজভগিনী, কখন তিনি মিথ্যা বলিবেন না, তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিলে, তিনিও আজ মহারাণী—এক্ষণে কাঙ্গালিনী—কিছুতেই দুঃখ নাই—সকল সময়েই হাসিমুখ, অথচ একটু ম্লান—জ্যোৎস্নাবতী ঠিক নাম, গম্ভীর অথচ আলোকময়—কিন্তু একটু ম্লান—তাহার ম্লানতা আর ঘুচিবে না। আজ জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলেছেন, হয় ত মনে কি ব্যথা পাইয়াছেন—রাণী বলেন, জ্যোৎস্নাবতী আজ চখের জল ফেলিয়া অমঙ্গল করিয়াছেন; স্ত্রীজাতির মন।—"

এই বলিয়া রাজা সশব্দে আবার নস্য গ্রহণ করিলেন। দেওয়ান মহাশয় বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, এ বিষয়ের কোন তদন্ত আবশ্যক হইবে না। আমি জানিয়াছি যে, কোন রাজশক্র এই কথা রটাইয়াছে। দশরথ ভট্টাচার্য্য কতকটা সাদা লোক, রটনার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া রাজসমক্ষে আসিতে সাহস করিয়াছেন।"

রাজা। তা বটে; কিন্তু কথাটা এই যে, রাজভগিনী সাক্ষী; তিনি ত রাজশক্রর দলের নহেন। তাঁহার কথা আমি কখন অবিশ্বাস করিতে পারি না।

দেও। রাজভগিনী ত সাক্ষী নহেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। রাজভগিনী এ কথা অবশ্য জানেন, এই অনুভব কেবল আপনিই করিতেছেন।

রাজা। তা সত্য, তথাপি তাঁহাকে এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়। কিন্তু মূল কথা, পরের সন্তান পিণ্ড দিলে আমার পিতৃপুরুষ গ্রহণ করিবেন না; তবে এমন সন্তান লইয়া কেবল অধর্ম্মাচরণ করিবার ফল কি?

দেওয়ান। এখনও ত স্থির হয় নাই যে, রাজকুমার দশরথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র; যদি তাহা স্থির হয়, তখন কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু রাজশক্ররা মহারাজের অভিপ্রায় এই সময়

জানিতে পারিলে, ভবিষ্যতে নানা ব্যাঘাত ঘটিইবে।

রাজা। না, আমি কোন কথাই এখন বলিতেছি না; রাজভগিনীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাঁহাকেও কোন কথা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিব না; তিনি বোধ হয়, কোনরূপ মনোব্যথা পাইয়াছেন।

জ্যোৎস্নাবতী বাস্তবিক সে দিবস বড় মনের কষ্টে ছিলেন, তাঁহার প্রতি রাণীর মনোভঙ্গ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের দিনে জ্যোৎস্না-বতী চক্ষের জল ফেলিয়াছেন বলিয়া রাণীর প্রথম বিরক্তি জন্মে; তাহার পর রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় জ্যোৎস্নাবতীকে খুঁজিয়া আনিতে হইয়াছিল বলিয়া রাণীর চিত্তবিকার আরও অধিক হয়; শেষ যখন রাণী সভাদর্শনে গিয়াছিলেন, সকল স্ত্রীলোকেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেবল জ্যোৎস্না-বতী উঠেন নাই; রাণীকে সম্মান করা দূরে থাক, একবার ফিরিয়াও চাহেন নাই; এই তাচ্ছল্য রাণীর অসহ্য বোধ হইয়াছিল। এমন কি, তিনি আর সেখানে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

দশরথ দেবশর্ম্মা গোপনে যে দুইজন দাসীর নাম করিয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বদাই রাণীর সঙ্গে থাকিত; রাণীর মনের গতি বিশেষ বুঝিত। রাণী অপমানিতা মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে সেই দুই দাসী সঙ্গে সঙ্গে শয়নাগারে গিয়া ব্যজনহস্তে জ্যোৎস্না-বতীর স্বপক্ষে দুই একটী কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, রাণীর রাগ তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন দাসীরা ক্রমে ক্রমে সুর ফিরাইল, অবধানে জ্যোৎস্নাবতীর দুই একটী নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল; এমন সময় তৃতীয় আর একজন পরিচারিকা অতি ব্যস্ত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী কোথায়? বিষম বিপদ্ উপস্থিত; জনকতক লোক রাজকুমারকে লইয়া যাইতেছিল।" "রাজা কোথা?" বলিয়া রাণী বাঘিনীর মত সদর্পে উঠিলেন। পরিচারিকা বলিল, "রাজকুমারকে বুকে করিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিতেছেন।" রাণী শিথিলোদ্যম হইয়া আবার পালঙ্কে বসিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

যে দুইজন দাসী রাণীকে ব্যজন করিতেছিল, তাহাদের একজন বলিল, "আমরা তা আগেই জানি, রাজভগিনীর মহলে রাম না হ'তে রামায়ণ হয়ে গিয়াছে। আজ ছেলে কাড়িয়া লইতে আসিবে,পরা-মর্শ হয়েছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম।

রাণী। কি শুনেছিলে?

প্রথম দাসী। আমাদের সে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না।

দ্বিতীয় দাসী। আমাদের বলা শুভালও হয় না, আমরা যেমন লোক, সেইরূপ থাকাই ভাল, আমাদের কথায় রাজঘরে মনান্তর হইলে আমাদের সে কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান হবে না।

রাণী। আমি সকল কথা শুনিতে চাই; আমার লোক হয়ে,আমার বিরুদ্ধের কথা যে গোপন করিবে, আমার বাটীতে তার স্থান হবে না।

প্রথম দাসী। আমাদের উভয় সঙ্কট, তা আর ভয় করিলে কি হবে, রাগ করিবেন না; একদিন আমরা দুইজনে রাজভগিনীর মহলে গিয়া শুনিয়া-ছিলাম যে, এত দিনের পর রাজবংশে পিণ্ডলোপ হ'ল। যে ছেলে আমরা লালন-পালন করিতেছি, সে ছেলে নাকি কোন বামুনদের। প্রসবের সময় যখন আপনি মূর্চ্ছা যান, তখন নাকি রাজভগিনী মরা মেয়ে ভূমিষ্ঠ দেখে কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মহলে চলে যান, তাহার পর আমরা নাকি কোন ধাইকে দিয়ে সেই মরা মেয়ে কোন বামুনদের আঁতুড়ে রেখে, তাদের নাকি ছেলে আপনার আঁতুড়ে এনে দিই। আবার নাকি টাকার লোভে আমরা এ কাজ করেছিলাম। চোখখাকীরা বলে কি রাজপুত্র হলে বড় ঘটা হবে, অনেক দান ধ্যান হবে, তাই নাকি আমরা দুইজনে পরামর্শ করে ছেলে বদল করেছিলাম।

রাণী। তোরা রাজভগিনীর মুখে এ কথা শুনেছিলি?

প্র, দা। না, তাঁর মুখে কেন? আমাদের কি এত সাহস হয় যে, আমরা সে কথা বলিতে পারি? আর পাঁচজনে এ কথা বলিতেছিল, তারা তাঁর লোক। তা তাঁর বলা কাজেই হ'ল বই কি।

রাণী তৎক্ষণাৎ সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিলেন; মাথা বাঁকাইয়া প্রথম দাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দুর্দ্দম রাগহেতু কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমরা একজন যাও, জ্যোৎস্নাবতীকে বল গিয়ে যে, যত দিন তিনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন, তত দিন তিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।"

প্রথম দাসী চলিয়া গেল। কয়েক পদ গেলে আবার রাণী তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের মহলে লইয়া গিয়া এই কথা বলিবে। আমার মহলে এ কথা বলিবে না।"

দাসী বিনীতভাবে জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার মহলে লইয়া গেল। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া দুই একবার চক্ষের জল মুছিল, তাহার পর বলিল, "রাণী ঠাকুরাণীর কি হয়েছে, সকলকেই কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন দিন যায় না যে, অনর্থক দুই একবার আমরা তিরস্কার না খাই—"

জ্যোৎ। তাই ব'লে তোমরা কিছু মনে কর না, তিনি স্বাভাবিকই একটু রাগী, রাগটা পীড়ার মধ্যে, রাগ যার আছে, তার উপর দয়া করা উচিত। রাগ শুনিলে আমার বড় লজ্জা হয়।

দাসী। তা যাহাই হউক, আমাদের উপর রাগ করে যাহাই বলুন, আমরা সকলই সহ্য করি, কিন্তু এখন যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন।

জ্যোৎ। "কেন, আবার কার উপর রাগ করে কি বলেছেন?" এই কথাটী জ্যোৎস্নাবতী কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল।

দাসী। তা আপনি ত বুঝেছেন।

জ্যোৎ। তা হোক, রাণী আমার উপর জন্ম জন্ম রাগ করুন।

দাসী। তিনি রাগ করে বলিলেন যে—

জ্যোৎ। যাহাই বলুন, সে কথা আমায় আর শুনাইবার আবশ্যক কি?

দাসী। আবশ্যক আছে বই কি, তিনি যে সে কথা শুনাইবার জন্য আমায় পাঠালেন।

জ্যোৎ। তুমি বল গে "বলে এসেছি।"

দাসী। তাহা না বলিলে চলিবে না। আপনি এখন দিনকতকের মত শ্বশুরবাড়ী গেলে ভাল হয়, এই কথা বলিতে বলিয়াছেন। আর বলেছেন যে, যদি আপনি সহজে না যান, তিনি জোর করে পাঠাইয়া দিবেন, এ রাজবাটীতে আপনার আর স্থান হবে না।

দাসী এই বলিয়া চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নাবতী ছাদের উপর শয়ন করিয়া চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন, নিকটে তাঁহার পরিচারিকা মাতঙ্গিনী বসিয়া মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "রাত্রি অধিক হয়েছে, ঘরের ভিতর চলুন।" জ্যোৎস্নাবতী বাক্য দ্বারা কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। যখনই মাতঙ্গিনী উঠিতে বলিতেছে, তখনই জ্যোৎস্নাবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। মুখে কথা নাই, চক্ষে জল নাই, বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্থিরভাবে আছেন।

মাতঙ্গিনী মাতৃপিতৃহীনা, অল্পবয়স্কা, আশ্রয়হীনা, সুতরাং অন্যের আশ্রয় ভাঙ্গিলে তাহার প্রাণ কাঁদে। সে মাতার ন্যায় জ্যোৎস্নাবতীকে ভালবাসে, জ্যোৎস্নাবতীর আশ্রয় ভাঙ্গিল শুনিয়া সে পূর্ব্বে কাঁদিয়াছিল, এখন জ্যোৎস্নাবতীর ম্লান মুখ দেখিয়া আবার তাহার চক্ষে জল আসিল। পূর্ণিমার রাত্রি মেঘাবৃত হইলে ম্লানজ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন কখন কখন প্রাণ কাঁদে, জ্যোৎস্নাবতীর ম্লানমুখ দেখিয়া মাতঙ্গিনীর প্রাণ সেইরূপ কাঁদিল। মাতঙ্গিনী কাঁদিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষের জল আর নিবারিত থাকিল না, একেবারে উছলিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী ভাবিল, জ্যোৎস্নাবতীর মনোবেদনা আরও বাড়িল। মাতঙ্গিনী অল্পবয়স্কা, সে বুঝিল না যে, যখন বিষম ঝড় বহিতে থাকে, তখন এক ফোঁটাও জল পড়ে না—ঝড় থামিলেই জল হয়। জ্যোৎস্নাবতীর হৃদয়ে যতক্ষণ ঝড় বহিতেছিল, ততক্ষণ চক্ষে জল আইসে নাই, ঝড় মন্দীভূত হইল, আর চক্ষে জল আসিল।

জ্যোৎস্নাবতী শেষ উঠিয়া মাতঙ্গিনীর চখের জল মুছাইয়া দিলেন। মাতঙ্গিনী পিতৃমাতৃহীনা, আশ্রয়হীনা, বিধবা, বিশেষতঃ সে মাতৃসম্বোধন করিত বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

মাতঙ্গিনীর চখের জল মুছাইয়া জ্যোৎস্নাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতি! তুই কাঁদিলি কেন?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "আপনার এখান হইতে অন্যত্র যাওয়াই ভাল।"

জ্যোৎস্না। আমার আর এ জগতে স্থান কোথা? আমি এইখানেই থাকিব।

মাত। কেন—আপনার শ্বশুরবাড়ী? শুনিয়াছিলাম, আপনার শ্বশুর রাজা ছিলেন, আপনি কেন সেইখানে যান্ না?

জ্যোৎস্না। শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিতে বড় কষ্ট হয়।

এই বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। শেষ জ্যোৎস্নাবতী

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিব না, কেনই বা বলি। দিবানিশি যে সেই কথাই আমার জপ, সেই কথাই লয়ে আমার সুখ, সেই কথাই লয়ে আমার দুঃখ।

মাত। আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথা মা? আমি সেখানকার কোন কথা কখন শুনি নাই।

জ্যোৎ। হলদির জাঙ্গাল দেখেছ?

মাত। দেখেছি—সেই জাঙ্গালের ধার দিয়ে একবার আমার মামার বাড়ী গিয়াছিলাম।

জ্যোৎ। সে জাঙ্গাল দিয়ে এখন আর লোক-জন চলে?

মাত। বড় নয়—কেহ যায় না বলিয়া তাহার মাঝখানে বড় জঙ্গল হয়েছে।

জ্যোৎ। তবে ঠিক আমার অদৃষ্টের মত হয়েছে।

মাত। কেন মা?

জ্যোৎ। সেই জাঙ্গাল আমার বিবাহের সময় য়। সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার শ্বশুর বিবাহ দিতে এসেছিলেন।

মাত। বিবাহের পর আপনি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন?

জ্যোৎ। তা ত যেতে হয়। সেখানে গিয়ে কাদিক্রমে ষোল বৎসর থাকি, তার পর চিরকালের এখানে আবার ফিরে আসি

জ্যোৎস্নাবতী এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিলেন।

মাত। ত—ষোল বৎসরের মধ্যে এঁরা আপনাকে আর আনেন নাই কেন?

জ্যোৎ। এ সকল রাজকায়দা। আমার তেমন বিপদের সময় বড় ইচ্ছা হয়েছিল, একবার এখানে এসে কাঁদি। আমি তখন সতের বৎসরের। বিপদের কি জানি, সংসারের কি জানি, কপালের কথাই কি জানি

মাত। কেন মা, কি হয়েছিল?

জ্যোৎ। কি হয়েছিল, তার কোনখানটা বলিব, তাঁর বয়স ২২ বৎসর, তখন সেই সর্ব্বনাশ তার পূর্ব্বে আমি কত সুখে ছিলাম; ভাবিতাম, বাই বুঝি এইরূপ। এ সুখ থাকে কি যায়, লের কপালে এ সুখ ঘটে কি না ঘটে, তাহা আরও মনে ভাবিতাম না, আপনার সুখে আপনি থাকিতাম। তাঁর ঘরে অন্ধ হয়ে থাকিতাম। এ তে কাহারও যে কষ্ট আছে, তাহা একেবারে জানি-না; তাঁরে আদর করিতাম, তাতে সুখ, আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতাম, তাতেও সুখ। তাঁরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু কি তাঁর দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল, আমায় লেখা-পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি শিখিতে কত আপত্তি করিতাম, পায়ে ধরে পর্য্যন্ত বলিতাম যে, আমাদের লেখা-পড়া শিখিতে নাই, শিখিলে অদৃষ্ট মন্দ হয়। তিনি তাহা কিছুই শুনিতেন না, আমার সকল কথা হাসিয়া কাটাইতেন; বলিতেন, "স্ত্রী রামায়ণ পড়িলে যদি স্বামী মরে, ত এমন স্বামী মরাই ভাল।" এ কথায় বড় ব্যথা পাইতাম। চোখের জল মুছিয়া পড়িতে বসিতাম। তিনি আমাকে পড়াইয়া একটী পাখী পড়াইতে যাইতেন; হাসিয়া বলিতেন, "এটীও তোমার মতন—খাঁচায় থাকে, জানে না যে কেন এ খাঁচা কেন আপনার এত রূপ, কেন এ মিষ্ট স্বর, কেন বা ঐ সূর্য্য, কেন বা ঐ চন্দ্র, কেন বা এ পৃথিবী, কেন বা এ জগৎ।" আমি হাসিয়া বলিতাম, "বল, এ দুটীর মধ্যে কারে ভালবাস?" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি হাসিয়া পলাইতেন, তাঁর হাসি কি আর ভুলিতে পারিব? পাখীটীও তাঁর হাসি বুঝিত, হাসি শুনিলে সুখে সে কত কথাই কহিত। আমি ভাবিতাম যে, আমার অপেক্ষা বুঝি পাখী তাঁরে বেশী আদর করিল। কখন কখন আমার হিংসা হইত, আমি তখন আর কার হিংসা করিব? তিনি চলিয়া গেলে, তাঁর হাসি কি কথা না শুনিতে পাইলে পাখীটী নীরবে থাকিত, আমি রাগ করে তার খাঁচা ধরে কত গালি দিতাম। পাখী একবার এ কাণ একবার ও কাণ ফিরাইয়া আমার গালি শুনিত, কোন উত্তর দিত না, এক একবার লাফাইয়া আমার আঙ্গুল ঠোক্রাইত, আমি আবার গালি দিতাম, তিনি ঘরে আসিলে তাঁর সাক্ষাতেও গালি দিতাম, বলিতাম, "ও আমার সতীন।" তিনি হাসিয়া উঠিতেন, পোড়া পাখী সে হাসি শুনিবামাত্র আবার আপনার সুর ধরিত, কত কথা কহিত; তিনিও যেন তার সকল সুর বুঝিতেন, সেইমত তাহার সঙ্গে আমোদ করিতেন। আমি রাগ করিয়া বসিয়া থাকিতাম; তখন বুঝিতাম না যে, তাঁরে পাখীটী পর্য্যন্ত সকলে ভালবাসে। উঠানে বাহির হইলে তাঁহাকে পায়রায় আসিয়া ঘেরিত; যে তাঁর শরীরে বসিতে না পাইত, সে তাঁরে বেড়িয়া বেড়িয়া উড়িত; তিনি মুখ তুলিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, উর্দ্ধ-মুখখানি কত সুন্দর দেখাত।

রাজবাটীতে যত হাতী ছিল, সকলে তাঁরে চিনিত, ভালবাসিত। তাঁর স্নানের সময় পুষ্করিণীতে সকলগুলি আসিত. তাঁরে লইয়া জলে কতই খেলা করিত। শুঁড়ে বসাইয়া কেহ তাঁরে জলে নামাইত, আর সকলে সেই সময় শুঁড় দিয়া তাঁর গায়ে জল ছিটাইত। এক একদিন পুষ্করিণীর ধারে যখন জল-চৌকিতে বসিয়া তিনি তৈল মাখিতেন, সেই সময় কোন হাতী হয় ত জল হইতে ধীরে ধীরে শুঁড় বাড়াইয়া তাঁর শরীর স্পর্শ করিত, তাঁর অঙ্গস্পর্শ না করিলে যেন সে আর থাকিতে পারে না। জলে নামিতে দেরি হইতেছে বলে কোন দুরন্ত হাতী হয় ত জল-চৌকি ধরিয়া টানিত; তিনি হাসিয়া গালি দিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, জলের ভিতর লুকাইতেন, আর সকল হাতীরা তাঁরে খুঁজিয়া বেড়াইত; আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জানেলায় বসিয়া থাকিতাম। তার পর তিনি একদিকে ভাসিয়া উঠিলে সকল হাতী সেই দিকে গিয়া পড়িত। শেষ তিনি সকল হাতীর শুঁড়ে একবার করিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের তৃপ্তি হইত। তাহার পর স্নান হইলে একটা হাতী শুঁড় দিয়া ছাতি ধরে বরাবর তাঁকে দ্বার পর্য্যন্ত দিয়া যাইত।

স্নানের পর পূজা করিতে বসিতেন। তখন তাঁর কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি হইত; মুখ দেখে বোধ হইত, যেন এ পৃথিবীতে আর তাঁর কোন সংস্পর্শ নাই। যখন চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন, সম্মুখের দেবতারা যেন তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। লোকে বলিত, দেবতারা তাঁর সঙ্গে কথা কহিতেন হবে আশ্চর্য্য কি! তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে দেবতাদের ইচ্ছা হইতে পারে, মানুষের মধ্যে তাঁর মত পবিত্র আর কে ছিল? মার নিকট বসে আহার করিতেন, কোন কোন দিন আহারের পর মার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মুখখানি শিশুর মত আদর ভরা দেখাইত।

তার পর বিষয়কার্য্য দেখিতে যাইতেন, যে অবধি তিনি কাছারি-বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই অবধি দেওয়ানের ভয় হইয়াছিল। তাঁকে সকলেই ভালবাসিত, কেবল দেওয়ান বিষ দেখিত। সেই দেওয়ানই আমার কাল হয়েছিল; কিন্তু তিনি থাকিতে দেওয়ান কিছু করিতে পারে নাই।

তাঁর সকলই গুণ ছিল, কেবল এক দোষের নিমিত্ত সকলেই তাঁর নিন্দা করিত; তিনি চেষ্টা করে বিপদ্ আনিতেন। বিপদ্ না ঘটে, এই সকলের চেষ্টা; কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল, কিসে বিপদ্ ঘটে। আমি তাঁরে কত বলিতাম, তিনি কিছুই শুনিতেন না; হাসিয়া বলিতেন, "অনেকে মধ্যে মধ্যে পা না টেপাইলে কষ্ট পায়; আমারও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিপদে না পড়িলে বড় কষ্ট হয়।" আমি অবাক্ হয়ে শুনিতাম। একবার কোন জমিদারি দেখিতে গিয়াছিলেন, বাটী আসিতে আসিতে পথে শুনিলেন যে, দূরে এক পুষ্করিণী-তীরে ডাকাতেরা বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে, পূর্ব্বদিন একজন ভদ্রলোকের কন্যা পাল্কী করে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল, ডাকাতেরা তাহাদের সকলকে মেরে ফেলেছে। শুনে সঙ্গীরা বলিল, ও পথে যাওয়া হইবে না। শুনে তিনি বলিলেন, ঐ পথে যেতে হবে। এই বলে বৌ সেজে পাল্কীতে উঠে সঙ্গীদের ফেলে চলিয়া গেলেন, সাত আট জন ডাকাতকে ধরে বাটী আনিলেন; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করিবার সময় একজন ডাকাত খুন হয়, সেই অবধি আমার কপাল ভাঙ্গে। কেমন তাঁর একটা ধারণা হয় যে, তাঁর লাঠিতেই ডাকাতটা মরেছে, অথচ সে সময় তাঁর হাতে লাঠি একেবারে ছিল না। যার লাঠিতে মরিয়াছিল, সে আপনি স্বীকার করেছিল, বখসীসও পেয়েছিল, তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না।

প্রথমে তিনি পূজা ছাড়িলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি এখন অশুচি—দেবতারা আর আমার পূজা লইবেন না।" তার পর ক্রমে ক্রমে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন; এক একবার বলিতেন, "প্রায়শ্চিত্ত করিব, অন্যের জন্য মরিলেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।" আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বুঝিতাম, সে মুখে আর হাসি নাই। শেষ একদিন বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে, পথে একটা দুরন্ত ছেলে ইট হাতে করে একজন বৃদ্ধ পাগলকে বলিতেছে, "আমি তোরে মারিব।" পাগল ভয়ে হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে। বালক বলিতেছে, "এই মারি"। পাগল ভয়ে আরও কাঁদিয়া উঠিতেছে। এই দেখে তিনি কেমন ব্যাকুল হলেন. তিনিও যেন ভয়ে কাঁদিয়া উঠেন বলিয়া তাঁর বোধ হ'ল। তার পর বাড়ী এসে তাহা বলিতে বলিতে ভয় পাইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, "পাগলের

কান্না দেখে তুমি ভয় পেয়েছ কেন, তুমি ক্ষেপেছ নাকি?' অমনি তিনি আমার মুখ চাপিয়া বলিলেন, "ও কথা কেন বলিলে? তবে কি সত্যই,—" এই বলিয়া আমার হাত ছিনিয়া পলাইলেন। আমার নিকট হইতে পলাইয়া মার নিকটে গেলেন, দুই হাতে মার পায়ের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "মা, আমার পীড়া হয়েছে, তোমার চরণরেণু মাখিলেই আমি ভাল হব।" এই কথায় কাঁদিয়া উঠিলেন, কান্না দেখিয়া আবার ভয় পেয়ে বলিলেন, "তবে কি—সত্যই।" অমনি সেইখান হইতে পলাইলেন। একবার আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন; পিতা ভাবিলেন, অসময়ে এ প্রণাম কেন? কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

রাত্রে আর তাঁকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। সেই দিন অবধি রাজবাড়ী শূন্য হ'ল।

চারি দিন পরে একজন জেলে আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজপুত্রকে পাওয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র রাজবাড়ীর সকলে জেলের সঙ্গে ছুটিল, গ্রামের লোকও পালে পালে গেল। আমি একা বসে মনে মনে করিতে লাগিলাম যে, এবারে তাঁরে পেলে আর তিলার্দ্ধের জন্য ছেড়ে দিব না; একবার তাঁরে দেখিতে পেলে হয়। অনেকক্ষণ পরে আবার পালে পালে লোক ফিরিয়া আসিতে লাগিল, রাজবাটীরও লোক সকল ফিরে আসিল; তাঁর আসার কথা কেহ বলে না। আমি ছটফট করিতে লাগিলাম, শেষ রাজমহলে কান্নার গোল উঠিল, আমি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু কেমন একটা আশঙ্কা হ'ল, আমি গিয়া শাশুড়ীকে বলিলাম, আপনি লুকালে ত কুসংবাদ লুকান থাকে না। ক্রমে শুনিলাম, নদীতীরে তাঁর দেহের সংকার আরম্ভ হয়েছে, জেলে জাল ফেলিতে গিয়ে তাঁর দেহ পাইয়াছিল, তাই রাজবাটীতে খবর দিতে এসেছিল, কেহই তার কথা বুঝিতে পারে নাই, শেষ নদীর ধারে গিয়া পারিল। তার পর আমার কি হ'ল, আমি বুঝিতে পারি নাই। যখন উঠে বসিতে পারিলাম, তখন একদিন শ্রাদ্ধের কথা আমার কাণে আমার যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম। সর্ব্বনাশের কথা আমার সকলেই বুঝেছিল, পোড়া কেবল আমি বুঝিতে পারি নাই। পায়রাগুলা আর সেরূপ গোলমাল করে না, কার্ণিসের নীচে চুপ করে বসে থাকে। পুষ্করিণীর ধারে তাঁর শ্বেতপাথরের একখানি জলচৌকি থাকিত, একদিন স্নানের সময় জানেলায় বসে আমি তাহা দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে একটী হাতী দৌড়িয়া সেই জলচৌকির নিকটে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কত লোক ছিল, কিন্তু হাতীর কাছে কেহই আসিল না। লোকে ভেবেছিল হাতী ক্ষেপেছে; কিন্তু হাতীটী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি এই হাতীটীকে বড় ভালবাসিতেন, এই হাতীটাই তাঁরে ছাতি ধরিত, এই হাতীটাই এক এক দিন শুয়ে থাকিত, আর তিনি তার পেটে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশী বাজাইতেন। হাতীটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘাটে দাঁড়ায়ে এদিক ওদিক ফিরে ঘুরে দেখিতে লাগিল, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সে তাঁরে খুঁজিতেছে। হাতীটী একবার গা য়ে চীৎকার করে ডাকিল, শেষ জলে নামিল; বুঝি মনে করিল, তিনি জলের ভিতর কোথাও লুকায়ে আছেন। হাতীটী কতবার ডুব দিল, কতবার মাথা তুলে চারি দিকে দেখিতে লাগিল। আবার জল হইতে উঠে জলচৌকির নিকট দাঁড়াইল, জলচৌকি সরাইয়া দেখিল। হাতী কি চায়, কি খুঁজিতেছে, মাহুত তা বুঝিল; কাছে এসে গা চাপড়ে বলিল, "আর কেন খোঁজ? সে ধন হারিয়ে গেছে।" হাতী সে কথা কিছুই শুনিল না, দাঁড়ায়ে রহিল; একজনের হাতে একটী ছাতি ছিল, শুঁড় দিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া জলচৌকির উপর ক্ষণেক তাহা ধরিয়া রহিল, তার পর যেন তাঁরে স্নান করাইয়া বাড়ী আনিতেছে, এই ভাবে ছাতি ধরে দরজা পর্য্যন্ত আসিল; এই দেখে মাহুত কেঁদে উঠিল। জানালা থেকে দাসীরা সকলে আমায় উঠাইয়া নিয়ে গেল।

তার পর শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ করিতে আমায় লয়ে গেল, আয়োজন দেখে তা বুঝিতে পারিলাম। আমি প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে আসিলাম, আর কোন মতে গেলাম না। শেষ আমার শ্বশুর নিজে এসে একবার কাঁদিতে লাগিলেন, একবার সাধিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করি, মিছে করে বলিলাম যে, "তিনি ত মরেন নাই, তিনি আবার ফিরে আসিবেন। জেলের কথা শুনে যে দেহের সংকার করা হয়েছে, সে দেহ ত তাঁর নহে। যারা দেখিতে গিয়েছিল, তারা কেবল কাপড় দেখে চিনেছিল; কিন্তু অন্য লোক কেহ যদি তাঁর কাপড় পরে থাকে?"

এই কথা শুনে আমার শ্বশুর অবাক্ হয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তার পর বলিলেন, "সত্য কথা, আমি কেন এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমার চাঁদ বেঁচে আছে। আবার আসিবে, অবশ্য আসিবে। আমি দেওয়ানকে বলি গিয়ে।"

কিন্তু পাষণ্ড দেওয়ান তাঁর সকল কথা উল্টাইয়া দিল। আবার শ্বশুর এসে জেদ করে ধরিলেন যে, "শ্রাদ্ধ করিতে হবে, নতুবা তাঁর গতি হবে না, প্রেত অবস্থায় কত কষ্ট পাবেন।" আমি আর কি করি ; শ্রাদ্ধ করিলাম।

মাতঙ্গিনী। আপনার শাশুড়ী কিছু বলিলেন না ? আপনি তাঁর কোন কথাই ত বলিতেছেন না ?

জ্যোং। তিনি বৃথা মানুষ ছিলেন, কখন কখন তাঁর জ্ঞান থাকিত না। আমার বিবাহের পর বরাবর দেখেছি, বেশ সহজ লোক ছিলেন ; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তিনি কথাও কহিলেন না, একদিন কাঁদিলেনও না ; আমি কাঁদিলে বলিতেন, "আমার ছেলের অকল্যাণ হবে।" তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, রোজ আমার কপালে সিন্দুর পরায়ে যেতেন। কিন্তু অধিক দিন বাঁচিলেন না। আমার শ্বশুর দিন কতক শোক করিলেন, তার পর ক্রমে ক্রমে সকল ভুলে গেলেন ; বুড়া লোকের শোক কত দিন থাকে ?

মাতঙ্গিনী। শোক নাকি আবার বুড়া যুবার পৃথক ?

জ্যোং। বিস্তর পৃথক। তা আমার শ্বশুর হতে দেখেছি। এক বৎসর না যাইতেই তিনি পোষ্যপুত্র লইলেন।

মাতঙ্গিনী। তা তিনি কি করিবেন, তাঁর রাজ্য ত রাখিতে হয় ?

জ্যোং। কে তাঁর রাজ্য কাড়িয়া লইতেছিল ? দুই বৎসর অপেক্ষা করিলে কি ক্ষতি হইত ?

মাতঙ্গিনী। লাভই বা কি হইত ? তাঁর ছেলে ত আর ফিরে আসিতেন না।

জ্যোং। তিনি ফিরে এসেছিলেন।

মাত। তার পর ?

জ্যোং। দেওয়ান কৌশল করায় তাঁর পিতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি অভিমানে আবার চলিয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে মাতঙ্গিনী একজন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিল, "আয়ি, আমার চাকুরীতে ইস্তফা—ঠাকুরাণী আমায় খুঁজিলে তাঁহারে বুঝাইয়া বলিও, আমি চলিলাম।" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল "সে কি ? তুই কোথায় চলিলি ?"

মাত। তা এখনও ঠিক জানি না।

বৃদ্ধা। কেন চলিলি ?

মাত। আর চাকুরী করিব না।

বৃদ্ধা। কি করে খাবি ?

মাত। ঘটকালী করে।

বৃদ্ধা। ও আবার কি কথা ? তা একটু থেকে যা, ঠাকুরাণী উঠিলে তাঁরে বলে যাস্।

মাত। তাঁরে বলা হবে না।

বৃদ্ধা। কেন ?

মাত। তাঁরে দেখিলে যাইতে পারিব না।

বৃদ্ধা। তা তোর গিয়ে কাজ কি ?

মাত। আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল। বৃদ্ধা একবার ডাকিয়া বলিল, "তোর পাওনা পাইয়াছিস্ ?" মাতঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না। বৃদ্ধা আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "মর ! ছুঁড়ী পাগল হয়েছে নাকি ?"

অপরাহ্নে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরাভিমুখে গেল। পথে দুই একটী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা মাতঙ্গিনীর প্রতি বিস্মিতলোচনে চাহিল। মাতঙ্গিনীর মনে পড়িল যে, সে যুবতী ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, অঞ্চল ধরিয়া, মাথা নাড়িয়া সদর্পে চলিয়া গেল, মন্দিরের সম্মুখে পৌছিলে তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ না করিয়া প্রবেশ করিল ; তথায় কেহ নাই দেখিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কালীদহ-তটে ব্রহ্মচারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত, ব্রহ্মচারী আসিলেন না। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল, তখনও ব্রহ্মচারীর দেখা নাই। মাতঙ্গিনী অন্ধকার দেখিয়া একবারমাত্র কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে চাঞ্চল্য আর রহিল না। কালীদহের সোপানে বসিয়া মন্দিরের প্রতি চাহিয়া রহিল। রাত্রি দুইপ্রহরের সময় ব্রহ্মচারী মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন দেখিয়া মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু

সে দিকে মন না দিয়া নির্ভরচিত্তে ব্রহ্মচারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "ভিখারিণী।

ব্রহ্ম। অসময়ে ভিক্ষার নিমিত্ত কেন ? আর আমি নিজে ভিক্ষুক, আমার নিকট ভিক্ষা কিরূপ ?

মাত। আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিতে গেলে বোধ হয় এই ঠিক সময়। অন্য সময়ে ত আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আর আপনার নিকট কেবলমাত্র একটী ভিক্ষা ; একজনের পরিচয় ভিক্ষা মাত্র।

ব্রহ্ম। কি পরিচয় ?

মাত। আপনি রাজ-জামাতাকে চিনিতেন ?

ব্রহ্ম। না—কিন্তু সে পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন ?

মাত। রাজ-জামাতার নিবাস কোথায় ছিল, আপনি জানেন ?

ব্রহ্ম। জানি—তক্ষপুর।

মাত। রাজ-জামাতার নাম কি ছিল জানেন ?

ব্রহ্ম। জানি—বিজয়রাজ। কিন্তু আর কোন কথার আমি উত্তর দিব না। তুমি বল, তোমার এ সকল কথায় কি প্রয়োজন ?

মাত। আমি বিজয়রাজকে খুঁজিতে —তাহাতেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার কি প্রয়োজন ?

মাত। বিজয়রাজ আমার মাতার নিকট বহু- অবধি ঋণী আছেন, সেই ঋণ আদায় করিতে তাঁহার নিকট যাইব।

ব্রহ্ম। কে তুমি ?

মাত। আমি বিধবা—অনাথা।

ব্রহ্ম। কিন্তু যুবতী দেখিতেছি।

মাত। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর তাহা চিনিতে পারা উচিত হয় না।

ব্রহ্ম। এই অন্ধকারে একাকী যুবতীর এই স্থানে আসা আরও উচিত হয় নাই।

মাত। বিপদগ্রস্তের সে বিচার থাকে না। তাহার সে বিচার করা অন্যায়।

ব্রহ্ম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কে ?"

মাত। আমায় যাহা দেখিতেছেন, আমি তাহাই। ইহার অধিক পরিচয় আর আমার নাই।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার মাতা যখন ঋণে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তখন তাঁহার পরিচয় বিলক্ষণ আছে, তবে তাঁহার পরিচয় দিতে তোমার আপত্তি কি ?

মাত। কোন পরিচয় আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি আপনাকে ভক্তি করি, তাহাতেই আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার সহায়তা করিতে পারেন, আপনার ধর্ম্ম আছে ; সহায়তা না করেন, বলিয়া দিন, তক্ষপুর কোন পথে যাইব।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজের বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে ; তক্ষপুরে তুমি অনর্থক যাইবে।

মাত। তাঁর আর কে আছে ?

ব্রহ্ম। এক ভাই আছে।

মাত। আপনি তাঁরে চিনেন ? তিনি কিরূপ ব্যক্তি ?

ব্রহ্ম। আমি চিনি, কিরূপ ব্যক্তি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তিনি এক্ষণে যুবা—যুবা কিংবা যুবতীর চরিত্র অনুভব করিতে পারি না।

মাত। তাঁর দুই একটী কথা যদি দেখিয়া থাকেন, আমায় বলুন, আমি অনুভব করিব।, মরেও

ব্রহ্ম। আমি তক্ষপুরে অনেক দিন ছিলাম। যখন যাইতাম, তখন ধনমদে তিনি উন্মত্ত তাঁহার দাম্ভিকতা অতিশয় বলিয়া বোধ কোন রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। এমন কি, তাঁহার জন্মদাতাকেও তিনি লক্ষ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার তাকিয়ায় লাথি মারিয়াছিলেন, আর পিতাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

মাত। পিতাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন কি. বুঝিলাম না। তাঁহার পিতা রাজা ছিলেন, তাঁহাকে কিরূপে বরখাস্ত করিয়াছিলেন ?

ব্রহ্ম। তাঁহার জন্মদাতা রাজা ছিলেন না. রাজার দেওয়ান ছিলেন। আপনার পুত্রকে পোষ্য-পুত্র দিয়াছিলেন। পোষ্যপুত্র ক্রমে এমনি কৃতঘ্ন হইয়া উঠিলেন যে, তিনি রাজা পাইবামাত্রই জনকের দেওয়ানী কাড়িয়া লইলেন।

মাত। কেন, তাহা কিছু জানেন ?

ব্রহ্ম। তাহা আমি ঠিক জানি না, কালমাহাত্ম্যে এ সকল ঘটে।

মাত। এখন দেওয়ান কে ?

ব্রহ্ম। বলিতে পারি না ; তবে শুনিয়াছি যে, বিজয়রাজের সময় যে সকল আমলা ছিল, তাহার ভাই তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম

দিয়াছেন, আর তাঁহার জনকের নিয়োজিত সকল লোককে তাড়াইয়াছেন।

মাত। দুইটীই শুভ সংবাদ। এখন তক্ষপুরের পথ বলিয়া দিন, আমি আমার মাতার ঋণ আদায় করিতে পারিব।

ব্রহ্ম। এই দুইটী পরিচয়েই তুমি কি বুঝিলে?

মাত। আমি এই বুঝিলাম যে, বিজয়রাজের ভাই বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মশীল—জনকের শঠতা বুঝিয়াছেন।

ব্রহ্ম। তাহা আমি ত কিছুই বুঝি নাই—ভাল, তুমি তক্ষপুরে যাইবে, তোমার সঙ্গে আর কে যাইবে?

মাত। আপনি যাইবেন।

ব্রহ্মচারী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মাতঙ্গিনী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মুহূর্ত্তেকমধ্যে মন্দির-প্রবেশ করিয়া কমণ্ডলু আনিয়া ব্রহ্মচারীর হাতে তিনি ধ. ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি?”

সিন্দুর পরা[illegible]নী বলিল, “চলুন।”

না। আমার.রী অবাক্ হইয়া আবার মাতঙ্গিনীর পর ক্র[illegible] চাহিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী বলিল, [illegible]ভাবিতেছেন কি? আপনাকে যাইতে হইবে। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার আর কেহ নাই যে, আমার সঙ্গে যাইবে। আমি যুবতী, অন্যে আমার সঙ্গে গেলে ভাল দেখাইবে না, অতএব আপনি যাইবেন। আপনার এখানে থাকিয়া কি লাভ? কাহার উপকার করিবেন? আমার সঙ্গে গেলে আমার উপকার হইবে। অতএব চলুন।”

ব্রহ্ম। তোমার নাম কি?

মাত। আমার নাম “মাতঙ্গিনী।”

ব্রহ্ম। তোমার বড় সাহস।

মাত। বড় সাহস না হইলে বড় সহায় ধরিতে আসি নাই।

ব্রহ্ম। তোমার মত স্ত্রীলোক কৈ আমি ত কখনও দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, তুমি তক্ষপুরে গিয়া কি কর, তাহা আমি দেখি।

মাত। তবে চলুন।

ব্রহ্ম। আজি নহে।

মাত। আজই। বিলম্ব হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না। অন্ততঃ আজি যাত্রা করে কতক দূর গিয়া বিশ্রাম করিবেন।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, চল, দেখা যাউক, ইহার পর আর কি আছে।”

তাহার পর উভয়ে তক্ষপুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে অপরাহ্নে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল, সেই অপরাহ্নে পুটুর মার প্রতিবাসিনী পদ্ম কেশবিন্যাসানন্তর রক্তবস্ত্র পরিয়া, মুখখানি তৈলে মার্জ্জিত করিয়া পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন; খড়কি-দ্বারে পুটুর মাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “ওলো কালামুখী! একটা কথা বলি, শুনে যা তো।” এই আহ্বানে পুটুর মা পরমাপ্যায়িত হইয়া হাসি হাসি মুখে পদ্মের নিকট গেলেন। অনেক দিনের পর পদ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ভাবিলেন, পদ্ম তাঁহাকে কতই মিষ্ট কথা বলিবে, তাঁহার জন্য কতই আহ্লাদ করিবে, তাহাতেই হয় ত পদ্ম এই সময়ে একা আসিয়াছে। পুটুর মা আরও ভাবিলেন যে, আমার এত বস্ত্র, এত অলঙ্কার ত আবশ্যক নাই; ইহার কতক পদ্ম পরিলে তাহাকে কতই সুন্দর দেখাবে, অতএব এই সময় তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি কিছু দিই; চুপি চুপি বা কেন, আমি দিলে কে রাগ করিবে? তিনি (স্বামী) দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের দিকে ত একবার ফিরিয়াও চান না, তবে কেন তিনি রাগ করিবেন? সোহাগীই বা কেন করিবে? তার কি ক্ষতি? হয় ত সে রাণীকে বলে দিবে; তা আমি তার হাতে ধরে তখন বারণ করিব।

এই ভাবিতে ভাবিতে পুটুর মা পুষ্করিণীর কূলে পদ্মের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্ম বলিলেন, “ওলো কালামুখী, বল দেখি, বুড়া রাজার মন কেমন করে ভুলালি?”

পুটুর মা। আমি ভুলাই নাই, ভাই, পুটু

পদ্ম। তা বই কি! এরেই বলে পোর নামে পোয়াতী বত্তায়। হা কালামুখী! তোর মরণের কি আর জায়গা ছিল না; হয় ত বলবি, নইলে এ ধন-দৌলত কোথা হইতে আসিত। তা অমন ধন-কড়ির গলায় দড়ি, অমন কাপড় পরার গলায়

দড়ি, অমন গহনা পরার গলায় দড়ি, ধিক্ তোরে ছারকপালী।

পুটুর মা। কেন ঠাকুরঝি, আমি কি করিলাম?

পদ্ম। আহা! কিছু জানেন না, আবার বলেন, কি করিলাম। রাজা তোরে এত ভালবাসে কেন, তোরে এত গহনাপাতি দেয় কেন, আর কাহাকেও দেয় না কেন?

পুটুর মা। আমি পুটুর মা বলে আমায় রাজা এই সকল দিয়াছেন। তিনি পুটুকে বড় ভালবেসেছেন।

পদ্ম। বলি, রাজা আর কাহারও পুটুকে ভালবাসেন না কেন? ছেলে মেয়ে ত আর অনেকের আছে। এ সকল কি ঢাকা থাকে? না বুঝিতে বাকি থাকে?

পুটুর মা। কি ঠাকুরঝি, তবে বল না, রাজা আমায় কেন ভালবাসেন?

পদ্ম। আ মরি লোক, কিছু জানেন না।

পুটুর মা। সত্য বলিতেছি, কই, আমি ত কিছুই জানি না।

পদ্ম। যখন দাদা তোর গলায় বঁটি দিবেন, তখন ত বলিতে পারবিনে যে, আমি কিছুই জানি না।

পুটুর মা। তবে কি হয়েছে বল না। তোমার পায় ধরি ঠাকুরঝি! আমায় বলে দেও সত্য বলছি আমি কিছু জানি না। এখন আমার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল যে।

পদ্ম। তবে বলে দিব? একান্ত বলিতে হবে— বলিলে তুই মানিবি না? (কর্ণে দুই তিনটী কথা।)

পুটুর মা তাহা শুনিয়া অবাক্ হয়ে পদ্মের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। পদ্ম চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এখন টের পাও, গহনা পরা কেমন মজার।"

পদ্ম চলিয়া গেলে মাধবীলতার মাতা অনেকক্ষণ পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটী জলচরের প্রতি চাহিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাহা দেখিতেছিলেন কি না সন্দেহ। সন্ধ্যার সময় মালতী আসিয়া ডাকিল, মাধবীর মাতা কোন উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে গেলেন। নির্জনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পদ্মের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে মৃত্যুই স্থির করিলেন; কিন্তু তিনি মরিলে পুটুর কি উপায় হইবে, এই কথা স্মরণ হইলে মরিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন, রাত্রিশেষে নিদ্রিত পুটুকে বক্ষে করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন, এই মনন করিলেন।

সেই রাত্রে পুটুর মা বহুক্ষণ অবধি নিদ্রিত পতির পদসেবা করিলেন, তাহার পর স্বর্ণালঙ্কারগুলি একে একে অঙ্গচ্যুত করিয়া আপনার "টেপারির" মধ্যে রাখিয়া তাহার চাবি রামসেবকের যজ্ঞোপবীতে বাঁধিয়া দিলেন। আপনার সঙ্গে কি লইবেন, একবার এই কথা তাঁহার মনে আসিল, তাহার পর কেবল পুটুর "চুলের দড়িগুলি" যত্নে অঞ্চলাগ্রে বাঁধিলেন। স্বামীর খড়ম দুইখানি পালঙ্কের নিকট ছিল, তাহার ধূলা ঝাড়িয়া হস্তমার্জনা করিয়া, যথাস্থানে রাখিলেন, তাহার পর দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না। ঝটিকাপ্রপীড়িত তৃণের ন্যায় পুটুর মার অন্তর থর থর কাঁপিতেছিল। যে ঝটিকার বেগে মহাতরু উন্মূলিত ও নিপতিত হয়, সামান্য তৃণের উপর সেই বেগ প্রবাহিত হইলে তৃণ উন্মূলিত হয় না, মরেও না, কেবল অনবরত ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে। পুটুর মার দশা সেইরূপ হইয়াছিল

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। যাত্রার সময় উপস্থিত দেখিয়া, পুটুর মা শয্যা হইতে উঠিলেন। স্বামীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইলেন, ধীরে ধীরে নিদ্রিত রামসেবকের পাদমূলে মস্তক রাখিলেন, অমনি চক্ষে জল আসিল, পুটুর মা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বামীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। জন্মের মত যাইবার সময় একবার স্বামীকে না দেখিয়াই বা কিরূপে যান; পুটুর মা সুতরাং প্রদীপ জ্বালিলেন, আলোকে নিদ্রিত স্বামীর স্নেহময় মুখ আরও স্নেহপূর্ণ দেখিয়া, পুটুর মার চক্ষে আবার জল আসিল। রামসেবককে পুটুর মা নিত্য নিদ্রিত দেখেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি ত আর কখন এরূপ দেখেন নাই। চক্ষু মুছিয়া পুটুর মা রামসেবকের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; বাল্যকাল হইতে রামসেবক পুটুর মাকে যত আদর করিয়াছিলেন, যত যত্ন করিয়াছিলেন, সে আদর,

সে প্রেম, সে স্নেহ, সে সমুদায় যেন তাঁহার মুখে অদ্য একত্রিত হইয়াছে; পুটুর মা সজলনয়নে কেবল সেই প্রেমময় মুখ দেখিতে লাগিলেন। আবার দেখিলেন, নিদ্রিত স্বামী যেন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। পুটুর মার আর যাওয়া হইল না; প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া স্বস্থানে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রদীপনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমায়া কতকটা অন্ধকারাবৃত হইল, তখন ক্রমে পদ্মকে আবার স্মরণ হইল, স্মরণমাত্রেই কলঙ্করটনা বৈদ্যুতাগ্নির ন্যায় পুটুর মার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল, আর শয়ন করা হইল না। প্রাতে স্বামী সেই কলঙ্ক অবশ্য শুনিবেন, এই মনে হইবামাত্র আর থাকিতে পারিলেন না। পুটুর মা পুটুকে বক্ষে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহদেবতা শালগ্রামকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ঠাকুর! বুড়া শাশুড়ী রহিলেন, যেন তাঁর কোন পীড়া না হয়। আর যিনি তোমায় নিত্য পূজা করেন, তাঁহার যেন কোন বিপদ্ না হয়।" পুটুর মা আবার প্রণাম করিলেন, তার পর বৃদ্ধা শাশুড়ীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, উদ্দেশে তাঁহাকেও প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আশীর্ব্বাদ কর, পথে যেন আমার পুটুর কোন বিপদ না হয়।" এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দুই এক পদ যাইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে স্বামীর দ্বারের দিকে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিবামাত্র স্বামীর নিঃসহায় মূর্ত্তি মনে পড়িল, আর একবার তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ফিরিলেন, কিন্তু দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মস্তক নত করিয়া, নিদ্রিত স্বামীর উদ্দেশে আবার প্রণাম করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পুটুর মা খিড়কির দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। পথে আসিয়া পুটুকে অঞ্চল দ্বারা আবৃত করিলেন। জলাহরণ উপলক্ষে নিত্য দীর্ঘিকায় যাতায়াত তাঁহার অভ্যাস ছিল, অতএব অভ্যাসবশতঃ সেই দিকেই চলিলেন। নীলাকাশে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে, স্নিগ্ধ বায়ু ধীরে ধীরে আসিতেছে, অথচ অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে না, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বৃক্ষ সমুদায় নিঃস্পন্দ রহিয়াছে, গৃহমাত্রেই আলোক নাই, পথে এখানে সেখানে কুকুর নিদ্রা যাইতেছে। পুটুর মার লঘু পাদ-বিক্ষেপে তাহাদের নিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি শেষে পুষ্করিণীর কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও অল্প রাত্রি আছে। তথায় দাঁড়াইয়া পুটুর মা ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর অজ্ঞাতে রাত্রিকালে বাটীর বাহির হইয়াছেন, রামসেবক হয় ত এতক্ষণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে পারিয়াছেন, এতক্ষণ হয় ত অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার এতক্ষণ দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রী পতিব্রতা নহে। এই কথা মনে হইবামাত্র পুটুর মা শিহরিয়া উঠিলেন, লজ্জায় অধোবদন হইলেন, অনেক ক্ষণের পর মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ম্লান শশী যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। অমনি আপনার গৃহ মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল,জন্মের মত তিনি গৃহসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, সে সুখ আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। এই সময় নিকটস্থ অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে পক্ষীরা কলরব করিয়া উঠিল। পুটুর মা দেখিলেন, পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়াছে, এখনই লোক যাতায়াত আরম্ভ করিবে, অতএব তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া প্রান্তর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর গেলে পর সূর্যো-দয় হইল। পুটুর মা আবার কতকদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সিংহশত গ্রাম আর দেখা যায় না; কেবল রামসীতার মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে; তাহার রৌপ্যচূড়া সূর্য্যকিরণে হীরক-খণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। পুটুর মা সেইখানে দাঁড়া-ইয়া রামসীতাকে প্রণাম করিলেন; মাথায় হাত দিয়া পুটুকেও প্রণাম করাইলেন, পুটু ক্রোড় হইতে কখন ক্ষুদ্র পদ দোলাইতেছে, কখন হাত তুলিয়া পক্ষীদের ডাকিতেছে, কখন মাতার মুখে হাত দিয়া মাতাকে টানিতেছে। কিন্তু পুটুর মা পুটুর সঙ্গে আর পূর্ব্বমত কথা কহিতেছেন না, অন্যমনে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। কোথা যাইবেন স্থির নাই। প্রথমে পিত্রালয়ে যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কলঙ্ক মনে পড়ায়, আর সে দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং যত্র তত্র চলিতে লাগিলেন। কাহাকেও পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন না; কোথায় যাইবে, যাহার স্থির নাই, পথের কথা সে কি জিজ্ঞাসা করিবে? পুটুর মা নিজে কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করুন, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল। প্রথমে একজন ছিন্নবস্ত্রা বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল, "বাছা, কোথা যাবে?" পুটুর মা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী যাব।" এই উত্তরে বৃদ্ধা পরি-তৃপ্ত হইয়া গোময়সঞ্চয়ন করিতে করিতে বলিল,

"তা যাও, বাছা, যাবে ই কি ; বাপের বাড়ী যাবে ।!" বৃদ্ধা একবার করিয়া কথা কহে, আর একবার করিয়া গোময়সন্ধানে এদিক্ ওদিক্ ঘোরে। বৃদ্ধার শ্রোতা আবশ্যক করে না, পুটুর মা চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা তখনও বলিতে লাগিল, "চিরকাল কি শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকিতে হয় ?"—(গোময়-সঞ্চয়ন)—যাও, বাছা ! জন্ম জন্ম বাপের বাড়ী যাও, বাপের কাছে কে ? শ্বশুর বল, শাশুড়ী বল, বাপের কাছে কে ?"—(গোময়-সঞ্চয়ন)—"এই যে আমি একা পড়ে থাকি ; বাতের কামড়ে চীৎকার করি, পাড়ার পোড়াকপালীরা কেউ একবার এসে জিজ্ঞাসা করে ? মোলো !—সকলেই আপনার ঘরে শুয়ে থাকে, শেজ পেতে শুয়ে থাকে !"—(গোময়-সঞ্চয়ন) "ওলো ! চিরকাল কিছু সমান যায় না ! আমারও এক কালে সকল ছিল। আমার মানুষ ছিল, গরু ছিল, ঢেঁকি ছিল।"—(গোময়-সঞ্চয়ন)—"আর এখন ঢেঁকি ঠেঙ্গাইতে পারি না, বুড়া হয়েছি।"—(গোময়-সঞ্চয়ন)—"এমন কপালও করে এসেছিলাম ! ভালখাকীরা কি এত ভাল কাজ করেছিল যে, সকল সুখ তাদের জন্য !"—(গোময়-সঞ্চয়ন)—"চোকখাকীরা কলসী-কাঁকে পথে চলেন, চোখে কাণে দেখ্‌তে পান না।" বৃদ্ধা মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আপনা-আপনি এইরূপ কথা কহিতেছে। অন্য সময় হইলে পুটুর মা দাঁড়াইয়া বৃদ্ধার কথা শুনিতেন।

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পুটুর মা যখন রাম-নগর নামে একখানি অপরিচিত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর ; গ্রাম-প্রান্তে একটী দীর্ঘিকায় স্নানার্থে গ্রাম্যলোকেরা যাতায়াত করিতেছিল। পুটুর মাও স্নান করিবেন মনে করিলেন ; কতক দূর গিয়া দেখেন, পথপ্রান্তে বৃক্ষছায়ায় দুইজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। দুইজনেই যুবতী ; পুটুর মার ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন, ইহারা আমাকে দেখিয়া কত উপহাস করিবে, হয় ত কি কটু বলিবে ; নিকটে অন্য পথ থাকিলে, পুটুর মা সেই পথে যাইতেন, এক্ষণে অনন্যগতি হইয়া, যুবতীদের দিকে সঙ্কুচিতপদে চলিতে লাগিলেন, এক এক বার সভয়ে তাহাদের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। এই সময় একজন স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা পশ্চাৎ হইতে যুবতীদের বলিল, "এখনও দাঁড়ায়ে কেন ? বেলা যে গড়িয়ে গেল।" যুবতীরা সভয়ে ভূমি হইতে আপন আপন কলসী তুলিয়া কক্ষে সংস্থাপন করিতে করিতে পশ্চাৎ ফিরিল। পুটুর মাকে দেখিয়া, বৃদ্ধা একটু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে, বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, বাছা ?" পুটুর মা মাথা অবনত করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। আবার বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী কি তোমার ?" পুটুর মা মাথা নাড়িয় স্বীকার করিলেন। এই সময় একজন যুবতী অগ্রসর হইয়া, পুটুর গাল ধরিয়া আদর করিল।

বৃদ্ধা। বাছা, তুমি কি লোকের মেয়ে ?

পুটুর মা। বামনের।

বৃদ্ধা। কোথায় যাবে ?

পুটুর মা কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধা। তোমার সঙ্গে লোক কই ?

পুটুর মা কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধা। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা ? তোমার বাপের বাড়ী কোথা ?

পুটুর মা তথাপি কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধা। তবে বুঝিছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধা আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে পশ্চাৎ ফিরিলেন, তাঁহার কন্যা এক একবার পুটুর মার প্রতি ফিরিয়া চাহিতেছিল দেখিয়া, বৃদ্ধা বলিল, "চলিয়া চল। গৃহস্থের বউ-ঝির ও সকল লোককে ফিরে দেখা কেন ?"

কন্যা উত্তর করিল, "মেয়েটী বড় সুন্দর।" বৃদ্ধা তাহাতে বিরক্তিসহকারে বলিল, "অমন সুন্দরের গলায় দড়ি ! যে লোক গৃহস্থের মেয়ে নয়, সে আবার সুন্দর কি ?"

এই কথা শুনিবামাত্র পুটুর মার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে, নিকটস্থ এক নির্জ্জন আম্রকাননে প্রবেশ করিয়া, একটী বৃক্ষতলে বসিলেন। মাধবী ধূলায় ক্রীড়া করিতে লাগিল, তিনি বৃক্ষে মাথা হেলাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের পর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি বলিলেন, "বুঝিছি, সকলই আমার দোষ। পোড়া লজ্জার ভয়ে আমিই আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করেছি।"

বাস্তবিক, কথা সত্য, কেবল লজ্জার ভয়ে মাধবীলতার মা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কলঙ্কের

কথা স্বামী প্রাতে শুনিবেন, এই লজ্জায় তিনি পলাইয়াছিলেন। এখন কলঙ্কের কথা শুনা দূরে থাকুক, সন্দেহেরও স্থল রহিল না। এতক্ষণ রামসেবক জানিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা। তাহাতেই মাধবীলতার মা বলিতেছিলেন, "সকলই আমার দোষ।" আর উপায় নাই, আর গৃহে যাইবার পথ নাই। পথে পথে বাস, ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন, এই এখন মাধবীলতার মার অদৃষ্টের লিখন। তিনি দার্শনিক নহেন যে, অদৃষ্ট লইয়া তর্ক করিবেন; কার্য্যকুশলী নহেন যে, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন করিবেন; মহাতেজাও নহেন যে, অদৃষ্টের আয়ত্তাতীত থাকিবেন; অদৃষ্ট যতই পীড়ন করুক, তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, তাহাতে কষ্ট অনুভব না করিয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিবেন। মাধবীলতার মাতা সামান্যা; অদৃষ্টের ভয়ে অতি ভীতা, কষ্টের স্পর্শমাত্রেই পরাজিতা, চক্ষের জল তাঁহার একমাত্র সহায়। পিতৃমাতৃসম্মুখে চক্ষের জল সহায় হইলে হইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্টের সম্মুখে তাহা কিছুই নহে, অশ্রুবর্ষণে কোন ফলই হয় না; তথাপি অদৃষ্টের পীড়নে সামান্য লোকেরা কাঁদে, মাধবীলতার মাও সামান্য লোকের মত কাঁদিলেন। সাধারণতঃ লোকে চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্টের প্রদর্শিত পথে চলিতে থাকে, মাধবীলতার মাও চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্ট-প্রদর্শিত পথে চলিবেন, অর্থাৎ ভিক্ষা করিবেন, স্থির করিলেন। "আমার অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে?" এই বলিয়া পুটুর মা দাঁড়াইলেন, পুটুর ধূলিধূসরিত অঙ্গ যত্নে ঝাড়িয়া, ক্রোড়ে লইয়া, গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে যাইতে যাইতে এক স্থানে দাঁড়াইলেন; একজন দাসীকে বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।" দাসী তৎক্ষণাৎ রাজভগিনীর মহলে প্রবেশ করিল। রাজা যষ্টি দ্বারা ভূপতিত একটি বিল্বপত্র নাড়িতে লাগিলেন, আর আপনা-আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজভগিনী আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং নতশিরে এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, "দেখ দেখি, কি অন্যায়!" জ্যোৎস্নাবতীর ভয় হইল; ভাবিলেন, রাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজা স্বয়ং তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন।

অল্প পরে রাজা আবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বড় অন্যায়, বড় অসঙ্গত, কে এখানে বিল্বপত্র ফেলিয়া গিয়াছে? হয় ত এই বিল্বপত্রে আমি পূজা করে থাকিব।" ইহা বলিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতী সযত্নে বিল্বপত্রটী তুলিয়া লইলেন। রাজা বলিলেন, "দেখ, যেন ভাল জায়গায় বিল্বপত্রটী ফেলা হয়। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি উত্তর দাও?" এই বলিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন; জ্যোৎস্নাবতী কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল? আমি ত সে সময় ছিলাম না?" জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সময়?"

রাজা। যে সময় রাণী প্রসব হন।

জ্যোৎ। আজ্ঞা করুন। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

রাজা। রাণী কি সন্তান প্রসব করেন?

জ্যোৎ। এক মৃত কন্যা প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছিলাম। তার পর—

রাজা আর কোন কথাই না শুনিয়া, বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। জ্যোৎস্নাবতী বলিতে লাগিলেন, "এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে, রাণী যমজ সন্তান প্রসব করেন।" রাজা সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, সভায় গিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্যেরা যে কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; রাজকুমার আমার পুত্র নহে রাণী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, আমি বিশেষ করিয়া তদন্ত করায় সকল কথা জানিতে পারিয়াছি; অদ্য ভট্টাচার্য্যদিগের আসিবার কথা আছে—এখনই আসিবেন; আমার ইচ্ছা যে, ছেলেটীকে পোষ্যপুত্র লই।"

এই কথা শুনিবামাত্র সভাসদ্‌সকলে বিমর্ষ হইলেন। দেওয়ান মহাশয় ভ্রূকুটী করিয়া, একবার রাজার দিকে কটাক্ষ করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

পিতম তখন রাজবাটীর অনতিদূরে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া, রাজসভায় কে কে যায় দেখিতেছিল; কি ভাবিয়া, তথা হইতে উঠিয়া অন্য পথে চলিল। কতকদূর গেলে একটা কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড় আসিয়া পিতমের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; পিতম ষাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ভৈরব, কেমন আছ?" ষাঁড়

মুখ তুলিয়া মাথা নাড়িল, অঙ্গ
মের স্কন্ধের দিকে গলা বাড়াইয়া দিল ; পিতম হস্তে
তাহার গলায় হস্তমার্জনা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা
করিল, "ভৈরব, তোমার উদরের সংবাদ বল ? তুমি
ও আমার মত উদরপরায়ন লোক, বল দেখি, গত
কল্য কি জুটিয়াছিল ? বৃক্ষতলে পড়িয়া কি কেবল
অম্বর্থ করিয়াছিলে ? তোমার বড় দোষ, কেহ
তোমায় না ডাকিলে তুমি খাও না, লোকে তোমায়
কেন ডাকিবে ? কে তুমি ? লোকের তোমায় কি
দরকার ? তোমার বিরাট মূর্ত্তিতে কে ভুলিবে ?
তোমার কোমলতা কে দাঁড়াইয়া দেখিবে ? তোমার
এই প্রস্তরস্তূপে নবপল্লবের কোমলতা চিনিয়া
কে তোমাকে বাহবা দিবে ? তুমি আমার সিরেট
মব, তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি একবার স্নান
করে আসি।" এই বলিয়া পিতম আপনার ঝুলি
ভৈরবের শৃঙ্গে ঝুলাইয়া, পাত্র-বস্ত্র তাহার পৃষ্ঠে
ফেলিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নামিল। এই সময়ে
অনেক ছেলে আসিয়া জুটিল ; তাহারা দূরে
দাঁড়াইয়া ভৈরবকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, ভৈরব
"ঝালনা-তলার" বরপাত্রের ন্যায় গম্ভীরভাবে দাঁড়া-
ইয়া রহিল, তাহাদের কোন কথা গ্রাহ্য করিল না।
পিতম আসিলে,তাহার জলসিক্ত অঙ্গ দেখিয়া ভৈরব
পিতমের গাত্রলেহন করিতে আরম্ভ করিল। বাল-
কেরা হাসিয়া বলিল, "পিতম, তোমায় ভৈরব বাছুর
ভাবিয়া আদর করিতেছে।" পিতম হাসিয়া উত্তর
করিল, "আর আমায় কে আদর করিবে ?" ছেলেরা
সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "আমরা আদর
করিব।" এই বলিয়া সকলেই পিতমকে ঘেরিয়া
কেহ হস্তে, কেহ জানুদেশে, কেহ
পৃষ্ঠদেশে চুম্বন করিতে লাগিল। ভৈরব তাহা
দেখিয়া কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে
গেল।

এই সময় দুই চারিজন প্রতিবাসী সেখানে
আসিয়াছিল, তাহারা দূরে দশরথ ভট্টাচার্য্যকে
দেখিয়া, রাজপুত্রের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। ক্রমে
একজন জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই কি
রাজকুমার দশরথ শর্ম্মার পুত্র ?" পিতম বলিল,
"দশরথের পুত্র অনেক দিন হ'ল মরে গেছেন।"

প্রথম প্রতিবাসী। পিতম, আমরা ত কিছুই
বুঝিতে পারিলাম না। তুমি এখন রাজবাটীতে
গিয়া থাক—কি শুনিতে পাও ? এ রূপ দশরথের
পরি কি ?—না সে কথা মিথ্যা ?

পিতম। সে কথা ভুবনেশ্বর বলিতে পারেন,
সে দিন রাত্রে ভুবনেশ্বর দশরথকে বলিয়াছিলেন,
"চূড়াধনের কথা শুনিস্ না।" এই কথা বলিয়া
চলিয়া গেল।

এদিকে একজন বালক গাইয়া উঠিল, "ভুবনে-
শ্বর কথা কয়। ছেলে দশরথের নয়।" সকলে
হাসিয়া বলিল, "বেশ বেশ।" অমনি আর সকল
বালকেরা নৃত্য করিতে করিতে একত্রে গাইতে
লাগিল :—

"ভুবনেশ্বর কথা কয়।
ছেলে দশরথের নয়॥"

দশরথ তাহা দূর হইতে শুনিতে পাইয়া তাঁহার
সঙ্গীদের মুখপ্রতি চাহিলেন ; ছেলেরা সেই দিকে
গাইতে গাইতে যাইতে লাগিল ; দশরথ তাহাদিগকে
চীৎকার করিয়া গালি দিলেন। "এত বড় মজার
খেপান" বলিয়া বালকেরা অধিকতর আনন্দে হাসিয়া
আরও গাইতে লাগিল ; শেষ দশরথ হস্তে ইষ্টক
লইলেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে
লাগিলেন ; তিনি শুনিলেন না দেখিয়া অগত্যা
তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যেখানে প্রাত-
বাসীরা দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল, সেই দিকে
চলিলেন।

পিতম যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সকলে
স্থির করিয়াছিল যে, দশরথের দাবি মিথ্যা। প্রথম
যখন দশরথ দাবি উপস্থিত করেন, উপস্থিত ব্যক্তি-
গণ সকলে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিল। রাজার
চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইয়া কতই
কথা, কতই পরামর্শ, কতই নিন্দা করিয়াছিল।
নিন্দা এ সংসারে পরম সুখ ; দশরথের দাবি উপ-
লক্ষে সে সুখভোগ হইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে
রস নাই, তখন নিন্দার স্রোত ফিরিবার সময় হই-
য়াছে. কাজেই প্রতিবাসীরা যখন দশরথের দাবি
মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইল,
আবার তাহারা চরিতার্থ হইল। একজন তখন বলিল,
"ঠিক্ কথা, এমন কি কখন হইতে পারে ? রাজা
কেন পরের ছেলে চুরি করে আনিবেন ? তাঁহার
পুত্র না হইলে তিনি অনায়াসে পোষ্যপুত্র লইতেন,
তাঁহার কিসের দুঃখ ? দেশে এত ছেলে থাকিতে
তিনি কেন লক্ষ্মীছাড়া দশরথের পুত্র লইতে
যাইবেন ? আমাদের ছেলে হয় ত সে স্বতন্ত্র কথা।
এ মিথ্যাদাবি বোধ হয়। টাকা পাইবার প্রত্যাশায়
দশরথ এই দাবি সাজাইয়াছে।"

দ্বিতীয় প্রতি। তাহার আর সন্দেহ নাই, নতুবা পিতম এ কথা বলিবে কেন? পিতম পাগল নহে, পিতম সিদ্ধপুরুষ; কেবল ঠাট করে বেড়ে—যেন কতই পাগল, কিন্তু কিছুই নয়—পিতম সকল জানে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে রাত্রে কি হয়েছিল, তাহা পর্য্যন্ত জানে।

তৃতীয় প্রতিবাসী। পিতম কি বলিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

প্র, প্রতি। বুঝিতে পারিলে না? চূড়াধনবাবু দশরথকে কিছু টাকার লোভ দেখাইয়া, এই কার্য্যে নামাইয়াছেন। রাজকুমার যদি দশরথের সন্তান বলিয়া জনরব থাকে, তাহা হইলে রাজার অবর্ত্তমানে চূড়াধনবাবু রাজ্য পাইবেন।

চতুর্থ প্রতি। সেই দেঁতো কটাচুলো হারামজাদা?

এমত সময় দশরথের সঙ্গীরা উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারখানা কি? ছেলেরা এ কি বলে?"

প্র, প্রতি। যাহা সত্য, তাহাই বলে।

চতুর্থ, প্রতি। দশরথ পশুকে সঙ্গে করে একবার রাজবাটীতে যাও, ব্যাপার শুনিতে পাবে, দেখিতেও পাবে। চূড়াধন বাবু ধরা পড়েছেন। দশরথকে ধরিতে শিপাহী এখনই যাইবে; কিন্তু ঐ দেখিতেছি, তিনি আপনিই ধরা দিতে আসিতেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে সে রাত্রে যে পরামর্শ হয়েছিল, তাহা এখন প্রকাশ পেয়েছে।

দশরথ এই সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, "দশরথ, এই সকল ভদ্র লোকে কি বলিতেছেন, শুন। তুমি কি একদিন রাত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গিয়া চূড়াধন বাবুর পরামর্শমতে এই মিথ্যা দাবি উপস্থিত করেছিলে? তাহা হইলে এই সময় বল, আমাদের আর কেন মজাও, এ কথা রাজসভায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

দশরথ চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন, শেষ পলায়নোন্মুখ। এই সময় একজন প্রতিবাসী বলিল, "সে গুড়ে বালি! শিপাহীরা আগতপ্রায়।"

দশরথ। আপনাদের সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি এক পয়সা লই নাই, আমি ত টাকার প্রত্যাশী নই?

এই সময় একজন বালক বলিল, "ঐ শিপাহী আসিতেছে।" দশরথ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, পলাইলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দশরথ পলাইলে পর, এই সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। যে অধ্যাপক পূর্ব্বে দশরথের পক্ষ হইয়া, দেওয়ানকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করিয়াছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া, যোড়-করে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের অপরাধ হইয়াছে, দশরথ বাচস্পতি শোকবিহ্বল হইয়া কেবল পরের পরামর্শে রাজকুমারকে দাবি করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে পরামর্শ হয়, তাহা এক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা সে পরামর্শের কথা পূর্ব্বে শুনি নাই; তাহা হইলে কদাচ দশরথের সঙ্গে আমরা আসিতাম না। দশরথ এক্ষণে পলাইয়াছেন, তিনি নিতান্ত পরের পরামর্শে এই কুকার্য্য করিয়াছেন; অতএব আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, সে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আপনি ক্ষমা করেন। তাঁহার অপরাধ গুরুতর নহে, যিনি তাঁহাকে লওয়াইয়াছেন, তিনিই প্রধান অপরাধী।"

রাজার কথা কহিবার পূর্ব্বেই দেওয়ান বলিলেন, "যিনি প্রধান অপরাধী, তাহা আমরা জানিয়াছি, এক্ষণে আপনারা বিদায় হউন।"

ভট্টাচার্য্যেরা বিদায় হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মৃত কন্যার কথাটা কি? আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেওয়ান। এখনই বুঝিতে পারিবেন, আমি রাণী ধাইকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে, রাজদাসীদের ডাকিয়া, এই রাজসভায় সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।

রাজা। আবশ্যক নাই, আমি স্বয়ং তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।

রাজা উঠিয়া গেলে, চূড়াধন বাবু বিমর্ষমুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "পিতম পাগল বিলক্ষণ ধূর্ত্ত, এক কথা রটাইয়া দশরথ বাচস্পতিকে ভাল ভয় দেখাইয়াছে। নিশ্চয় পিতম পাগল দশরথকে পথ হইতেই তাড়াইয়াছে।"

দেও। সম্ভব। পিতম ধূর্ত্ত না হইলে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম রাজসভায় বলিয়া ফেলিত।

চূড়াধন। যেখানে আপনার মত দেওয়ান উপস্থিত, সেখানে পাগলেরও বিজ্ঞতা জন্মে।

দেও। যেখানে আপনার মত ব্যক্তি থাকে, সেখানে বিজ্ঞতা আবশ্যক, তাহা না হইলে বেয়াদবি হয়।

এই সময় একজন ফকির আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সভা বরখাস্ত, রাজা বাহাদুর অসুস্থ হইয়াছেন।"

সভাভঙ্গ হইলে রাজা অন্দর হইতে আসিয়া, এক নির্জ্জন ঘরে অতি বিমর্ষভাবে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইল। রাণীর মহলে গিয়া রাজা বড় যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলেন। রাণীকে মৃতকন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া রাজার প্রতি খর-দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "অদ্য প্রাতে জ্যোৎস্নাবতী আমায় বলিয়াছিলেন যে, তুমি এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলে; তাহাতেই আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই কথা শুনিবামাত্র রাণী অতি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতী আমার পরম শত্রু; সেই প্রথমে রটাইয়াছে যে, রাজকুমার আমার সন্তান নহে। তাহারই বলে ভট্টাচার্য্যেরা আসিয়াছিল। আপনার ভগিনী নিজের সংসার জ্বালাইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে আমার সংসার শ্মশান করিতে বসিয়াছে। তাহাকে দুশ্চরিত্রা বলে একবার তাহার শ্বশুর তাড়াইয়াছে, এবার আমি তাড়াইব। আপনি তাড়াইতে না দেন, আমি নিজে সংসার ত্যাগ করে যাব, আপনি ভগিনী লয়ে রাজ্য করুন।"

রাজা। স্থির হও, আমার বলিতে ভুল হইয়াছে। হয় ত ভুলে আমি জ্যোৎস্নাবতীর নাম করিয়াছি।

রাণী। আমি আর সে সকল স্তোকবাক্য শুনিতে চাই না। এখনই পাল্কী আনিতে পাঠান, তাহাতে জ্যোৎস্নাবতী উঠিবে, নতুবা আমি উঠিব।

রাজা। জ্যোৎস্নাবতী পাল্কীতে উঠিয়া কোথায় যাবে? তাহার আর স্থান কোথায়? সে এখন অনাথিনী, তাহার প্রতি দয়া কর, তাহার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রাণী। তোমার জ্যোৎস্নাবতীর স্থান আছে কি না, তা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমার বাটীতে তাহার স্থান হইবে না তাহা নিশ্চয়।

এই বলিয়া রাণী বেগে জ্যোৎস্নাবতীর মহলে গেলেন। রাজা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বাহির্বাটীতে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

অপরাহ্নে একজন পরিচারিকা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিল, "রাজভগিনী রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলেন?" পরিচারিকা উত্তর করিল, "জানি না।" রাজা উত্তরীয় দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

পরদিবস প্রাতে রাজসভায় সকলে বিমর্ষভাবে প্রবিষ্ট আছেন, রাজা অন্যমনস্কে কি ভাবিতেছেন, এমত সময় কতকগুলি শিবিকাবাহক আসিয়া জানাইল, রাজভগিনী কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবিকা ত্যাগ করে পদব্রজে গেলেন, আমরা এত মিনতি করিলাম, তিনি শুনিলেন না; বলিলেন, "আর আমার পাল্কীর প্রয়োজন কি?"

শুনিবামাত্র রাজা গাত্রোত্থান করিলেন; এই সময় দেওয়ান মহাশয়কে একজন জানাইল যে, রামী ধাই উপস্থিত। রামী প্রণাম করিয়া যোড়-করে দাঁড়াইল; রাজা কক্ষান্তরে যাইতেছিলেন, এমত সময় দেওয়ান মহাশয় রামী ধাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীর কি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল?"

রামী ধাই। প্রথমে এক কন্যা।

রাজা যাইতে যাইতে এই কথা শুনিয়াও শুনিলেন না দেখিয়া দেওয়ান উঠিয়া যোড়-করে বলিলেন, "এই সময় একটু অপেক্ষা করিলে ভাল হয়; বোধ হয়, আমার এই শেষ অনুরোধ।" রাজা দাঁড়াইলেন, রামী ধাইয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি রাজকুমার রাণীর গর্ভে জন্মে নাই?"

রামী ধাই। রাজকুমারও রাণীর সন্তান; প্রথমে কন্যা জন্মে, পরে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। রাণী তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। কন্যাটী মৃত মনে করে, আমরা তাহার সংকার করিতে যাই, সেই সময় কোথা হইতে পিতম পাগল আসিয়া তাহাকে লইয়া পলায়, পরে আমরা জানিলাম যে, একটী ব্রাহ্মণের কন্যা সেই সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরে, তাহার জননী সেই মৃত সন্তান ক্রোড়ে করে শুইয়া থাকে। পিতম তাহার ক্রোড় হইতে মৃত কন্যা চুরি করে মহারাজের কন্যাকে তাহার ক্রোড়ে রাখিয়া আসে। সেই ক্রোড়ে আপনার মৃতবৎ কন্যা জীবিতা হয়, অদ্যাপি জীবিতা আছে, আমরা ভয়ে এ কথা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি নাই।

রাজা। এখন আমার কন্যা কোথা?

রামী ধাই। এখন কোথা, তা বলিতে পারি না; গত পরশ্ব হইতে তাহার আর উদ্দেশ নাই।

রাজা। কেন?

রামী। পাড়ার লোকেরা ব্রাহ্মণীকে ইদানীং

বড় জ্বালাতন আরম্ভ করেছিল, গত পরশ্ব তিনি মেয়েটী সঙ্গে দেশত্যাগী হয়েছেন।

রাজা। কাহার বাটীতে আমার কন্যা ছিল?

রামী। রামসেবকের বাটীতে।

রাজা। মাধবীলতা তবে আমার কন্যা?

রামী। নিশ্চয়ই?

রাজা। আর এই শিশু, যাহাকে আমি আমার বলিয়া প্রতিপালন করিতেছি?

রামী। এটীও আপনার পুত্র; এইমাত্র আমি বলিয়াছি যে, প্রথমে আপনার মৃত কন্যা জন্মে, শেষ এই রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হন। উভয়ে যমজ।

রাজা। তুমি আমার বড় কষ্ট নিবারণ করিলে; যদি আমার আর আর প্রকারের মনকষ্ট না থাকিত, তবে তোমায় আজ বিশেষ পারিতোষিক দিতাম, তথাপি যাহা দিব, এ পর্য্যন্ত আমি তাহা আর কাহাকেও দেই নাই।

রামী। এ দাসীর অপরাধ যে মার্জ্জনা হইল, এই আমার পরম লাভ। পারিতোষিক অতিরিক্ত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক দিবস প্রাতে গুরুপুরের রাজদ্বারে দুই জন ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারবানেরা প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বার ছাড়িয়া দিলে, তাঁহারা সদরমহল অতিক্রম করিয়া খাসমহলের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভোজপুরী জয়পুরী দরওয়ানের পরিবর্ত্তে গুটিকতক শান্ত বঙ্গসন্তান বসিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল; জাতিতে ভাট, সুতরাং তাহারা কথায় বর্ত্তায় অতি নম্র। তাহাদের মাথায় লাট্‌দার পাগ্‌ড়ী, পরিধানে আজানুলম্বিত জোড়া, অস্ত্র মাত্রেই নাই। ব্রহ্মচারীদের দেখিবামাত্র তাহারা ব্যস্ত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বসিতে আসন দিল। ব্রহ্মচারীরা আসন গ্রহণ না করিয়া, অবিলম্বে রাজ-দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন। একজন ভাট বলিল, "দুই জন দর্শন-প্রার্থী একত্রে যাইতে নিষেধ আছে; অতএব আপত্তি না থাকিলে, আপনাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে চলুন।" ব্রহ্মচারীরা তাহাতেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের একজনকে সঙ্গে করিয়া সেই ভাট আর এক দ্বারে উপস্থিত হইল। তথাকার দ্বার-রক্ষক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নাম রাঘব শর্ম্মা। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় উত্তরীয়, কপালে রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোটা। বামপার্শ্বে সামুদ্রিক স্বরোদয় এবং তিন চারি খানি তন্ত্র পড়িয়া আছে। দক্ষিণপার্শ্বে নাসদানি, বালি-খড়ী, দুয়াত, কলম আর কতকগুলি তুলট কাগজ আছে। ভাট আসিয়া তাঁহার নিকট যোড়-করে নিবেদন করিল, "এই মাত্র দুই জন ব্রহ্মচারী আসিয়া রাজ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলে আমি তাঁহাদের বলিলাম যে, 'দুইজন প্রার্থী একত্রে যাইতে নিষেধ আছে,' তাহাতে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী আমাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া, এই যুবা ব্রহ্মচারীকে আমার সঙ্গে দিয়াছেন, এক্ষণে যাহা অভিরুচি।" এই বলিয়া ভাট চলিয়া গেল। তখন দ্বার-রক্ষক ব্রাহ্মণ অতি তীব্রদৃষ্টিতে যুবা ব্রহ্মচারীর প্রতি কটাক্ষ করিয়াই হাসিয়া উঠিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ হাসি সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমায় রাজদর্শন করিতে পরামর্শ দিয়াছে?"

ব্রহ্মচারী। এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি আমার কথা আপনাকে বলিয়া গেলেন, কিন্তু আপনি যে কে, তাহাতো তিনি আমায় কিছু বলিয়া গেলেন না। আপনি রাজা স্বয়ং, কি তাঁহার কোন কর্ম্মচারী, এ কথা বিশেষ না জানিলে আমি তাহার কোন উত্তর দিতে পারি না।

রাঘব। (হাসিয়া) আমি রাজা নহি, কিন্তু রাজা হইতে বড় দূরও নহি। আমি রাজকর্ম্মচারী বলিলে বলিতে পারি। কেন না, আমি দ্বারপাল।

ব্রহ্ম। দ্বারপালের অস্ত্রশস্ত্র কই?

রাঘব। এই আমার বামপার্শ্বে।

ব্রহ্ম। পুথি, না পুথির তক্তাগুলি?

রাঘব। উভয়ই, যখন যাহা প্রয়োজন।

ব্রহ্ম। বশিষ্ঠের নিকট ইহার কোনটাই ত কার্য্যের নহে।

রাঘব। সম্পূর্ণ কার্য্যের, তবে তোমার মত ছদ্মবেশীর নিকট অন্য কোন অস্ত্র আবশ্যক হইলে হইতে পারে।

ব্রহ্ম। মনুষ্যমাত্রেই ছদ্মবেশী। আত্মার ছদ্মবেশ এই দেহ। দেহের মিথ্যা-বেশ এই বস্ত্র।

রাঘব। এত কথা শিখ্‌লে কবে?

ব্রহ্ম। আপনার সহিত কি আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল? আমার মুখে এ কথা কি অসম্ভব?

রাঘব। সম্পূর্ণ অসম্ভব

ব্রহ্ম। কেন?

রাঘব। তাহা রাজমুখে শুনিতে পাইবে।

এ যুবা [illegible] দাঁড়াইয়াছিলেন, রাঘব তাঁহাকে বসিতে আসন দেন নাই। এখন একখানি মৃগচর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বসুন।" ব্রহ্মচারী না বসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন; রাঘব একখানি কাগজে কি লিখিলেন, কাগজখানি একটী স্বর্ণকৌটায় বন্ধ করিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিলেন, ডাকিবামাত্র ভৃত্য যোড়হস্তে ছুটিয়া আসিয়া স্বর্ণকৌটা লইয়া গেল। রাঘব আর একখানি কি লিখিতে লাগিলেন, এমত সময় ভৃত্য আসিয়া স্বর্ণকৌটা রাঘবকে প্রত্যর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। রাঘব কৌটা খুলিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "রাজদর্শনের অনুমতি হইয়াছে, আপনি যান।"

ব্রহ্মচারী। কাহার সঙ্গে যাব?

রাঘব। আবার সঙ্গী কেন? ব্রহ্মচারী হইয়া কে কোথায় সঙ্গী অনুসন্ধান করে?

ব্রহ্ম। রাজদ্বারে আর শ্মশানে সঙ্গী চাই, দুই তুল্য ভয়ানক স্থান।

রাঘব। সঙ্গী আপনি খুঁজিয়া লউন।

ব্রহ্ম। আমি আর এখন সঙ্গী কোথা পাব? এক বড় সঙ্গী আনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদের দ্বারে আটকাইয়া গেলেন। আমি রাজাকে কখন দেখি নাই; তিনি কোন্ ঘরে বসেন, তাহা জানি না; সুতরাং কেহ সঙ্গে না গেলে কোন্ পথে কাহাকে রাজা-ভ্রমে আপনার গোপন কথা কহিব?

রাঘব। "পথ বলিয়া দিতেছি, কিন্তু সঙ্গী দিব না, সঙ্গী দেওয়া এখানে প্রথা নাই।" এই বলিয়া, রাঘব উঠিলেন, একটী বৃহৎ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "এই পথে যান, সম্মুখে যে সিঁড়ি দেখিতেছেন, ঐ সিঁড়ি অতিক্রম করিলেই [illegible]প্রস্তরের দালান দেখিতে পাইবেন, সেই দালানের পরেই যে ঘর দেখিবেন, তথায় মহারাজ একা বসিয়া আছেন—উপরে অন্য ঘর নাই, অন্য [illegible] নাই।" এই বলিয়া রাঘব আবার পূর্ব্বমত হাসিলেন। ব্রহ্মচারী সেই হাসি গ্রাহ্য না করিয়া, সদর্পে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন। রাঘব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া—স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারী দালানে প্রবেশ করিয়া সভয়ে দাঁড়াইলেন। দালানের অপর প্রান্তে দুইটী ব্যাঘ্র ক্রীড়া করিতেছিল; ধরিব, ধরা দিব না—এই ক্রীড়া উপলক্ষে একটীর পশ্চাৎ অপরটী ছুটিতেছিল; ছুটিতে ছুটিতে একবার একবার উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে থাবা রাখিয়া পশ্চাৎপদে দাঁড়াইতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ থাবা ভূমে নামাইয়া পূর্ব্বমত দৌড়িতেছিল। ব্রহ্মচারীর বয়স অদ্যাপি বিংশতি পূরে নাই। ব্যাঘ্র দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এ ব্যাঘ্র হইতে অনিষ্ট শঙ্কা থাকিলে, এরূপ স্থানে ইহাদের ছাড়িয়া রাখা হইত না। সুতরাং ব্রহ্মচারী আর ইতস্ততঃ না করিয়া অগ্রসর হইলেন, ব্যাঘ্রের তাঁহার প্রতি কটাক্ষও করিল না। ব্রহ্মচারী নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, এক গৌরাঙ্গ যুবা একা বসিয়া কি অঙ্কপাত করিতেছেন। চারিপার্শ্বে সংস্কৃত পুথি, আরবী ও পারসী গ্রন্থ পড়িয়া আছে। নিকটে অপরাপর আসনের মধ্যে একখানি মৃগচর্ম্ম, আর একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম রহিয়াছে। ব্রহ্মচারী ব্যাঘ্রচর্ম্মের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু না বসিয়া, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যুবা বসিতে না বলিয়া এবং মাথা না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার নিকটে আসিয়াছ?"

ব্রহ্ম। আমি মহারাজ মহেশচন্দ্রের নিকটে আসিয়াছি।

যুবা। কি অভিপ্রায়ে? বল, আমিই মহেশচন্দ্র।

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া, মহারাজ মহেশচন্দ্র হঠাৎ মাথা তুলিয়া ব্রহ্মচারীর চক্ষের প্রতি চাহিলেন। চাহিবামাত্র ব্রহ্মচারী পল্লবের দ্বারা চক্ষু আবরণ করিয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন।" তখন কোমলস্বরে মহেশচন্দ্র বলিলেন, "বসুন।"

ব্রহ্মচারী ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বাম পদ দিয়া দাঁড়াইলেন। মহেশচন্দ্র বলিলেন, "ব্যাঘ্রচর্ম্মে নহে, মৃগচর্ম্মে বসুন। ব্যাঘ্রচর্ম্মে আপনার অনধিকার।"

ব্রহ্মচারী মৃগচর্ম্মের দিকে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন, মহেশচন্দ্র কি বুঝিয়া সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া, আবার অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারী এই অবকাশে ধীরে ধীরে মৃগচর্ম্মে বসিলেন। তখন মহারাজ মহেশচন্দ্র মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবার ব্রহ্মচারী আর পূর্ব্বমত

নম্র ও লজ্জাবনতমুখ নহেন; তিনি বলিলেন, "আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি।"

মহেশচন্দ্র। তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, আমার অধিকারে যত ব্রহ্মচারী আছেন, আমি সকলকেই চিনি, কিন্তু তাঁহারা আপনার মত কেহই নহেন।

ব্রহ্ম। কেন ?—কোন্ অংশে নহেন ?

মহেশচন্দ্র। সর্ব্বাংশে। তাহা যাহা হউক, এখন জানিতে ইচ্ছা করি, কি অভিপ্রায়ে আসা হইয়াছে।

ব্রহ্ম। একটা ব্যবস্থা জানিবার জন্ত আসিয়াছি। পিতৃ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুত্রে অর্শে কি না ?

মহেশচন্দ্র। এ স্মৃতির ব্যবস্থা; স্মৃতিব্যবসায়ী কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত।

ব্রহ্মচারী। আমি মনে করিয়াছিলাম, রাজারা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী।

মহেশচন্দ্র। তাহা হইলেও ব্যবসায়ীর নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। তথাপি বৃত্তান্তটা একটু বিস্তারে বল।

ব্রহ্মচারী। কথাটি সংক্ষেপে; এক চাতক ও এক চাতকী কোন বৃক্ষে বাস করিত। দৈবযোগে এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইল। নবাবেরা টাকা পাইলে রাজাদের সাত খুন পাঁচ খুন মাপ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ব্যাধের সহস্র সহস্র খুন মাপ আছে; সুতরাং ইতস্তত না করিয়া ব্যাধ চাতককে খুন করিল। কাতরা চাতকী আর এক স্থানে উড়িয়া গেল। ভাল স্থান দেখিয়া বাসা করিল; কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ চাতকীর সে বাসাও ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। এ সকল দুর্ঘটনা কেবল ব্যাধের নিমিত্ত ঘটিয়াছে; ব্যাধ এখন নাই, ব্যাধের পুত্র আছে, অতএব ব্যাধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুত্রের করা উচিত কি না ?

মহেশচন্দ্র। তুমি কি নিজে সে চাতকী ?

ব্রহ্ম। না।

মহেশচন্দ্র। তবে কি তুমি সিংহশত গ্রাম হইতে আসিয়াছ ?

ব্রহ্ম। আপনি সত্যই অনুমান করিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র। তবে জ্যোৎস্নাবতীর কি বাসা ভাঙ্গিয়াছে ?

ব্রহ্ম। ভাঙ্গে নাই—কিন্তু আমি যে দিন সেখান হইতে আসি, সে দিবস ভাঙ্গিবার উদ্যোগ দেখিয়া আসিয়াছি।

মহেশচন্দ্র। আমি সর্ব্বদাই তার সংবাদ লইয়া থাকি, কিন্তু এ সংবাদটী ত পাই নাই; এ কত দিনের কথা ?

ব্রহ্ম। গত পরশ্বের কথা।

মহেশচন্দ্র। তোমার নাম কি মাতঙ্গিনী ?

মাতঙ্গিনী। আপনি কিরূপে অনুমান করিলেন ?

মহেশচন্দ্র। সে সকল অনেক কথা। তুমি অবিলম্বে সিংহশত গ্রামে ফিরিয়া যাও। তুমি গিয়া মাকে বুঝাইয়া বল যে, তাঁহার রাজ্যে তিনি আসুন; এ রাজ্য তাঁহার, ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই। আমি কিছু ভোগ করি না, অপব্যয় করি না। তাঁহার কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি, আরও বলিও যে, তাঁহাকে আনিবার নিমিত্তে আমি সস্ত্রীক হইয়া, কল্যই যাত্রা করিব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনিই কি তোমায় আমার নিকট পাঠাইয়াছেন ?

মাত। তিনি পাঠান নাই, আমার আসার সংবাদও তিনি জানেন না, আমি তাঁহাকে না বলিয়া আসিয়াছি।

মহেশচন্দ্র। কি ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, আমাকে সবিস্তারে বল।

মাতঙ্গিনী তাহা কতক সংক্ষেপে বলিল: কিন্তু রাজা মহেশচন্দ্র তাহা শুনিবামাত্র দুর্দ্দম বেগে একটা স্বর্ণ-ঘণ্টা বাজাইলেন এবং আপনি বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাতঙ্গিনী আবার আসিলে, তিনি মাতঙ্গিনীকে বলিলেন, "কদাচ আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না। তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পার ?"

মাত। (লজ্জিতভাবে) না।

মহেশচন্দ্র। তবে আমার পাল্কীতে যাও।

মাতঙ্গিনী অস্বীকার করিল।

মহেশচন্দ্র কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "ভাল, তবে আমার সঙ্গেই কল্য প্রাতে যাইবে।"

এই সময় দূরে যোড়-করে একটী প্রাচীন সোটাদার আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহেশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "জমাদারকে শীঘ্র ডাক।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন অপরাহ্ণে পিতম পাগলা সিংহশত গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, কেন গেল, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিল না। কেবল দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ সন্ধ্যার পর বহির্গত হইয়া, পিতমের তত্ত্বে চলিল। যে দিকে পিতম গিয়াছে, তাহা তাহারা পূর্ব্বেই জানিয়াছিল, অতএব প্রান্তর দিয়া সেই

দিকে চলিল। কতক দূর গিয়া একজন বলিল,"বোধ হয় লোকের কোলাহল শুনা যাইতেছে।" আর একজন তখন কোন উত্তর না করিয়া, মাথা তুলিয়া শব্দ শুনিয়া পরে বলিল, "কেবল দুই জন লোক কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে।" তাহার পর উভয়েই নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। অনেক পরে দুই জন পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা বলিতে বলিতে আসিতেছিল,"পিতম কি সুন্দর বাঁশী বাজায়।" এই কথা শুনিবামাত্র একজন অস্ত্রধারী তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল,"কে সুন্দর বাঁশী বাজায়?"

উত্তর। পিতম পাগলা, ঐ দীঘির পাড়ে বাঁশী বাজাইতেছে। আমরা তাই দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম।

প্রশ্নকারী। কোন দীঘির ধারে?—সে এখান হইতে কত দূর?

উত্তর। এখান হইতে পূর্ব্বে এক ক্রোশ হইবে। এই পথের ধারেই সে দীঘি।

প্রশ্নকারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, কিঞ্চিৎ খর-পাদবিক্ষেপে সঙ্গীর সহিত পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর গেলে অল্প অল্প বংশীর রব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, একবার বায়ুর সঙ্গে স্পষ্ট স্বর আসিতেছে,আবার তাহা ফিরিয়া যাইতেছে। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, সে ধ্বনি আরও স্পষ্টীভূত হইল; যেন বাঁশী ধীরে ধীরে অলসে কাঁদিতেছে। একজন বলিল, "পিতম এইবার মরণ-কান্না কাঁদিতেছে। সঙ্গী তাহাতে কোন উত্তর করিল দুই জন অস্ত্রধারীর মধ্যে একজনের বয়স অষ্টাবিংশতি বৎসর। এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ কথা সেই কহিতেছে। অপর অস্ত্রধারীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। চূড়াধন বাবুর বাটীতে রাত্রিকালে যে দুই ব্যক্তি যাতায়াত করিত, তাহারাই একত্রে পিতমের অন্বেষণে যাইতেছিল।

যাইতে যাইতে কালিদাস বলিল, "অদ্যকার কার্য্যের ভার আমারই থাক্‌। একটা রোগা পাগল তোমার তরবারির যোগ্য নহে।" জনার্দ্দন কোন উত্তর করিল না, কিঞ্চিৎ পরেই সঙ্গীত বন্ধ হইল। কালিদাস বলিল,"পাগলা পলাইল না কি?" এবারও জনার্দ্দন কোন উত্তর করিল না। ক্রমে উভয়ে দীঘিকার নিকটে উপস্থিত হইল। সেখানে কেহই নাই। দীঘিকার কূলে বড় বড় বকুল গাছ নিস্তব্ধভাবে জ্যোৎস্না-কিরণ উপভোগ করিতেছে, নিকটে একটী ক্ষুদ্র মন্দির বৃক্ষচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে, দীঘিকা অতি প্রশস্ত; পদ্মপত্রে পরিপূর্ণ, দুই একটী রাত্রিচর পক্ষী জলে ভাসিতেছে—দৃষ্ট হয় না, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া আপনাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। তথাপি দীঘিকা স্থির, যেন নিদ্রিত, অস্ত্রধারীরা আসিয়া বকুলতলায় দাঁড়াইল; কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কালিদাস দৌড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "ওখানে কেহ নাই, বোধ হয় পলাইয়াছে; আমরা আসিতেছি, পাগলা হয় ত সে সন্ধান পাইয়া থাকিবে।"

জনার্দ্দন। পিতম কিরূপে জানিবে যে, আমরা আজি তাহার শিরশ্ছেদ করিতে আসিতেছি।

কালিদাস। যদি না জানিবে, তবে সিংহশত গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিলে কেন?

জনার্দ্দন। আমার বোধ হয়, পিতম এইখানে কোথায় আছে।

"নিশ্চয় কথা, আমি এইখানেই আছি।" এই কথা পিতম এক বৃক্ষ হইতে বলিয়া উঠিল।

একটি পুরাতন মাধবীলতা বকুলবৃক্ষের একস্থল শাখা-প্রশাখা দ্বারা এরূপভাবে ব্যাপিয়াছিল যে,অনায়াসে একজন তাহার উপর শয়ন করিতে পারিত। পিতম সেইস্থানে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়াছিল বাঁশীটী ঘুরাইতে ফিরাইতেছিল, অন্যমনস্কে কি ভাবিতেছিল, এমত সময়ে জনার্দ্দনের কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল; বলিল,"আমি এইখানেই আছি,নামিব কি?"

জনার্দ্দন। আমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, বুঝিলে তুমি নামিতে চাহিবে না।

পিতম। তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি আরও একটু বেশী বুঝিয়াছি যে, তুমি জনার্দ্দন; চূড়াধন বাবু তোমায় এই সৎকার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছেন।

জনার্দ্দন কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হস্তের তরবারিখানি নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতে লাগিল, 'আমার নাম জনার্দ্দন, পাগল এ কিরূপে জানিল? সিংহশত গ্রামের কেহই ত আমায় চিনে না। আমিও দিবাভাগে বাহির হই না। তবে কিরূপে আমায় চিনিল? চিনিয়াই বা কেন আপনার মরণ-সন্ধান আপনি বলিয়া দিল? অতএব পিতম হয় সত্যই উন্মাদ, নতুবা বীর। উভয়ই সম্ভব, কেন না উভয়-প্রকার ব্যক্তির প্রকৃতি কতক অংশে একইরূপ। যাহা হউক, পিতমকে দেখিলে বুঝা যাইবে।" তাহার পর পিতমের কথার উত্তর দিল "সৎকার্য্য হউক, অসৎকার্য্য হউক, যখন আমি ব্রতী, তখন কার্য্য সমাধা করিব।"

পিতম। আমার কোন আপত্তি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করি—কি অস্ত্রের দ্বারা ?

কালিদাস। এই তরবারির দ্বারা।

পিতম। লাঠি হইলে ভাল ছিল, আমার সেই ইচ্ছা অনেক দিন অবধি আছে ; তবে তরবারিতে ক্ষতি নাই।

এই বলিয়া পিতম বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। জনার্দ্দন ভাবিল, এটা সত্যই পাগল। তখন পিতম হাসিমুখে জনার্দ্দনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় কালিদাস পশ্চাৎ হইতে তরবারি তুলিল। জনার্দ্দন লম্ফ দিয়া সেই তরবারি ধরিল; কালিদাস চীৎকার করিয়া জনার্দ্দনকে গালি দিল ; বলিল, "তুমি নেমকহারাম, যাহার নুণ খাও, তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত কর।"

জনার্দ্দন। আমি কাহার নুণ খাই ? চূড়াধনের মিথ্যা কথা। আমি তাহার সঙ্গে। আমার সাহায্যে সে রাজা হইতে চায় ; তাহারে রাজা করি না করি, আমার ইখ্‌তিয়ার।

কালিদাস। ভাল, তবে আমি যাই। সেই কথাই চূড়াধন বাবুকে বলিগে।

জনার্দ্দন। বলগে, এখনই চূড়াধন আমার হাতে ধরিবে বই আমি তাহার হাতে ধরিব না।

কালিদাস সদর্পে চলিয়া গেল।

জনার্দ্দন পিতমকে বলিল, "তোমার মরিতে ভয় নাই কেন ?

পিতম। জানি না।

জনার্দ্দন। এখন আমি যদি তোমায় রক্ষা করি, বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি আমার অনুগত থাকিবে, আমি যাহা বলিব, তাহা করিবে।

পিতম। আমাকে ত হত্যা করিতেই হইবে ; নতুবা তোমার দু'টাকা লাভ হইবে না।

জনার্দ্দন রাগত হইয়া বলিল, "আমি কি দুই টাকার জন্য নরহত্যা করি ?"

পিতম। না হয় চারি টাকার জন্য। না হয় আরও কিছু বেশী। এ ব্রতে টাকা ভিন্ন তোমার আর কোন ও উদ্দেশ্য নাই। চূড়াধন বাবু রাজা হবেন, তুমি দুই চারি টাকা পরিতোষিক পাইবে ; যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে। আমি মরিয়া তোমায় চারি টাকা দেওয়াইব ; তুমি হত্যা করিয়া আর এক জনকে রাজ্য দেওয়াইবে, এইরূপ ভাগাভাগি।

জনার্দ্দন বলিল, "বুঝিয়াছি, তোমার ভয় হইয়াছে। তুমি যেরূপেই আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা কর—বৃথা। মৃত্যু তোমার আবশ্যক, অতএব যদি তোমার ইষ্টদেবতার নাম লইতে ইচ্ছা থাকে, এই সময় নাম করিয়া লও।"

পিতম। আমি সকল সময়ই প্রস্তুত আছি। তুমি তরবারি তোল, তোমায় কেমন দেখায় দেখি।

"তবে এই দেখ" বলিয়া, জনার্দ্দন সতেজে তরবারি তুলিল। চন্দ্রকিরণ তাহার ফলকে বিদ্যুৎবৎ নাচিয়া উঠিল, কিন্তু তরবারি নামিল না। পশ্চাৎ হইতে এবার কালিদাস আসিয়া জনার্দ্দনের হস্ত ধরিয়াছিল।

কালিদাস জনার্দ্দনের সহিত বচসা করিয়া, সিংহশত গ্রামাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিল যে, হয় ত জনার্দ্দন আপনি কৃতকার্য্য হইবে বলিয়া আমাকে তাড়াইয়াছে। অতএব তাহাকেও কৃতকার্য্য হইতে দেওয়া হইবে না, এই বলিয়া সে ফিরিল। যাহা অনুভব করিয়াছিল, আসিয়াও ঠিক্ তাহাই দেখিল, অতএব তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া জনার্দ্দনকে নিরস্ত করিল।

তখন উভয়ে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল ; বিরোধ আর বাক্যে নহে, অস্ত্রে অস্ত্রে চলিল। পিতম এই অবকাশে চলিয়া গেল। কেহ তখন লক্ষ্য করিল না ; কিন্তু যখন বিরোধ থামিল, উভয়ে ব্যস্ত হইয়া পিতমের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

কালিদাস বৃক্ষে উঠিয়া দেখিল যে, পিতম বৃক্ষে নাই, জনার্দ্দন তাহা বিশ্বাস করিল না। অতএব আপনি বৃক্ষে আরোহণ করিল, কিন্তু তথায় কেহই নাই দেখিয়া, দুই এক বার নাম ধরিয়া পিতমকে ডাকিল। কালিদাস উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং জনার্দ্দনকে উপহাস করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

"কোথায় পিতম, শীঘ্র এস, মরিবার নিমিত্ত আর দেরী করিও না। আমরা খাঁড়া-হাতে দাঁড়াইয়া আছি।"

জনার্দ্দন। উপহাস নহে, পিতম কোথায়

কালিদাস। বোধ হয়, অন্য কোন গাছে গিয়াছে।

এই বলিয়া কালিদাস আর একটী গাছে উঠিল, তথায়ও পিতম নাই দেখিয়া, তৃতীয় বৃক্ষে আরোহণ করিল, এইরূপে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি বকুল, তেঁতুল, আম্র বৃক্ষ অনুসন্ধান করিল ; কিন্তু পিতম এই সময় ধীরে ধীরে একটী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, আর একটী দীঘিকার নিকটবর্ত্তী হইল।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় বিস্তর দীর্ঘিকা ছিল; এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লোপ পাইতেছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তকাবি এড্ভান্স (Tuccavi Advance) দিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ রক্ষা করিতেছেন। শিতম সেই দীর্ঘিকার কূলে এক বটবৃক্ষের তলে শয়ন করিল, এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রা গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে পুটুর মা গৃহত্যাগ করিয়া যান, সেই রাত্রের প্রথম ভাগে সোহাগী চাকরাণী শয়ন করিয়া পান চর্ব্বণ করিতে করিতে, অপর এক চাকরাণীকে বলিতেছিল, "ওলো মেনকার মা! আমার এখানে আর চাকরী করা হলো না।"

মেনকার মা। কেন লো?

সোহা। এখানে কোন সুখ নাই, যাঁর কাছে থাকি, তাঁর না আছে সক, না আছে পছন্দ, না আছে কিছু। আজ এত করে চুয়া চন্দন মিলাইয়া একটু বুকে দিতে গিয়াছিলাম, তাঁর মনে ধরিল না, উনি বলেন, ওতে বড় দুর্গন্ধ। এমন পছন্দ যাঁর, তাঁর পায়ে নমস্কার; আমি কাল সকালেই চলে যাব।

মেনকার মা। সকালে কেন, এখনই চলে যা না।

সোহা। রাত্রি অন্ধকার, এখন আমার সঙ্গে কে যাবে?

মেনকার মা। যম যাবে।

সোহা। যমের ভাব বুড়ার সঙ্গে? তোর মত বুড়া মাগী পেলে যম বড় খুসী হয়, আমাদের কাছে যম কই আসে?

প্রাতে মেনকার মা উঠিয়া দেখিল যে, সোহাগী সত্যই চলিয়া গিয়াছে। ক্ষণবিলম্বে জানিল পুটুর মাও বাটীতে নাই, অতএব রামসেবকের মাতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই পোড়ার-মুখী সোহাগীর সঙ্গে ঠাকুরাণী কোথায় গিয়েছেন?"

বৃদ্ধা। কি জানি বাছা! সোহাগী সঙ্গে গেছে? তবে আর ভাবনা কি? এখনই আসিবে।

মেনকার মা। পোড়ার মুখ সোহাগীর!

পুটুর মা কুলত্যাগী হয়েছে, এইকথা মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে, পুরুষমহলে মহাকোলাহল বাধিয়া গেল। পরস্পর সকলেই বলিতে লাগিল "আমি সর্ব্বাগ্রে বলেছিলাম যে, রামসেবকের স্ত্রী কুলটা।"

প্রথম কোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিলে, সকলে রাজার উদ্দেশে তিরস্কার আরম্ভ করিল। সকলেরই স্থির প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সোহাগীকে রাজা কেবল এই কার্য্যের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। অতএব রাজার প্রতি লোকের ক্রোধ বিষম হইয়া উঠিল। কোথায় তিনি রামসেবকের স্ত্রীকে লুকাইয়াছেন, প্রথমতঃ কেবল এই সন্ধান করা সকলের পরামর্শসিদ্ধ হইল।

পুটুর মার অনুসন্ধান করিতে যুবারাই আপনা-আপনি ব্রতী হইলেন; তাহাদের মধ্যে এক দল—অধিকাংশই টোলের ছাত্র—স্মৃতিশাস্ত্রের তক্তা-হস্তে বাহির হইলেন, যেখানেই রুদ্ধদ্বার দেখেন, সেইখানেই তাঁহারা দ্বারভেদ করেন।

শেষ এক দিন সকলেই একত্র হইয়া, রামসেবককে অনুরোধ করিলেন যে, "তুমি একবার নিজে রাজার নিকট যাও, মাধবীলতার সংবাদ লইয়া আইস।" রামসেবক সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থি মুক্ত করিতেছিলেন, নতশিরে তাহাই করিতে লাগিলেন। যে অবধি রাজানুগ্রহে রামসেবক সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন, সেই অবধি কেহ তাঁহার মুখাবলোকন করিত না, কেহ তাঁহার বাটীতে আসিত না, এক্ষণে তিনি সমাজে ঘৃণিত ও পতিত হইয়াছেন, শুভানুধ্যায়ী পল্লীবাসীদের সুতরাং যাতায়াত আরম্ভ হইল। রামসেবক তাঁহাদের কথার প্রায় উত্তর দিতেন না। তাঁহার পত্নীর কথা কেহ উপস্থিত করিলে, তিনি উঠিয়া স্বতন্ত্র স্থানে তামাকু সাজিতে বসিতেন।

দাসীদের মুখে রাজা যখন শুনিলেন যে, সোহাগীর সঙ্গে পুটুর মা গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, পুটুর মা কুলত্যাগী হইয়াছে নতুবা সোহগীর সঙ্গে কেন? দুই এক দিন পরে দাসীদের কথার ভঙ্গীতে যখন তিনি বুঝিলেন যে, লোকে এই সম্বন্ধে রাজার কলঙ্ক রটাইয়াছে, তখন রাজা কিছু চমৎকৃত হইলেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, মনে মনে এই ঘটনার হেতু বিবেচনা করিতে লাগিলেন। হেতু নিতান্ত অমূলক বোধ হইল না; পূর্ব্বকথা আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল, রাজা মাধবীলতাকে এত ভালবাসেন কেন? তাহার নিমিত্ত এত অর্থব্যয় করেন কেন? তাহার মাতাকেই বা এত অলঙ্কার

দিবার তাৎপর্য্য কি? মাধবীলতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকল রাজার মত কেন? দেখিলে মাধবীলতাকে রাজার কন্যা বলিয়া বোধ হয় কেন? রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি।"

জ্যোৎস্নাবতীর উপলক্ষে রাজার প্রতি রাণীর মন পূর্ব্বেই বিশেষ ভার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আরও বাড়িল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধানে রাজা আপনি যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, লোক পাঠাইলেই ত হইত; তবে রাজা নিজে যে গেলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত। এক্ষণে রাণী বুঝিলেন যে, জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধান কেবল ছলমাত্র, মাধবীলতার মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। রাণী সর্পীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি।"

রাণী নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে একবার সদর্পে উঠিয়া কক্ষান্তরে গিয়া, প্রিয়তম দুই একজন পরিচারিকাকে ডাকিলেন। রামীধাই মাধবীলতা-সম্বন্ধে যাহা রাজসভায় প্রতিপন্ন করে, তাহা তাহারা শুনিয়াছিল। রাণী যে এ পর্য্যন্ত সে সংবাদ শুনেন নাই, এ কথা তাহারা জানিত না। সুতরাং অতি তীব্রদৃষ্টিতে তাহাদের বলিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে যে মাধবীলতার অনুসন্ধান করিয়া দিবে, সেই আমার স্ত্রী-ধনের অর্দ্ধাংশী হইবে।" রাণীর চাঞ্চল্য কেবল নিজ সন্তান নিমিত্ত, এই বুঝিয়া তাহারা নিরুদ্বেগে বলিল যে "মাধবীলতার অনুসন্ধান বিধিমতই হইতেছে, দুই এক দিনের মধ্যে সে সংবাদ পাওয়া যাইবে।" রাণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "সে সকল অনুসন্ধান আমি চাই না; আমার ইচ্ছা যে, আমার নিজের লোকে এই অনুসন্ধান করে।" এই কথা বলিতে বলিতে রাণীর দৃষ্টি আবার পূর্ব্ববৎ প্রখর হইয়া উঠিল। দাসীরা সভয়ে "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল।

পরদিবস রাজা ইন্দ্রভূপ প্রত্যাগমন করিলেন। শিবিকায় বসিয়া অনুসন্ধান বড় হয় না, তথাপি তিনি চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রাজভগিনী পথে কোথাও বসিয়াছিলেন না, সুতরাং রাজা ইন্দ্রভূপ তাঁহার দেখাও পাইলেন না। তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শাস্ত্রালাপ করিত, সুতরাং রাজভগিনীর অনুসন্ধান করিবার আর তাঁহার অবকাশ থাকিত না। শেষ তিনি হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাজা, রাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া, অমাত্যবর্গের সহিত দুই একটা কথা কহিয়াই অন্তঃপুরে গেলেন। রাণী তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কিঞ্চিৎ মন্দগমনে নিকটে উপস্থিত হইলেন। একজন দাসীকে পাখা আনিতে বলিয়া, রাজার শারীরিক কুশলবার্ত্তা কিঞ্চিৎ ঔদাস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেজন্য মহারাজের যাওয়া হইয়াছিল, তাহার মঙ্গল?"

রাজা। মঙ্গল আর কেমন করে বলিব, জ্যোৎস্নাবতীর জন্য গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও সাক্ষাৎ পাইলাম না। শেষ আর কি করি, আমি পথে পথে বেড়াইলে ত বিষয় কার্য্য চলে না, সুতরাং ফিরে আসিতে হইল; তবে বড় দুঃখ রহিল যে, রাজকন্যা এই কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

রাণী। কে রাজকন্যা? মাধবীলতা?

রাজা। না, আমি জ্যোৎস্নাবতীর কথা বলিতেছি, তি—

রাণী। আপনার মাধবীলতার মা যে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে?

রাজা। তাহা জানি; আমি তাহা এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বেই শুনিয়া গিয়াছিলাম।

রাণী। সাক্ষাৎ হইয়াছিল? সেইজন্য কি এত বিলম্ব?

রাজা। সে নিমিত্ত আমি এক্ষণে ব্যস্ত নাহ; আমি এখন ব্যস্ত জ্যোৎস্নাবতীর নিমিত্ত; তাহার অনুসন্ধান কিরূপে পাইব।

রাণী। মাধবীলতার জন্য আপনি যে ব্যস্ত হইবেন না, তাহা কতক বুঝিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাণী হঠাৎ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় দাসীকে বলিয়া গেলেন, "তুমি ব্যজন কর, আমার আসিতে বিলম্ব হবে।"

উভয়ে উভয়ের শেষ কথার অর্থ বিপরীত ভাবিলেন। রাজা বুঝিলেন যে, মাধবীলতার জন্য আমি বড় ব্যস্ত নহি, এ কথা বলায় রাণীর অভিমান হইয়াছে। হওয়াই সম্ভব, কেন না রাণী তাহার গর্ভধারিণী; স্নেহ কোথা যাবে? এ দিকে রাণীর নিশ্চয় ধারণা হইল যে, মাধবীলতার মাতা কোন নিরুপদ্রব স্থানে রক্ষিত হইয়াছে; নতুবা রাজা কেন বলিয়া ফেলিবেন যে, মাধবীলতার নিমিত্ত বড় ব্যস্ত নহেন।

সেই দিবস অবধি রাজার সহিত রাণীর আর বড় সাক্ষাৎ হইত না। সাক্ষাৎ হইলে রাজাও বিশেষ যত্ন করিয়া কথা কহিতেন না, তাঁহারও মন ভার হইয়াছিল। তিনিও স্থির করিয়াছিলেন যে, নিরূপমাধা জ্যোৎস্নাবতীর গৃহত্যাগ কেবল রাণী হইতেই হইয়াছে; রাণীর নিমিত্ত তিনি আপনার ভগিনীকে বাটী হইতে প্রকারান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এ অকার্য্য তাঁহাকে কেবল রাণীর ভয়েই করিতে হইয়াছে। রাণীই এ অনর্থের মূল।

ক্রমে তাঁহাদের পরস্পরের অন্তরঙ্গ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজা দুই একবার যত্নসহকারে রাণীর সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; রাণী সে যত্ন গ্রহণ করেন না দেখিয়া, রাজা অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। যেখানে পুরুষে অসদ্ভাব, সেখানে মঙ্গল নাই, এ কথা রাণীকে একদিন বুঝাইবেন, রাজা মনে মনে স্থির করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান মহাশয় মাধবীলতাকে অনুসন্ধান করিবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি প্রায় প্রতিগ্রামে গিয়া, গোমস্তা, বিশেষতঃ দরিদ্র, ভিক্ষুক, ঠাকুর-পূজারি, অতিথিশালার ভাণ্ডারী প্রভৃতিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করায়, এক স্থানে একজন বৃদ্ধা ভিখারিণী বলিল, "আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, বোধ হয়, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ক্রোড়ে একটী বৎসরের কন্যা আছে।"

দেওয়ান কোথায় দেখিয়াছিলে?

বৃদ্ধা। এই গ্রামের প্রান্তভাগে বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি চক্ষের জলে অঞ্চল ভিজাইলেন, তবু কোন কথারই উত্তর দিলেন না। আমি তাঁহার কন্যার নিমিত্ত একটু দুধ আনিতে গেলাম, কিন্তু আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে আজ চারি পাঁচ দিনের কথা।

দেওয়ান মহাশয় সেই বৃক্ষতলে গিয়া অনুভব করিলেন যে, মাধবীলতার মা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে, অতএব পাল্কী আরোহণ করিয়া সেইদিকে গেলেন। অপরাহ্ণে প্রতাপনগরের নিকটবর্ত্তী হইলেন; প্রান্তর হইতে দেখিলেন, নগরটী বহুতর দেবমন্দিরে সুশোভিত, তাহার ত্রিতল অট্টালিকা-সমূহ শ্বেতকপোতসমাকীর্ণ, লোককোলাহল অতি-দূরব্যাপী। সেই গ্রামেই মাধবীলতার মাতা মাধবী-লতাকে লইয়া বাস করিতেছিলেন। দূরসম্বন্ধে তাঁহার এক বিধবা পিসী ভিক্ষা দিতে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং অতি যত্নে আপনার গৃহে তাঁহাকে স্থান দিয়াছিলেন।

যখন দেওয়ান মহাশয় নগর-প্রবেশ করিতে-ছিলেন, পুটুর মা একটী পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া, তাঁহার পাল্কী দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন যে এই পাল্কী যদি আমাদের রাজার হয়, তবে তাঁর পায়ে পুটুকে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রাণত্যাগ করি। রাজা অবশ্য পুটুকে প্রতিপালন করিবেন, তিনি পুটুকে ভালবাসেন। পুটু আমার কত শান্ত মেয়ে। এই যে রৌদ্রে রৌদ্রে আমি তাকে বুকে করে ফিরিতেছি, পুটু তবু ত কাঁদে না, যেন পুটুর তাতে আরও আহ্লাদ বেড়েছে; পুটু হাসিতেছে, কাক ডাকিতেছে, হাত ঘুরাইতেছে, আয় আয় করে চাঁদ ডাকিতেছে। মাধবীলতার মা একা দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, কিন্তু পুটু তখন তাহার ক্রোড়ে ছিল না। তাঁহার অতি নিকট দিয়া পাল্কী চলিয়া গেল; পাল্কীতে দেওয়ান ছিলেন, কিন্তু তিনি কিংবা তাঁহার পরিচারকগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না; তিনিও জানিতেন না যে, তাঁহারই অনুসন্ধানের নিমিত্ত স্বয়ং রাজ-দেওয়ান যাইতেছেন। দেওয়ান নগরে প্রবেশ করিয়া, কোন এক প্রধান ব্যক্তির বাটীতে অবস্থান করিলেন, সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, সকলকেই তিনি মাধবীলতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ভিখারী, পূজারি, কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। দেওয়ান কোন সংবাদ না পাইয়া, অগত্যা বিবেচনা করিলেন যে, যে গ্রামে বৃদ্ধার মুখে পুটুর মার প্রথম সংবাদ পাইয়াছিলেন, সেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করাই উচিত; অতএব প্রাতে তথায় ফিরিয়া গেলেন।

পথিমধ্যে পিতম পাগলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পিতম কোন সম্ভাষণ করিল না দেখিয়া, দেওয়ান তাঁহাকে ডাকিলেন। পিতম আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

দেওয়ান পিতমকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন

স্থানে বসিলেন। পিতম তখনও কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া আপনিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতেছিলে ?"

পিতম। এই দিকে।

দেওয়ান। এই দিকে কোথা ?

পিতম। তা এত জানি না। তুমি কোথা গিয়াছিলে ?

দেওয়ান। রাজকন্যা মাধবীলতার অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা হইল।

পিতম। ভালই হইয়াছে।

দেওয়ান। কেন ?

পিতম। তুমি যদি রাজার মঙ্গল ইচ্ছা কর, মাধবীলতার নাম করিও না; মাধবীলতা রাক্ষসী, অথবা আর কিছু; যে তাহার সংস্রবে আসিবে, সেই কষ্ট পাইবে অথবা নষ্ট হইবে; অতএব তুমি পালাও। মাধবীলতা নিজে দুরদৃষ্ট, মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছে; অতএব তুমি পালাও। তুমি ছিন্নমস্তা দেখিয়াছ ? আমি তাহারই পার্শ্বে মাধবীকে দেখিয়াছি।

ছিন্নমস্তার রূপ কে কল্পনা করিয়াছিল, জান ? ঘোর অদৃষ্টবাদীর এ কল্পনা। কল্পনা নহে, ইহা সত্য সত্যই অদৃষ্টের মূর্ত্তি; অদৃষ্ট আর প্রকৃতি এক। আমার সহিত তর্ক করিও না। আমি স্বচক্ষে এ মূর্ত্তি দেখিয়াছি; একদিন অট্টালিকায় শয়ন করিয়াছিলাম, রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় একরূপ পৈশাচিক শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শয্যা হইতে দেখি, আমার গবাক্ষের নিম্নে এক স্থান হইতে বহুতর গৃধিনী, শকুনি উড়িয়া আকাশপথে যাইতেছে, তাহাদের পক্ষ-সঞ্চালনের শব্দে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সকল পক্ষীই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের এক দিকেই বেগে যাইতেছে দেখিয়া আমি গবাক্ষের নিকটে গেলাম। যে দিকে পক্ষীরা ছুটিতেছে, সেইদিকে ধীরে ধীরে নেত্রপাত করিয়া দেখি, স্বর্গ-মর্ত্ত্য স্পর্শ করিয়া এক রুদ্ররূপিণী যুবতী; আপনার মস্তক আপনি ছেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুক্তকেশ অবিরত তরঙ্গ তুলিয়া, আকাশ ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বামকরস্থ ছিন্নমস্তক উন্নতমুখে রক্তধারার উৎপতন ও প্রপতন দেখিতেছে, হাসিতেছে আর তাহা পান করিতেছে। উৎপ্রেক্ষিত রক্তের আভায় অন্ধকারও রক্তবর্ণ হইয়াছে। আকাশ, বৃক্ষ, জল, তৃণ, সমুদায়ই রক্তাক্ত হইয়াছে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, আকাশে, চারিদিক্ ব্যাপিয়া, গম্ভীর "ওঁম্" শব্দ স্থিরভাবে ধ্বনিত হইতেছে। তেত্রিশ কোটি দেবতা করযোড়ে স্তব করিতেছেন, "হে জগন্মাতঃ! কেন মা, তোমার গুপ্তমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছ ? আবার এ মূর্ত্তি কেন, আমরা যে ভয় পাইতেছি।" কেবলমাত্র মহাদেব আসিয়া বলিলেন, "প্রকৃতি দেবি! তুমিই সত্য, তোমার এই রূপই সত্য, তোমার এই রূপ আমার মনোমোহিনী।" মহাদেবের কথায় রুদ্ররূপিণী ঈষৎ হাসিয়া ক্রমে ক্রমে আকাশে মিলাইয়া গেলেন। আর কোথাও কেহ নাই, আমি দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, "প্রকৃতি দেবী কি ছিন্নমস্তা ? এই কি প্রকৃতির যথার্থ মূর্ত্তি ? তাই কি অস্তরা আপনার শাবক আপনি খায় ? তাই কি নারী আপনার কন্যা আপনি নষ্ট করিতে চান ? তবে হে প্রকৃতি! আমাদের কেন ঠকাও ? তোমার এই যথার্থ মূর্ত্তি ঢাকিয়া কেন নিয়ত মোহিনী মূর্ত্তিতে আমাদের চোখে চোখে বেড়াও ?—কেন ফুল ফুটাও, কেন বা কোমল লতাবল্লরী দোলাও, কেন পাখী উড়াও, কেন জ্যোৎস্না মাখ, কেন অনন্তনক্ষত্রসনাথ কিরীট মাথায় পর ? আমি আর ঠকিব না।"

দেওয়ান। তুমি মাধবীলতার সন্ধান করিতে পার ?

পিতম ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি আলোচনা করিতে করিতে এরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, দেওয়ানের উপস্থিতি তাহার একেবারে স্মরণ ছিল না। দেওয়ানের কথার কোন উত্তর না করিয়া, পিতম ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। অন্যমনস্কে হউক, সমনস্কে হউক, যে গ্রামে মাধবীলতার মাতা বাস করিতেছিলেন, পিতম সেই প্রতাপপুর গ্রামের দিকে চলিল। কতকদূর গিয়া প্রান্তরমধ্যে দেখিল, এক স্থান নগরের ন্যায় জনসমাকুল; কেহ ডাকিতেছে, কেহ দৌড়িতেছে, কেহ তিরস্কার করিতেছে, কেহ চন্দ্রাতপ উঠাইতেছে, কেহ ঘোড়া টহলাইতেছে, কোন মল্ল ডন করিতেছে, কেহ বা কচ্ছ কসিতেছে, কেহ চুনী কাটিতেছে, কেহ ভাঙ্গ ঘুঁটিতেছে, কেহ ছায়ায় বসিয়া খঞ্জনী বাজাইতেছে। কোলাহলের আর সীমা নাই। একজন যুবা এক বৃক্ষমূলে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সে হঠাৎ এই সময় ঘণ্টাবাদন করিল। ঘণ্টার শব্দমাত্রেই কোলাহল যেন শিহরিয়া থামিয়া গেল। তখন সকলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকে দেখিতে লাগিল। সে দিকে কেবল ধূলা উড়িতে-

ছিল, অনতিবিলম্বে বহু-অশ্ব-পদ-সঞ্চারিত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। অমনি শিবিরস্থ সকলে নিঃশব্দে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। দণ্ডেক কাল অতীত হইতে না হইতেই কতকগুলি যুবা অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদেরই মধ্যে একজনকে সসম্মানে বেষ্টন করিয়া শিবিরপ্রবেশ করিলেন। তিনিই তক্ষপুরের রাজা। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মহেশচন্দ্র। কিন্তু পিতম সে পরিচয় পাইল না। কে কোথায় যাইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিল না, অন্যমনস্কে কিঞ্চিৎকাল দেখিল মাত্র, তাহার পর চলিয়া গেল। তখন পিতমের অন্তরে ...নমস্তার রূপ জাগরিত।

রাজা মহেশচন্দ্র তাঁবুতে প্রবেশ করিয়াই সম-...স্থদের বিদায় দিয়া রাঘব শর্ম্মাকে ডাকিলেন। রাঘব আসিয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিয়া, একখানি পত্র হস্তে দিলেন। মহেশচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া ...তে হাসিতে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া ..., নিশ্চিন্ত ছিলে না, আমার নিমিত্ত ...ক কার্য্য জুটাইয়া রাখিয়াছ। অদ্য আর আমায় ...শ দিবে না দেখিতেছি। ইন্দ্রভূপের দেওয়ান ...পপুরে আসিয়াছিলেন, অথচ মাধবীলতার ...দ পান নাই। আর তুমি আসিয়াই তাহার ...ক পাইয়াছ। তুমি যে সে দেওয়ান অপেক্ষা ...ক, এ কথা শুনিলে ইন্দ্রভূপ তোমায় ছাড়ি-

রাঘব। তাঁহার দেওয়ান এখন রাণী বহাল ...। তিনি কাশী চলিলেন। আমি সুতরাং ...র হাত ছাড়াইয়াছি। এখন অনুমতি হয় ত ...শী বিদায় হই, একটী বিশেষ কার্য্যের ক্ষতি হই-

...না মহেশচন্দ্র হাসিয়া রাঘবকে বিদায় দিলেন।

... শিবিরের নিকট দিয়া একজন সন্ন্যাসী ...পুর গ্রামে যাইতেছিল। বিশেষ মনোযোগ ...দেখিলে, তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া বোধ হয়; ... প্রবেশ করিয়া,এক দেবমন্দিরের সমীপ-...হইলেন। তথায় পিতম পাগলা প্রস্তরে ...কটী শ্লোক ঊর্দ্ধমুখে পাঠ করিতে চেষ্টা ... পিতম একবার তাঁহার প্রতি কটাক্ষ ...রে সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী হইলে, পিতম মুখ ... করিয়া বলিল, "জনার্দ্দন ভায়া, সন্ন্যাসী ...বি?" সন্ন্যাসী একটু চঞ্চল হইয়াই তৎক্ষণাৎ সাবধান হইলেন, হাসিমুখে কি বলিবেন উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময় পিতম বলিল, "বাঙ্গালা অক্ষরগুলি তান্ত্রিক, মুসলমানদিগের অক্ষর সামরিক, ফিরিঙ্গীদিগের অক্ষর সাংসারিক; সেইরূপ সন্ন্যাসীও গৃহী, তান্ত্রিক, সামরিক আছে। তুমি কোন্ জাতীয় সন্ন্যাসী? বুঝি সামরিক?"

সন্ন্যাসী। আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।

পিতম। বুঝিলে না? ফারসি অক্ষরগুলি কেবল তরবারি—ছোট তরবারি, বড় তরবারি, ভগ্ন তরবারি, বিনমিত তরবারি—তাই বলিতেছিলাম, ফারসি অক্ষর সামরিক। আর এক দেশের অক্ষর তীরের মত ছিল,—বাঁকা তীর, সোজা তীর, তির্য্যক্ তীর তাহাও সামরিক। ফিরিঙ্গীর অক্ষর গৃহদ্রব্য অনুরূপ,—কোচ, কেদারা, বাসনকোসন, প্লেট, ডিস, ফানস, এণ্ডা ইত্যাদি। তাহাতেই সে অক্ষরগুলি গৃহী। আর আমাদিগের অক্ষর পূজাঙ্গের অনুরূপ; ত্রিকোণ যন্ত্র, মুদ্রা, নরকপাল ইত্যাদি, তাই তান্ত্রিক। অক্ষর-সৃষ্টির সময় যে জাতির যে দিকে দৃষ্টি অধিক থাকে,সে জাতির সেইমত হয়। যদি বৈষ্ণবেরা অক্ষর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তিলক-তুলসীর আকারে তাঁহাদিগের অক্ষর হইত। আর তুমি যদি এখন অক্ষর প্রস্তুত করিতে, তাহা হইলে কাহার আকৃতি লইয়া অক্ষর করিতে? মাধবীলতার?

সন্ন্যাসী। তোমার পাগলামি ছল মাত্র; তোমায় শমনভবন না পাঠাইলে আর আমার কোন সুখ নাই।

এই বলিয়া জনার্দ্দন রাগভরে ফিরিয়া গেল, আর মন্দিরে দাঁড়াইল না। পিতম প্রসন্নবদনে মন্দিরের শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জনার্দ্দন শর্ম্মার সম্বন্ধে পিতম পাগলা যাহা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। ভিক্ষার ছলে সন্ধ্যার সময় জনার্দ্দন এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, ভিক্ষা চাহিল না, কাহাকেও ডাকিল না, কেবল অলক্ষ্যে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল; শেষ যাহা অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সেই বাটীর সম্মুখে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া বসিল। বলা বাহুল্য যে, পুটুর মা এই বাড়ীতে বাস করিতেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটীর বহির্ভাগে গোল-যোগ হইল। মাধবীর মা তাহা কিছুই শুনিতে পান নাই, বৃদ্ধও তাহা জানিতে পারেন নাই। উভয়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সদর-বাটীতে আগুন লাগিয়াছিল; যে লাগাইয়াছিল, সে নিদ্রার ছলে অশ্বথ-মূলে শয়ন করিয়া আছে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, প্রথমে গৃহকপোতেরা জাগিয়া উঠিল, আলোকে আহ্লাদে তাহারা ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া গর্জ্জিতে লাগিল, তাহার পর উড়িয়া প্রতি-বাসীদের আলিসায় গিয়া সারি সারি বসিতে লাগিল; অগ্নির আলোকে তাহাদের শ্বেত শরীর ঈষৎ রক্তাভ দেখাইতে লাগিল। কেবল একটী কপোতী উড়িল না, নীড়ে বসিয়া সভয়ে গলা বাড়াইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল, তাহার নীড়ে দুইটী শাবক ছিল।

বাটীর চতুষ্পার্শ্বে শত শত লোক আসিয়া জমিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল, সকলেই জল আনিতে বলিতে লাগিল; কিন্তু নিজে কেহ জল আনিবার চেষ্টা করিল না, সকলেই হাঁ করিয়া অগ্নির ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "আহা! সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল।" কেহ বলিতে লাগিল, "হায় হায়! আর কিছু না, ঘরে স্ত্রীহত্যা হইল।' কেহ বলিল, "ইস! দেখ দেখ! আগুনের ঢেউ দেখ; এইবার সদরদ্বার গেল, এই বার ফুরাইল, আর কার সাধ্য ভিতরে যায়।"

এই সময় একজন বৃদ্ধ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিল, "যে কেহ এক প্রাণী বাঁচাবে, আমি তাহাকে এক শত টাকা দিব।" এ কথা সকলেই শুনিল কিন্তু কেহ অগ্রসর হইল না বা কেহ কোন উত্তর দিল না। শেষ জনার্দ্দন শর্ম্মা অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যাঁ, তুমি দিবে? কথা ঠিক ত?"

বৃদ্ধ। নিশ্চয় দিব, এখনই দিব, আমি শপথ করে বলিতেছি, এখনই দিব।

জনার্দ্দন। কত টাকা?

বৃদ্ধ। একশত টাকা। যদি বাঁচাতে পার, তবে আর কথায় সময় নষ্ট ক'র না।

জনার্দ্দন। একশত নগদ টাকা ত?—রোক?

বৃদ্ধ। হাঁ, তার আর অন্যথা হবে না।

জনার্দ্দন। তোমার নাম কি?

বৃদ্ধ। রামকমল বিদ্যানিধি, আমরা ফুলের মুখটি, বলরাম ঠাকুরের সন্তান।

জনার্দ্দন। তবে যা কর ভৈরবি।

এই বলিয়া জনার্দ্দন ইতস্ততঃ অবলোকন করিল; দেখিল, দূরে একটা লাঙ্গল পড়িয়া রহিয়াছে। সদর্পে তাহা উঠাইয়া অৰ্দ্ধদগ্ধ দ্বার আক-র্ষণ করিল। দ্বার অমনি পড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশপথে উঠিল। সকলে সাশ্চর্য্য হইয়া সেই দিকে দৌড়িল, তখন জনার্দ্দন এক দীর্ঘ লগুড় লইয়া আসিল, সকলকে সরিয়া যাইতে বলিল, সকলে সরিয়া দাঁড়াইল, আরও সরিয়া যাইতে বলিল, লোক আরও সরিয়া গেল। তখন দূর হইতে জনার্দ্দন লগুড়-হস্তে দৌড়িয়া আসিল, লগুড়ে ভর করিয়া এক লম্ফে দগ্ধদ্বার উলঙ্ঘন করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহির হইতে সকলে লগুড়ের অগ্রভাগ দেখিতে লাগিল, লগুড়াগ্র হেলিতেছে, দুলিতেছে, চলিতেছে। অনেকে বলিতে লাগিল, এখনও সন্ন্যাসী উঠানে রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে আকাশমুখী লগুড়াগ্র হঠাৎ দুলিয়া পড়িয়া গেল, সকলে ভয়ে নিঃস্পন্দ হইল, লগুড় আর উঠিল না; তখন কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল, বুঝি সন্ন্যাসী পুড়িয়া গেল। এই সময় জনার্দ্দনের হাসি শুনা গেল; জনার্দ্দন বলিতেছে, "কপোতি তুমি এখনও বসিয়া আছ?"

উত্তাপে কপোতী কাতর হইয়াছে, কণ্ঠ কাঁপি-তেছে, ওষ্ঠ বিযুক্ত হইয়াছে, কপোতী চারিদিকে দেখিতেছে, এখানে ওখানে বসিতেছে, আবার ফিরিয়া নীড়ে আসিতেছে। শাবকেরা ব্যাকুল হইয়া চীৎ-কার করিতেছে। জনার্দ্দন বলিল, "বুঝিছি, মায়া আমি উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, তোমায় উদ্ধার করিব।"

এই বলিয়া জনার্দ্দন আবার লগুড় গ্রহণ করিয়া তাহার অগ্রভাগ অগ্নিতে ধরিল, শেষ দগ্ধ লগুড় ঊর্দ্ধে উঠাইল। বাহির হইতে সকলে দেখিল, লগুড় ক্রমে দুলিতে দুলিতে চণ্ডীমণ্ডপ স্পর্শ করিল, চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিল। লোকেরা বলিয়া উঠিল, "পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসী চণ্ডীমণ্ডপে আগুন দিল, মার সন্ন্যাসীকে।" এই বলিয়া সকলে বাটীর ভিতরে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্যও করিল না।

চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী লগুড় দ্বারা নীড় ভাঙ্গিয়া দিল। শাবক দুইটী ভূমে পড়িয়া গেল, জনার্দ্দন তাহাদের পক্ষ ধরিয়া দোলাইয়া প্রজ্বলিত

তাসনে নিক্ষেপ করিল। কপোতী তাহা নিঃশব্দে দেখিল। সন্ন্যাসী তখন লগুড় হস্তে তাহাকে তাড়না করিল। শোকাকুল কপোতী উড়িল, চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল, কিয়দ্দূর উঠিয়াই অগ্নির উত্তাপে আগুনে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিল, "তোর অদৃষ্ট ! আমার দোষ কি ?"

চণ্ডীমণ্ডপে একখানি পট ছিল, এতক্ষণ সন্ন্যাসী তাহা দেখে নাই, অগ্নির আলোকে দেখিতে পাইয়া এক লম্ফে পটের সম্মুখে গিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল পটখানি কালীমূর্ত্তি। জনার্দ্দন বলিল, "মা ! আমার অপরাধ হয়েছে, তুমি এখানে আছ, তাই এতক্ষণ এ ঘরে আগুন লাগে নাই, আমি তাহা না জেনে আগুন দিয়াছি। ইষ্টদেবি ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই সময় মাধবীর মা ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছিল, কিরূপে মাধবীকে বাঁচাইব। কোন উপায় নাই, চারি দিকেই অগ্নি ; যে দিকে অগ্নি নাই, সে দিকে উচ্চ প্রাচীর। মাধবীর মার পিসী নিরুপায় হইয়া মালা জপ করিতে বসিয়াছিলেন। এক এক-বার মাধবীর মাকে বলিতেছিলেন, "ভয় নাই, কালী রক্ষা করিবেন।" কিছু ক্ষণ পরে মা দেখিল, সম্মুখে এক ভয়ানক মূর্ত্তি ! মনে করিল, যমদূত মাধবীকে লইতে আসিয়াছে, অতএব মাধবীকে বুকে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক চীৎকার শুনিয়াও শুনিল না, হস্ত প্রসারিয়া মাধবীকে ধরিল। মাধবীর মা মূর্চ্ছা গেল। সেই অবকাশে আগন্তুক মাধবীকে লইয়া ছুটিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃদ্ধাও ছুটিল।

আগন্তুককে যমদূত বলিয়া বৃদ্ধার ভ্রম হয় নাই। আপাদ-মস্তক কর্দ্দমাক্ত বলিয়া আগন্তুকের আকৃতি ভয়ানক দেখাইতেছিল। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া [illegible] যে, আগন্তুক অগ্নিভয়ে আপনার সর্ব্বাঙ্গে [illegible] প্রলেপ দিয়াছে। আগন্তুক মাধবীকে পৃষ্ঠে [illegible] উত্তরের প্রাচীরে উঠিল এবং তথায় দাঁড়াইয়া প্রাচীর-সংলগ্ন অন্য এক গৃহস্থের ত্রিতল অট্টালিকায় উঠিবার নিমিত্ত মাথা তুলিয়া দেখিতে [illegible] অট্টালিকায় বালির জমাট কিংবা চুণ কাম নাই, এইজন্য তাহাতে উঠিলে উঠিতে পারা যায় ; কিন্তু সে অতি দুঃসাহসিক কার্য্য। কিন্তু আগন্তুক আর অধিক ইতস্ততঃ না করিয়া, এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়ানক দুঃসাহসিক কার্য্য দেখিয়া বৃদ্ধার হৃৎকম্প হইতে লাগিল, আপনার বিপদ একেবারে ভুলিয়া বৃদ্ধা একদৃষ্টিতে সেই অপরিচিত ব্যক্তির বিপদ দেখিতে লাগিল ; প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার পদস্খলন-আশঙ্কা হইতে লাগিল। বৃদ্ধা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধমুখে কেবল সেই দিকে চাহিয়া রহিল ; বিপদে ইষ্টদেবীকে ডাকিবে, কিন্তু ইষ্টদেবীর নাম মনে আসিল না।

বহুকষ্টে অপরিচিত ব্যক্তি ত্রিতল অতিক্রম করিয়া কার্ণিসে দাঁড়াইল ; একবার নিশ্বাস ফেলিল, বৃদ্ধার শরীরে যেন সেই সঙ্গে স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। আর কত উঠিতে হইবে, তাহা একবার অপরিচিত ব্যক্তি মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহার পর আবার পূর্ব্বমত উঠিতে লাগিল। এবার আর বৃদ্ধা চাহিয়া দেখিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া চক্ষু মুদিল, ক্ষণেক পরে বৃদ্ধা আবার চাহিয়া দেখিল, অপরিচিত ব্যক্তি ছাদে উঠিয়াছে। তখন বৃদ্ধা আসন্নবিপদুদ্ধৃত ব্যক্তির শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। তখন আপনার অবস্থার প্রতি মন গেল, বৃদ্ধা ক্রমে ক্রমে বুঝিল যে, প্রাণ আর কোন ক্রমে রক্ষা হয় না ; চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত অগ্নি আসিয়াছে, তাহার উত্তাপে অন্তঃপুরে আর থাকা যায় না। যে ঘরে মাধবীর মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, সে ঘর ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার দ্বারে অগ্নি লাগিতে আর বিলম্ব নাই। অগ্নিময় বাটী হইতে আর কোন কৌশলে বহির্গত হইতে পারা যায় না। অতএব মৃত্যু নিশ্চয় আগত বুঝিয়া, বৃদ্ধা রুদ্রাক্ষমালা মস্তকে বাঁধিবার নিমিত্ত ঘরের ভিতর গেল।

এই সময় পূর্ব্বকথিত অপরিচিত ব্যক্তি আবার অট্টালিকা হইতে অবতরণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল। তথায় গিয়া মাধবীর মার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর অপরিচিত ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। দেখিল, স্ত্রীলোকদের পলাইবার কোন পথ নাই। বহির্ব্বাটীর দিকে গিয়া দেখিল, তথায় চারিদিকের চালাঘর পুড়িয়াছে, পুড়িতেছে—সে দিকেও পথ নাই, তথাপি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আগন্তুক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। তখন জনার্দ্দন শর্ম্মা পটহস্তে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিতেছিল, আগন্তুককে দেখিতে পাইল না ; দেখিলেও চিনিতে

পারিত না। আগন্তুক অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, জনার্দ্দন উঠান দিয়া যাইতে যেন অশক্ত, অগ্নির দিক চাহিতে পারিতেছে না, চক্ষু কুঞ্চিত করিতেছে, উত্তাপ যেন তাহার অসহ্য হইয়াছে। সন্ন্যাসী কয়েক পদ গিয়া ফিরিল; দেখিল, ফেরা বৃথা; চণ্ডীমণ্ডপের উপর অগ্নি তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতেছে। উত্তাপ সে দিকেও অসহ্য।

অপরিচিত ব্যক্তি তখন এই সময় অগ্রসর হইয়া বলিল, "পলাও, আর বিলম্ব করিও না।"

জনার্দ্দন। তুমি কে? তুমি কি অগ্নির দেবতা? নতুবা এই অনন্ত হুতাশনের মধ্যে কেমন করে স্বচ্ছন্দমনে বেড়াইতেছ?

অপরিচিত। আমি যে হই, তুমি পলাও, নতুবা তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না, এখনও পলাও। আগুন আজ ক্ষেপেছে, আজ দেবতারও বশ নহে, কাহারও কথা শুনিবে না, তোমারই জন্ত জলেছে; দেখিতেছ না, তোমাকে ঝাঁপে ফেলেছে, তোমার চারি দিকে আগুন। যদি সাধ্য থাকে, এখনও পলাও।

জনার্দ্দন। আমার আর সাধ্য নাই, মাথা ঘুরিতেছে, চক্ষে যেন কি দেখিতেছি, কাণ গু হু করিতেছে।

অপরিচিত। ওখান হইতে একটু দূরে আইস। অগ্নি তোমায় লক্ষ্য করেছে, ঐ দেখ, চণ্ডীমণ্ডপ হইতে তোমারই মাথায় পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে।

এই বলিতে বলিতেই চণ্ডীমণ্ডপের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পূর্ব্বে সতর্ক না হইলে, তৎক্ষণাৎ জনার্দ্দনের শেষ হইত। চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়া আরও উত্তাপ বাড়িল; জনার্দ্দন বলিয়া উঠিল, "আমি মরি, আমায় বাঁচাও। না হয় বল, আমি আগুনে ঝাঁপ দিই, সে বরং ভাল, শীঘ্র ফুরাবে।"

অপরিচিত। তুমি কোন্ পথ দিয়ে আসিয়াছিলে?

জনার্দ্দন। আমি ঐ সদর দরওয়াজা লাফাইয়া আসিয়াছিলাম, আমি এখন আর তা—

এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী পড়িবার উপক্রম করিল। অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল। জনার্দ্দন চক্ষু বুজিল, আর কথা কহিল না। অপরিচিত ব্যক্তি জনার্দ্দনকে বুকে তুলিয়া নিমেষমধ্যে দগ্ধদ্বার অতিক্রম করিয়া, তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় জনার্দ্দনকে শয়ন করাইল, ক্ষণেক দাঁড়াইয়া তাহার মুখপ্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর চীৎকার করিয়া বলিল, "কে আছ, সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা কর।" সে চীৎকার শতশত-কণ্ঠ-নিঃসৃত কোলাহলের উপর উঠিল, যেন ঝিল্লীরবের উপর সারস ডাকিল; অমনি সকলে ফিরিয়া নীরব হইল। অপরিচিত ব্যক্তি আবার ফিরিয়া দগ্ধ-গৃহে প্রবেশ করিল। অপরিচিত ব্যক্তির সে কণ্ঠ একজন চিনিল, চিনিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা করিতে বসিল।

পরক্ষণেই সেই অপরিচিত ব্যক্তি আবার বহির্গত হইল। এবার বৃদ্ধাকে আনিয়া, মৃত্তিকায় যত্নে রাখিয়া পুনর্ব্বার গৃহপ্রবেশ করিল। বৃদ্ধা রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার অল্প জ্ঞান আছে; তখন লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যে তোমাকে রক্ষা করিল, এ ব্যক্তি কে?" বৃদ্ধা কোন উত্তর করিতে পারিল না।

সে ব্যক্তি আবার এখনই আর একজনকে আনিবে, এই প্রত্যাশায় সকলে দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, আসিতেছে কি না দেখিবার নিমিত্ত সকলেই পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে আর স্থান নাই, তথাপি অগ্রে দাঁড়াইবে বলিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। এই সময়ে মাধবীর মাকে ক্রোড়ে লইয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি অতি বেগে আসিয়া লম্ফ দিল। কিন্তু সম্মুখে স্থান ছিল না, বেগ সংবরণ করিতে গিয়া দগ্ধদ্বারের উপর পড়িয়া গেল। চারিদিকে মহাকোলাহল হইয়া উঠিল।

অপরিচিত ব্যক্তি বিদ্যুদ্বেগে অগ্নি হইতে উঠিল। তখনও মাধবীর মা তাহার ক্রোড়ে। কিন্তু অগ্নিসংস্পর্শে যুবতীর বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উলঙ্গ না করিলে আর রক্ষা নাই দেখিয়া, অপরিচিত তাহার বস্ত্র ধরিল। যুবতী তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অমনি সেই জ্বলন্ত বস্ত্র আপনার অঙ্গে জড়াইয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলই ফুরাইয়া গেল। মাধবীর মা লজ্জার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, এবার লজ্জার ভয়ে দেহত্যাগ করিল। লোকেরা সকলে দাঁড়াইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ পারিল খড়, বাঁশ, বস্ত্র, মাধবীর মাকে দগ্ধ করিল। তার পর অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে শবের অঙ্গারমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। কেবল বামপদখানি অগ্নিতে পড়ে নাই, সুতরাং পুড়ে নাই; তাহা অলক্তসংযুক্ত এখনও রহিয়াছে; নখরে অগ্নিশিখা এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। অনেকে তাহা দেখিতে ও দেখাইতে লাগিল; কিন্তু একজন যুবা তাহা দেখিতে পারিল না; "আমি সপ্তকাণ্ডিক।

দিই” বলিয়া, কতকগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া সেই কোমল শবখানি আবরণ করিল। তাহার পর আবার কাষ্ঠ আনিয়া নিষ্ঠুর লোকেরা কঠোর দৃষ্টি হইতে শবের সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিল। আবার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, শবদাহ সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দূর হইতে জনার্দ্দন শর্ম্মা এই সকল দেখিল। ভাবিল, “আমার কার্য্য যখন সিদ্ধ হইল মাধবীও রক্ষা পায় নাই, কেন না, অপরিচিত ব্যক্তি কেবল বৃদ্ধাকে আর মাধবীর মাকে বহন করিয়া আনিয়াছে, মাধবীকে আনে নাই; সুতরাং সে অবশ্য মরিয়াছে।” মনে মনে এই আলোচনা করিয়া জনার্দ্দন উঠিয়া বসিল।

এই সময় পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ রামকমল বিদ্যানিধি কুলের মুখটি বলরাম ঠাকুরের সন্তান আসিয়া জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিল, “কর্দ্দমাক্ত ব্যক্তি যে তোমাদের উদ্ধার করিল, সে কে?”

জনার্দ্দন। সে আমার পরিচিত বটে, আত্মীয়ও বটে।

রামকমল। উহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

জনার্দ্দন। তা আমি বলিব না; বলিতে সে নিষেধ করে গেছে। পাছে আপনারা কেহ তাহাকে [illegible] পারেন, এই ভয়ে সে গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছিল।

রামকমল। আমরা তাকে চিনিলে দোষ কি?

জনার্দ্দন। দোষ একটু আছে; তা আপনার [illegible]র শুনে কাজ নাই; সে আমায় বিশেষ করে নিষেধ করে গেছে, আমি আর তাহা বলিব না।

রামকমল। ভাল, আমরা ত কেহ উহাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই।

জনার্দ্দন। গৃহদাহের পূর্ব্ব হইতেই ঐ ব্যক্তি [illegible]রে ছিল, নিত্যই থাকিত।

রামকমল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ বাটীর ত কেহ [illegible] এ বাটীতে পুরুষমাত্রেই নাই।

[illegible]নার্দ্দন। পুরুষ ছিল না, কিন্তু ইদানীং [illegible] আমরা সন্ন্যাসী, এরূপ কতই দেখি- [illegible] সে যাহা হউক, এখন আর জুটিবে না, [illegible] জুটিয়াছিল, এখন ত সে গেল।

[illegible]। তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিলাম না।

[illegible]র্দ্দন। সে সকল কথা থাকৃ; আপনার [illegible] কাজ নাই। যিনি মরিলেন, তিনি আপনাদের কিংবা আপনাদের গ্রামের কেহ ছিলেন না, সিংহশওগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। যিনি আমাদের উদ্ধার করিলেন, তিনিও সিংহশওগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। সেইখানেই আবার গেলেন। যাবার সময় আমায় টাকার কথা বলে গেলেন।

রামকমল। কোন্ টাকার কথা?

জনার্দ্দন। আপনি যে টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। এক একজন এক এক শত টাকার হিসাবে তিন শত টাকা তাহার পাওনা; তা আমি বলেছি যে, আমার হিসাবে ছেড়ে দেও, আমি বাহিরের লোক। দুই শত টাকা তাহার ন্যায্য পাওনা; তবু আমি আপনার হয়ে বলেছি যে, একজন ত মরে গেল। তা সে শুনিল না; সে বলে, আমি ত উদ্ধার করেছি; তার পর কে এখন জলে ডুবে মরিবে, কে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, তা আমার কি?”

রামকমল। তা, তারে আসিতে বলিবেন, দেখা যাবে।

জনার্দ্দন। আবার তাকে কেন? তবে আমি বলিলাম কি? সে যদি আপনাদের নিকট মুখ দেখাবে, তবে মুখে কাদা মাখ্‌বে কেন? এই সোজা কথা আপনি বুঝিতেছেন না?

রামকমল। বুঝেছি, কিন্তু যে ব্যক্তি এমন ধর্ম্মিষ্ঠ লোক, এমন বীর, সে আমাদের নিকট কেন মুখ দেখাবে না?

জনার্দ্দন। ঐ যে বলিলাম, যে যুবতী এইমাত্র ভস্ম হইল, উহার নিতান্ত অনুরোধে পড়ে এ গ্রাম পর্য্যন্ত সে এসেছিল, তাতেই ভদ্রলোকের ছেলে লজ্জায় মরে গেছে। কিন্তু সিংহশওগ্রামে যেখানে উভয়ের বাড়ী, সেখানে উহার কোন কলঙ্ক নাই; লোকে জানে, মাধবীর মা কুলত্যাগিনী হয়েছে, কিন্তু কার সঙ্গে, তা কেহ ঠিক জানে না।

রামকমল। এমন পাপিষ্ঠকে আমি কদাচ পারিতোষিক দিব না।

জনার্দ্দন। কেন দিবেন না? পাপিষ্ঠ হইলে টাকা দিবেন না, এমন কথা ছিল না। হলোই বা সে নিজে পাপিষ্ঠ, লম্পট লোকের কি দয়া থাকে না? না, স্নেহ থাকে না? লাম্পট্য-দোষে দয়ার কার্য্য কি কখন কলুষিত হয়? সে ব্যক্তি লম্পট বলিয়া কি আমাদের প্রাণরক্ষা হয় নাই? না আমাদের প্রাণের কোন কামবেশী হইয়াছে? ধর্ম্ম সতত পবিত্র; চণ্ডালে ধর্ম্ম করিয়াছে বলে, ধর্ম্ম কখন কি অপবিত্র হয়? আর এক বিশেষ কথা আছে, আপনি

দুই শত টাকা দিয়া এই ধর্ম্ম ক্রয় করিতেছেন, এ ধর্ম্ম ত সে অপাত্রে থাকিতেছে না—খরিদ করিলেই ধর্ম্ম আপনাতে আসিবে; খরিদ না করেন এ ধর্ম্ম তাহারই থাকিবে। দুই শত টাকায় প্রাণরক্ষা বড় সস্তা।

রামকল্প। কথা ঠিক বটে,তবে আর ভাবা চিত্ত কি? আইস, আমার সঙ্গে আইস; আমি বলেছি দিব, তার অন্যথা হইবে না। তবে কি জান, দুই শত টাকা অনেকগুলা টাকা; কিছু কম হইলে ভাল হয়।

জনার্দ্দন। তা আমি কি করিব; আমি ত লইতেছি না, তা হইলে আপনার অনুরোধ আমার রাখিতে হইত। এখন যদি আপনি সমুদায় পূরা রোক টাকা না দেন, আপনাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ, আপনি কেন অন্যের জন্য আপনার ধর্ম্মের ক্ষতি করেন? বিশেষতঃ এ ধর্ম্ম বড় সামান্য নহে, দুই হাজার টাকা ব্যয় করেও কেহ প্রাণরক্ষা করিতে পারে না; এ ঘটনা ত সর্ব্বদা ঘটে না, আপনার বড় ভাগ্য, তাই এই গৃহদাহ হইয়াছে; দেখুন দেখি, ধর্ম্মের কি অশ্চর্য্য খেলা—একজনের গৃহদাহ হইল, আপনার ধর্ম্মসঞ্চয় হইল!

রামকল্প। তবে আর কোন কথায় কাজ নাই, তুমি টাকা লইয়া যাও; কিন্তু একটা কথা আছে: যিনি মরিলেন, তিনি কে?

জনার্দ্দন। তিনি রামসেবক শর্ম্মার বিবাহিতা স্ত্রী—কুলটা; আর অধিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না।

এই বলিয়া টাকা লইয়া জনার্দ্দন চলিল। পথে আসিয়া একবার আন্তরিক হাসিয়া বলিল, "এ বুড়া বেটা ধর্ম্ম কিনিতে চায়! চা'ল কেনে, ডাল কেনে, কাজেই ধর্ম্মও কিনিবে; ধর্ম্ম চা'ল ডা'লের মধ্যেই বটে।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে পিতম পাগলা এক দীর্ঘিকার মৃত্তিকাস্তূপে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া রাজা মহেশচন্দ্রের শিবির দেখিতেছিল। এই সময় গুটীকতক হস্তী ও হস্তিনী স্নান উপলক্ষে দীর্ঘিকায় আনীত হইল। পিতম দেখিল যে, তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ হস্তীকে মাহুতেরা কতক জলে কতক স্থলে বসাইয়া তাহার গাত্র মর্দ্দন করিতে লাগিল; হস্তীটী শিশুর ন্যায় বসিয়া শুণ্ডক্রীড়া করিতে লাগিল; কখন ধীরে ধীরে জলস্থ ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি স্পর্শ করিতেছে, কখন স্থলজ তৃণ-পল্লব টানিয়া ছিঁড়িতেছে, কখন বা মাতৃহস্ত হইতে পলায়নোন্মুখ বালকের ন্যায় জল হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছে; মাহুতেরা গালি দিলে আবার স্থির হইয়া অর্দ্ধ জলে অর্দ্ধ স্থলে বসিতেছে। তখন স্থূলাঙ্গ শিশুর ন্যায় তাহার উদর দুই পার্শ্বে স্ফীত দেখাইতেছে। প্রকাণ্ড হস্তীতে শিশুর কোমলতা আশ্চর্য্য। আর কয়টী হস্তিনী কুলবধূর ন্যায় জলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল মধ্যে মধ্যে শুণ্ডাগ্র ঈষৎ তুলিয়া ফুৎকার করিয়া জল ছড়াইতেছে। পিতম উঠিয়া সেই দিকে গেল। প্রথম হস্তীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার অমলশ্বেত দীর্ঘদন্ত দেখিতে দেখিতে অস্পষ্টস্বরে তাহাকে ডাকিল, "বৃহদ্দন্তেশ্বর!" হস্তী মুখ তুলিল, ব্যস্তভাবে পিতমকে দেখিতে লাগিল। মাহুত বলিল, "ভাগো!" পিতম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ধীরে ধীরে আর একটু অগ্রসর হইল, তাহার পর আর একটু গেল, ক্রমে জলে গিয়া দাঁড়াইল। মাহুত নিষেধ করিতে করিতে পিতম হস্তীর শুণ্ড স্পর্শ করিল, স্পর্শমাত্রেই হস্তী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর কি বুঝিয়া দীর্ঘিকা কম্পিত করিয়া বৃংহতধ্বনি করিতে করিতে জল হইতে উঠিয়া পিতমকে ধরিল, অপর হস্তী ও হস্তিনীগণ ব্যস্ত হইয়া জল হইতে কূলে আসিয়া মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে পিতমকে ঘেরিল। তখন হস্তী হস্তিনী সকলে একত্রে আকাশ পূরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পিতমের দশা কি হইল, তাহা আর না দেখিয়া না বুঝিয়া, মাহুতেরা চীৎকার করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে ছুটিল। শিবিরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। "হস্তী একজন ভিক্ষুককে হত্যা করিয়াছে" এই জনরব সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। মহারাজ মহেশচন্দ্র শিবির হইতে স্বয়ং দীর্ঘিকার দিকে দৌড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক দৌড়িল। রাজা কিয়দ্দূর আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বিস্মিতনেত্রে হস্তীদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একজন মাহুত দূর হইতে বলিল, "আর যাওয়া বৃথা, শেষ হইয়া গিয়াছে।" রাজা সে কথা না শুনিয়া পশ্চাদ্দিকে মাথা ফিরাইয়া সকলকে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাহার পর একাকী

স্তীদিগের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন হস্তীরা কেহ পিতমের গাত্রে শুণ্ডাগ্র স্পর্শ করাইতেছে; কেহ সপত্র মৃণাল তুলিয়া তাহার অঙ্গে দিতেছে; কেহ কর্দম তুলিয়া তাহার অঙ্গে লেপন করিতেছে। প্রথম হস্তীটী পিতমকে শুণ্ডবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, পিতমকে দেখিতেছে,—পিতমের কপোলদেশে ধমনী উঠিয়াছে, চক্ষুর নিম্নে শিরা স্ফীত হইয়াছে; পিতম হস্তীর গণ্ডদেশে সাদরে হাত বুলাইতেছে। রাজা মহেশচন্দ্র আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন; হস্তীরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না; পিতমও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। পিতম হস্ত বাড়াইয়া হস্তীর গলদেশের এক স্থান স্পর্শ করিয়া বলিল, "বৃহদ্দন্তেশ্বর! এখন আমায় ছাড়িয়া দাও, তোমার রাজা দেখিতে পাইবেন।" বৃহদ্দন্তেশ্বর হুঙ্কার ছাড়িয়া পিতমের অঙ্গ হইতে বেষ্টিত শুণ্ড খুলিয়া লইল। রাজা মহেশচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি।" পিতম জিজ্ঞাসা করিল, "এ হস্তী বুঝি তোমার? হস্তীগুলি বেচিবে?" মহেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন, বলিলেন, "আসুন, আমরা এইখানে বসিয়া হস্তীর মূল্য অবধারণ করি।" পিতম বলিল, "আজ নহে, এক্ষণে আমি ভিক্ষায় যাই।" রাজা মহেশচন্দ্র কাতর-নয়নে পিতমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পিতম গ্রামাভিমুখে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমত সময় হস্তীরা আবার আসিয়া তাহাকে ঘেরিল।

বৃহদ্দন্তেশ্বর পিতমকে আবার হঠাৎ শুণ্ডবেষ্টিত করিয়া তুলিল, সযত্নে ধীরে ধীরে আপনার বাম দন্তে তাহাকে বসাইয়া আপনার শুণ্ড "রামশিঙ্গার" ন্যায় বাঁকাইয়া ঊর্দ্ধে তুলিল। পিতম তাহা দক্ষিণ করের আলিঙ্গন করিয়া তাহার উপর মাথা হেলাইয়া বসিল। তখন হস্তীরা একত্রে মহাসুখে বৃংহিতনাদ করিয়া আকাশ পরিপূর্ণ করিল, শব্দে সকলে শিহরিয়া উঠিল। সকলে দেখিল, পিতম হস্তিদন্তে বসিয়া দুলিতে দুলিতে গমন করিতেছে, রাজা মহেশচন্দ্র হস্তীর দন্তাগ্র ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন।

এই সময় একটী যুবা ব্রহ্মচারী একাকী দাঁড়াইয়া একটী বৃক্ষে মাথা হেলাইয়া চক্ষের জল মুছিতে-ছিল। রাজা মহেশচন্দ্র তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য দেখিলাম।" যুবা কাঁদিয়া ফেলিল, বস্ত্রাগ্রে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "এ দাসীর এখন কার্য্য ফুরাইল, এ অনাথার অদৃষ্টে এত সুখ ছিল!"

মহেশচন্দ্র। মাতঙ্গিনি! তোমার ঋণ আমি আর পরিশোধ করিতে পারিব না।

এই বলিয়া রাজা মুখ ফিরাইয়া হস্তীর সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে রাজা মহেশচন্দ্র একাকী অন্যমনস্কে আছেন, এমত সময় পিতমের বংশীরব তাঁহার কর্ণে গেল। রাজা একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বংশী বাজাইতেছে?" ভৃত্য বলিল, "সেই ভিক্ষুক।" রাজা দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিলেন ভৃত্য চলিয়া গেল। মহেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, যেন পিতম সুখসাগর মন্থন করিতেছে, কতই রত্ন তুলিয়া মালা গাঁথিতেছে, আদরে কাহারে পরাইতেছে ও আপনি দেখিতেছে; দেখিয়া আহ্লাদে কাঁদিতেছে। রাজা আবার ভৃত্যকে ডাকিলেন, বলিলেন, "ভিক্ষুক বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ তাহাকে বারণ করে নাই?"

ভৃত্য। বারণ করিতে গিয়াছিল, বৃদ্ধ রাঘব শর্ম্মা বারণ করিতে দেন নাই।

রাজা। রাঘবকে ডাক।

পরক্ষণেই রাঘব আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাঁশী বাজাইতেছে?"

রাঘব। যে ভিক্ষুককে মহারাজ প্রাতে শিবিরে আনিয়াছেন।

রাজা। তুমি এখনও তাঁহাকে ভিক্ষুক বল?

রাঘব। তাঁহার স্কন্ধে এখনও ঝুলি ঝুলিতেছে, তাহাতেই ভিক্ষুক বলি।

রাজা। যদি ঝুলি না থাকিত, তবে কি বলিতে?

রাঘব। পাগল বলিতাম, লোকে তাঁকে পিতম পাগল বলে।

রাজা। তুমি তাঁর আর কোন নাম জান না?

রাঘব। জানি,—বোধ হয় মহারাজ নিজেও তাহা জানেন।

রাজা। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না—আজ জানিয়াছি। বিজয়রাজের অনুসন্ধানে কত বৎসর ধরিয়া কত স্থানে লোক পাঠাইয়াছি, কেহ কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

রাঘব। এ অধীনের প্রতি কখন ও সে অনুমতি হয় নাই; হইলে বিজয়রাজের সংবাদ অনেক পূর্ব্বে পাইতেন।

রাজা। তুমি কি তবে এ সংবাদ পূর্ব্ব হইতে রাখিতে?

রাঘব। কেতকটা রাখিতাম।

রাজা। যখন আমি এখানে সেখানে এই জন্য লোক পাঠাইতাম, তখন তুমি এ সংবাদ আমায় দেও নাই কেন?

রাঘব। অনেক কারণ ছিল; তন্মধ্যে প্রধান কারণ—বিজয়রাজকে তখন দেখিলে মহারাজ শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না, তাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

রাজা। এখন ত সে অবস্থা নাই বলিয়া বোধ হয়।

রাঘব। এখন তিনি নামে মাত্র পিতম পাগ্‌লা, কিন্তু কার্য্যে ঠিক সেই যুবা বয়সের বিজয়রাজ; গত রাত্রে তাঁর বলবীর্য্য দেখিয়া আমি অবাক্ হয়েছিলাম;

রাজা। তিনিই কি তবে স্ত্রীলোকগুলিকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করেছিলেন?

রাঘব। তিনিই, নতুবা আর কার সাধ্য?

রাজা। তুমি কি আজ গোপনে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেছিলে?

রাঘব। করি নাই, কিন্তু যদি অনুমতি হয়, তবে গিয়া একবার সাক্ষাৎ করি।

রাজা। আমারও ইচ্ছা, আমি গিয়া একবার সাক্ষাৎ করি।

রাঘব। কিন্তু মহারাজ যে তাঁকে চিনিয়াছেন, এ কথা কোনরূপে প্রকাশ না হ'লে ভাল হয়।

রাজা। কেন?

রাঘব। এখন পরিচয় তাঁর পক্ষে সুখের হবে না, তিনি স্ত্রীর অনুসন্ধান পেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে ভাল হয়।

রাজা। সে অনুসন্ধান করিবার ভার আমি ত তোমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছি; কিন্তু, কই, তুমি ত এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারিলে না?

রাঘব। আমি গত কল্য এ ভার পাইয়াছি। শীঘ্রই আমি সে সন্ধান আনিয়া দিব।

রাজা মহেশচন্দ্র উঠিলেন, ধীরে ধীরে হাতীশালার নিকটস্থ এক স্থানে গিয়া অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, বৃহদ্দন্তেশ্বরের নূতন সজ্জা হইয়াছে; মাথায় খর্জ্জুর-পল্লব-রচিত এক রাজমুকুট, তাহাতে বনপুষ্প বনলতা নানা ভঙ্গীতে গ্রথিত, গলায় ধ্যন-ফুলের লম্বিত মালা। তাহার শুণ্ডাকৃতি শুণ্ড পিতম বামকরে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া একটী হস্তি-শাবককে ডাকিতেছে; শাবকটী মাতৃক্রোড়ের নিম্নে দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে; কোমল ক্ষুদ্র শুণ্ডটী পিতমের দিকে বাড়াইয়া আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শুণ্ডাগ্র বিস্ফারিত করিতেছে, একবার একবার দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছে, আবার পিছাইতেছে। পিতম নানাস্বরে তাহাকে অভয় দিতেছে। শেষ করি-শাবক ক্রীড়ালুব্ধ হইয়া পিতমের সম্মুখে আসিয়া মুখ তুলিয়া শুণ্ডাগ্র বিস্ফারিত করিতে লাগিল; সাহস করিয়া একবার পিতমের অঙ্গ স্পর্শ করিল, স্পর্শমাত্রেই পলাইয়া আবার মাতৃ-উদরের নিম্নে গিয়া দাঁড়াইল; তথা হইতে নির্ভয়ে পিতমকে দেখিতে লাগিল। এমত সময় বৃদ্ধ রাঘব শর্ম্মা আসিয়া পিতমের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পিতম বামকরে বৃহদ্দন্তেশ্বরের শুণ্ড আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, রাঘবকে দেখিয়া হস্তি-শুণ্ডমূলে মাথা হেলাইয়া অতি বিমর্ষভাবে রাঘবের প্রতি চাহিয়া রহিল, যেন কি বলিবে, অথচ বলিতে পারিল না। ক্ষণেক বিলম্বে মৃত্তিকা হইতে ঝুলি স্কন্ধে তুলিয়া গমনোন্মুখ হইল। এই সময় রাজা মহেশচন্দ্র অগ্রসর হইতে উদ্যম করায় রাঘব ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। পিতম পাগ্‌লা চলিয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতম কতক দূর গিয়া এক দীর্ঘিকার সোপানে বসিল; উচ্চ বৃক্ষের পল্লবে সূর্য্যকিরণ রহিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যায় নাই। এখন পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে, কেহ জলে সাঁতরাইতেছে, কেহ উড়িতেছে, কেহ পঞ্চমে চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইতেছে। পিতমের মুখে যেন একটু আহ্লাদের ছায়া পড়িল; চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া পাখীর খেলা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল; একটী বকের প্রতি কাতর-নয়নে চাহিয়া রহিল। বকটী পীড়িত হইয়াছে, বৃক্ষশাখায় বসিতে পারে নাই, বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ

দাঁড়াইতে পারিতেছে না, গলায় তার আর বহন করিতে পারিতেছে না,

ক্রমে নামিতেছে, যারও নামিতেছে, শেষ তাহার ওষ্ঠাগ্র মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। অমনি বকের চেতনা হইল, চক্ষু চাহিল, গলা তুলিল, কর্দমাক্ত চঞ্চু উর্দ্ধে উঠাইল, উভয় পক্ষ ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহা পৃষ্ঠে তুলিল, কিন্তু ঠোঁটের কাদা আর ঝাড়িতে পারিল না। চক্ষু মুদিল, আবার ডানা ঝুলিতে লাগিল, আবার মাথা নামিতে লাগিল, আবার ওষ্ঠ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল, এইরূপ পিতম দুই তিনবার দেখিয়া অগ্রসর হইল, বক পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পা নাড়িতে পড়িয়া গেল। তাহার নিমিত্ত ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার জন্য পিতম তখন জলে নামিল, অন্যমনস্কে মৎস্য খুঁজিতেছে, এমত সময় একটা শব্দ হইল; পিতম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, একটা শৃগাল আসিয়া বককে মুখে করিয়া দৌড়াইতেছে। পিতম জলে দাঁড়াইয়া দেখিল, আর কিছু বলিল না; ধীরে ধীরে কূলে আসিয়া আপনার অঙ্গের জল মুছিল; তাহার পর গম্ভীরভাবে প্রান্তরাভিমুখে চলিল।

পিতম প্রান্তর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, দূরে একটী গ্রাম-পার্শ্বে শবদাহ হইতেছে, কি ভাবিয়া পিতম সেই দিকে চলিল। কতক দূর গেলে একজন বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পিতম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে মরিয়াছে? কার শবদাহ হইতেছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "কে জানে বাছা, বুঝি কোন অনাথা মরেছে, যার ছেলে পিলে আছে, যার দশ জন দেখ্‌বার আছে, সে কি মরে? ব্যাধি বল, পত্তি বল, তার কিসের ভাবনা, যত দুঃখ আমার মত পোড়া-কপালীদের। আমার আপনার দুঃখ কে ভাবে, তার ঠিকানা নাই, আবার সে দিন একজন আমার মত পোড়া-কপালী আমার ঘরে এসে পড়্‌লো। এলো তা আর কি করি, বলি বাছা, দুদিন থেকে একটু ভাল হয়ে আবার যেখানে যাবা, সেখানে যাস্‌। তা ভাল হবে কেন? কে হাত ধরে দেখ্‌বে? ক্রমেই তার রোগ বাড়িল, মরিতে বসেছে। তা বলি, এখানে কোথাকার রাজা এসেছে, একবার তাঁর কাছে যাই; তাঁর সঙ্গে কবিরাজ আছে, বলি একবার ডেকে আনি। তা পোড়া-কপালীর এমনি -কপাল, আমি সেখানে যেতে পেলেম না, -পুরেরা মারিতে এলো। তাই বাছা, ফিরে যাচ্ছি বলি দেখিগে ছুঁড়ী বেঁচে আছে কি মরেছে।"

পিতম। ছুঁড়ী—যার পীড়ার কথা বলিতেছ, তাঁর কি অল্প বয়স? আমি মনে করেছিলেম, তাঁর বয়স অধিক হয়েছে।

বৃদ্ধা। অনেক আর কি, বাপ! এই, দশ গণ্ডা কি এগারো গণ্ডা হবে, এ আবার কিসের বয়স?

পিতম। তাঁর বর্ণ কি বড় গৌর? তিনি কি বড় সুন্দরী?

বৃদ্ধা। হাঁ বাছা! বড় সুন্দরী।

পিতম। তাঁর জোড়া ভুরু?

বৃদ্ধা। হাঁ বাছা, তাঁর ভুরু জোড়া, তবে যে দেখিতেছি, তুমি তাঁরে চেন। তা বাছা, যদি তাঁর আপনার জনকে সংবাদ দেও ত আমি বাঁচি। আমি কাঙ্গাল, আমার ঘরে মলে কে তাঁর গতি করিবে?

পিতম। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি কবিরাজ ডেকে আনি; দেখ, আমার বিলম্ব হলে চলে যাইও না।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, বাছা! যাও, তুমি চিরজীবী হও, এ উপকার আমার কেউ করে নাই। আমার এমন স্বভাব নয়, একবার উপকার করিলে আমি এ জন্মেও তা ভুলি না।

পিতম সত্বরে ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া আনিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনী স্ত্রীবেশে আসিল। বৃদ্ধা অতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে মাতঙ্গিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিল। পিতম কিম্বা ব্রহ্মচারী সে কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া পরস্পর নিঃস্তব্ধে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শেষ সন্ধ্যার পর সকলে বৃদ্ধার বাটীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতম এবং ব্রহ্মচারী উভয়ে নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। বৃদ্ধা গৃহপ্রবেশ করিয়া দীপ জ্বালিতে বসিল, একবার অন্ধকার কুটীরের এক পার্শ্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ গা?" কেহ কোন উত্তর দিল না। মাতঙ্গিনী কোন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল না। কিন্তু কিছু না বলিয়া দীপ জ্বালার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শেষ দীপ জ্বালা হইল। তখন মাতঙ্গিনী দেখিল, কুটীরপ্রান্তে ছিন্নশয্যায় একজন কে পড়িয়া রহিয়াছে, শয্যার ক্ষুদ্রতা হেতু তাহার আলুলায়িত কেশরাশি ধূলায় পড়িয়া আছে; সেই কেশের উপর দুই চারিটী তেলপায়ী বিচরণ করিতেছে। রুগ্নার মুখ ছিন্নবস্ত্রে আবৃত রহিয়াছে। মাতঙ্গিনী বৃদ্ধার হস্ত হইতে দীপ লইল, ধীরে ধীরে মুখের বস্ত্র সরাইল, চিনিতে আর বাকী রহিল না, "এ অনাথিনী-সাজ

তোরে কে সাজাইল, মা।" বলিয়া মাতঙ্গিনী পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার হস্তের প্রদীপ নিবিয়া গেল ; সকল অন্ধকার হইল। মাতঙ্গিনী বলিল, "হয় ত সকল ফুরাইয়াছে।" বৃদ্ধা বলিল, "ভয় নাই, ও ঘুম। অমন হয়, আমি ঘুমালে দশ ডাকে উত্তর দিই না, কিছু ভয় নাই।" প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া মাতঙ্গিনী বাহিরে গেল, ব্রহ্মচারীর সহিত চুপি চুপি দুই একটী কথা কহিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রোগীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। দীপালোকে ব্রহ্মচারী নিরীক্ষণ করিয়া কিছুই বলিলেন না। রোগীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিলেন, দণ্ডেক পরে পিতমের নিকট গিয়া বসিলেন এইরূপে ব্রহ্মচারী কখন রোগীর নিকট, কখন বৃক্ষতলে থাকিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মাতঙ্গিনী একাগ্রচিত্তে রোগীর মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিলেন পিতম একবার আসিয়া রোগীকে দেখিল না কি রোগ, বা কাহার রোগ, তাহা একবার ব্রহ্মচারীকে কি মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল না। অথচ বৃক্ষমূলে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পর দিবস দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নাবতী একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন, একবার ঊর্দ্ধে চালের দিকে, একবার সম্মুখস্থ প্রাচীরের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। পরে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে, আবার একবার চক্ষু চাহিলেন, আবার চারিদিক্ চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মাতঙ্গিনার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিয়ৎক্ষণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, স্মরণ করিবার চেষ্টা দেখিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "আমি যে তোমার মাতু।" জ্যোৎস্নাবতী তখন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায়? এ ঘর ত আমি কখন দেখি নাই—আমি এখানে কেন? আমার আর সকলে কোথায়?" মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "মনে করেছিলাম যে, এখন সে সকল কথা তুলিতে দিব না, কিন্তু আর উপায় নাই, এখন তুমি নিজে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে গেলে পরিশ্রম হবে ; স্মরণ না হইলে যন্ত্রণা বাড়িবে ; অতএব সকল ঘটনা মনে করাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতী ক্ষণেক চুপ করিয়া শুনিলেন, পরে বলিলেন, "আমার গা নাড়া দে দেখি, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাবে এখন" মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "মা! তোমার এ ঘুম নহে তুমি জাগিয়া আছ।" জ্যোৎস্নাবতী উত্তর করিলেন "আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না. আমার ঠিক স্বপ্ন বোধ হইতেছে, আমি কাল সকালে নিদ্রা-ভঙ্গে সকলের নিকট এই সকল কথার পরিচয় দিব।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই তিন দিবসের মধ্যে জ্যোৎস্নাবতী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া পূর্ব্বমত সদানন্দচিত্তে মাতঙ্গিনীর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। একদিন অপরাহ্নে মাতঙ্গিনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, এখন আমি কোথা যাই? এখানে আর কয় দিন বা থাকিব? তার পর আমার স্থান কোথা?"

মাতঙ্গিনী। স্থান অনেক আছে, যেতে পারিলেই হয়। আর দুই এক দিন এখানে থেকে একটু বল পেলে যাওয়া যাবে।

জ্যোৎ। আমি আর সিংহশত গ্রামে যাব না।

মাত। আমিও যাইতে বলি না।

তাহার পর অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ থাকিলেন। শেষ জ্যোৎস্নাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতি! তুই এখানে আমার সন্ধান কিরূপে পাইলি, এ কথা অনেক পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, তুই সকল বিবরণ বলিবি না ভাবিয়া আমি তখন জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন বল্ দেখি শুনি।"

মাতঙ্গিনী সকল কথা বলিতে লাগিল। প্রথমে তক্ষপুরে তাহার যাত্রার কথা বলিল। তাহার পর রাজা মহেশচন্দ্রের সহিত যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা বিবৃত করিল। যখন মাতঙ্গিনী বলিল যে, রাজা মহেশচন্দ্র বলেছিলেন, "তুমি গিয়া মাকে বুঝাইয়া বল যে, তাঁহার রাজ্যে তিনি আসুন,এ রাজ্য তাঁহার, ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই, আমি ইহার কিছু ভোগ করি না, অপব্যয় করি না। তাঁহার কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি।"—তখন জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষে জল আসিল,তিনি মহেশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি আর রাজ্য লইয়া কি করিব? আমি এখন ভিখারিণী, চিরকাল ভিখারিণীই থাকিব। তিনি আমার দেবর, এখন তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে রাজ্যভোগ করুন, এই আমার আশীর্ব্বাদ। আমি এখানে পীড়িত হয়ে পড়ে আছি, এ সংবাদ তোরে কে দিলে?"

মাতঙ্গিনী ইতস্ততঃ করিয়া পিতম পাগ্‌লার নাম করিল। এই নাম শুনিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষে আবার জল আসিল, আসিয়াই তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া

গেল। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "পিতম পাগ্‌লা কে, মা? তুমি তারে চেন বলিয়া বোধ হয়, সেও যেন তোমায় চেনে, তুমি সিংহশত গ্রাম হইতে চলিয়া আসিলে, পিতমও চলিয়া আসিল, তুমিও যেখানে, পিতমও সেইখানে।"

আবার জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, আর বাধা মানিল না, ঝর ঝর করিয়া কতকগুলি মুক্তা বর্ষণ করিল। আরও যেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "পিতম কে বল, তা না হলে আমি এখনই গিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসা করিব।"

জ্যোৎ। তিনি কোথায়? তিনি কি এই গ্রামেই আছেন?

মাত। তিনি এই বাড়ীর সম্মুখে গাছের তলায় দিবারাত্রি পড়েছিলেন। গেল কাল উঠে গেছেন, বোধ হয়, তিনি এই গাঁয়েই আছেন, আমি এখনই তাঁরে খুঁজিয়া আনিতে পারি। তুমি বল, তিনি কে?

জ্যোৎ। তাঁরে দেখ্‌তে আমার বড় সাধ হয়।

মাত। তুমি বল, কে তিনি?

জ্যোৎ। আমি কে বলিতে পারি না, আমার সন্দেহ হয়, কিন্তু মুখে আনিতে সাহস হয় না।

মাত। কেনই বা সাহস হয় না? তুমি বল, তাঁরে ডেকে আনি, তিনি তোমার বিজয়রাজ, আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমার ঐ বৃহদন্তেশ্বর নামে হাতীও তাঁরে চিনিয়াছিল।

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী সে পরিচয় দিতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শেষ তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন, "মাতু, আমার, আমায় একবার নিয়া চল, আমি তাঁরে একবার দেখিব, কিছু বলিব না, তাঁর সম্মুখেও যাইব না। এত দুঃখের পর তাঁর শরীর কেমন আছে, আমি একবার কাছে গিয়া দেখিব।"

মাত। তোমায় যেতে হবে না; আমি তাঁকে ডেকে আনি, তোমার কথা কিছু তাঁকে বলিব না, যা বলিতে হয়, তুমি নিজে বলিবে।

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী উঠিয়া গেল; জ্যোৎস্নাবতী নিষেধ করিলেন, পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন, মাতঙ্গিনী ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না, বেগে চলিয়া গেল। তখন জ্যোৎস্নাবতী অনুতাপ করিতে লাগিলেন, "কেন পেছু হইতে ডাকিলাম, হয় ত মাতী তাঁর দেখা পাবে না।"

অন্যমনস্কে থাকিয়া জ্যোৎস্নাবতী হঠাৎ আপনার ছিন্ন বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যতটুকু পারিলেন, যত্নে তাহা অঙ্গে বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া থাকিলেন। বিধবার বেশ ঘুচাইতে পারিলেন না বলিয়া চক্ষের জল মুছিলেন। অনেক বিলম্বে পিতম আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া জ্যোৎস্নাবতী একটু অন্তরালে সরিয়া গেলেন মাতঙ্গিনী পিতমকে অন্দরে আসিতে আহ্বান করিল, পিতম মাথা নাড়িল। মাতঙ্গিনী বলিল, "তুমি আজ আমাদের অতিথি, তুমি অন্দরে আসিয়া আহার করিবে।" পিতম জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যাঁর পীড়া হয়েছিল, তিনি কেমন আছেন?"

মাতঙ্গিনী। তুমি নিজে এসে দেখ—কেমন আছেন।

পিতম পশ্চাৎ ফিরিল, পশ্চাৎ হইতে এই সময় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হইল। পিতম আবার ফিরিল, দেখিল, এক অবগুণ্ঠনবতী কষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিতেছে। পিতম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" "দাসীকে চিনিতে পারিলে না?" বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী পিতমের পদতলে আছাড়িয়া পড়িল। পিতম কম্পিতস্বরে ডাকিল, "জ্যোৎস্নাবতী!"

জ্যোৎস্নাবতী মৃত্তিকায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতম বলিল, "আজও কি চক্ষের জল ফুরায় নাই?"

জ্যোৎস্নাবতী উঠিয়া মুখ মুছিলেন, নতমুখে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন পিতম যত্নে দুই হস্তে জ্যোৎস্নাবতীর দুই গাল আপনার মুখের নীচে ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, পিতমের চক্ষের জল জ্যোৎস্নাবতীর কপালে গালে বর্ষিতে লাগিল। কেহ কোন কথা কহে না। শেষ জ্যোৎস্নাবতী বলিলেন, "আর আমায় ত্যাগ করিবে না, বল?"

পিতম। আমি ভিক্ষুক, তোমায় কোথায় লয়ে যাব?

জ্যোৎ। আমিও ভিখারিণী, তোমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াব। তুমি যা পাবে, আমি গাছতলায় বসে পাক করিব।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছু দিবস পরে রাজা মহেশচন্দ্র রাঘবশর্ম্মা-সমভিব্যাহারে বৃদ্ধার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে পিতম পাগ্‌লা জ্যোৎস্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গমন

করিয়াছিল, সুতরাং তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইল না। মহেশচন্দ্র বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু পিতম কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। অগত্যা মহেশচন্দ্র শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া রাঘবের প্রতি নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। রাঘব তাহাতে দুঃখিত হইলেন না, মহেশচন্দ্রের নিকট নিজের ত্রুটিও স্বীকার করিলেন না, বরং মনে মনে একটু হাসিলেন।

অপরাহ্নে মহেশচন্দ্র একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলাম না, তোমরা সকলে আগামী পরশ্ব প্রাতে ফিরিয়া যাইবে, আমার জন্য অপেক্ষা করিও না, কিংবা আমার কোন অনুসন্ধান করিও না।"

সেই দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় রাজা মহেশচন্দ্র ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আর এক ব্যক্তি ছদ্মবেশে তাঁহার অনুসরণ করিল। কিন্তু রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না। রাজা কতক দূর গিয়া এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায়?" মহেশচন্দ্র কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ চলিলেন; পশ্চাৎ হইতে আবার প্রশ্ন হইল। এবার মহেশচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে হেতের আছে? কি হেতের আছে দেখি?" মহেশচন্দ্র সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিলেন। কিছু দূর গেলে বুঝিতে পারিলেন, কে একজন তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে। তিনি দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসিতেছ?" আগন্তুক নিকটে আসিয়া উত্তর করিল, "আমি রাঘব শর্ম্মা।"

মহেশ। এত রাত্রে এ পথে কেন?

রাঘব। পিতম পাগ্‌লার সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

মহেশ। তিনি কোথা?

রাঘব। যাইট পইঠার ঘাটে বাস করিতেছেন।

মহেশ। সে স্থান এখান হইতে কতদূর হইবে?

রাঘব। প্রায় বিশ ক্রোশ হইবে।

মহেশ। কিরূপে যাইতে হইবে?

রাঘব। নৌকাপথে যাইতে হইবে, প্রাতে নবতশরে নৌকা প্রস্তুত থাকিবে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।

পিতম পাগল যে ঘাটে বাস করিতেছিল, তাহা রাজা মহেশচন্দ্রের জনক—যিনি দেওয়ান ছিলেন, তিনি—বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করেন; তাদৃশ সুন্দর ঘাট পশ্চিমরাজ্যেও কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। রক্ত, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের নানা আকৃতির ইষ্টক এরূপ কৌশলে প্রোথিত হইয়াছিল যে, দূর হইতে দেখিলে ঘাটটিকে একখানি নূতন গালিচা বলিয়া ভ্রম হইত, নিকট হইতে দেখিলে একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইত, জল হইতে চাঁদনী পর্য্যন্ত চিত্রশূন্য স্থান একেবারে ছিল না; চিত্রের মধ্যে এখানে সপুষ্প বনলতা ঝুলিতেছে, ওখানে মত্ত হস্তী বনলতা ছিঁড়িতেছে, এখানে প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, ওখানে ক্ষুদ্র কলি কুণ্ঠিতভাবে হংসপার্শ্বে লুকাইতেছে; আবার এখানে শতরঞ্জীর ছক, ওখানে পাশার ঘর। সোপানের তিন চারিটী ধাপ অন্তর দুইপার্শ্বে প্রতিধাপে প্রস্তর-নির্ম্মিত এক একটী প্রমাণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে—এখানে কৃষ্ণক্রোড়ে যশোদা দাঁড়াইয়া চাঁদ ডাকিতেছেন, ওখানে চতুর্ব্বর্ষীয় দুরন্ত কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া পলাইতেছে—যেন কাহার দুগ্ধভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া তাড়িত হইয়াছে। এখানে কিশোর-বয়স্কা রাধিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতে করিতে প্রৌঢ়া ললিতা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে, রাধা লজ্জায় মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ওখানে যুবতী রাধা ললিতাকে লইয়া মালা গাঁথিতেছেন, আর হাসিয়া হাসিয়া কতই পরিচয় দিতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি মূর্ত্তি দুই পার্শ্বে সজ্জিত রহিয়াছে। ঘাটের উপর চাঁদনী; চাঁদনীর উভয় পার্শ্বে দ্বাদশ মন্দির—তৎপশ্চাৎ এখানে সেখানে করবীরের ঝাড়, তৎপরে একটী পরিষ্কার ঝর্‌-ঝরে ক্ষুদ্র প্রান্তর। নিকটে কোন গ্রাম নাই, মহেশচন্দ্রের জনক নূতন গ্রাম বসাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অপেক্ষা না করিয়া তিনি কাশীযাত্রা করেন। সেই অবধি আর গৃহে আসেন নাই।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দিবস প্রাতে মহেশচন্দ্র এবং রাঘব শর্ম্মা একত্রে নৌকা আরোহণে যাইতেছিলেন, সেই দিবস অপরাহ্নে যাইট পইঠার ক্ষুদ্র প্রান্তরে একটী শিশু আর একটী যুবতী হাসি তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। শিশুটী হাঁটিতে পারে, কিন্তু ছুটিতে পারে

না ; ছুটিতে পাড়িয়া যাইতেছিল, আবার উঠিয়া "ধ ধ" বলিয়া যুবতীর অঞ্চল ধরিতে যাইতেছিল, আর হাসিতেছিল। তাহাদের হাসির লহরী নদীকূল হইতে শুনা যাইতেছিল ; তথায় সেই বিচিত্র নানা-বর্ণে রঞ্জিত ঘাটে বসিয়া পিতম আর জ্যোৎস্নাবতী হাসি শুনিতেছিলেন আর আপনা-আপনি কথাবার্তা কহিতেছিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী মাতুর সঙ্গে মাধবীলতার বড় ভাব হয়েছে।

পিতম। দুই জনারই ভাবের বয়স।

জ্যোৎস্নাবতী। মানুষের কোন্ বয়সটা ভাবের নয় ?

পিতম। আমাদের বয়স—এই বুড়া বয়স ভাবের নয়।

জ্যোৎস্নাবতী। (হাসিয়া) মিথ্যা কথা।

পিতম। কেন ? তুমি মাতুকে ভালবাস বলে তাই বলিতেছ মিছে কথা। আমি ত বুড়ো,কই আমি ত কাহাকেও ভালবাসি না।

জ্যোৎস্নাবতী। ভালবাস বই কি।

পিতম। কাহাকে ভালবাসি ?

জ্যোৎস্নাবতী। তুমিই জান। তোমার "নিরেট" আছে, তোমার ঝুলি আছে, তোমার কত কি

পিতম। আমার ঝুলির কথা সত্য ; সকলের চেয়ে আমি এই ঝুলিটীকে ভালবাসি ; এ কত-আমার সঙ্গে আছে, এক মুহূর্তের জন্য আমার ছাড়ে নাই। ছিঁড়েছি, তবু ছাড়ে নাই। এখনও রাত্রিকালে ইহাকে মাথায় ক'রে নিদ্রা যাই, কাঁধে ক'রে বেড়াই। আগে যেন বোধ হত ঝুলি আমার সঙ্গে কথা কহিত, আমায় কতই বুঝাইত, বলিত—

জ্যোৎস্না। বুঝি বলিত ;—দেখা দিও না, আমার ভাগ্য ফিরাইও না, অভাগা—

ম। তা নয়, ঝুলি আমায় বলিত—আর কোথা যাইও না, মরিতে হয়, এইখানেই মরিও।

কথায় জ্যোৎস্নাবতীর মনে হইল, পিতম চিরকাল সিংহলের গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন, আর কোথাও যান নাই। তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি মাথা অবনত করিয়া থাকিলেন, পিতম কত কি বলিতে লাগিল,জ্যোৎস্নাবতী তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কেবল সেই কথা লাগিলেন,"মরিতে হয়—এইখানেই মরিও"। ক্রমে দুই চারি বিন্দু চক্ষুজল চিত্রিত ইষ্টকে পড়িল। পিতম তাহা দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আবার কিসে কাঁদালাম, এই কয় দিনে যে কত কাঁদিলে, তবু কি জল শুকায় না ? আমায় দেখিলে কাঁদ, আমার সহিত কথা কহিতে কাঁদ, আমার সেবা করিতে কাঁদ। কেন ? এত দুঃখ পাও কেন ?"

জ্যোৎস্নাবতী। এ আমার দুঃখ নয় ; এই আমার সুখ। আমার ভাগ্যে এত সুখ ছিল।

পিতম। গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে এত সুখ ?

এই সময় মাতঙ্গিনী মাধবীকে ক্রোড়ে লইয়া ব্যস্ত হইয়া আসিল। পিতমকে বলিল, "একবার শীঘ্র আসুন, মন্দিরে যিনি আছেন, তিনি কেমন করিতেছেন।"

মন্দিরে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিত, অতি শীর্ণকায়, চলৎশক্তি প্রায় রহিত। এই স্থানে আসিয়া অবধি জ্যোৎস্নাবতী তাহার সেবা করিতেন। পিতম সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধারণ করিত। বৃদ্ধ বলিত, "শেষ দশায় আমি বড় সুখী হইলাম, জন্মান্তরে তোমরা আমার কন্যা-পুত্র ছিলে, এ জন্মে আমার কেহ নাই—আছে, আমি বড় পাপী, তাই বঞ্চিত।"

জ্যোৎস্নাবতীকে বৃদ্ধ মা বলিয়া ডাকিত,পিতমকে বাবা বলিত। উভয়েই বৃদ্ধকে পিতার ন্যায় যত্ন করিতেন। উভয়েই জানিতেন,যত্ন আর অধিকদিন করিতে হইবে না। বৃদ্ধের শেষ হইয়া আসিয়াছে। যখন মাতঙ্গিনী মাধবীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, তখন হঠাৎ মন্দির হইতে একটী শব্দ তাহার কর্ণে যায়। তথায় গিয়া দেখে, বৃদ্ধ শয্যা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, কি বলিতেছে, বুঝা যাইতেছে না।

পিতম তথায় যাইয়াই অবস্থা বুঝিল। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ক্রোড়ে লইয়া ঘাটে ছুটিয়া আসিল, একস্থানে শয়ন করাইয়া মুখে জল সেচন করিতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতী অঞ্চল দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক বিলম্বে বৃদ্ধের কিঞ্চিৎ চেতনা হইল, পিতমের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ;—শেষে বলিল, "মা এ সময় কি আমায় ত্যাগ করে গেলেন ?" "না, এই যে আমি" বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ চেষ্টা করিতে লাগি-

লেন, জ্যোৎস্নাবতী মস্তক নত করিলেন। বৃদ্ধের ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, চুপি চুপি কত কি বলিতে লাগিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ ক্রমে ক্রমে চক্ষু বুজিলেন। এই সময় একখানি নৌকা ঘাটে আসিল। অনেক পরে আবার বৃদ্ধ হঠাৎ চাহিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন, শেষে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বলিতে লাগিলেন, "আমি তাঁকে এ দেশ ও দেশ কত খুঁজিলাম, খুঁজিব বলে ধর্ম্মকর্ম্ম সকল ত্যাগ ক'রে আবার এ দেশে আসিলাম, কিন্তু আর দেখা পেলেম না।"

পিতম। কার দেখা পেলেন না, কাকে খুঁজেছিলেন ?

বৃদ্ধ। তাঁকে।

পিতম। কে তিনি? তাঁর নাম কি?

বৃদ্ধ। যদি মরিবার সময় একবার তাঁকে দেখিতে পেতাম। "তিনি যে উপস্থিত," পশ্চাৎ হইতে একজন বলিয়া উঠিল।

কথাটী বৃদ্ধের কর্ণে গেল। বৃদ্ধ চারি দিকে চাহিতে লাগিল। রাঘব বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আপনি যাঁকে খুঁজিতেছিলেন, তিনি ত আপনার কাছেই রহিয়াছেন।"

বৃদ্ধ। কই ?

ব্রহ্মচারী। এই যে তোমার পাশে দাঁড়াইয়া এই পিতম।

পিতম অগ্রসর হইল, জানু নামাইয়া পার্শ্বে বসিল। বৃদ্ধ একদৃষ্টে তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিজয়রাজ"! ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু আর কথা ফুটিল না।

রাঘব শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই বৃদ্ধকে চিনিতে পারেন ?"

মহেশচন্দ্র। না, কে ইনি ?

রাঘব। আপনার জনক।

মহেশচন্দ্র কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতম শিহরিয়া উঠিলেন। শেষ বৃদ্ধের অন্তর্জ্জলি করা হইল। মহারাজ মহেশচন্দ্র নদী-জলে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের অঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া ধরিলেন, পিতম মস্তক ধরিয়া রাঘবের সহিত গগনভেদী গম্ভীরস্বরে 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্নেহময়ী জ্যোৎস্নাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। তখনও বৃদ্ধের দৃষ্টি পিতমের প্রতি রহিয়াছে, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, যেন বৃদ্ধ কত দূর হইতে চাহিতেছে, তথাপি দৃষ্টি পিতমের প্রতি রহিয়াছে। শেষ নাম ডাকা থামিল। জ্যোৎস্নাবতী বুঝিলেন, সকল শেষ হইয়া গেল তখন মহেশচন্দ্র মৃত জনকের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, অনেক পরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! তোমার প্রায়শ্চিত্তের যাহা বাকি থাকিল, তাহা আমি করিব।" পিতম গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! স্থির হও, প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে।"

সৎকার হইয়া গেল। দুই তিন দিন মহেশচন্দ্র ষাইট পইঠার ঘাটে পিতমের সহিত একত্রে বাস করিলেন। একদিন নানা কথাবার্ত্তার পর অতি সাবধানে মহেশচন্দ্র বলিলেন, "দাদা, এখন আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন, আমায় বিদায় দিন।" পিতম হাসিলেন;—বলিলেন, "আমার আকাঙ্ক্ষা অতি সামান্য, দুই মুষ্টি ভিক্ষায় যে পরিতৃপ্ত, তার মাথায় রাজ্যভার কেন ?"

মহেশচন্দ্র। ভাল হোক, মন্দ হোক, আপনি নিজের রাজ্য নিজে ভোগ করুন। আমি দেখিয়া সুখী হই। রাজ্যভোগে আমার সুখ নাই।

পিতম। আমি অনেক দিন হইতে মনে মনে তোমায় রাজ্যদান করেছি। আজ আবার আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করিলাম, সূর্য্যদেব সাক্ষী, সকল দেবতা সাক্ষী।

মহেশচন্দ্র একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "আমি এ দান স্বীকার করিলাম। আজ হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বস্ব কেবল পরের উপকারে নিয়োজিত করিব, সকল দেবতা সাক্ষী।" জ্যোৎস্নাবতী আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিলেন।

পরদিবস প্রাতে মহেশচন্দ্র অনেক অনুসন্ধান করিলেন, পিতম কি জ্যোৎস্নাবতী কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাঁহারা উভয়েই কোথা চলিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি আর তাঁহাদের সহিত মহেশচন্দ্রের দেখা হইল না মাধবী-সমভিব্যাহারে মহেশচন্দ্র গৃহে আসিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন, রাজা ইন্দ্রভূপ আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেওয়ান কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। চূড়াধন বাবু রাণীর বিশ্বাস-পাত্র হইয়া রাজকার্য্য চালাইতেছেন।

সম্পূর্ণ।

কণ্ঠমালা।

(শৈবল)

(মাধবীলতার পরভাগ)

(উপন্যাস)

সঞ্জীবচন্দ্র-চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত ।

গ্রন্থকারের বক্তব্য।

ভ্রমরনামক মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসের সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। ভ্রমর পত্রিকা বন্ধ হওয়ায় গল্পটী শেষ হইতে পায় নাই, এক্ষণে শেষ করা গেল। * * *

শৈলের চরিত্র কতকটা প্রকৃতিমূলক। যেমন সচ্চরিত্রের আখ্যান উপকারী, তেমন অসচ্চরিত্রের কথনেও উপকার আছে। যাহারা পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যরূপে হিংস্র জন্তু, তাহাদের জানাও আবশ্যক। সেই উদ্দেশেই গল্পটীর কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। পরে বাঙ্গালার কোন শ্রেষ্ঠলেখক সেই লিখিত অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটী পড়িয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন যে, গল্পটীর যদি শত দোষ ঘটে, তথাপি এই এক পরিচ্ছেদের গুণে সে সকল দোষের মার্জ্জনা হইবে। বলিতে কি, আমি সেই অবধি গল্পটী বাড়াইতে আরম্ভ করি, কিন্তু পরে সে উৎসাহ থাকিল না।

কাঁঠালপাড়া।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কণ্ঠমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া জনেক নাপিতানী একটী অল্পবয়স্কা গৌরাঙ্গীর পদে আলতা পরাইতেছিল। নাপিতানী চিত্রকরের ন্যায় অতি সাবধানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিল; যুবতী একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন। উভয়েই নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে নাপিতানী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হয়েছে।" সুন্দরী ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচলাম।" নাপিতানী উত্তর করিল, "কি করিব মা, কালো পা হলে শীঘ্র আলতা পরা হইত, তোমার মত সুন্দর বর্ণ হলে আলতার রেখা সাবধানে টানিতে হয়; একটু বাঁকা হলে লোকে বলবে, নাপিতানীর চক্ষু ছিল না।"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "আমার বর্ণ কি এত ভাল?"

নাপিতানী বলিল, "সে কথা তোমার নিকট আর কি বলিব মা, আমরা তা ঘরে বসে সর্ব্বদা বলাবলি করি থাকি। এমন সুন্দর বর্ণ কখন দেখি নাই; এমন সুন্দর গড়নও কখন দেখি নাই; পা দুখানি যেন ননীতে গড়া; চাঁপাফুলের বর্ণ, তাতে আলতার সঙ্গ কত শোভা হয়। ইচ্ছা করে, তুমি দুগাছা হীরাকাটা নতন মল পর; আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি।"

সুন্দরী অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা আর এ জন্মে হয়েছে. নিত্য যে অন্ন পাই. এই যথেষ্ট, আবার হীরাকাটা মল কোথায় পাব?"

নাপিতানী বলিল, "তা হবে না মা। হীরাকাটা মল তোমাকে পরতেই হবে।" এই বলিয়া নাপিতানী বিদায় হইল। নিকটে একখানি পুরাতন দর্পণ ছিল। যুবতী কি ভাবিতে ভাবিতে দর্পণখানি সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন. পরে গাত্রমার্জ্জনী লইয়া ওষ্ঠাধর আর একবার মার্জ্জন করিলেন; অল্প পূর্ব্বে কেশ-বিন্যাস করিয়াছিলেন, কেশ পূর্ব্বমতই বিন্যস্ত আছে, তথাপি দর্পণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর একবার দুই এক-গাছি কেশ উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করিতে লাগিলেন; তাহা সমাধা হইলে দর্পণ হাতে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন; দাঁড়াইয়া স্কন্ধের দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া গুলফ-রঞ্জিত অলক্তক-রাগ দেখিতে লাগিলেন; দেখিবার নিমিত্ত বাম গুলফ ঈষৎ তুলিতে হইল, শরীর অল্প বাঁকাইয়া বক্ষ ঈষৎ উন্নত করিতে হইল. এই ভঙ্গীতে তাহাকে যে দেখিল. সে ভাবিল সুন্দর। নিকটস্থ অন্য একটী ছাদে বিলাসবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, যুবতী তাহা জানিতে পারেন নাই।

পাছে অলক্তকরাগ মুছিয়া যায়, এই জন্য পদপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যুবতী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ছাদ হইতে বিলাসবাবু ভাবিলেন, যেন বিদ্যুৎ খেলাইতে খেলাইতে একখানি গম্ভীর মেঘ চলিয়া গেল।

সুন্দরীর নাম শৈল। বয়স উনবিংশতি বৎসর। তিনি আপনার গৃহে একা কুটীরে থাকিতেন, স্বামী ভিন্ন আর কেহই গৃহে ছিল না। স্বামীর নাম বিনোদ; বয়স বত্রিশ বৎসর; বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সরল, আমোদপ্রিয়। কোন কারণ প্রযুক্ত পিতৃত্যক্ত অর্থ অনেক দিন হইল নষ্ট করিয়াছিলেন. এক্ষণে যে সামান্য আয় ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন। কষ্ট তিনি সবিশেষ জানিতে পারিতেন না। সাংসারিক-অপ্রতুলতা-জনিত যত যন্ত্রণা, তাহা প্রায় শৈল একা ভোগ করিত, বিনোদ কেবল আহারের সময় আসিয়া আহার করিতেন, কোন বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন না।

শৈল ছাদ হইতে নামিলেন। শয়নগৃহে স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "বেলা যে শেষ হইল এখনও স্নান করিতে গেলে না?" বিনোদ প্রত্যহ অপরাহ্নেও একবার স্নান করিতেন; অপরাহ্ন হইয়াছে শুনিয়া

বিনোদ গ্রন্থ রাখিয়া উঠিলেন, সেই সময় স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, বিনোদ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রক্ত মাড়াইলে?" শৈল বলিলেন, আলতা পরিয়াছি বলে উপহাস করিতেছ, তবে আমি ধুয়ে ফেলি।"

বিনোদ বলিলেন, "ধুতে হবে না, বড় সুন্দর দেখাইতেছে। তোমায় কিসে না সুন্দর দেখায়! সে দিন দৈত্যের মা'র উপর রাগ করিয়া যখন তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলে, তখন তোমাকে কত সুন্দর দেখাইতেছিল। সিংহীর ন্যায় কেশরাশি ফুলাইয়া ঈষৎ বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়াছিলে, আমি কত সুন্দর দেখিলাম। আর একদিন একখানি পাঁচি ধুতি পরিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া কুণ্ঠিতভাবে সেই কাপড় টানিতেছিলে, শরীর ঢাকা পড়ে, কিন্তু ঢাকা থাকে না; তুমি লজ্জা পাইতেছিলে, লজ্জার হাসি অধর-পার্শ্বে টিপিতে টিপিতে, এক একবার আমার দিকে চাহিতেছিলে; আমি তোমার সেই মূর্ত্তি কত সুন্দর দেখিয়াছিলাম!" এই বলিয়া শৈলের মুখপ্রতি চাহিতে চাহিতে ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি বিনোদ আদরে টিপিলেন। আবার হাতখানি যেখানে ছিল, সেই-খানে যত্নে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে প্রাঙ্গণ হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন। শৈল তখনও বিমর্ষভাবে দ্বারে মাথা হেলাইয়া বিনোদের প্রতি চাহিয়া আছে। বিনোদের চক্ষে জল আসিল, বিনোদ চলিয়া গেলেন এই সময় রেবতী ঠাকুরঝি আসিলে, শৈলের সঙ্গে পাড়ার নানা কথা আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে ফেলিয়া বিনোদ বহির্গত হইয়া, অন্যমনস্কে ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিলাসবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে! বিলম্ব কর না, সন্ধ্যার পরই তাস আরম্ভ করিতে হইবে।" বিনোদ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।" আবার কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে আর একজন সমবয়স্ক ডাকিয়া বলিল, "দেখ হে, শীঘ্র এসো, অদ্য সন্ধ্যা হইতে কেবল টপ্পা গাইতে হইবে।" বিনোদ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আচ্ছা।" আবার কতক দূর গেলে, গোপালবাবু বৈঠকখানা হইতে বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র গা ধুইয়া আইস, এই-খানে কাপড় ছাড়িতে হইবে।" বিনোদ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি আহারের দৌরাত্ম্য আছে?" গোপালবাবু বলিলেন, "আছে; গুটী-কতক খইচুর পাইয়াছি, ভাবিয়াছি যে, অপাত্রে ফেলিব।" বিনোদ বলিলেন, "উত্তম ভাবিয়াছ, এখন দুই একটা নমুনা পাইতে পারি?" এই সময় কতক-গুলি শিশুর কোলাহলশব্দ গোপালবাবু শুনিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, ছেলেদের জন্য নমুনা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু তাহা উহাদের দেওয়া বৃথা। ছেলেরা এ সব জিনিসের আস্বাদন বুঝিতে পারে না।" বিনোদ ভাবিলেন, "আমিই কোন্ পারি।" এই সময়ে শিশুরা আসিয়া বিনোদকে ঘেরিল; কেহ পৃষ্ঠের উপর উঠিতে গেল, কেহ গলা ধরিল, কেহ কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। তিনি একে একে সকলকে বুকে তুলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। "আমি আগে, আমি আগে," বলিয়া অনেক ছেলে হাত তুলিতে লাগিল। গোপালবাবুর দেড় বৎসরের একটী পুত্র তাহার অষ্টমবর্ষীয়া ভগিনীর ক্রোড়ে আসিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে হেলিয়া পড়িল। বিনোদ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। শিশু, ভগিনীর প্রতি চাহিয়া মাথা হেলাইয়া হাসিতে লাগিল, যেন ভগিনীকে বলিতে লাগিল, "দেখিলি? আমি কোলে উঠেছি।" আবার বিনোদবাবুর দিকে ফিরিয়া সহাস্যবদনে চাহিতে লাগিল, তাঁহার ওষ্ঠের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "এই কাকা!"

সে স্থান হইতে বিনোদ চলিলেন। শিশুরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে এই শিশুর পল্টন দেখিয়া, ছাগীরা দুগ্ধস্থলী দোলাইতে দোলাইতে পলাইতে লাগিল। তাহাদের একটী বৎস ধরা পড়িল। একটী উলঙ্গ ছেলে বৎসটীকে পেটের উপর তুলিল; আর একজন কোলে লইতে পারিল না বলিয়া, তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। গোপালবাবুর সন্তানটী ভগিনীর ক্রোড় হইতে হেলিয়া পড়িয়া ছাগশিশুর মুখে অঙ্গুলি দিয়া ভগিনীকে দেখাইতে লাগিল, "এই ব্যা।" বিনোদ বহুযত্নে ছাগশিশুকে অব্যাহতি দিয়া পদ্ম-পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন। ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া কে কোন পদ্মটী লইবে, তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিনোদবাবু জলে নামিলেন। জলের পক্ষীরা চারি-দিক্ হইতে কোলাহল করিয়া এক স্থান হইতে উড়িয়া আর এক স্থানে পড়িতে লাগিল, পদ্মের

পাপড়ি ভাঙ্গিতে লাগিল, পাতা ছিঁড়িতে লাগিল। বিনোদ তাহাদের গালি দিতে লাগিলেন; ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে গালি দিতে লাগিল। জলে চলিতে চলিতে বিনোদবাবু জল দোলাইতে লাগিলেন। জলের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মেরা দুলিয়া উঠিল। ভ্রমরগণ পদ্ম ছাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া পদ্ম বেড়িয়া উড়িতে লাগিল পদ্ম অস্থির দেখিয়া শেষ তাহারা অন্যদিকে বেগে উড়িয়া গেল। বিনোদ হাসিয়া গাইতে লাগিলেন—

"ও বঁধু যেও না হে যেও না,
রাগ করে যেও না।"

সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাও গাইয়া উঠিল—

"দেও না দেও না আগ কলে দেও না।"

বিনোদবাবুর সকল গীত, সকল শ্লোক ছেলেরা জানিত; বিনোদ গাইলে তাহারাও গাইত। বিনোদ পদ্ম তুলিয়া এক একটী সকলের হাতে দিলেন, আনন্দে ছেলেরা নাচিতে লাগিল; একজন কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"আমার পদ্ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেও।" পদ্মকলি জলে মাথা তুলিয়াছিল; শিশুর হাতে আসিয়া তাহার মাথা হেলিয়া পড়িল। ক্রোড়স্থ শিশুর নিদ্রা আসিলে মার স্কন্ধে যেরূপ তাহার মাথা হেলিয়া পড়ে, পদ্মকলির মাথা সেইরূপ হেলিয়া পড়িয়াছিল। বালক কাজেই মনে করিল, তাহার পদ্ম ঘুমাইয়াছে। বিনোদ সেই ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিলেন।

এদিকে রেবতী ঠাকুরঝি, শৈলের সঙ্গে বিনোদসম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। রেবতী বলিতেছিলেন, "বিনোদ যথার্থ সুখী।" শৈল উত্তর করিলেন, "তাঁহার সুখের কথা ছেড়ে দেও, তিনি যে কিসে সুখী না হন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ণিমায় বলেন—'দেখ, দেখ, কেমন পৃথিবী হাসিতেছে, এ পৃথিবীতে লোক আবার কেমন করে অসুখী হয়! জ্যোৎস্না সুন্দর, শাদা ফুলগুলি সুন্দর, তুমিও সুন্দর, আমি কেন সুখী না হইব?' আবার অমাবস্যার রাত্রে বলেন—'দেখ, দেখ, রাত্রি কেমন অন্ধকার!—মরি, মরি, এ সুন্দর অন্ধকার যে না দেখিল, সে এ পৃথিবীর কিছুই সৌন্দর্য্য দেখিল না'!"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমত সময় বিনোদবাবু গোপালের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পূরবি আলাপচারি করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন। শৈল শিশুকে আদর করিতে লাগিলেন, রেবতী উঠিয়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে প্রাঙ্গণপার্শ্বে বসিয়া বিনোদবাবু মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া খিড়কিদ্বারে দাঁড়াইল। সেই সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া কতকগুলিন কনেষ্টবল ও পুলিস-দারোগা, গোপালবাবু, বিশ্বাসবাবু প্রভৃতি আসিলেন। বিনোদ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন।

দারোগা বলিলেন, "গত কল্য পাড়ায় একটী চুরি হইয়াছে, সেই চুরির দ্রব্য অনুসন্ধান করিতে আমি আপনার বাড়ী আসিয়াছি। গোপালবাবুর বালক রাত্রে ঘরে গেলে গোপালবাবুর পরিবার দেখিলেন, শিশুর গলায় কণ্ঠমালা নাই। প্রাতে গোপালবাবুর স্ত্রী বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, কণ্ঠমালা পান নাই। মহাশয়ের বাটীতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, আপনার স্ত্রী তাহাতে রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং দুই একটী গালিও দিয়াছেন। অগত্যা আমি তদন্ত করিতে আসিয়াছি, অতএব বিলম্ব করিবেন না; আপনার পরিবার ও দাসীকে এই পাকশালায় শীঘ্র আসিতে বলুন, আমি একবার ঐ ঘর অনুসন্ধান করিব।" বিনোদবাবু উঠিলেন, একবার গোপালবাবুর দিকে চাহিলেন। গোপালবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমি কি করিব ভাই, চুরি গিয়াছে, পুলিসে জানাইতে হয়, আমি জানাইয়াছি। এতদূর হইবে, অনুভব করিতে পারি নাই।"

বিনোদের পরিবার পাকশালায় আসিল। দারোগা প্রথমে ভস্মস্তূপ, নাউমাচার তলা, এদিক্ সেদিক্ সকল সন্ধান করিলেন। শেষ সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দারোগা প্রথমে দুই একটী সিন্দুক-পেটারা সন্ধান করিলেন, তাহার পর একটী ক্ষুদ্র বাক্স বিনোদকে খুলিতে বলিলেন। বাক্সটী শৈলের; বিনোদ তাঁহার নিকট হইতে চাবি চাহিয়া আনিয়াছিলেন; সেই চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া দিলেন। দারোগা দুই একটী জিনিস তুলিবামাত্রেই চোরা কণ্ঠমালা বাহির হইল। তাহা দেখিবামাত্র বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন; একদৃষ্টে কণ্ঠমালার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল, এখনই শৈলকে কনেষ্টবলেরা লইয়া যাইবে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পথে কত রসিকতা করিবে, হয় ত ধাক্কা

মারিবে; সুতরাং যখন দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাক্স কাহার?" বিনোদ পরিষ্কার-স্বরে বলিলেন, "বাক্স আমার।" দারোগা কহিলেন, "কিরূপে কণ্ঠমালা এ বাক্সে আসিল?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "আমি রাখিয়াছিলাম।"

দা। আপনি তবে চুরি একরার করিতেছেন?

বি। একরার করিতেছি।

তাহার পর আর কেহ কোন কথা বলিলেন না, সকলে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পথে আসিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা, তোমার হাতকড়ি কই?"

দারোগা বলিলেন, "হাতকড়ি ইতর লোকের নিমিত্ত।"

বিনোদ বলিলেন, "আমি অতি ইতর লোক, আমায় শীঘ্র হাতকড়ি দেও, আমার অসহ্য হইয়াছে।"

জমাদার কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া হাতকড়ি পরাইতে লাগিলেন।

বিনোদ বলিলেন, "জোরে পরাও, আরও উপরে, আরও উপরে।"

বিনোদবাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলে, তাঁহার আদরের স্ত্রী পাকশালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। সকলে গিয়াছে দেখিয়া রীতিমত সুর করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

যে গ্রামে বিনোদের বাস, তথা হইতে মেজেষ্টরি কাছারি প্রায় তিন ক্রোশ পথ। মধ্যাহ্নকালে মেজেষ্টর বসিয়া কাছারি করিতেছেন, এমন সময় দারোগা বামাল সমেত আসামীকে হাজির করিলেন। গোপালবাবু চুরির এজেহার দিলেন। বিনোদের বাক্স হইতে চুরির দ্রব্য যে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে বিলাসবাবু ও আর একটী ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিলেন। শেষ বিনোদ স্বয়ং চুরি স্বীকার করিলেন। বিনোদের প্রতি এক বৎসর সশ্রমে কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কিন্তু হুকুম দিবার সময় মেজেষ্টর বলিলেন যে, "এই আসামীর কোন পরিচয় আমি জানি না; ইহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। কিন্তু দেখিবামাত্র, ইহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। ইহার মুখের প্রতি অঙ্গে নির্ম্মলতা, সরলতা অঙ্কিত রহিয়াছে। যে মেজেষ্টরেরা মুখ দেখে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের যে কত ভুল হয়, তাহা এইস্থলে প্রমাণ হইতেছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলে আসামীর প্রতি চাহিল। বিনোদ তখন অধোমুখে কি ভাবিতেছিলেন, মেজেষ্টরের কথা শুনেন নাই। তাঁহার মুখে অভিমান দৃষ্ট হইল। এই অভিমান শৈলের প্রতি হইয়াছিল।

মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে একজন কনেষ্টবল তাঁহার গাত্রে হাত দিয়া বলিল, "চল।" বিনোদ অন্যমনস্কে চলিলেন। পরে জেলখানার দ্বারে আসিয়া কনেষ্টবলগণ দাঁড়াইল। জেলের ভীম কবাটের ভীষণ ঘর্ষণশব্দ হইল, বিনোদ চাহিয়া দেখিলেন, জেলখানা। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গোপালবাবু অতি বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারে কোন কথা বলিলেন না, পরস্পরে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ গোপালবাবুর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল; তাহা দেখিয়া বিনোদ বলিলেন, "আমি চলিলাম! আপনি ঘরে যান, তথায় সকলে আপনার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। আমার বাড়ীতে বলিবেন যে—" আর বলিতে পারিলেন না, শেষ কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বলিলেন, "দাদা, আমার শৈলকে দেখ,—অল্প বয়স, এতটা বুঝিতে পারে নাই—তার আর কেহ রহিল না।" শেষ কথাগুলিন অতি ধীরে ধীরে অন্যমনে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ছয় মাস অতীত হইল। বিনোদবাবু জেলখানায় আছেন, উৎকট পরিশ্রমে পীড়া জন্মিয়াছে। আর সে গৌরকান্তি নাই, আকার আর সরল নাই—ঈষৎ নত হইয়াছে। স্কন্ধাগ্র উচ্চ হইয়াছে, গলদেশ যেন দেহমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। দৃষ্টি বিকট হইয়াছে, কপালে রেখা পড়িয়াছে, চক্ষুপার্শ্বে শিরা উঠিয়াছে, মুখ কেবল অস্থিময় হইয়াছে।

বিনোদবাবু এই অবস্থায় একদিন অপরাহ্নে একটী স্তম্ভে মাথা ঠেশ দিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন; পার্শ্বদ্বয় উঠিতেছে পড়িতেছে। নিকটে একটী ঘানি, ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে, তিন চারি জন কয়েদী তাহা বহু পরিশ্রমে ঘুরাইতেছে। এই কয়েদীদিগের মধ্যে শম্ভু নামে একজন নিকটে আসিয়া মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, কষ্ট কমিয়াছে?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "অনেক।" কয়েদী প্রসন্নবদনে ফিরিয়া ঘানিতে বুক দিল। ঘানি এবার অপেক্ষাকৃত শীঘ্র চলিতে লাগিল।

ক্ষণেক বিলম্বে বিনোদবাবু সুস্থ হইয়া ঘানি ফিরাইতে গেলেন। সঙ্গীরা ঘানি স্পর্শ করিতে

দিল না, বলিল, "আবার পরিশ্রম করিলে বাঁচবে না।" বিনোদ বলিলেন, "আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, ওবারসিয়ার বাঁচাবে না।" শম্ভু বলিল, "তার সঙ্গে আমি বুঝিব।"

এই কথা বলিতে বলিতেই ওবারসিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদবাবুর প্রতি অতি তীব্র-দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে কৃষ্ণঠাকুরের মত দাঁড়াইয়া আছ?" বিনোদ বলিলেন, "বড় পীড়া বোধ হইয়াছে, তাই একটু দাঁড়াইয়াছি।"

ওবা। পীড়া হইয়া থাকে, ডাক্তারকে বলিও, আমার কাছে সে কথা খাটিবে না। কেন? ডাক্তার যে বড় মোটা দরমাহা খায়, পীড়া ভাল করিতে পারে না? আজ তোমায় রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত ঘানি চালাইতে হইবে, একা চালাইতে হইবে, না পার, পিঠের ছাল যাবে।

শম্ভু কয়েদী এতক্ষণ কিছু বলে নাই; শেষ এই কথা শুনিয়া ওবারসিয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; গম্ভীরভাবে বলিল, "বিনোদবাবুকে আমি কাজ করিতে দিই নাই, আর তুমি যদি মনুষ্যের জাত হতে, তুমিও কাজ করিতে দিতে না। বিনোদবাবুর আকার দেখ, তাহার পর হুকুম করিও।"

ওবা। চোর আবার বাবু হলো কবে?

শম্ভু। "সাবধানে কথা কও, বিনোদবাবুকে যদি অপমান কর, তবে নিশ্চয় তোমার মরণ।" আর সকল কয়েদীরা সাহস পাইয়া ওবারসিয়ারকে কটূক্তি করিল।

ওবারসিয়ার তৎক্ষণাৎ রাগভরে চলিয়া গেল। বিনোদ ধীরে ধীরে বলিলেন, "কর্ম্ম ভাল হল না।"

কর্ম্ম যে ভাল হয় নাই, তাহা এক ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল। সন্ধ্যার সময় একজন প্রহরী আসিয়া বিনোদকে জেল-দারোগার নিকট লইয়া গেল। জেল-দারোগা একজন সাহেব; তিনি কতক হিন্দী কতক ইংরাজীতে বলিলেন, "তুমি অদ্য কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তোমার নামে রিপোর্ট হইয়াছিল, তোমার প্রতি চারি বেতের হুকুম আসিয়াছে, অতএব প্রস্তুত হও।" বিনোদবাবু অধোবদনে রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না; হুকুম তামিল হইল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিনোদের চেতন হইল; দেখিলেন, কে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছে! বিনোদ, "এ শৈল!" অতএব মৃদুস্বরে বলিলেন, "শৈল, তোমার হাতে ব্যথা হবে; শৈল, রাত্রি অনেক হয়েছে।" পার্শ্বে যে বসিয়া ছিল, সে ব্যক্তি বলিল, "আমি শৈল নই, শৈল তোমার কে?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "শৈল আমার সর্ব্বস্ব! তুমি কে?" পার্শ্ববর্ত্তী বলিল, "আমি শম্ভু।"

বিনোদ দুই একবার মুখে বলিলেন, "শম্ভু! শম্ভু! শম্ভু কে? আমি তবে কোথায়?" শম্ভু উত্তর করিল, "তুমি জেলখানায় শুয়ে আছ।"

বিনোদের সকল মনে পড়িল, অর্দ্ধ পীড়ায় একটী অস্ফুট শব্দ করিয়া চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ আর কোন কথা কহিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে বিনোদ বেত্রাঘাতে আহত হইয়া জেলখানায় অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই রাত্রে গোপালবাবু আপন শয়নঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সন্তানেরা নিদ্রা যায় নাই; কেহ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, কেহ বসিয়া বলিতেছে, "আমি ঘুমাইব না।" এই সময় কেহ তাহাদের শয়ন করিতে বলিলেই সে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তাহাদের গর্ভধারিণী নিকটে বসিয়া আদর করিয়া ভুলাইতেছেন।

এই সময় গোপালবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটী মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কৈ?"

গোপালবাবুর পরিবার বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কাকা?"

শিশু বলিল, "সেই কাকা গো"

গৃহিণী বলিলেন, কোন কাকা?"

শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটী উচ্চ করিয়া বলিল, "সেই।" তথাপি গর্ভধারিণী বুঝিতে পারিলেন না, দেখিয়া শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর জ্যেষ্ঠ ভগিনী নিকটে ছিল; সে বলিল, "খোকা বিনোদ কাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

গোপালবাবুর পরিবার সস্নেহে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমার সোনার চাঁদ, তুমি তাঁরে ভুল নাই। তাঁরে সকলে ভুলে গেছে। যার জন্য তিনি জেলে গেলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁরে ভুলে গেছে।"

গোপালবাবু এই সময় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমিও বিনোদকে ভুলি নাই; এ জন্মে ভুলিতে পারিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে গোপালবাবুর চক্ষে জল আসিল। পরে বলিলেন, "বিনোদ

এখনও স্ত্রীকে ভালবাসে।" গোপালের স্ত্রী বলিলেন, "পোড়াকপাল অমন ভালবাসায়।"

গো। পোড়াকপাল নহে, এই ভালবাসাই সুখের! বিনোদের ভালবাসায় ভ্রম আছে সত্য, কিন্তু কাণা না হইলে ভালবাসা জন্মে না; যে দোষ দেখিতে পায়, সে কখন ভালবাসিতে পারে না; ভ্রমই এই পৃথিবীর সুখ।

গোপালবাবুর পরিবার আর কোন উত্তর না করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া দোলাইতে লাগিলেন। শিশুকে এতক্ষণ তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিন্দু-কাকার কথা বলিয়া ভুলাইতেছিল; বিনোদের নিমিত্ত শিশু অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিল, একণে মাতৃক্রোড়ে দুলিতে দুলিতে নিদ্রাসক্ত হইল। শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে মাতা অতি মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন, "ঘুম আয় রে আয়।" শিশু ক্ষুদ্রহস্তে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে নিদ্রাবেশে মাতার স্বরের সঙ্গে বলিতেছে, "কাকা আয় লে আয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে জেলখানায় ডাক্তারসাহেব আসিয়া যে ঘরে বিনোদ পড়িয়াছিলেন, সেই ঘরে গেলেন, এবং পরীক্ষা করিয়া অতি বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "রোগ সাংঘাতিক।" পরে জেল-দারোগাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার অনবধানতা প্রযুক্ত এই লোকটী মরিতে বসিয়াছে। তুমি তত্ত্ব হইলে, আর আমাকে সময়ে জানাইলে, এতদূর ঘটিত না।" ডাক্তারসাহেব চলিয়া গেলে জেলদারোগা নেটিব ডাক্তারকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "তুমি সময়ে চিকিৎসা করিলে এরূপ হইত না।"

বেলা দুই প্রহরের সময় মেজেষ্টর-সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তারসাহেব আবার আসিলেন। তখন বিনোদ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। উভয় সাহেব একত্রে তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে শ্রম হইতে অব্যা... দিয়া গেলেন। মেজেষ্টর-সাহেব কাছারীতে গিয়া বিনোদকে খালাস দিবার নিমিত্ত রিপোর্ট করিলেন। কিছুদিন পরে রিপোর্ট মঞ্জুর হইয়া আসিল। প্রাতঃকালে জেল-দারোগা স্বয়ং আসিয়া বিনোদকে সে সংবাদ দিয়া গেল।

বিনোদ আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিলেন। সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শম্ভুর অনুসন্ধান করিতে গেলেন। শম্ভু এ সংবাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, অতএব বিনোদকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ করিলেন না; কেবল বলিলেন, "তোমায় পাইয়া অবধি আমি সংসারের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম, তুমিই আমার সংসার হইয়া পড়িয়াছিলে।" বিনোদ বলিলেন, "এখনও তুমি আমার জন্য যন্ত্রণা পাবে। আমায় মনে পড়িবে, আর কাতর হবে। সত্য করে বল শম্ভু খুড়া, তুমি কাতর হবে না?"

শম্ভু গম্ভীর হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে আছে? শৈল তোমার কে? অনেক দিন অবধি এইটী জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা করি নাই, এখন না জিজ্ঞাসা করে থাকিতে পারিলাম না।"

বিনোদ বলিলেন, "শৈল আমার স্ত্রী—শৈল ব্যতীত আমার আর কেহ নাই; আমি ব্যতীত শৈলের আর কেহ নাই। শৈল আমাকে বড় ভালবাসে, একদণ্ড আমাকে না দেখিলে অস্থির হয়, এতদিন আমাকে না দেখিয়া সে কেমন করে প্রাণ ধরে আছে, জানি না।"

শম্ভু। সে বিষয় তোমার চিন্তা করিতে হবে না। এখন কথা এই যে, তুমি পীড়িত, তোমার চিকিৎসা আবশ্যক, সেবা আবশ্যক, এ সকল তোমার স্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হবে?

বি। হবে, সে বিষয়ের কিছু ভাবনা নাই। তুমি জান না, শৈল কত যত্ন জানে। স্ত্রীজাতি রত্নবিশেষ।

শ। স্ত্রীজাতি ইদানীং রত্ন হয়ে থাকিবে, কিন্তু আমি যখন জেলে আসি নাই, তখন এ রত্ন বড় দেখিতে পাই নাই। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত শৈলের কারণে কয়েদ হও নাই?

বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না— না—মিথ্যা কথা।"

শম্ভু উঠিয়া গেলেন। বিনোদ অনেকক্ষণ বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শম্ভু আবার আসিয়া আর একটী পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ সে পরিচয়টী দিবামাত্র শম্ভু শিহরিয়া উঠিলেন, অতি দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। শম্ভুর সহিত আর বিনোদের সাক্ষাৎ হইল না।

অন্যান্য কয়েদীরা আসিয়া বিনোদের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ করিল। "রোগ শীঘ্র আরোগ্য হউক"

লিয়া সকলেই দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে চলিয়া গেলে বিনোদ একা বসিয়া বাড়ী যাইবার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। "আজ শৈলকে দেখিতে পাব। শৈল এখনও জানিতে পারে নাই যে, আমি আজ বাড়ী যাব। আমায় হঠাৎ দেখিয়া সে কিরূপ করিবে? আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিবে। না—না—আহ্লাদে নহে। দুঃখে কাঁদিয়া উঠিবে—আমার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিবে, 'আমি কত অপরাধী—আমার জন্তে কত কষ্ট পেয়েছ।' আবার এই রুগ্ন শরীর দেখিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিবে, আমি তখন কি বলে তারে শান্ত করিব? আমি তখন তার মুখখানি আমার কাঁধে লইয়া চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে তারে দেখিব; ছয় মাস দেখি নাই,—চোক পূরে দেখিব, আর তারে প্রবোধবাক্যে বলিব,—ভয় নাই, আমি বাঁচিব।" বিনোদ এইরূপ অনুভব করিতেছেন, এমত সময়ে একজন কনষ্টেবল আসিয়া বিনোদকে জেলদারোগার নিকট

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে পর, বিনোদ জেলখানা হইতে মুক্তি পাইলেন। যে বস্ত্র পরিয়া জেলখানায় আসিয়াছিলেন, সেই বস্ত্র পরিয়া যষ্টির উপর ভর দিয়া জেলখানার বাহিরে দাঁড়াইলেন। প্রাচীরে, বৃক্ষে, আকাশে, শত শত পক্ষী আহ্লাদে কোলাহল করিতেছে। ছেলেরা হাসিতেছে, খেলিতেছে। যুবতীরা পরস্পরকে সুখের কথা কহিতে কহিতে ঠমকে চলিতেছে; পৃথিবী পূর্ব্বমতই আছে। তাঁহার কষ্টে দেশের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা কেবল বিনোদের শরীরে হইয়াছে। যদি কেহ বিমর্ষ হইয়া থাকে, বিনোদ ভাবিলেন, সে কেবল শৈল হইয়াছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদ ধীরে ধীরে চলিলেন। বাজারে প্রবেশমাত্রই আরসী, চিরুণী, ফিতা প্রভৃতি শৈলের প্রীতিকর-সামগ্রী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। লাঠিটী মৃত্তিকায় রাখিয়া বিনোদ ধীরে ধীরে একখানি দোকানের সম্মুখে বসিলেন। আসিবার সময় জেলদারোগার নিকট হইতে যে কয়টী পয়সা পাইয়াছিলেন, তাহা দোকানীকে দিয়া একখানি চিরুণী কিনিয়া লইলেন। বহুযত্নে সেইখানি আবার বস্ত্রাগ্রে বাঁধিয়া যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।

নগর অতিক্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, আর চলিতে অক্ষম। জেলখানা হইতে যখন বহির্গত হন, তখন আপন দুর্ব্বলতার বিষয় কিছুই ভাবেন নাই। শৈলকে দেখিবার স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, অতএব চলিবার কষ্ট ভাবেন নাই। এক্ষণেও সেই স্পৃহা বলবতী রহিয়াছে, অতএব শৈলের মুখ মনে করিয়া আবার উঠিলেন; কিন্তু কতক দূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না; বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় একজন কৃষক নগরে ধান্য বিক্রয় করিয়া বাটী ফিরিয়া যাইতেছিল। বিনোদ তাহাকে কাতরস্বরে অবস্থা জানাইলেন। কৃষক যত্ন করিয়া বিনোদকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল। বিনোদ গাড়ীতে উঠিয়া নিজগ্রামের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি চন্দ্রোদয় দেখিবে বলিয়া পূর্ব্বদিকের আকাশপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, মেঘসীমা স্বর্ণরেখায় মণ্ডিত হইতে লাগিল। দুই একটী অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী আকাশপথে উড়িতে লাগিল। তালপত্র কাঁপিতে লাগিল, শেষ তাহার অন্তরাল হইতে চন্দ্র দেখা দিল, পৃথিবী আলোকে ভাসিল। আনন্দে কৃষক গীত আরম্ভ করিল—

"মাথা তোল পদ্মমুখি
চাঁদের আলোয় মুখ দেখি।"

গীত সমাপ্ত হইলে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে আছে?" কৃষক উত্তর করিল, "সংসারে আমার সকলেই আছে।"

বি। তোমার স্ত্রী আছেন?

কৃ। আছে; না থাকিলে আমি চাষ-আবাদ করিতে পারিতাম না; এখন আমি ভাবি, যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারা কেমন করে পৃথিবীতে থাকে?

বিনোদ আর কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এতক্ষণ জানেলা দিয়া চন্দ্রের আলো শৈলের গাত্রে লাগিয়াছে; শৈল শয়ন করিয়া আমার যন্ত্রণা ভাবিতেছে। ক্ষণেক পরে কৃষক বলিল, "এই স্থানে নামিতে হইবে, আমি অন্য পথে যাইব।" বিনোদ নামিলেন।

কৃষক আপনার গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলে, বিনোদ একা পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। নিজ-গ্রাম আর অধিক দূর নাই, গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। সেই সকল বৃক্ষের নিকটেই শৈল আছে—তথায় গেলেই তাহারে দেখিতে পাইবেন—সকল যন্ত্রণা যাবে, এই মনে করিয়া বিনোদ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার পদ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু চলিতে লাগিলেন; শরীর কাঁপিতে লাগিল, তবু চলিতে লাগিলেন; মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে আর ভাল দেখিতে পান না, তথাপি চলিতে লাগিলেন; শেষ পড়িয়া গেলেন;—কিন্তু অচেতন হইলেন না। গ্রামের আলোক প্রতি চাহিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে নিদ্রা আসিল। নিদ্রাবেশে বিনোদ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন শৈল আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন বলিতেছে, "এখন ওঠ, আমি তোমার দাসী এসেছি, তোমায় কতদিন দেখি নাই; কতদিন তুমি আমায় আদর করে ডাক নাই; এখন চল—তোমার ঘর অন্ধকার হইয়া পড়ে আছে, একবার দেখিবে চল; তুমি আসিবার সময় যেখানে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছিলে, সেইখানেই তাহা পড়িয়া আছে, আমি তাহা তুলি নাই তুলিতে পারি নাই, তুলিতে গেলেই তোমায় মনে পড়ে।" শৈলের স্নেহ দেখিয়া নিদ্রাবস্থায় বিনোদ কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ দেখিলেন, শৈল নাই। নিকটে একটা শৃগাল দাঁড়াইয়া আছে; মৃত দেহ ভাবিয়া সে আসিয়াছিল, কিন্তু বিনোদকে কাঁদিতে দেখিয়া শৃগাল ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। বিনোদ উঠিয়া বসিলেন, একে একে সকল স্মরণ করিলেন, আবার ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক চলিবার সাধ্য নাই; কখন চলেন, কখন বসেন। ভালবাসার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার 'মোহিনী'-বলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় এইরূপ কষ্টে বিনোদ বাটী পৌঁছিলেন। শয়ন-ঘরের নিকটেই খিড়কী-দ্বার। তথায় যাইয়া ডাকিলে, শৈল শীঘ্র শুনিতে পাইবে, এই প্রত্যাশায় বিনোদ সেই দিকে কোনমতে গেলেন। বিনোদ আহ্লাদে বলিবার চেষ্টা করিলেন, "শৈল রে, আমি এসেছি।" কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না—কণ্ঠ হইতে কেবল একটা বিকট শব্দ নির্গত হইল মাত্র। বিনোদের বাক্যরোধ হইয়া আসিয়াছিল; সর্ব্বাঙ্গের ক্রিয়ারোধ হইতেছিল। বিনোদ উঠানে আসিয়া শয়নঘরের নিকট পড়িয়া গেলেন। আর কোন অঙ্গসঞ্চালনের সাধ্য রহিল না; শৈলকে আর ডাকিতে পারিলেন না, কেবল তৃষিতলোচনে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "শৈল, একবার উঠ, আমি তোমার দ্বারে পড়ে। শীঘ্র উঠ, বুঝি আর দেখা হল না।"

শৈল শীঘ্র উঠিল। বিনোদ গৃহপ্রবেশমাত্র যে শব্দ করিয়াছিলেন, শৈল তাহা শুনিয়াছিল। কি শব্দ হইল, জানিবার নিমিত্ত শৈল প্রদীপহস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিল। বিনোদ তাহাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইলেন; শৈল আরও সুন্দর হইয়াছে; ডাইমনকাটা মল পরিয়াছে, গলায় চিক্ দিয়াছে, শান্তিপুরে ধুতি পরিয়াছে। শৈল এ সকল কোথা পাইল, এই মনে করে বিনোদ একাগ্রচিত্তে শৈলের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শৈল মাথা ফিরাইয়া "এস না?" বলিয়া একজনকে ডাকিল। "যাইতেছি" বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে একজন পুরুষ আসিয়া শৈলের পশ্চাতে দাঁড়াইল। বিনোদ চিনিলেন যে, সে "বিলাসবাবু!" বিনোদ অমনি চক্ষু মুদিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু চক্ষু মুদিত হইল না। কোন অঙ্গই তাঁহার আর বশ নহে, চাহিয়া থাকিতে হইল।

শৈলের কথামত বিলাসবাবু খিড়কীদ্বারে শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেন। যাইতে তাঁহার দক্ষিণ পদ বিনোদের বুকে পড়িল; বিলাস চমকিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া দেখেন, একটা মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে; শৈলকে প্রদীপ আনিতে বলিলেন, দীপালোকে চিনিতে পারিলেন। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" বিলাসবাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শৈল আপনি প্রদীপ লইয়া দেখিল, চিনিতে পারিয়া বিলাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি কাণ্ড, আছে না গেছে?"

বিলাস সভয়ে বলিল, "গিয়াছে।"

বিনোদ পিশাচীর প্রতি কেবল চাহিয়া রহিলেন।

বিলাস পলাইবার উদ্যম করিল, শৈল তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার চুল ধরিল, এবং গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোমায় ফাঁসি দেওয়াইব। কালামুখ! এই সময় পলাতে চাও?"

পরে শৈল ঘরের মধ্যে বিলাসকে লইয়া গিয়া কোদালি-শাবল দেখাইয়া বলিল, "যাও, এই সকল লইয়া ঐ প্রাচীরের নিকট গর্ত্ত কর।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। বিলাসবাবু গর্ত্ত কাটিতেছেন; নিকটে বিনোদ পড়িয়া আছেন, তাহার পার্শ্বে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। বৃক্ষসকল স্তব্ধ, নক্ষত্র কণ্টকিত হইয়া শৈলের কার্য্য দেখিতেছে। গর্ত্তখনন সমাধা হইল, বিলাসবাবু গর্ত্ত হইতে উপরে উঠিলেন; শ্রমজনিত নিশ্বাস ফেলিলেন, কপালের ঘর্ম্ম মুছিলেন।

বিনোদ দেখিলেন, আপন আসন্নকাল উপস্থিত; গর্ত্ত প্রস্তুত, মুহূর্ত্তেক মাত্র বিলম্ব, তাহার পর সকল ফুরাইবে; বিনোদের বাক্যরোধ হইয়াছে, গতিরোধ হইয়াছে, আর কোন উপায় নাই। শৈলকে কত আদর করিবেন, কত কথা বলিবেন, মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল ফুরাইল। এখন মরণই ভাল। বিনোদ মনে মনে তখন জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন।

এই সময় বিলাসবাবু শৈলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এখন মড়া গর্ত্তে ফেলি?"

শৈল তৎকালে গর্ত্তের পার্শ্বে বসিয়া প্রাচীরের দিকে কি দেখিতেছিল, সে দিকে চাহিয়া বিলাসবাবু দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প হইল; অকস্মাৎ পড়িয়া মূর্চ্ছা গেলেন। শৈল সেই দিকে মুখে চাহিয়া রহিল। বৃক্ষপার্শ্বে প্রাচীরের উপর আকার এক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দীর্ঘাকার পুরুষ প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে আসিতে লাগিল, শৈল উঠিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে সেই আকৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল! এ কি?"

শৈল শিহরিয়া উঠিল, এ স্বর অপরিচিত নহে। বালিকাকালের কি এক ঘোর অথচ অস্পষ্ট কথা মনে আসিয়া আর আসিল না।

ভীম পুরুষ বলিলেন, "আইস, আমার সঙ্গে আইস।" শৈল যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে ভীম একরূপ মর্ম্মভেদী কটাক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন। শৈল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অনেকক্ষণ বিলম্বে ভীমপুরুষ একা ফিরিয়া আসিলেন, শৈল সঙ্গে ছিল না। বিনোদ যে স্থানে পড়িয়া ছিলেন, সেই স্থানে অগ্রসর দাঁড়াইলেন। বিনোদ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, শম্ভু কাকা?" শম্ভু আহ্লাদে আর থাকিতে পারিলেন না, বিনোদকে বুকে তুলিলেন, পরে উপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইয়া চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিনোদের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শম্ভু অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে এক প্রান্তর অতিক্রম করিয়া একটী সামান্য গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামটী বনাকীর্ণ, বসতি অতি অল্প; মধ্যে মধ্যে দুই একটী দেবমন্দির আছে, আর অধিকাংশ স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নাট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। শম্ভুকে দেখিয়া দুই একটী পেচক স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ এক ভগ্নমন্দির বেড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে উড়িতে লাগিল; তাহাদের পক্ষসঞ্চালিত বায়ুর দ্বারা দুই একটী সূক্ষ্ম লতা ঈষৎ দুলিতে লাগিল; দূরে একটী শৃগাল ক্ষুদ্র বন হইতে মাথা তুলিয়া শম্ভুকে দেখিল। চণ্ডালোকে শম্ভু ধীরে ধীরে ইষ্টকস্তূপের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন, কখন বাম বাহু কখন দক্ষিণ বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পদস্খলন রক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। শেষ একটী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। পরে মৃদুস্বরে সঙ্কেত করায় রামদাস সন্ন্যাসী দ্বার মোচন করিয়া, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রামদাস প্রথমে শম্ভুকে চিনিতে পারে নাই; পরে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক যোড়করে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের এত সত্বর আবার ফেরা হইল কেন? পথে যাইতে কোন ত বিঘ্ন ঘটে নাই?"

শম্ভু সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস! তুমি এখনও শয়ন কর নাই?"

রাম। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া এইমাত্র গৃহে আসিতেছি।

শম্ভু। দেখ, তাহার কোন অংশে অন্যথা ত হয় নাই?

রাম। মহারাজের আজ্ঞা কখন তিল পরিমাণে অন্যথা হইতে শুনি নাই।

শম্ভু। তোমার অধীনে লোকা কি পাল্‌কী প্রস্তুত আছে? দুইয়ের এক আমার অবিলম্বে চাই।

রাম। পাল্‌কী প্রস্তুত হইতে একদণ্ড লাগিবে, নৌকা প্রস্তুত আছে।

শম্ভু। তবে ভাল, নৌকাই ভাল।

এই বলিয়া শম্ভু এক ভগ্ন পালঙ্কের উপর বসিলেন। এই সময় গৈরিক-বস্ত্রধারী একটী মোহান্ত আসিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শম্ভু। একখণ্ড হীরক আনয়ন করুন, ওজন ২ রতির ন্যূন না হয়। ইতিপূর্ব্বে দুই শত টাকা যে কারণে লইয়াছি, ইহাও সেই বিষয়ে খরচ লিখিতে অনুমতি করিবেন। আর একটা কথা আছে; দীনদুঃখীর বিবাহ নিমিত্ত কত টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ আছে?

মোহান্ত উত্তর করিলেন, "একলক্ষ টাকা।"

শম্ভু। উত্তম, এই টাকা অদ্য হইতে অনাথগৃহে বৎসর বৎসর ব্যয়িত হইবে, অনাথগৃহের বরাদ্দ বড় অল্প আছে।

মোহান্ত। অনাথগৃহে পাঁচ লক্ষ ব্যয় হইয়া থাকে।

শম্ভু। উত্তম, এক্ষণ হইতে ছয় লক্ষ ব্যয় হইবে।

মোহান্ত। মহারাজ যখন বিবাহের বিষয়ে এই টাকা বরাদ্দ করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, যুবামাত্রেরই বিবাহ হওয়া উচিত; সময়ে বিবাহ না হইলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বভাব কলুষিত হয়, সংসার না থাকিলে সমাজ থাকে না; অবিবাহিত অবস্থা ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

শম্ভু। এ সকল কথা বলিয়া থাকিব, কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে আমার অন্যরূপ বিবেচনা হইয়াছে।

মোহান্ত। যখন মহারাজ অজ্ঞাতবাস হইতে আসিলেন—

শম্ভু। এখনও আমার অজ্ঞাতবাস। বোধ হয়, আপনার বলিবার অভিপ্রায় যে, যখন আমি পশ্চিম দেশ হইতে পুনরায় বাঙ্গালায় আসি।

মোহান্ত। আমি তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যখন মহারাজ পশ্চিম হইতে আসিয়া রাজকুমারীর কোন উদ্দেশ পাইলেন না—

এই কথায় শম্ভু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজকুমারীর নাম আর আমার সাক্ষাতে উল্লেখ করিবেন না।" এই বলিয়া শম্ভু উরুর উপর উরু রাখিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক ধরিয়া অতি তীব্রদৃষ্টিতে দীপশিখার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শেষে স্মরণ হইল, হঠাৎ উঠিয়া রামদাসকে বলিলেন, "পাল্কী লইয়া শীঘ্র মুরগ্রামে যাও, তাহার দক্ষিণপাড়ায় একস্থানে তিনটী দেবদারু বৃক্ষ আছে, সেইখানে যে বাটীর দ্বারে দেখিবে, একটী আম্রশাখা ঝুলিতেছে, আর তোমার নামের আদ্যাক্ষর ইষ্টকখণ্ডে লিখিত আছে, সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যে রুগ্ন পুরুষকে দেখিবে, তাহাকে পাল্কীতে তুলিবে। তাহার নাম বিনোদ, সেখানে আর কেহ নাই। বিনোদকে নৌকা করিয়া ভুবনপুরে লইয়া আমার বৈঠকখানায় রাখিবে, চিকিৎসা করাইবে; তাহাকে আমার কোন পরিচয় দিও না; সে আমাকে শম্ভু-কয়েদী বলিয়া জানে, তাহার সেই বিশ্বাস রাখিবে। আর আর যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি সময়ে লিখিয়া পাঠাইব। কিন্তু সাবধান, বিনোদকে যে তোমরা স্থানান্তরিত করিলে, ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে; প্রতিবাসীরা জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে লইয়া যাইবে।"

রামদাস, বেহারা সমভিব্যাহারে চলিয়া গেল এই সময় মোহান্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শম্ভুর হস্তে হীরকখণ্ড আনিয়া দিলেন। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি আর কত আছে?" মোহান্ত উত্তর করিলেন, "অতি অল্প আছে।" শম্ভু আর অপেক্ষা করিলেন না, সত্বর চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শম্ভু এক সঙ্গীন ডাকাতি মোকদ্দমায় কয়েদ হইয়াছিলেন, তথাপি জেলদারোগা কখন কখন শম্ভুকে ডাকাত নহে বলিয়া ভাবিতেন। একদিন তিনি গোপনে শম্ভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শম্ভু তাহাতে উত্তর করিলেন, "আমাকে আপনার কি বোধ হয়?" জেলদারোগা বলিলেন, "তোমার শক্তি, সাহস, দৃষ্টি প্রভৃতি দেখিয়া তোমাকে ডাকাত বলিয়াই আমার প্রতীতি হয়; কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, বিশেষতঃ দুখানি পা দেখিলে, আমার সন্দেহ জন্মে। আমি অনেক ডাকাত দেখিয়াছি, এই হাতে অনেক ডাকাতকে ঘুসা মারিয়াছি, কিন্তু কখন কাহারও এরূপ পা দেখি নাই; দেখিলেই বোধ হয়, তোমার পা কখন কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই; বোধ হয় যেন কোমল জুতা পরা তোমার সর্ব্বদা অভ্যাস ছিল; কিন্তু ডাকাতেরা ত কখন জুতা পরে না; তাহাদের পা পুরু, ফাটা, বাঁকা, কঠিন, তাহাদের পায়ে কাঁটা ফুটে না, কিন্তু দেখি-

তেছি, তোমার পায়ে ঘাসের আগাও বিঁধিতে পারে। অন্য ডাকাতের সহিত তোমার এ প্রভেদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না।" শম্ভু বলিলেন, "আমি ডাকাতি মোকদ্দমায় জেলখানায় আসিয়াছি, অতএব আমাকে ডাকাত ভিন্ন অন্য ভাবা অনর্থক; ডাকাত যদি ধনী হয়, তবে এক জোড়া জুতা পরিয়া পা রক্ষা করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?"

জেলদারোগা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন; শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শম্ভু তুমি আমায় প্রতারণা করিও না, নিশ্চয় করিয়া বল, তুমি ডাকাত কি না?" শম্ভু বলিলেন, "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমাকে ডাকাত বিবেচনা করা উচিত।"

জেলদারোগা বলিলেন, "তুমি যদি ডাকাত, তবে তোমার অধীন লোক অবশ্য ছিল, তাহারা এক্ষণে কোথায়?"

শম্ভু বলিলেন, "তাহারা এক্ষণে কোথায়, আমি জেলে থাকিয়া কিরূপে বলিব?" জেলদারোগা বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি যদি কোন রাত্রে এই জেল হইতে পলাইতে পাও, তাহা হইলে কি কর? তুমি কি আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ডাকাতি কর?"

শম্ভু বলিলেন, "করি।"

জেলদারোগা বলিলেন, "তোমার আর কে আছে?"

শম্ভু উত্তর করিলেন, "আমার আর কেহ নাই, সকল ডাকাতেই যে সংসার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ডাকাতি করে, এমত নহে; অনেকে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, কাজেই ডাকাতি করে। ডাকাতির পরামর্শ, অনুসন্ধান, লোকযোজনা প্রভৃতি কার্য্য আমার মত লোকের পক্ষে বড় সুখের; আবার ডাকাতির সময় আরও সুখ। আপনারা ইংরেজ, বুঝিতে পারিবেন, দশ হাজার ফৌজ লইয়া আপনারা যখন একটী কেল্লা চড়াও করেন, বলুন দেখি, তখন সেই ফৌজের মধ্যে যাহারা বীরপুরুষ, কত সুখ হয়? সেই মুহুর্মুহুঃ তোপের কোন বীরপুরুষের অন্তর বাজিয়া না উঠে? ন কে আগে কেল্লায় উঠিবে, এই লইয়া পরস্পর মধ্যে প্রতিযোগিতা জন্মে, চারিদিকে গুলি- হইতেছে, তথাপি গ্রাহ্য নাই, চারিদিকে কামান কার করিয়া বজ্রবর্ষণ করিতেছে, তাহাতে কাহা- ভয় নাই বরং বীরেরা তাহাতে আরও মাতিয়া ঠে; আমাদের দেশে ডাকাতিতে সেইরূপ মাতামাতি আছে। আমরা যুদ্ধে যাইতে পাই না, কিন্তু আমাদের সে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ডাকাতি করিয়া সে বীরবৃত্তির কতক শমতা করি। আমরা দশহাজার ফৌজ লইয়া কেল্লা লুটিতে যাই না, দশজন কি পনেরজন একত্রে যাই এবং দশ পনের জনের উপযুক্ত কেল্লা দখল করি। কিন্তু দশ জনে গৃহস্থের ঘরই আক্রমণ করা যাক, কিংবা দশজনে কেল্লাই আক্রমণ করা যাক, সাহসীর সুখ উভয় স্থলেই সমান। ডাকাতির পর আরও সুখ আছে; পুলিসের চক্ষে ধূলা দিতে যে কৌশল আবশ্যক, তাহার চালনার অনেক সুখ হয়, কিন্তু এক্ষণে যদি আমি কোন রাত্রে গিয়া ডাকাতি করি, তাহা হইলে সেই সুখে বঞ্চিত হইব।"

জেলদারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বঞ্চিত হইবে?" শম্ভু উত্তর করিলেন, "পুলিসের চক্ষে ধূলা দিবার নিমিত্ত আমায় কোন কৌশল করিতে হইবে না, আমি জেলখানায় আছি, আমায় কেহ সন্দেহ করিবে না, আমায় নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমার সুখ আর কই হইল?" জেলদারোগা সে দিন আর কোন কথা বলিলেন না, অন্যমনস্কে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

আর একদিন সন্ধ্যার সময় শম্ভুকে গোপনে লইয়া গিয়া জেলদারোগা আপনার ঘরে বসাইলেন; অন্যান্য দুই একটী কথার পর বলিলেন, "তুমি যে সে দিবস বলিতেছিলে যে, এক্ষণে জেল হইতে গিয়া ডাকাতি করিলে কেহ তোমার প্রতি সন্দেহ করিবে না, এ কথা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তুমি ঠিক বলিয়াছিলে; যদিও কোন গতিকে কেহ তোমাকে চিনিতে পারে, তথাপি কেহ তাহা মুখে আনিতে পারিবে না।"

শম্ভু বলিলেন, "পাকা ডাকাতকে চিনিবার সাধ্য কাহারও নাই; অন্য লোকে চেনা দূরে থাকুক, দলের লোক সকলে জানিতে পারে না; দলে কে কে আসিয়াছে, আর কে কে আসে নাই, সে তত্ত্ব লইবার ক্ষমতা সকলের নাই। দলস্থ অধিকাংশ লোক সাঙ্কেতিক স্থানে একে একে গিয়া অন্ধকারে জমিতে থাকে। তখন সর্দ্দারের নায়েবস্বরূপ যে থাকে, কেবল তাহার স্বর চিনিতে পারিলেই, তাহারা সন্তুষ্ট হয়, আর কেহ কাহারও তত্ত্ব লয় না, তত্ত্ব লইবার সময়ও থাকে না; অতি অল্পক্ষণ সাঙ্কেতিক স্থানে থাকিতে হয়, তাহার পরই কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন কে কার অনুসন্ধান করে?" জেলদারোগা

বলিলেন, "তবে ত এক্ষণে তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া ডাকাতি করিতে পার।" শম্ভু বলিলেন, "তাহা পারি সত্য, কিন্তু জেলখানা হইতে যাইতে পারি কই ?"

জেলদারোগা বলিলেন, "যদি আমি যাইতে দিই, তাহা হইলে তুমি আমাকে কি দিবে ?"

শম্ভু বলিলেন, "যাহা আমি উপার্জ্জন করিব, তাহার অর্দ্ধেক দিব। অথবা প্রত্যেক রাত্রের নিমিত্ত দুইশত করিয়া টাকা দিব, ইহার অধিক পাই, আমার থাকিবে; ইহা অপেক্ষা অল্প পাই, আমার পূর্ব্বসঞ্চয় হইতে আপনাকে পূরণ করিয়া দিব।"

জেলদারোগা বলিলেন, "আমি স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমায় ছাড়িয়া দিলে তুমি যদি আর ফিরে না আইস, তখন কি হইবে ?"

শম্ভু উত্তর করিলেন, "এ সন্দেহ আপনি অবশ্যই করিতে পারেন, কিন্তু আমি যে পলাইব না, তাহার জামিন আমার কথা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না; আমি হিন্দু, মিথ্যা কথা আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি মিথ্যাবাদী হইলে কখন অন্যে আমাকে সর্দ্দার বলিয়া গ্রহণ করিত না; তাহারা ডাকাত সত্য, কিন্তু তাহারা কাপুরুষকে ঘৃণা করে, মিথ্যা কথা কেবল কাপুরুষের অবলম্বন। আমার কথার উপর নির্ভর করা না করা আপনার ইচ্ছাধীন, সাহস করিয়া আমায় ছাড়িয়া দিতে পারেন, লাভ আপনার নিজের, না পারেন, তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই।"

জেলদারোগা বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন, পরে উঠিয়া ঘরের মধ্যে আবার অনেকক্ষণ বেড়াইলেন, শেষ শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কিঞ্চিৎকাল তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "শম্ভু তুমি বীরপুরুষ, আমি ইংরেজ, বীরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি, তোমার কথায় বিশ্বাস করিলে আমাকে যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না, তাহা একপ্রকার নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি; অতএব তুমি যে রাত্রে ইচ্ছা কর, সেই রাত্রেই যাইতে পারিবে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণে আমায় না জানাইলে আমি তাহার উদ্যোগ করিতে পারিব না। মেম-সাহেবের নিমিত্ত আমি নিতান্তই দায়গ্রস্ত হইয়াছি; তাহাতেই তোমাকে মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলাম, কিন্তু দেখ, যেন আমি মারা না পড়ি।"

শম্ভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে বিষয়ে আপনার কোন ভয় নাই।"

সেই দিন হইতে শম্ভু এক প্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন, যে দিন ইচ্ছা, সেই দিন জেলখানা হইতে বহির্গত হইতেন, কেবল একবার সন্ধ্যার সময় জেলদারোগাকে জানাইতে হইত; জেলদারোগা তাঁহার অগম-নির্গমের উপায় করিয়া দিতেন। এই জন্য যে দিন বিনোদ জেলখানা হইতে মুক্ত হন, সেইদিন শম্ভু অনায়াসেই বিনোদের বাটী যাইতে পারিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামের ভগ্ন অট্টালিকমধ্যে রামদাস সন্ন্যাসী আর মোহান্ত বাস করিতেন, শম্ভু শৈলকে সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামে গিয়াছিলেন। রামদাসের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া শৈল-সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলে, রামদাস শৈলকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

শৈল প্রথমে কোন উত্তর দিল না, মস্তক ফিরাইয়া শম্ভুকে দেখিতে লাগিল। শম্ভু দৃষ্টির বাহির হইলে, শৈল সন্ন্যাসীর কথায় কর্ণপাত করিল না। সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

শৈল ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় যাইব ? কেন যাইব, কে তুমি ?" শম্ভু যে দিকে গিয়াছেন, সেই দিক্ দেখাইয়া রামদাস বলিলেন, "আমি ঐ প্রভুর অনুমত্যানুসারে বলিতেছি, আমার সঙ্গে আইস।"

শৈল। আমি যদি না যাই ?

রা। তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।

শৈ। এখানে তোমার সঙ্গে আর কে আছে ?

রা। অনেকে আছে।

শৈ। কয় জন ?

রা। বাইশ জন।

শৈ। তবে চল।

শৈলকে সঙ্গে লইয়া রামদাস সম্মুখস্থ এক দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শৈল দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। রামদাস বলিলেন, "আইস।" শৈল বলিল, "আবার কোথায় ?" রামদাস ভিত্তিপার্শস্থ সোপান দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে চল।" শৈল সদর্পে মন্দিরের উপর স্তবকে গিয়া আর একটী দেবমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে, রামদাস তাহার চক্ষু বাঁধিয়া কয়েকবার প্রতিমা বেষ্টন করাইয়া হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আবার চল।" শৈল আর কোন আপত্তি করিল না, কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিল

না, পূর্ব্বমত দর্পিতভাবে চলিল। কয়েক পদ যাইয়া শৈল বুঝিতে পারিল, সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে। যে সোপান দিয়া উঠিয়াছিল, সেই সোপান কি অন্য সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু জিজ্ঞাসাও করিল না।

সোপান অবতরণ করিয়া শৈল অনুভব করিল যে, কোন প্রস্তরময় পথ দিয়া চলিতেছে। আবার পরক্ষণেই অনুভব করিল, পথটী প্রশস্ত নহে। উভয় দিকে প্রস্তরময় প্রাচীর আছে। ক্ষণবিলম্বে সিক্ত মৃত্তিকার দুর্গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ক্রমে সেই গন্ধ আরও প্রবল হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া শৈল বলিল, "সন্ন্যাসি! কোথায় লইয়া যাও, আমার শ্বাসরোধ হয় যে।" রামদাস তখন শৈলের চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া বলিল, "আর একটু যাইতে হইবে।"

শৈলের চক্ষুর বন্ধনমোচন হইল সত্য, কিন্তু শৈল কিছুই দেখিতে পাইল না। পথ অন্ধকার-ময়। সন্ন্যাসীর পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া শৈল যাইতেছিল, হঠাৎ শব্দ স্থগিত হইল। শৈল ভাবিল, সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছে, অতএব দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক বিলম্বে জিজ্ঞাসা করিল, "সন্ন্যাসি, দাঁড়াইলে কেন?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিল না। আবার শৈল সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এবারও উত্তর পাইল না। শৈল ফিরিল, ফিরিয়া দেখে, পশ্চাতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে—পথপ্রমাণ [illegible] পথরোধ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখে, প্রস্তরময় প্রাচীর। বাম দিকেও সেইরূপ, কেবল সম্মুখে খোলা আছে, কিন্তু বড় অন্ধকার। উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া দেখে, আকাশনক্ষত্র কিছুই দেখা যায় না, সকলই অন্ধকার। শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হইল। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া শৈল ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "সন্ন্যাসি! আমি কি এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব? না আর কোথায় আমায় যাইতে হইবে? এস্থানে আমার শ্বাসরোধ হইতেছে। এ কি প্রস্তরময় গর্ত্তে আনিয়া আমায় রুদ্ধ করিলে?" শৈলের প্রশ্নে কেহ উত্তর দিল না। শৈল ক্ষণেক কর্ণ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ উত্তর দিল না; কোন শব্দ নাই, তখন শৈল সম্মুখে হস্ত প্রসারিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অল্পদূর আসিলে, শৈলের অঙ্গে প্রাতর্বায়ু স্পর্শ করিল। শৈল পুলকিত হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, "ভয় নাই, শীঘ্র মরিব না; সম্মুখে অবশ্য বায়ুর পথ আছে।" অতএব তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু কয়েক পদ না যাইতে যাইতেই প্রাচীর-স্পর্শ হইল। শৈল বাম দিকে ফিরিয়া আবার কয়েক পদ গেল, সে দিকেও পূর্ব্বমত প্রাচীর-স্পর্শ হইল। এইরূপে শৈল চারিদিকে ফিরিল। চারিদিকেই প্রস্তরময় প্রাচীর; কোথায় বায়ুর পথ, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু শৈলের নিশ্চয়ই বোধ হইল যে, প্রস্তরময় কোন ঘরে সে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অন্ধকারে নির্গমের পথ নির্ণয় করা কঠিন, অতএব দাঁড়াইয়া প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈলের অনুভব মিথ্যা নহে। যেখানে দাঁড়াইয়া শৈল প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা প্রস্তরময় একটী ক্ষুদ্র ঘরের অংশ বটে। কিন্তু ঘরটী মৃত্তিকার মধ্যে এত গভীর স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, কস্মিন্‌কালে তাহার ছাদে বৃক্ষের মূলস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রায় সহস্র বৎসর হইল, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন ধনী ব্যক্তি ধর্ম্ম-চিন্তা করিবার নিমিত্ত মৃত্তিকার ভিতর এই ঘর প্রস্তুত করেন। তথায় যাতায়াতের নিমিত্ত, তাঁহার শয়নঘর হইতে এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই সুড়ঙ্গের কিয়দংশ দিয়া শৈলকে যাইতে হইয়াছিল।

প্রথমে এই ঘরটী ধর্ম্মার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শেষে প্রায় তাহার বিপরীত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। আদিশূরের পূর্ব্বপুরুষ যিনি যখন আসামদেশীয় রাজাদিগকে পরাভব করিতে পারিয়াছেন, তিনিই তখন এই ঘরে পরাভূত রাজার বাস-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং তদুপযোগী করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এই ঘরের অনেক পরি-বর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

ভূগর্ভস্থ এই ঘরটীর পূর্ব্বদিকে একটী বেগবতী নদী প্রবাহিত ছিল, সেই নদী হইতে এই ঘরের উর্দ্ধভাগ কতক দেখা যাইত, কিন্তু সে ভাগ এরূপ নির্ম্মিত ছিল যে, তাহা কেহ চিনিতে পারিত না।

নদীর এই অংশে 'বুড়ির ঘোল' নামে এক আবর্ত্ত ছিল, তাহার ভয়ে কোন নৌকা ঐ অংশ দিয়া যাইতে সাহস করিত না।

প্রাতঃকাল হইলে শৈল দেখিল যে, ঘরটী সমুদয় বড় বড় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ছাদে কড়ি-বরগা নাই, কেবল একটী খিলান, তাহাও প্রস্তরময়। খিলানের নীচে পূর্ব্বদিকে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া প্রাতর্বায়ু আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ঐ গবাক্ষদ্বার দিয়া কি দেখা যায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত শৈল চেষ্টা করিল, কিন্তু তত ঊর্দ্ধ স্থানে উঠিবার কোন উপায় দেখিল না। পরে শব্দ দ্বারা স্থানটী অনুভব করিতে পারিবে বলিয়া, শব্দানুসন্ধানে কর্ণপাত করিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না; ভাবিল, "বেলা হউক, লোকজন যাতায়াত করিলেই বুঝিতে পারিব।"

ক্রমে অল্প বেলা হইল। গবাক্ষদ্বারের সম্মুখে সূর্য্য উঠিলে ঘরের পশ্চিম দিকে সূর্য্যকিরণ লাগিল এবং তাহার প্রতিঘাতে ছাদের খিলান পর্য্যন্ত বিলক্ষণ আলোকবিশিষ্ট হইল। শৈল দেখিল, খিলানের দুই একখানি প্রস্তর ঈষৎ নামিয়াছে এবং তাহার পার্শ্ব দিয়া বর্ষাসিক্ত কর্দ্দম, স্থানে স্থানে নয়নাশ্রুর ন্যায় পড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; কোথাও কোথাও যেন শ্বেত ফেন শুকাইয়া রহিয়াছে। শৈল এ সকল একবারমাত্র দেখিয়া আবার গবাক্ষদ্বার প্রতি চাহিয়া রহিল, ঐ দ্বার দিয়া কি দেখা যাইবার সম্ভাবনা, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। বেলা হইয়াছে, তথাপি মনুষ্যের শব্দ শুনা গেল না। কেবল দূরে অস্পষ্ট কোলাহল ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই। শৈল ভাবিল, "এ দিকে বসতি নাই গতিবিধির পথও নাই, বোধ হয়, কেবল মাঠ হইবে।" অপর তিন দিকে যে বসতি আছে, তদ্বিষয়ে শৈল প্রথমে কোন সন্দেহ করে নাই। কিন্তু ক্রমে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল। ভাবিল, "যদি এ সকল দিকে বসতি থাকে, তবে মনুষ্যের কণ্ঠ কেন শুনা যায় না?" শৈল জানিত না যে, যে ঘরে সে রহিয়াছে, তাহা ভূগর্ভে নির্ম্মিত। এখান হইতে স্পষ্ট শব্দ শুনিবার সম্ভাবনা নাই।

শেষে শৈলের মনে হইল যে, এখানে আসিবার সময় যে কয়েকটী ভগ্ন কুটীর দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে অধিক লোকের বাস নাই। ভাবিল, "এই জন্যই এখান হইতে সতত মনুষ্যশব্দ শুনা যায় না, কিন্তু নিকটে লোক অধিক বা অল্প থাকু,তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? নিকটে যাহারা বাস করে, তাহারা অবশ্য আমার শত্রু, নতুবা সন্ন্যাসী রাত্রে আমাকে এই গর্ত্তের মধ্যে আনিতে সাহসী হইত না। আমাকে একাকিনী পাইয়া সন্ন্যাসী তাহার বীরত্ব দেখাইয়াছে। কি বলিব, কল্য রাত্রে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, নতুবা সন্ন্যাসীর বীরত্ব দেখিতাম। আহা, কি ভুলই ভুলিছি। একবার যদি সন্ন্যাসীর চুল ধরিতাম, তবে সে নাকে খত দিয়া পলাইত। তখন ভাবিলাম, একটা সন্ন্যাসী আমার কি করিবে? এখন ত দেখিতেছি, আমাকে শিয়াল-কুকুরের ন্যায় পিঞ্জরে পুরিয়াছে—" এই ভাবিতে ভাবিতে শৈল দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরে দুইটী দ্বার। একটী পশ্চিম দিকে, আর একটী দক্ষিণ দিকে; উভয় দ্বারই এক্ষণকার সচরাচর দ্বারের ন্যায় দ্বিদল নহে, উভয়ই একদল এবং একখণ্ড লৌহ দ্বারা গঠিত। শৈল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুই একবার অতি তীব্র কটাক্ষে সেই লৌহময় রুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিল মাত্র, দ্বারের নিকট গেল না বা নির্ব্বোধের ন্যায় দ্বার ঠেলিল না। শৈল কক্ষ প্রান্তে একটী বেদির উপর যাইয়া বসিল, বসিয়া আবার একবার দ্বারের দিকে চাহিল। প্রস্তরের প্রাচীর, লৌহদ্বার ইত্যাদি দেখিয়া শৈল আপনার অবস্থা বুঝিয়াছিল, অতএব ভাবিতে লাগিল, "আমাকে কি সত্যসত্যই আবদ্ধ করিল? আমাকে কি আর ছাড়িয়া দিবে না? আমায় এখানে কতদিন থাকিতে হইবে? কেন থাকিতে হইবে? কার কথায় থাকিতে হইবে? সন্ন্যাসীর কথায়? সন্ন্যাসী ত কেহই নহে বুঝিতে পারিয়াছি, তবে যিনি রাত্রে আসিয়াছিলেন, তিনিই—" এই সময় শম্ভু-করেদীর আকৃতি শৈলের মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, শৈল নতশির হইয়া বসিল। শম্ভু স্বয়ং সেই ঘরে উপস্থিত হইলে, শৈলের যেরূপ ভাব হইত, সেইরূপ হইল। শৈল বালিকাকাল অবধি কখন ভয় পায় নাই, কখন কোন ভয়ানক দৃশ্য দেখে নাই; অথবা যদি কখন দেখিয়া থাকে, তাহাতে তাহার ভয় হয় নাই। রাত্রে শম্ভুকে দেখিয়া তাহার ভয়ের এই প্রথম সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে শম্ভুর চক্ষু মনে পড়িয়া সেই ভয় আরও স্পষ্টীকৃত হইল। শম্ভুকে ভুলিবার নিমিত্ত শৈল শরীর কুঞ্চিত করিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ভুলিতে পারিল না। শম্ভুকে মনের মধ্যে সভয়ে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, শৈলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শৈল উঠিয়া দুই হস্তে কেশবিন্যাস আরম্ভ করিল, তাহা সমাধা হইলে মুখ মুছিয়া দর্পণ লইবার নিমিত্ত একবার অন্যমনস্কে বামহস্ত প্রসারণ করিল, করিয়াই অমনি হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ দিকের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। কে মুক্ত করিল, কখন্ মুক্ত করিল, শৈল তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। মুক্ত দ্বার দিয়া কোথায় যাওয়া যায়, দেখিবার নিমিত্ত শৈল সেই দিকে গেল। যাইয়া দেখে, একটী ক্ষুদ্র ঘরে স্নানাদির উপকরণ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। শৈল প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া আর এক স্থানে দেখিল, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে। শৈল তথায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে অন্ন কে আনিলে? এ অন্ন আমি খাইব না, আমি বিধবা। হবিষ্য করিব, অথবা অনাহারী থাকিব।"

শৈলের এ কথায় কেহ উত্তর করিল না। শৈল দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল, কোনদিকে নির্গমের পথ দেখিল না। আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "কে অন্ন আনিয়াছ, লইয়া যাও, আমি বিধবা।" এই কথা বলিয়া শৈল যেন রাগভরে ফিরিয়া আসিল।

বেদির উপর বসিয়া শৈল দক্ষিণদিকের দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিল। এই সময় সেই দ্বার নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল, আর সমস্ত দিনের মধ্যে মুক্ত হইল না। শৈল অভুক্ত রহিল।

ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল, গবাক্ষদ্বার দিয়া যে পরিমাণে আলোক আসিতেছিল, তাহা ক্ষীণীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। হর্ম্ম্যতলে অন্ধকার গাঢ় হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শেষ শৈল বেদিতে শয়ন করিয়া, যেন অন্ধকারে ডুবিয়া অন্ধকারের তলস্পর্শ করিয়া রহিল।

পরদিবস প্রাতে শৈল হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া গবাক্ষদ্বারের দিকে চাহিয়া প্রভাতালোক দেখিতেছে; অনাহারে বড় দুর্ব্বল, উঠিতে আর বড় ইচ্ছা নাই, ...ই বা আর কি করিবে। শৈল নিশ্চয় করিয়া-... যে, রাত্রে সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে এই ঘর স্থানান্তরে লইয়া যাইবে বা অব্যাহতি দিবে, তাহা ও হয় নাই, সন্ন্যাসী ত আইসে নাই। একবার ভাবিল, "হয় ত সন্ন্যাসী রাত্রে ...ছিল, আমি নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, তাহার ...মনশব্দ শুনিতে পাই নাই।" আবার ভাবিল, "যদি সন্ন্যাসী সত্য সত্যই আসিত, তাহা হইলে, অবশ্য শব্দ দ্বারা আমার নিদ্রাভঙ্গ করিত। নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী আইসে নাই। কেন আইসে নাই? আমাকে এইখানেই রাখা তাহার অভিপ্রায়, আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি তবে কয়েদী। আমি তবে আর ইচ্ছা করিলে এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না। আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। কতদিন থাকিতে হইবে? তাহারও নিশ্চয় নাই।"

এই সময় একটী টিকটিকী গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। টিকটিকী হেলিয়া দুলিয়া দুই এক পদ যায়, আবার মাথা তুলিয়া দেখে; এইরূপে গৃহগোধিকা প্রাচীর দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। শৈলের ইহা অসহ্য হইল, বেদি হইতে লম্ফ দিয়া শৈল টিকটিকীকে আঘাত করিল। টিকটিকী ভূমিতলে পড়িয়া চীৎ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শৈল তখন তাহাকে পদতলে দলিত করিয়া বলিল, "কেমন, এখন ইচ্ছামত যাতায়াত কর। আমি কয়েদী, আর এই সামান্য টিকটিকী স্বাধীন! ইচ্ছামত এই ঘরে গতায়াত করে! এই ঘরে আমাকে আবদ্ধ করিল, কিন্তু এই পোড়া ক্ষুদ্র জন্তুকে কয়েদ করিতে পারিল না। যত যন্ত্রণা আমারই জন্য ছিল।"

এই বলিয়া শৈল গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিতে লাগিল। টিকটিকীর ছিন্ন লাঙ্গুল স্বতন্ত্র স্থানে পড়িয়া নাচিতে লাগিল। ক্রমে লাঙ্গুল নির্জ্জীব হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল। শৈল তখনও সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিলাসবাবু প্রাচীরের উপর ভীমাকৃতি দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলেন, সেখানে শৈল কি আর কেহই নাই, কেবল মৃতদেহ তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। বিলাসবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া যথাসাধ্য বেগে পলাইলেন। আপনার গৃহে যাইয়া শয়নকক্ষের সমুদায় দ্বার জানেলা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। তখন কোনক্রমে মন স্থির করিয়া প্রাচীরের উপর আকাশপটে যে মূর্ত্তির কতক আভাস চিত্রিত দেখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, প্রাচীরে কেবল মনুষ্যাকৃতিই দেখিয়াছিলেন। আবার ভাবিলেন, "না, আর কি হইবে।" বিলাসবাবু বাস্ত-

বিক সে মূর্ত্তিটী বিশেষ করিয়া দেখিতে পারেন নাই, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে ভয় সঞ্চারিত হইয়াছিল; একে রাত্রিকাল, তাহে নিকটে মৃতদেহ চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছে, আবার তিনিই সেই দেহের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন। বিলাসবাবু নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারই পদদলিত হইয়া বিনোদের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অতএব ভয়ে তাঁহার অন্তর কম্পিত হইতেছিল। এই অবস্থায় সামান্য উপলক্ষ হইলেই তিনি মূর্চ্ছা যাইতেন, যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বেশীর ভাগ।

বিলাসবাবু যাহা দেখিয়াছিলেন, শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি ভয়ানক হইতে লাগিল; ক্রমে ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল; শেষ বিলাসবাবু চক্ষু মুদিলেন, তবুও বিকটমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, চক্ষু বোজা বৃথা হইল। মনশ্চক্ষে এই সকল মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন, দৈহিক চক্ষু মুদিলে কি হইবে? বরং চক্ষু মুদিয়া বিলাসবাবু আরও বিষম করিলেন, ভয়ে আর চক্ষু খুলিতে পারিলেন না; তখন ঘরের ভিতর চারিদিকে সেই সকল বিকটমূর্ত্তি রহিয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি যেন তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। তাঁহার শয্যার চারিদিকে বসিতে লাগিল। বসিয়া যেন একবার পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বিলাসকে দেখাইল; তাহার পর যেন একবাক্যে সকলেই মাথা নামাইয়া গলা বাড়াইয়া বিলাসের মুখের নিকট তাহাদের নাসা আনিল; তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুনা যাইতে লাগিল; ক্রমে বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের নাসা বিলাসের মুখের উপর আসিয়াছে। মুখস্পর্শ করে নাই, অল্প, অতি অল্প, ব্যবধান আছে, স্পর্শ করিতে আর বিলম্ব নাই। তখন বিলাসবাবু ঘর্ম্মাক্ত, কম্পিত, শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। বিকট আকারেরা যেন দন্ত দেখাইয়া হাসিয়া উঠিল। বিলাসবাবু আবার মূর্চ্ছা গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে বিলাসবাবুর জ্ঞান হইল; তখনও মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক রহিয়াছে, কিন্তু কিসের নিমিত্ত সে আতঙ্ক, তাহা বড় স্মরণ নাই; ক্রমে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; ঘরের ছিদ্র দিয়া ঘরে সূর্য্যকিরণ আসিয়াছে পার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি দেখিয়া জানিলেন যে, তাঁহার আপন শয়নকক্ষেই আছেন; পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা তখন একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। আদ্যোপান্ত সকল স্মরণ হইলে, ভাবিতে লাগিলেন, "শেষ যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা কি ভৌতিক? ভৌতিক ভিন্ন আর কি সম্ভবে? মনুষ্য কে এমন আছে যে, সেই সময়ে হঠাৎ উপস্থিত হইবে? শৈলের বাড়ীতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা সেই রাত্রে অনুসন্ধান করিবার জন্য কাহার প্রয়োজন পড়িবে? অতএব অবশ্য কোন ভৌতিক ব্যাপার হইয়াছিল। নতুবা শৈল কোথা গেল। শৈলকে কোথায় লইয়া গেল, লইয়া কি করিল, তাহাকে কি বধ করিয়াছে? না—বোধ হয়, এই ব্যাপার ভৌতিক নহে, যদি তাহা হইত, তবে মৃত দেহ পড়িয়া থাকিত না, শুনিয়াছি, শবের সহিত ভূতের নিকট সম্বন্ধ আছে, ভূতের আবির্ভাব হইলে মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। যে ব্যক্তি আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি চোর নহে, শৈলের কি ছিল যে, চোর কষ্ট পাইয়া আসিবে? বিশেষ যদি চোর আসিত, তাহা হইলে প্রদীপ আর আমাদের দেখিয়া কদাচ সে অপেক্ষা করিত না, প্রথম উদ্যমেই পলাইত। কিন্তু যদি চোর না হইল, শৈল অথবা বিনোদের কোন আত্মীয়স্বজন না হইল, তবে কে? তবে কি পুলিসের লোক আসিয়াছিল? মৃতদেহ দেখিয়া শৈলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি যে খুন করিয়াছি, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, বোধ হয়, আমাকে দেখিতেও পায় নাই। কিন্তু না দেখুক, শৈল বলিয়া দিবে, সে অনায়াসে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। বিশ্বাসঘাতিনী নিশ্চয়ই আমার নাম করিবে। তাহা হইলেই আমি গেলাম। খুন করিয়াছি, আমিই খুন করিয়াছি। ফাঁসি—"

ফাঁসির আনুসঙ্গিক একেবারে সমস্তই মনে পড়িল; চারিদিকে কনেষ্টবল, মেজেষ্টর ও অন্যান্য লোক, মধ্যস্থানে মঞ্চ, তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানাবলী, ঊর্দ্ধে দড়ি দুলিতেছে। বিলাসবাবু অমনি আপনার গলায় একবার হাত দিলেন, ভাবিলেন, এইবার আমার শেষ হইল, গোপালবাবু প্রভৃতি সকলেই এই পৃথিবীতে সুখভোগ করিবে, কেবল আমিই গেলাম। শৈলের সহিত আলাপ হইবার পূর্ব্বে আমি ত সুখী ছিলাম! কত সুখী ছিলাম! এখন আমার দশা কি হইল।" ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল আসিল, "বিনোদ বিনোদ!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ক্রন্দনধ্বনি বিলাস বাবুর মাতৃষ্বসার কর্ণে গেল, তিনি কর্ম্মান্তরে বিলাসবাবুর শয়নকক্ষের নিকট আসিয়াছিলেন। শব্দ শুনিয়া দ্বার ঠেলিলেন। দ্বার বন্ধ; বিলাসকে ডাকিলেন, বিলাস ভগ্নস্বরে উত্তর দিলেন। তাঁহার মাতৃষ্বসা ভাবিলেন, বিলাস স্বপ্নে কাঁদিতেছে—অতএব আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিলাসবাবু গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, বেলা বড় প্রহর অতীত হইয়াছে। ভাবিলেন, "এত বেলা হইয়াছে, অথচ কেহ আমাকে ডাকে নাই, মাসী আমার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অবশ্য আমার প্রতি সকলের কিছু মন ভার হইয়াছে, রাত্রের ব্যাপার সকলে জানিতে পারিয়াছেন। পুলিসে সংবাদ পাঠাইয়াছে বলিয়া, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা; পুলিস জানিতে পারিলে এত বেলা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিত না, প্রত্যুষে আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিত। কেবল এই গ্রামবাসীরা যদি জানিয়া থাকে, তবে বোধ হয় সংকারের নিমিত্ত বিনোদকে নদীকূলে লইয়া গিয়াছে।"

এই মনে করিয়া বিলাসবাবু ছাদের উপর উঠিলেন। তথা হইতে বিনোদের গৃহাভ্যন্তর কিছুই দেখা যায় না, কেবল প্রাঙ্গণস্থ আম্রবৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগ দেখা যায়। তথায় শকুনি প্রভৃতি মাংসভুক্ পক্ষি দেখিতে পাইলেন না, কুক্কুরদিগের কলহধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, অতএব মনে করিলেন যে, "তবে বিনোদকে সংকারের নিমিত্ত প্রতিবাসীরা লইয়া গিয়াছে।" আবার ভাবিলেন, "আমিও ত প্রতিবাসী এবং আত্মীয়, আমাকে ডাকে নাই, তাহাতেই বোধ হইতেছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে, নতুবা আমাকে ডাকিত।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিলাস ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া আপন কক্ষে যাইতেছিলেন, এমত সময় পথে কনিষ্ঠা সহোদরার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক রাত্রের মধ্যে বিলাসের মুখমাধুরী একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চর্ম্ম শুষ্ক হইয়াছে, চক্ষু তেজোহীন, কেশ রুক্ষ এবং কণ্টকবৎ হইয়াছে, বিলাসবাবু যেন চিরদিনের রোগী। তাঁহার ভগিনী হঠাৎ তাঁহার এই বিবর্ণতা দেখিয়া তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। জ্ঞানতঃ কখন জ্যেষ্ঠের সম্মুখে মুখ তুলে নাই, অদ্য চাহিয়া রহিল। বিলাস ভাবিলেন, "সহোদরাও জানিয়াছে, তাহারও আমার প্রতি ঘৃণা হইয়াছে।"

বিলাস সত্বরে আপন ঘরে লুকাইলেন, কিঞ্চিৎ বিলম্বে জানেলার রন্ধ্র দিয়া দেখিলেন, পাকশালার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটী প্রতিবাসীর কন্যা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে, আর একবার একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে। বিলাসবাবু নিশ্চয় বুঝিলেন, তাঁহারই কথা হইতেছে। এই সময় তাঁহার সহোদরা আসিয়া ওষ্ঠাধরমধ্যে অঙ্গুলাগ্র দিয়া একদৃষ্টে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিলাসের সন্দেহ হইল যে, নিশ্চয়ই তাঁহার কথা হইতেছে।

আবার অনেক বিলম্বে জানেলা খুলিয়া দেখেন, পথে স্থানে স্থানে দুই চারিজন লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। বিলাস ভাবিলেন, "অন্যদিন লোকে এত কথাবার্ত্তা কহিত না, অদ্য সকলে কেবল আমারই কথা কহিতেছে আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি।"

বিলাসবাবু অতি ব্যথিত হইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। এই সময় একজন বৃদ্ধা অপরের সহিত কলহ করিয়া পথিমধ্যে আপনা-আপনি দুই একটী তিরস্কার ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছিল। বিলাসবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন, বৃদ্ধার কেবল এই কথাগুলি শুনিতে পাইলেন, "অমন লোকের গলায় দড়ি, ছি! যারে হাড়ি বাগ্দীতে গালি দেয়, ঝাঁটা মারিতে চায়, তার আবার বাঁচা কেন?" বিলাসবাবু ভাবিলেন, "এই গালি লোকে পথে আমারই উদ্দেশে দিতেছে। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তবে আর কখন বাটীর বাহির হইতে পারিব না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে, দেঁতোর মা গোপালবাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার পরিবারকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিল। গোপালবাবুর স্ত্রী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেঁতোর মা, তুমি এতদিন কোথা ছিলে?"

দেঁতোর মা উত্তর করিল, "আমি জেলখানার নিকটে একটী গৃহস্থের বাটীতে আছি, আমাদের বাবুকে দেখিতে পাব বলে, সেইখানে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, একান্ত দেখিতে না পাই, তথাপি তাঁহার নিকটে আছি, এই মনে করিতে পারিলেও আমার সুখ হবে। প্রথম প্রথম তাঁকে দেখিতে

পাই নাই; এক একদিন জেলখানার ভিতর সন্ধ্যার সময় বড় গোল হইত; কেন গোল হইত, তখন আমি তাহা জানিতাম না, কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিত; কত দেবতার নিকট মানিতাম, যেন আমাদের বাবুর আবার কোন বিপদ্ না ঘটে।" এই বলিতে বলিতে দেঁতোর মা অঞ্চল দিয়া আপনার চক্ষের জল মুছিল, তাহার পর বলিতে লাগিল, "একদিন বাবুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অন্য কয়েদীর সঙ্গে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। একে স্বভাবতঃ শান্ত, তাতে লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছেন। অন্য কয়েদীরা হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে আসিল, আসিয়াই ঝুপ্ ঝাপ করিয়া জলে পড়িল, কেহ সাঁতার দিতে লাগিল, কেহ গীত গাইতে লাগিল, কেহ জল ছড়াইতে লাগিল, পুকুর একেবারে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। আমাদের বাবু ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, কোন দিকে ফিরেও চাহিলেন না, কাহারও সহিত কথাও কহিলেন না, পোড়া লোকেরা কেহ একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসাও করিল না। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 'হে ঠাকুর, বাবু একটা কথা কহেন ত আমার কাণ জুড়ায়, একবার একটু হাসেন ত আমার প্রাণ জুড়ায়। ও মুখ কখন হাসি-ছাড়া ছিল না।' হাসি দূরে থাক, একটী কথাও কহিলেন না, পরে বাবু জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। আমি দাঁড়াইয়া মুখখানি দেখিতে লাগিলাম; শেষ যখন বাবু হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের দিকে মাথা তুলিলেন, আমার বুক উথলে উঠিল। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম, বাবু মনোবেদনা সূর্য্যদেবকে জানাইতেছেন। আমিও সেইখানে কলসী রাখিয়া তেমনি করিয়া হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের কাছে কাঁদিলাম; 'বলি ঠাকুর, তুমিই এ সংসারে সত্য, তুমি সকল দেখিতেছ, রাতদিন করিতেছ; বাবু যে নির্দ্দোষী, তা জেনেও কেন আর দুঃখ দেও? ঠাকুর, যেমন করে তুমি অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাক, একবার তেমনি করে বাবুর শত্রু নষ্ট কর, দশে ধর্ম্মে দেখুক।' তার পর সন্ধ্যা করা হইলে, বাবু সকলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেই দিন ভিন্ন আর আমি বাবুকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যখনই বাবুর যোড় হাত মনে পড়িত, তখনই কেঁদে উঠিতাম।"

গোপালবাবুর পরিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখন সেখানকার চাকুরি ছেড়ে এসেছ?"

দেঁতোর মা বলিয়া উঠিল, "আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। যদিও বাবুকে আর দেখিতে পাই নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাবুর সংবাদ পাইতাম; বাবুর বড় শক্ত পীড়া হইয়াছিল। রোগ দেখে সাহেবেরা তাঁহাকে কাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কথা আজ প্রাতে শুনে তাই দৌড়ে এলাম; কিন্তু দেখা হল না, মাঠাকুরাণী এখনও দ্বার খুলেন নাই, পাছে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তাই বুঝি লজ্জায় দ্বার খুলেন নাই, তা হোক, খেদ মিটিয়ে একা সেবা করুন, আমি না হয় পরে সেবা করিব। তিনি যে এখন আপনার ধন চিনিতে পারিলেন, এই আমাদের সুখ। তা মা, আজ আর কোথা যাব, বলি, তোমার ঘরে একপাশে পড়ে থাকি।"

গোপালবাবুর স্ত্রী তাহাকে থাকিতে বলিয়া স্বামীর নিকট যাইয়া কহিলেন যে, "বিনোদবাবু বড় পীড়িত বলিয়া সাহেব তাঁহাকে খালাস দিয়াছেন। তিনি গত রাত্রে বাটী আসিয়া থাকিবেন, কিন্তু শৈল এ পর্য্যন্ত দ্বার খুলে নাই বলিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে, তুমি লোকদ্বারা একবার সংবাদ জান। আপনি স্বয়ং সে স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই।" গোপালবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় এ সংবাদ কে দিল?" তাঁহার পরিবার দেঁতোর মাকে দেখাইয়া দিলে, গোপালবাবু স্বগত প্রশ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। শৈল এ পর্য্যন্ত কেন দ্বার খুলে নাই, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রে বিনোদকে লইয়া যাইবার সময় রামদাস সন্ন্যাসী বাটীর ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন। এ সংবাদ কেহই জানিত না, সুতরাং সকলেই ভাবিয়াছিল, শৈলই দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরে রহিয়াছে। শেষ গোপালবাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া জনেক সরকার দ্বারা দারোগার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। গোপালবাবু আপন বাটীর সম্মুখে এক পুষ্পোদ্যানে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, নিকটে তাঁহার কন্যা দাঁড়াইয়া একটী গোবৎসের সহিত সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার ক্রীড়া দেখিতেছে; শিশু তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিতেছে, আবার বৎসটী পূর্ব্বরূপ দৌড়িয়া পলাইতেছে, আবার আসিতেছে। একবার একবার আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শিশুর মস্তকের নিকট নাসা বিস্তার করিতেছে; শিশু চক্ষু মুদিয়া কাঁদিয়া

উঠিতেছে; বৎস অতিভিত হইয়া অমনি পলাই-তেছে।

এই সময় বিলাসবাবু তথায় আসিলেন; আসিবার ভঙ্গী দেখিয়া গোপালবাবুর কন্যা তাঁহার আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। পদদ্বয় যেন অচল হইয়াছে, কিঞ্চিৎ বক্রভাবে ভূমিস্পর্শ করিতেছে। গোপালবাবুর কন্যা ভাবিল, "পায়ে বেদনা হইয়া থাকিবে।" বিলাসবাবুর সম্মুখদৃষ্টি ঘুচিয়া প্রায় পার্শ্বদৃষ্টি হইয়াছে। গোপালবাবুর কন্যা ভাবিল, "বিলাসবাবু টেরা হইয়াছেন।" বিলাসবাবু প্রায় পাঁচ ছয় মাস হইবে, গোপালবাবুর বাটীতে আসেন নাই।

বিলাসবাবু আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন,গোপালবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অল্প শব্দ করিলেন। গোপালবাবু তাঁহার প্রতি চাহিবামাত্র বিলাসবাবু বায়ুতে মাথা ঠুকিলেন, অর্থাৎ আধুনিক না-ইংরাজি-না-মুসলমানী কেতায় সম্ভাষণ করিলেন। গোপাল-বাবু অন্যমনস্কবশতঃই হউক, আর ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, সে সম্ভাষণ বড় গ্রহণ করিলেন না। বিলাস-বাবু ভাবিলেন, আমাকে গোপালবাবু চিনিতে পারেন নাই, অতএব দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া স্বর পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত দুই একবার কাসিলেন,পরে বলিলেন, "গোপালবাবু ভাল আছেন? কল্য রাত্রে আমি এখানে ছিলাম না, তাই ভাবিলাম যে,সে কথাটা একবার আপনাকে বলে আসি, আর একবার দেখা করে আসি, অনেকদিন দেখা হয় নাই।" গোপালবাবু ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "আপনি ভাল আছেন?" বিলাসবাবু কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "আমাকে 'আপনি' 'মহাশয়' এ সকল কথা কেন বলেন? পূর্ব্বে যখন ঐ বৈঠক-খানায় বসিয়া দিবারাত্রি তাস খেলা যাইত, তখন ত এ সকল শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; আমি আপনার ইয়ার-ইয়ার।"

এই সময় দারোগা, কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে গোপালবাবুর গেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিলাসবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি পলাইবার উদ্যম করিলেন। দারোগা উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "বিলাসবাবু পলাও কোথা?" বিলাসবাবু সত্য সত্যই পলাইলেন। যে দিকে গেট, সে দিকে কনেষ্টবলগণ বলিয়া অন্য দিকে ছুটিলেন, কিন্তু অল্প দূরে গিয়াই দেখেন, সম্মুখে প্রাচীর। বিলাসবাবু তাহা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। বিলাসবাবু কেন পলাইলেন, এ কথা গোপালবাবু কি দারোগা, কেহই বুঝিতে না পারিয়া, উভয়ে বিলাসবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বিলাসবাবু ভূমি হইতে উঠিয়া দেখেন, দারোগা নিকটে দাঁড়াইয়া। তখন অনন্যোপায় হইয়া বলি-লেন, "যখন আপনি সকলই জানিয়াছেন, তখন আর কতদূর পলাইব; আমি ধরা দিলাম, কিন্তু সত্য করে বলুন, আমার কি ফাঁসি হবে? আমি খুন করেছি সত্য, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কি জানত খুন করি নাই; অন্ধকারে বুকে পা দিয়াছিলাম, তাই বিনোদের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।"

গোপালবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তবে কি বিনোদ নাই!"

বিলাসবাবু বলিলেন, "বিনোদ নাই, কল্য রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, দারোগা-মহাশয় তা সকল জানেন।"

দারোগা-মহাশয় আর কোন উত্তর না করিয়া বিলাসকে গ্রেপ্তার করিলেন। সজোরে হাতকড়ি কসিতে, বিলাসকে লাগিল। বিলাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোলমাল শুনিয়া প্রতিবাসীরা চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের দুরদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই সংসারে সচরাচর ঘটে না। তজ্জনিত বিনোদের যে চিত্ত-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাও প্রায় সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিনোদের পক্ষে শৈল এ সংসারে একমাত্র গ্রন্থি ছিল; সে গ্রন্থি ছিঁড়িল। বিনোদের চক্ষে সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "সংসার অকারণ, পৃথিবী অকারণ, সৃষ্টিই অকারণ।"

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্র দ্বারা বিনোদের মনের অবস্থা কতক অনুভূত হইতে পারে। এই পত্রগুলি বিনোদ সময়ে সময়ে শম্ভুকে লিখিয়াছিলেন। কোন পত্রে শৈলের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহা না থাকুক, মনের যন্ত্রণায় যে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম পত্র।

যেখানে পাঠাইয়াছিলে, আমি সেইখানেই আছি। স্থানটী চমৎকার নির্জ্জন; যে কয় দিন

বাঁচি, ইচ্ছা হয় যেন এইখানেই থাকিতে পাই। পূর্ব্বদিকের জানেলা খোলা থাকে; পালঙ্কে শুইয়া আমি সেই দিকে চাহিয়া থাকি, কেবল পৃথিবী দেখি। আ[illegible], প্রান্তর, আর মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ ব্যতীত এ দিকে আর কিছুই নাই। মনুষ্যসমাগম একেবারে নাই।

এইমাত্র বড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। দূর্ব্বাদল, বৃক্ষপত্র, সূর্য্যকিরণে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। নানাবর্ণের প্রজাপতি উড়িতেছে; পক্ষীরা কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এক একটী পক্ষী ডালে একা বসিয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতেছে; তাহারা কিছু চাহে না, কাহারেও ডাকে না, অথচ আপন মনে চীৎকার করিতেছে। আমার ইচ্ছা হয়, আমিও ঐরূপ একবার প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করি। ইতি।

দ্বিতীয় পত্র।

এক্ষণে আমি এক একটু চলিতে পারি, অদ্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রায় দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলাম। আমি এতদূর চলিতে পারি দেখিয়া, আমার আনন্দের আর সীমা ছিল না। নবশিশু দুই এক পদ চলিতে পারিলে যেরূপ আপনাকে অসামান্য মনে করিয়া মাতৃপ্রতি দৃষ্টি করিয়া হাসিতে থাকে, আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। আমি যে আর কখন চলিয়াছিলাম, কি চলিতে পারিতাম, তাহা আমার মনে ছিল না। আমার চলিতে ইচ্ছা কেন, চলিতে এত যত্ন কেন, এত আনন্দ কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ইতি।

তৃতীয় পত্র।

অদ্য কবিরাজ আসিয়াছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শেষ বলিলেন, "আর ভয় নাই, আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।" অমনি আমি আহ্লাদে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলাম। হাত ধরিয়াই সকল মনে পড়িল। আমার আবার আহ্লাদ কেন? সম্প্রতি অনেকবার ভাবিয়াছিলাম, জীবনে আর আমার ইচ্ছা নাই; মরিলেই ভাল। কিন্তু সে কথা মিথ্যা; বাঁচিতে আমার বড় ইচ্ছা। বুঝেছি, এ পৃথিবীতে অবশ্য কিছু সুখ আছে, নতুবা বাঁচিতে ইচ্ছা কেন? কিন্তু সে সুখ কি?

আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিদল প্রাতে ঐ সুন্দর পুষ্পবৃক্ষে বসিয়া কত কথা বলে, কত কলহ করে, কতবার উড়ে, কতবার বসে, কত পুষ্প ঝরাইয়া ফেলে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি; প্রজাপতিগুলি উড়িতেছে; কখন শূন্যে উঠিতেছে, কখন নামিতেছে, একের পশ্চাতে অপরটী ছুটিতেছে, প্রথমটী আবার পলাইতেছে; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। বড় বড় তরুসকল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেখানে জন্মিয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, কতবার দুলিয়াছে, একবারও সরে নাই, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। অতি প্রচণ্ড রৌদ্রে বৃহৎ বৃহৎ পক্ষী উচ্চাকাশে উঠিয়া তিলবৎ আকারে ঘুরিতেছে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। ভালবাসি সত্য, কিন্তু কেবল এই সকল দেখিবার নিমিত্ত কি আমি বাঁচিতে চাহি? কদাচ নহে। সকল সময় ত এ সমস্ত ভাল লাগে না। যখনই ভাবি, ঐ বৃহৎ পক্ষী সমস্ত দিন কেবল আহারের নিমিত্ত এই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে উড়িতেছে, অমনি আমার রাগ হয়। এই যে সুন্দর প্রজাপতি সর্ব্বদা উড়িতেছে, ইহারও আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; কেবল আহার খুঁজিতেছে, মরণপর্য্যন্ত কেবল আহারই খুঁজিবে! কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! ইহারা কেবল আহারের নিমিত্ত জন্মিয়াছে!

কেবল পক্ষী প্রজাপতিরই কথা কেন বলি। জগতের সকল জীবই এইরূপ যন্ত্রণা পাইতেছে। ভেক, মূষিক, হস্তী, সিংহ, মশা, মাছি, বিহঙ্গ, বানর সকলেই কেবল আহার অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের আর কোন ইচ্ছা নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। হে জগদীশ্বর! তাহাদের কেবল কি আহার করিতে পাঠাইয়াছ?

কেবল এই সকল জীবজন্তু কেন? মনুষ্যই বা কি? তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের উদ্দেশ্য কেবল আহার। লক্ষ লক্ষ মনুষ্য নিত্য জন্মিয়া লক্ষ লক্ষ নিত্য মরিয়াছে; কিন্তু আহার ভিন্ন তাহারা আর কি করিয়া গিয়াছে। এইরূপ কতকাল অবধি মনুষ্য জন্মিতেছে, মরিতেছে, তাহাদের সংখ্যা একবার ভাবিয়া দেখ। এই অসংখ্য অভাবনীয় মনুষ্যরাশি কি কেবল আহার করিবার নিমিত্ত সৃজন হইয়াছিল? তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের এক্ষণে আর কি চিহ্ন আছে? তাহারা কেন জন্মিয়াছিল? সত্যসত্যই কি কেবল আহার করিতে জন্মিয়াছিল? তাহা যদি হয়, তবে—হে ঈশ্বর—এ জীবন অনর্থক, এ দেহ বৃথা, আমি ইহা চাই না, তোমার পৃথিবী মিথ্যা। প্রত্যহ তোমার সেই দিন, সেই

রাত্রি; সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই বৃক্ষ, সেই লতা; সেই জল, সেই স্থল; আর আমার সহে না। আমার শেষ কর।

শেষ কি? মৃত্যু! তাহার পর—পরকাল। তাহাও কি এইরূপ উদ্দেশ্যরহিত? কে জানে, কে বলিতে পারে। পরকাল যে দেখেছে, সে ফেরে নাই; তৎসম্বন্ধে যে যাহা বলে, সে কেবল অনুভব মাত্র; শাস্ত্রের কথাও কেবল অনুভবমূলক। কিন্তু পরকাল এক নিমিষের পথ, আমি এখনই দেখিলে দেখিতে পারি; ইহকাল আর পরকালের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ব্যবচ্ছেদ, এখনই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারি। এক পা গেলেই পরলোক দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা দেখিলে আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। তখন ভাল না লাগে, তবে কি উপায় হইবে?

আমি মরিব না, পরলোক আমি চাহি না। মরিব না বা কেন বলি, মরণ আছেই; মৃত্যু অলঙ্ঘ্য, অপরিহার্য্য; যে জন্মিয়াছে, সেই মরিয়াছে বা মরিবে। তুমি নিশ্চয় মরিবে। আমিও মরিব। সময় উপস্থিত হইলে যত্নে কি রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব আমার অনিচ্ছা বৃথা।

মরণ নিশ্চিত, এই পাপ সংসার হইতে যে উদ্ধার তাহা কাজেই নিশ্চিত; তবে মরিতে অনিচ্ছা মরিতে ভয় কেন? বাঁচিব শুনিলে আহ্লাদ মনের এ সকল গতি কিছুই বুঝিতে পারি না। এ সকল চিন্তা আমার পক্ষে এক্ষণে গুরুতর পড়িয়াছে। কিন্তু বোধ হয়, তোমার ভাল না। অতএব ক্ষান্ত হইলাম।

চতুর্থ পত্র।

তোমার বয়স হইয়াছে, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, কখন কি এ সংসারে উদ্দেশ্যরহিত ব্যক্তি দেখিয়াছ? যে সংসারী, সংসারের সুখ তাহার উদ্দেশ্য; যে সন্ন্যাসী, পরকালের পথ তাহার উদ্দেশ্য; যে ধনহীন, ধনোপার্জ্জন তাহার উদ্দেশ্য; যে ধনবান্, প্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য; এইরূপ সকলেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহাই লক্ষ্য করিয়া সকলেই কার্য্য করে; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্য নাই, সে কি বিষয়ের উদ্যোগ করিবে? সে ব্যক্তি প্রাতে উঠিয়া ভাবিবে, কি করিব? মধ্যাহ্নে বসিয়া ভাবিবে, কি করিব? শয়নকালে দীপ জ্বালিয়া ভাবিবে, কি করিব? বাস্তবিক এ পৃথিবীতে সে কি করিবে?

পঞ্চম পত্র।

পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে একটী শালবৃক্ষের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়াছিলাম। কি কারণে জানি না, বৃক্ষটী একসময় অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল; তাহার কোমল মঞ্জরী-গুলি গিয়াছে, পত্রগুলি গিয়াছে, শাখাগুলি পর্য্যন্ত গিয়াছে, কেবল অঙ্গারাবশিষ্ট বৃক্ষস্কন্ধ, আর দুই একটী শাখার অংশমাত্র রহিয়াছে। চারিদিকে ফলে ফুলে শোভিত বিটপীসমূহ সুখে দুলিতেছে। তাহার মধ্যস্থলে এই দগ্ধতরু বাহু প্রসারিয়া হা হা করিতেছে। সুখসমীরণ সকল বৃক্ষের নিকট যাইতেছে, সকলকে ভুলাইতেছে, দোলাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষের নিকট যাইতেছে না। চন্দ্রকিরণ কত সুখের সামগ্রী! সকল তরুকে আলোকে হাসাইতেছে, ভাসাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষকে স্পর্শ করিতেছে না। চারিদিকে বৃক্ষ সকল কোমল সুবর্ণে প্লাবিত হইতেছে, কেবল এই হতভাগ্য বৃক্ষ-স্কন্ধ, যেমন অঙ্গারবর্ণ, তেমনই রহিয়াছে—আবার একা রহিয়াছে। অন্য কোন বৃক্ষ ইহার নিকটে নাই। দেখিয়াছিলাম, কেবল একটী লতা দূর হইতে ক্রমে ক্রমে এই হতভাগ্য তরুর মূল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ভাবিলাম, লতা স্ত্রীজাতি, তাহা না হইলে কাতরের প্রতি এত দয়া কেন, যাহারে সকলে ত্যাগ করিয়াছে, লতা তাহারে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে; লতা সেই অঙ্গারাবিষ্ট দেহ আপন পল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া আবার ফলফুলে শোভিত করিবে। দগ্ধ তরুকে শীতল করিবে, সতত কাছে থাকিবে, কোমল বাহু দ্বারা তাহাকে আপন হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবে।

তখন আমার কি ভ্রম ছিল! এখন আমি বুঝিয়াছি, লতা কেবল ঐ ভাগ্যহীন তরুকে অবলম্বন করিয়া আপন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবে বলিয়া আসিতেছিল, দয়াভাবে আইসে নাই।

তোমায় যাহা বলিব মনে করিয়া এই পত্রখানি লিখিতে বসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারিলাম না, বারান্তরে চেষ্টা করিব। ইতি

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু কয়েদী এই শেষ পত্রখানি পড়িয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন, পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিয়া রাখিয়া দিলেন। বিনোদ ভাবিয়াছিলেন যে, যাহা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাহা পত্রে প্রকাশ

করেন নাই; কিন্তু শম্ভু ভাবিলেন, বিনোদ তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে রাত্রে শম্ভু বিনোদের এই পত্র পাঠ করিয়াছিলেন, সে রাত্রে বিনোদ ছাদের উপর শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন। অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষ তাঁহার দৃষ্টি চন্দ্রের উপর পড়িল। অনেকক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে, বিনোদ অনেকবার চন্দ্রের প্রতি চাহিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। এইবার চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে মনে হইল যে, এই চন্দ্রকিরণ কতদূর ব্যাপিয়া কত পদার্থের উপর পড়িয়াছে; পর্ব্বতে, কন্দরে, অরণ্যে, সাগরে—যে পর্ব্বতে কখন কেহ যায় নাই, যে কন্দর আছে কি না কেহ জানে না, যে অরণ্যে মনুষ্য কখন প্রবেশ করে নাই, যে সাগরে মেঘ ভিন্ন অন্যের ছায়া পড়ে নাই—সর্ব্বত্র চন্দ্রের কিরণ পড়িতেছে। এই চন্দ্ররশ্মি হিমালয়ের তুষাররাশিতে জ্বলিতেছে; দেবমন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় জ্বলিতেছে; শার্দ্দূলের চক্ষে জ্বলিতেছে; হত্যাকারীর অস্ত্র-ফলকে জ্বলিতেছে; হতব্যক্তির রক্তধারায় জ্বলিতেছে; আবার কত দুর্ভাগ্যের নয়নাশ্রুতে জ্বলিতেছে।

বিনোদ আবার মনে করিতে লাগিলেন, "চন্দ্রের দিকে চাহিতে আমার যে সময় লাগিল, এই অল্প-সময়-মধ্যে পৃথিবীর কত স্থানে কত সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, চন্দ্র তাহা নিঃশব্দে দেখিলেন। এই মুহূর্ত্ত-মধ্যে কত স্থানে কত মনুষ্যজীবন জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলিয়া গেল। রাত্রের মৃত্যু ভয়ানক, নিঃশব্দে অন্ধকারে মরণ ভয়ানক। মৃত্যুগৃহে রাত্রে যে আলোক জ্বলে, তাহা আরও ভয়ানক, রাত্রের যম স্বতন্ত্র। তাহার সঙ্গী পাপ। রাত্রের যম মনুষ্যজীবন চুরি করে, পাপ তাহার পরামর্শী। সিংহ-শার্দ্দূলের হিংসা-হত্যার সময় রাত্রি। এই সময় কত পথে কত সর্প পথিকের প্রতীক্ষা করিতেছে। কত গৃহে কত কামিনী সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে সর্প ও যুবতী একদল, একত্রে পরামর্শ করিয়া পৃথিবীতে অনিষ্টের বীজ বপন করিয়াছিল। বোধ হয়, সে পরামর্শ রাত্রে হইয়াছিল। দিবস পুণ্য, রাত্রি পাপ। দিন সুখ, রাত্রি দুঃখ। রাত্রি শোকের সময়। রাত্রি হতভাগ্যের দিন। আমার মত কত হতভাগ্য এই চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আপন গতানুশীলন করিতেছে। তাহারা কি আমার মত? আমার মত কি আর আছে? চন্দ্র! তুমি বৃহৎ-সূক্ষ্ম সকল দেখিতেছ. নদীকূলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলি জল হইতে কর্দ্দমে উঠিয়া সূক্ষ্ম শুণ্ড নাড়িতেছে, তুমি তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছ। তুমি স্বরূপ বল, আমার মত হতভাগ্য আর কাহাকে দেখিয়াছ? তুমি অনেক দিনের। সীতা-শোকে অধীর শ্রীরামের চক্ষের জল দেখিয়াছ; অভিমন্যু-শোকাভিভূত অর্জ্জুনের যন্ত্রণা দেখিয়াছ; নল রাজার উন্মত্ততা দেখিয়াছ; ছোট বড় দেব-মানব, কত লোকের পুত্রশোক, পত্নীশোক দেখিয়াছ। কিন্তু স্বরূপ বল, আমার মত শোকের আধার আর কখন কি দেখিয়াছ? আমি ছয়মাস অনুপস্থিত ছিলাম—এই ছয়মাস-মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পূর্ব্বে সে আমায় কত ভালবাসিত, আমিও কত ভালবাসিতাম, এখন কেন এমন হইল? সেই ত সকল রহিয়াছে। গৃহে সেই আম্রবৃক্ষ, সেই প্রাচীর, সেই দ্বার, সেই সকলই রহিয়াছে; কিন্তু সে আদর, সে গৃহসুখ কোথা গেল!"

এই সময় হঠাৎ নদীকূলে মৃদুমধুর সঙ্গীতধ্বনি ক্রমে আকাশ প্লাবিত করিল; বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষীরা জাগ্রত হইয়া উঠিল, দুই একটা কোকিল ও পাপিয়া ডাকিতে লাগিল। কোকিলেরা যাহাকেই ডাকুক, ডাকিবার সময় প্রথমে অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে ডাকে; যাহারে ডাকে, সে আইসে না; সে শুনেও না; কোকিল আবার ডাকে, উচ্চৈঃস্বরে উপর্য্যুপরি ডাকে। প্রাণ ভরে মর্ম্মভেদ করিয়া ডাকে; শেষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আবার ডাকিতে থাকে। প্রথমে ভগ্নস্বরে, ক্লান্তস্বরে ধীরে ধীরে ডাকিতে থাকে, ক্রমে আবার তীক্ষ্ণস্বরে ডাকের উপর ডাকে।

বিনোদ যে সংগীত শুনিতেছিলেন, তাহাও সেইরূপ প্রথমে ধীরে ধীরে গীত আরম্ভ হইয়া, ক্রমে স্তরে স্তরে উঠিতে লাগিল, মর্ম্মব্যথার সঙ্গে সুর আরও উঠিতে লাগিল। সুরের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বহিতে লাগিল, সুর যেন ব্যাকুল হইয়া চারিদিক্ ব্যাপিয়া ফেলিল। সুরের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, এতদিনের পর যেন কে তাঁহার নিমিত্ত কাঁদিল, বিনোদ আপনিও সুরের সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন। গীত থামিল; কিন্তু বিনোদ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, পরে মাথা তুলিলেন, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। বিনোদের হৃদয় লঘু হইল। অনেক যন্ত্রণা গেল।

আবার গীত আরম্ভ হইল। এবার সুর স্বতন্ত্র, পূর্ব্বরূপ উচ্চ নহে, তীক্ষ্ণ নহে, কেবল অলসময়, কিন্তু বড় মধুর। বিনোদের চিত্ত ক্রমে প্রফুল্লোন্মুখ

হইয়া আসিল; কিন্তু আবার তখনই মুদিত হইয়া গেল, যেন কি তাঁহার মনে আসিতেছিল, কিন্তু আসিতে আসিতে আর আসিল না। ক্রমে গীতধ্বনি চন্দ্রালোকে মিলাইয়া গেল।

সেই সুর আবার শুনিবেন বলিয়া বিনোদ ব্যগ্র-চিত্তে বসিয়া রহিলেন। সুর আবার অলসভরে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। এবার তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রফুল্লিত হইল; পূর্ব্বে যাহা মনে আসিয়া আসিয়া আইসে নাই, এবার তাহা মনে আসিল—তাঁহার পূর্ব্বসুখ—যে সুখে আপনি শৈলের অন্তরে ডুবিয়াছিলেন, শৈলকে আপনার অন্তরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সুখপ্রতিমা, আলোকময়ী, আহ্লাদময়ী, দেবপ্রতিমার ন্যায় মনে আসিল। বিনোদ ভাবিলেন, "আমি কত সুখেই ছিলাম, এ সুখ আমার কেন গেল; সেই শৈল এরূপ না হইলে ত আমি সেইরূপই সুখে থাকিতাম। সেই রাত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, তাহা কি নিশ্চিত? না, হয় ত আমার ভ্রম। ভ্রম ত লোকের হয়। আমি হয় ত সে রাত্রে অজ্ঞানাবস্থায় অন্য কাহারও বাটীতে গিয়াছিলাম। প্রদীপ-ে যে যুবতীকে দেখিয়া শৈল ভাবিয়াছিলাম, সে ত আর কেহ হইবে। শৈল সে সকল অলঙ্কার কোথায় পাইবে, এ কথা আমার তখনই বিবেচনা উচিত ছিল। কি আশ্চর্য্য! এই সহজ কথা আমি এত দিন অনুধাবন করিয়া দেখি নাই, অনর্থক মর্ম্মভেদি-যন্ত্রণায় জ্বলিতেছি।"

বালকে কোন পক্ষিশাবক হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলে যেমন আহ্লাদে উছলিয়া উঠে, চারিদিক্ দেখে, আর শাবকটীকে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে থাকে, বিনোদ সেইরূপ মনের ভাবটী আহ্লাদে অন্তরের ভিতরে লুকাইতে লাগিলেন। 'সে যুবতী শৈল নহে—আর কেহ হইবে' এই কথাগুলি বিনোদ হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলেন, এবং বালকের মত সুখে পুনঃপুনঃ হৃদয়ে টিপিয়া ধরিতে লাগিলেন।

তাহার পর ভাবিতে লাগিলেন, "আমার শৈল গৃহে আছে, আমি এখানে কেন রহিয়াছি? ভ্রম, আমার সকলই ভ্রম। যাই, এখনই তাহার নিকট যাইবার উদ্যোগ করি।"

এই সময় সঙ্গীতসুর ক্রমে মন্দীভূত হইয়া যেন অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িল, আর জাগিল না। বিনোদ অনেকক্ষণ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন; গীতের আর কোন সম্ভব নাই বুঝিতে পারিয়া শেষ ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিলেন। ভাবিলেন,"এ মধুর গীত কে গাইল, একবার তাহাকে দেখিয়া আসি," এই মনে করিয়া তাহার অনুসন্ধানে গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যে দিক্ হইতে সংগীতধ্বনি আসিয়াছিল, বিনোদ একা সেই দিকে গিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু গায়কের দেখা কোথাও পাইলেন না। এক-স্থানে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে বোধ হইল, এক ব্যক্তি কে, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। বিনোদ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া দেখেন, সেখানে কেহই নাই, কেবল একস্থানে পত্রাভাবে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে। অন্ধকারমধ্যে সেই চন্দ্ররশ্মি শ্বেতবসন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বিনোদ ভাবিলেন, "আমাদের কত সহজেই ভ্রম হয়; বৃক্ষচ্ছায়ায় চন্দ্রকিরণ যদি মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে তবে অজ্ঞানাবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আর এক ব্যক্তি বোধ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? অপরা সুন্দরীকে শৈল বলিয়া বোধ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদ নদীকূলে দাঁড়াইলেন। সেখানেও কেহই নাই, কেবল একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা রহিয়াছে; নৌকায় আলোক নাই, দুই তিনটী দাঁড়ি-মাঝি শয়ন করিয়া আছে; নৌকাখানি সমস্ত দিনের পর যেন অবকাশ পাইয়া ক্রীড়া করিতেছে; স্রোতে সরিতেছে ফিরিতেছে, একবার একবার রজ্জু ধরিয়া টানিতেছে, আবার অগ্রসর হইয়া কূলের দিকে আসিতেছে। বিনোদ তথায় অনেক দাঁড়াইয়া বৈঠকখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একজন পরিচারক জাগ্রত ছিল, তাহাকে বলিলেন, "এইমাত্র কে একজন গীত গাইতেছিল, আমি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না, তুমি একবার নদীকূলে যাইয়া দেখ, নৌকায় কে আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ সেই মধুর গীত গাইয়াছিল কি না, জানিয়া আইস।"

পরিচারক নদীকূলে যাইয়া "মাঝি মাঝি" বলিয়া দুই একবার ডাকিল, কেহ উত্তর দিল না। নাবিকেরা নিদ্রিত মনে করিয়া পরিচারক জলে নামিল। তাহাকে অগ্রসর দেখিয়া নৌকা মধ্য হইতে একটী স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে মাঝিদিগকে ডাকিতে লাগিল;

মাঝিরা কেহ উত্তর দিল না। পরিচারক নৌকার নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল যে, "এইমাত্র কে গীত গাইতেছিলে, আমার সঙ্গে আইস।"

এই সময় নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকটী বাহির হইয়া বলিল, "আমি গীত গাইয়াছি।" পরিচারক চন্দ্রালোকে তাহার রূপরাশি দেখিয়া বলিল, "আসুন, যিনি আপনার গীত শুনিয়া কাঁদিয়াছেন, তিনি একবার আপনাকে দেখিবেন।"

স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কে?" পরিচারক বলিল, "আমি তাহা বিশেষ জানি না। তিনি পীড়িত হইয়া এই বৈঠকখানায় আসিয়াছেন; পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, অদ্যাপি দুর্ব্বল আছেন, এই পর্য্যন্ত আমি জানি।" স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "পীড়িত ব্যক্তির স্বভাব কিরূপ? তাহারে দেখিলে কি বোধ হয়?" পরিচারক উত্তর করিল, "তাঁহাকে দেখিয়া আপনি নিজেই অনুভব করিয়া লইবেন।" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিলেন, "আমি পূর্ব্বাহ্নে কিছু পরিচয় না পাইলে যাইব না।" পরিচারক বলিল, "রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহার আর কেহই নাই; বাস্তবিক আত্মীয় থাকিলে তাঁহার কেহ না কেহ তত্ত্ব করিতে আসিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ আসে নাই; কেহ একখানা তাঁহাকে পত্র পর্য্যন্ত লেখে নাই। তিনি একা থাকেন, একা বেড়ান, একা ভাবেন; মধ্যে মধ্যে আমায় জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার আর কে আছে?' আমি কতবার সে কথার উত্তর দিয়াছি, তবু আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে যাহাই হউক, লোকটী বড় ভদ্র, কিন্তু বড় ভীরু। একদিন একস্থানে একটী গোর দেখিয়াছিলেন, দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, আর তাঁহার পা উঠিল না। কপাল ঘামিতে লাগিল, আমি সঙ্গে ছিলাম, তাহাতেই কোনপ্রকারে ফিরে আসিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অবধি আর সে দিকে যান না। দিনের বেলাই তাঁহার এত ভয়, না জানি, রাত্রি হইলে কি হইত; কিন্তু যদি তিনি আপনার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহেন, তবে সময়মত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন; আমি চাকর হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।" স্ত্রীলোকটী এক বৃদ্ধা সঙ্গিনীকে সমভিব্যাহারে করিয়া বিনোদের দ্বারে যাইয়া সারঙ্গের ঝঙ্কার দ্বারা আপন আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাহার পর স্ত্রীলোকেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিনোদ একটী আলোকের নিকট বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন। তাঁহার গাত্রে একখানি চাদর রহিয়াছে, নিকটে একটী লাঠি পড়িয়া আছে। বিনোদ সত্যই কোথায় এখনই যাইবেন। স্ত্রীলোকেরা কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া বসিল। বিনোদ মাথা তুলিয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, অথচ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

প্রথমে যে স্ত্রীলোকটী পরিচারকের সহিত কথা কহিয়াছিল, সে আসিবার সময় বিনোদের আকার একপ্রকার মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া চক্ষে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিতা হইল; বিনোদ যে এত যুবা কি এমত রূপবান, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই।

এই সময় বিনোদ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরাই কি এইমাত্র গীত গাইতেছিলে? তোমাদের স্বর অতি মধুর, আমি আর কখন এরূপ স্বর শুনি নাই।"

বৃদ্ধা সঙ্গিনী যুবতীকে দেখাইয়া বলিল, "ইনিই গাইতেছিলেন।"

যুবতী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নতমুখে বলিল, "এ দুর্ভাগিনী একসময় এই ব্যবসায়ে শিক্ষিতা হইয়াছিল বটে।"

বিনোদ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের ডাকি নাই; যদি পরিচারক তোমাদের ডাকিয়া থাকে, তবে অন্যায় করিয়াছে। তোমাদের দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমার অনুভব হয় নাই যে, তোমরা স্ত্রীলোক। এক্ষণে তবে তোমরা নৌকায় যাও; পরিচারক যে তোমাদের কষ্ট দিল, তাহাতে কিছুমাত্র মনে করিও না।"

যুবতী এই কথা শুনিয়া একবার মাথা তুলিয়া বিনোদের প্রতি চাহিয়াই আবার মাথা নত করিল, কিন্তু উঠিল না। বিনোদ ভাবিলেন, 'বোধ হয়, ইহারা কিছু অর্থের প্রত্যাশা করে।' অতএব বলিলেন, "আমায় তোমরা যেরূপ সুখী করিয়াছ, তাহাতে ইচ্ছা হয়, তোমাদের পাথেয় কিছু দিই, কিন্তু আমি দীনহীন, অন্যের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছি।"

এই কথা সমাপ্ত না করিতে করিতেই যুবতী বলিল, "মহাশয়, ব্যস্ত হইবেন না; আপনার সহস্রমুদ্রা দান করিবার সাধ্য থাকিলেও আমি লইতাম না, মহাশয়ের চাকর আমাকে ডাকিয়াছে

বলিয়াই যে আমি আসিয়াছি, এমত নহে। আমি এই বাটীতে বাল্যকালে অনেকবার আসিয়াছি যে সুরের বা রাগিণীর আপনি প্রশংসা করিতেছিলেন, তাহা এই ঘরে বসিয়া শিখিয়াছিলাম, তাই একবার এই ঘর দেখিতে আসিয়াছি।" বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন এ বাড়ীতে কে থাকিত ?" যুবতী উত্তর করিল, "এ বাড়ীতে তখন কেহ নিরবধি বাস করিতেন না, মধ্যে মধ্যে মহারাজ মহেশচন্দ্র আসিয়া থাকিতেন; আমিও সেই সঙ্গে আসিতাম।"

বিনোদ বলিলেন, "মহারাজ মহেশচন্দ্র প্রাতঃস্মরণীয় লোক, আমি তাঁহারে কখন দেখি নাই; তাঁহার আকার কিরূপ ?"

এই কথা শুনিয়া যুবতী আপনার গলদেশ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত চিত্র লইয়া বিনোদের নিকট রাখিলেন। বিনোদ তাহা ব্যগ্রচিত্তে দীপের নিকট ধরিলেন। চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই চমকিয়া উঠিলেন, দীপালোকে চিত্র আবার দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমায় কে বলিল, এ মূর্ত্তি মহারাজ মহেশচন্দ্রের ? মিথ্যা কথা, অসম্ভব !"

যুবতী বলিলেন, "চিত্র মিথ্যা নহে, আমি আশৈশব তাঁহার প্রতিপালিতা, আমি গতকল্যও তাহাকে দেখিয়াছি।"

বি। এ মূর্ত্তি যে আমি চিনি। এ যে শম্ভু-কয়েদীর মূর্ত্তি।

যু। শম্ভু-কয়েদীই মহারাজ মহেশচন্দ্র।

বি। সে কি ! মহারাজ কি ডাকাতি করিয়াছিলেন ?

এই বলিয়া বিনোদ অন্যমনস্কে কক্ষান্তরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈল অপেক্ষা এই যুবতী প্রায় সাত আট বয়োধিকা; তদ্ভিন্ন শৈল ক্ষীণাঙ্গী, যুবতী স্থূলাঙ্গী। শৈলকে কখন হাসিতে দেখা যাইত না, যুবতী কখন হাসি ছাড়া থাকিত না; যুবতী কখন উচ্চ হাসি হাসিত না, অথচ সতত হাসিত; মিষ্ট কথায় বক্তার মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত; কষ্টকথায়ও হাসিত, কিন্তু সে সময় নিকটস্থ লোকদিগের মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত। আবার যখন অপ্রতিভ কি লজ্জিত হইয়া হাসিত, তখন মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া হাসিত। যুবতীর অপ্রতিভের হাসি আর তাহার দুঃখের কান্না প্রায় একই রূপ দেখাইত; হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে, সহজে তাহা বুঝা যাইত না, অনেকে বলিত, ওষ্ঠের গঠনের নিমিত্ত তাহার ক্রন্দনেও হাসি বোধ হইত।

আবার কথায় কথায় তাহার মুখ আরক্ত হইত; তৎসঙ্গে নিম্নদৃষ্টি, নাসাগ্রে ঘর্ম্ম, ওষ্ঠকম্প দেখা যাইত। শৈলের এ সকল কিছুই ছিল না।

শৈলের দৃষ্টি সর্ব্বদাই তীব্র বোধ হইত; আবার তাহার প্রতি কেহ চাহিলে সেই তীব্রতা আরও বাড়িত। যুবতীর নয়ন স্বভাবতঃ ভীত, কেহ তাহার চক্ষু প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নয়নপল্লব নামিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষুদিগকে আচ্ছাদিত করিত।

মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে এই রূপবতী আশৈশব প্রতিপালিতা, অথচ তাহার পরিচয় কেহ জানিত না, লোকে নানা সন্দেহ করিত। কেহ কেহ বলিত, যুবতী কোন নর্ত্তকীর গর্ভজাত। গায়কী ও নর্ত্তকী মহারাজের দুই একটী ছিল, কিন্তু কথিত আছে, মহারাজ স্বয়ং নৃত্য ভালবাসিতেন না; অন্য কেহ নৃত্যের প্রশংসা করিলে, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেন। তাঁহার গৃহে কখন "নাচের মজলিস" হইত না। গীত শুনিতে তিনি আন্তরিক ভালবাসিতেন, কিন্তু গায়ককে সম্মুখে বসাইয়া গীত শুনিতে পারিতেন না। গায়কেরা স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া গাইত, আপনিও স্বতন্ত্র স্থানে একা শয়ন করিয়া গীত শুনিতেন। সে সময় তাহার পরমাত্মীয়গণেরাও নিকটে যাইত না; অনবধানতাপ্রযুক্ত কেহ গেলে তিনি সিংহের ন্যায় মাথা তুলিতেন, অন্যপ্রকারে বৈরক্তি প্রকাশ করিতেন না; আর কিছু বলিতেনও না। এদেশীয় সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, কোন গায়ক তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিত না। অথচ তিনি কখন এই-দেশী রাগ-রাগিণী শুনিতেন না। তিনি যাহা শুনিতেন, তাহার কোনটীর নাম "শোক", কোনটীর নাম "সুখ" ইত্যাদি। যুবতীর প্রথম যে সুরে বিনোদ কাঁদিয়াছিলেন, তাহার নাম "শোক", দ্বিতীয় সুরটীর নাম "সুখ।" এই সকল রসাত্মক সুর একজন ব্রহ্মচারী যুবতীকে শিখাইতেন।

বস্ত্র-অলঙ্কার প্রতি যুবতীর একপ্রকার ভয় ছিল। রাণী প্রথম যৌবনকালে একবার তাহাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু অলঙ্কার পরিয়া যুবতী আর মাথা তুলিল না, বরং বিন্দু বিন্দু

থাকিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া তাহার পরিচারিকারা অলঙ্কার খুলিয়া লইল। তখন হাসি-হাসি মুখে যুবতী একজনের কর্ণে বলিয়াছিল যে, "অলঙ্কার পরিলে আমার মনে হয়, যেন সকলেই আমার দিকে চাহিতেছে।" কিন্তু এ কথা প্রথমাবস্থার। এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছিল।

মহারাজ মহেশচন্দ্রের পট দেখিয়া বিনোদ কক্ষান্তরে গেলে যুবতী ক্ষণকাল বসিয়া রহিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে একখানি চিত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভাবিল, "এখানি নূতন, পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই", অতএব বিশেষ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত যুবতী উঠিল; বামহস্তে প্রদীপ লইয়া ঈষৎ তাহা উদ্দীপন করিল, তাহার পর চিত্রের নিকট যাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল। সেই উদ্দীপ্ত দীপালোকে সুন্দরীর উন্নত মুখমণ্ডল আর একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সে মুখের তাৎকালিক সুখমাধুরী পটে অঙ্কিত করা চিত্রকরের অসাধ্য।

যুবতী যে পটখানি একাগ্র হইয়া দেখিতেছিল, তাহাতে চিত্রকরের বিশেষ নিপুণতা-প্রকাশ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু চিত্রিত বিষয় অতি সামান্য। একটী জলাশয়ে কেবল গুটীকতক হংস বিচরণ করিতেছে। এই সামান্য বিষয়ে চিত্রকর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। পটের ঊর্দ্ধভাগে আকাশ চিত্রিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া সূর্য্য দেখিতেছে। পটে সূর্য্য চিত্রিত হয় নাই, কিন্তু পশ্চিমদিকের আকাশে সূর্য্যালোক মৃদু অথচ স্পষ্ট রহিয়াছে। আকাশের অন্য দিকে সে আলোক নাই, ক্রমে মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল এই চিত্রিত আকাশ দেখিলেই বোধ হয়, অপরাহ্ণ উপস্থিত এবং তাহা শরৎকালের অপরাহ্ণ। তাহার পর চিত্রিত জলাশয় ও তাহার পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি দেখিলে শারদীয় অপরাহ্ণ আরও স্পষ্ট জানা যায়। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্রে মলিন স্বর্ণ-আভা লাগিয়াছে, তাহা এত মলিন যে, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইতেছে। উষা ফুরাইয়াছে, জলাশয়টী পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বর্ষার লতাগুলি তীরস্থ শাখা হইতে দুলিতেছে, তাহার পুষ্পগুলি গম্ভীর, স্থির কাল-জলে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। জলে অপরাহ্ণের ছায়া পড়িয়াছে, সকল স্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর। এই সময় একটী রাজহংস গ্রীবা বাঁকাইয়া মাথা ফিরাইয়া তরঙ্গ তুলিয়া যাইতেছে, কাল-জলে তাহার অমল শ্বেতপক্ষ আরও অমল দেখাইতেছে। আর দুইটী রাজহংস পার্শ্বাপার্শি হইয়া স্থির-জলে স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেন তাহারা কূলে যাবে কি না, তাহাই ভাবিতেছে। আর এক স্থানে আর একটী রাজহংস ডুবিয়া উঠিয়াছে, মাথায় জলকণা শত শত অমল মুক্তাকারে পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; হংস আবার ডুবিবে বলিয়া মাথা নামাইতেছে।

পটের নিম্নে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে একটী পুরাতন গীতের এই অংশটী লিখিত আছে। যথা——

"আমি শ্যাম-সায়রে হংসী ছিলাম,
ডুবিতাম, উঠিতাম, ভেসে যেতাম,
কত উলটি পালটি ভেসে যেতাম।"

যুবতী শেষ এই গীতাংশ পড়িয়া চক্ষের জল মুছিল। দীপাধারে প্রদীপ রাখিয়া, ধীরে ধীরে আসনে আসিয়া বসিল; ক্রমে উপাধানের উপর মস্তক নত করিয়া অতি মৃদুস্বরে গীতটী গাইতে লাগিল। গীতটীর প্রথম কথা "সুখময় সায়র"; এই অংশ গায়িতে গায়িতে যুবতী একবার আপনা-আপনি বলিল, "সুধাময় সাগরই বটে," আবার পূর্ব্বমত গায়িতে লাগিল। পার্শ্বস্থ কক্ষে বিনোদ আছেন, এ কথা যুবতী গায়িতে গায়িতে ভুলিয়া গেল, উন্মত্তা হইয়া গায়িতে লাগিল। বিনোদ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে নর্ত্তকীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। গীত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গীত তুমি কোথায় পাইলে?" গায়িকা কেবল অঙ্গুলিদ্বারা পট দেখাইয়া দিল। বিনোদ পটের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া, যুবতী উঠিয়া প্রদীপ-হস্তে সঙ্গে সঙ্গে গেল। আলোক বাড়াইবার নিমিত্ত যুবতী পটের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র তাহার অঙ্গের মাধুর্য্য ও সৌগন্ধ বিনোদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বিনোদ ভাবিলেন, "এ যে আমার শৈলের অঙ্গসৌরভ।" বিনোদ অমনি যুবতীর দিকে মাথা ফিরাইলেন; সৌরভ তাঁহাকে আরও মোহিত করিল; মোহিত হইয়া তিনি যুবতীর কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ দেখিতে লাগিলেন। যুবতী এ সকল কিছুই জানিতে পারিল না, স্থিরভাবে প্রদীপ ধরিয়া পট দেখিতেছিল, মনে করিয়াছিল, বিনোদও পট দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিনোদ বলিলেন, "তোমার অঙ্গের কি আশ্চর্য্য সৌগন্ধ?" অমনি যুবতীর হস্ত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল, ঘর অন্ধকার হইল। বিনোদ পরিচারককে ডাকিয়া আলোক আনাইয়া দেখেন, যুবতী চলিয়া গিয়াছেন। একবার ভাবিলেন, "কেন সে প্রদীপ ফেলিয়া চলিয়া গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি"; কিন্তু সৌরভে শৈলকে মনে পড়িয়াছিল, অন্তরে তাহার চিত্র দেখিতে দেখিতে শয়নঘরে গেলেন, অতি অল্পক্ষণমধ্যেই নিদ্রা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সে রাত্রে তাঁহার আর নুরপুরে যাওয়া হইল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় আহ্লাদে পূরিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তমীর প্রাতে বাদ্যোদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বালক যেমন "আজ দুর্গোৎসব" বলিয়া আহ্লাদে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, বিনোদ সেইরূপ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। অদ্য নুরপুরে যাইবেন, তাঁহার প্রতিমাকে দেখিবেন, অদ্য তাঁহার দুর্গোৎসব। ত্বরায় পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিয়া বাহির হইলেন; একবার পরিচারককে বলিলেন, "আমি চলিলাম, পরে সংবাদ পাঠাইব।" পরিচারক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া দেখেন, সম্মুখস্থ উপবনে যুবতী কতকগুলি লতা-পুষ্প-হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয়, যুবতী যেন আর কি খুঁজিয়াছিল, পায় নাই। বিনোদ ভাবিলেন, "আমি যে চলিলাম, তাহা একবার উঁহাকে বলিয়া যাই। অনেক দিনের পরে গতরাত্রে আমি যে সুখী হইয়াছিলাম, তাহা কেবল এই গায়িকার কণ্ঠগুণে, সুরের অসাধ্য কিছুই নাই; আমার মত অভাগ্যেরও ভাগ্য ফিরাইতে পারে।"

বিনোদকে অগ্রসর দেখিয়া যুবতী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নৌকাভিমুখে যাইতে লাগিল। কিন্তু উপবন অতিক্রম না করিতে করিতেই বিনোদ তাহার নিকট আসিলেন। তখন গায়িকা উপায়ান্তর না দেখিয়া নতমুখে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে একটী মাধবীলতার নবপত্র কোমল অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ বলিলেন, "তুমি যাও নাই? আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি রাত্রেই গিয়াছ।" গায়িকা আরও লজ্জিতা হইল। বিনোদ তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন যাইবে?"

যুবতী। এখনই যাইব।

বি। আমিও চলিলাম।

যু। কোথায়?

বি। নুরপুরে—সেখানে আমার বাস।

যু। তাহা আমি জানি।

বি। তুমি নুরপুর কখন গিয়াছিলে? শৈলকে চেন?

যু। চিনি, তিনি আমাদের রাজকুমারী।

বি। রাজকুমারী!—

যু। মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা।

বি। সে কি! তুমি অন্য শৈলের কথা বলিতেছ।

যু। আমি আপনার শৈলকে মনে করিয়া বলিতেছি। আমি তাঁহাকে তাঁহার শৈশবাবস্থায় ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতাম। আমরা একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছি।

বি। আমার শৈল রাঘবরামের কন্যা।

যু। রাঘবরামের পালিতা কন্যা।

বি। রাজার কন্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা কি? মহারাজ মহেশচন্দ্রের কি অভাব ছিল যে, তিনি অন্নের নিমিত্ত দরিদ্রের ঘরে আপনার কন্যা পাঠাইবেন? যদি তাহা হইত, তবে সে কথা অবশ্য শৈল জানিত। শৈল দরিদ্রকন্যা, আমিও দরিদ্র, এইজন্য বুঝি তুমি আমাদের উপহাস করিতেছ? তুমি স্ত্রীলোক না হইলে আমি উপহাসে রাগ করিতাম।

যু। অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আমি এ পর্য্যন্ত কাহারেও কখন উপহাস করি নাই, আমাকেও কেহ উপহাস করে নাই, উপহাস আমি বুঝিতেও পারি না। শৈলসম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা সত্য, চলুন, আমি এখনই তাহার কতক প্রমাণ দিতে পারিব।

এই বলিয়া যুবতী নিকটস্থ একটী মন্দিরের দিকে যাইতে লাগিল; বিনোদও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যুবতী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হর্ম্যতলে প্রস্তরখোদিত এই কয়েকটী কথা দেখাইলেন।

মহারাজ-মহেশচন্দ্রস্য

প্রথমাস্তজায়াঃ শৈলকুমার্য্যাঃ

জন্মাহে
শৈলেশ্বরস্য
মন্দিরমিদং স্থাপিতম্

বিনোদ ইহা পড়িয়া বলিলেন, "মহারাজ মহেশ-চন্দ্রের প্রথমা কন্যার নাম যে শৈলকুমারী, তাহাই ইহাতে লিখিত আছে। কিন্তু সেই শৈলকুমারী যে আমার পত্নী, তাহা ইহা দ্বারা ত প্রমাণ হইল না।"

যুবতী বলিল, "তাহা প্রমাণ হইল না সত্য, কিন্তু আসুন, আর এক প্রমাণ দিতেছি।" এই বলিয়া বিনোদকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানা-বাড়ীর শয়নঘরে প্রবেশ করিল। তথায় উত্তরদিকের একটী ক্ষুদ্র দেরাজের চাবি খুলিল। চাবিটী পালঙ্কের এক অংশে একটী স্থানে অলক্ষ্যে লগ্ন ছিল। খুলিবামাত্র বিনোদ দেখিলেন যে, একটী বালিকার প্রতিমূর্ত্তি একখানি পটে চিত্রিত রহিয়াছে। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এই প্রতিমূর্ত্তি চিনিতে পারেন?"

বিনোদ বলিলেন, "না, আমি চিনিতে পারিলাম না, শৈলের সঙ্গে কোন বিশেষ সাদৃশ্য ত দৃষ্ট হয় না, তবে ওষ্ঠ আর যুগ্ম ভ্রূ উভয়ের কতক কতক একপ্রকার বোধ হয়।"

যুবতী বলিল, "বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখুন, তিন বৎসর বয়সের আর উনিশ বৎসর বয়সের মনুষ্যের আকৃতি-অবয়ব একই প্রকার থাকে না, যে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবেন, এই আপনার শৈলের বাল্যমূর্ত্তি।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী রাঘব-রামের কেন প্রতিপালিত হইলেন?"

যুবতী উত্তর করিল, "সে অনেক কথা। কি কারণে জানি না, হঠাৎ একদিন মহারাণী বিবাগিনী হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান। দস্যুরা কি গতিকে জানিতে পারিয়া পথে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। মহা-রাণী একা পদব্রজে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সাংঘাতিক পীড়িতা হইয়া জামতলী-গ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। মরিবার সময় একটী ব্রাহ্মণকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া যান। কন্যাটীর বয়স তখন চারি বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। ব্রাহ্মণের নাম রাঘবরাম। রাঘবরামের অনেক বিবাহ ছিল, তাহা বোধ হয়, আপনি ভাল জানেন। কোথায় তাঁহার কয়টী সন্তান আছে, তাহা তাঁহার নিজগ্রামের লোকেরা জানিত না। এক দিবস তিনি শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া আপন গ্রামে আনিয়া বলিলেন, 'আমার জামতলীর প্রথমা স্ত্রী সম্প্রতি গত হইয়াছেন, তিনি এই কন্যাটী রাখিয়া গিয়াছেন।' সকলেই সেই কথা বিশ্বাস করিল। সেই অবধি শৈল রাঘবরামের কন্যা বলিয়া পরিচিত হইলেন। শৈলও জানিতেন যে, তাঁহার গর্ভধারিণী গত হইয়াছেন, রাঘবরামের গৃহিণীকে তিনি বিমাতা বলিয়া জানিতেন। রাঘবরাম নিজেও জানিতেন না যে, শৈল রাজা মহেশচন্দ্রের কন্যা। তিনি কেবল এই-মাত্র জানিতেন যে, শৈল ভদ্রবংশজাত ব্রাহ্মণকন্যা।"

বিনোদ বলিলেন, "এ পরিচয়ে আমার সংশয় দূর হইল না। যিনি কন্যা সমর্পণ করিয়া যান, তিনি মহেশচন্দ্রের রাজমহিষী, তাহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল?"

যুবতী বলিল, "ব্রাহ্মণকে রাজমহিষী একটী স্বর্ণ-কৌটা সমর্পণ করিয়া যান, তাহাতে এই কথাটী লিখিত ছিল, 'মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা শৈলকে যিনি প্রতি-পালন করিবেন, তিনিই এই কৌটার সমস্ত রত্না-দিতে অধিকারী হইবেন।' রাঘবরামের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্বশুর স্বর্ণকৌটাটী আপনি রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহা খুলিতে না পারিয়া সম্প্রতি এক স্বর্ণ-কারের নিকট খুলিতে আনিয়া সকল জানিতে পারিয়াছেন। আর উহা যে রাজমহিষীর হস্তাক্ষর, তাহা মহারাজের কর্ম্মচারীরা চিনিয়াছেন।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের কর্ম্মচারী কে?" যুবতী বলিল, "যিনিই হউন, তাঁহার সহিত আপনার শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। সময় হইলে তিনি আপনিই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার কারণ আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমি তাহা বলিতেও পারিব না। শৈল যে রাজকুমারী, এ বিষয়ে আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না।"

বিনোদ বলিলেন, "হইতেও পারে—অসম্ভব কি—রাজকুমারী না হইলে সে ভ্রূকুটী কি আর কাহার হইতে পারে? শৈল নিশ্চয়ই রাজকুমারী—আমার শৈল রাজকুমারী—আমি ত রাজকুমারীর যত্ন জানি না—আমি দরিদ্র, সে রত্নের আদর জানি না—কতবার হয় ত শৈল আমাকে অসভ্য রূঢ় ভাবিয়াছে। এইবার আমি সকল শোধ করিব। আমি তবে চলিলাম।"

যুবতী অতি কাতর অন্তরে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। শেষ বিনোদকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছেন?"

বি। সুরপুর যাইতেছি—শৈলের নিকট যাইতেছি।

যু। সুরপুরে শৈলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

বি। কেন?

যু। রাজকুমারী সেখানে নাই।

বি। শৈল তবে কোথা?

যু। আপনি তাহা বোধ হয়, আমার অপেক্ষা অধিক জানেন।

বি। কে, আমি ত কিছুই জানি না—আমার সহিত তাঁহার অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই। যে দিবস আমি জেলে যাই, সেই দিবস প্রাতে দেখা হইয়াছিল। কিন্তু তখন শৈল কি করিতেছিলেন, বা সেখানে কোন্ সময় দেখা হইয়াছিল, তাহা কিছুই আমার স্মরণ হয় না। সেই দিন অবধি আর দেখা নাই।

যু। আর একদিন দেখা হইয়াছিল।

বি। কবে?

যু। যে দিন আপনি জেলখানা হইতে আইসেন।

বিনোদ ঈষৎ কাঁপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

যু। মহাশয়ের বাটীতে।

বিনোদ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই রাত্রে?"

যু। সেই রাত্রে।

বিনোদ ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ উন্মাদের চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি রাত্রের ঘটনা সত্য?"

যুবতী মস্তক নত করিয়া রহিল, আর কোন উত্তর করিল না।

বিনোদ মর্ম্মজ্বালায় ছুটিলেন; একবার মস্তক ফিরাইয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি চাহিয়া, "পাপিষ্ঠা, আমার সুখ ঘুচাইলি" বলিয়া নদীকূলে চলিলেন। তাঁহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া গাভীরা মুখ তুলিয়া রহিল, হংসগণ কূল হইতে জলে নামিল, দুই কুক্কুরেরা আহার ফেলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিতে লাগিল। বিনোদ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া দ্রুত বেগে ছুটিতে লাগিলেন। কতক দূর যাইয়া কূলে একটী অস্থিময় মড়ার মাথা দেখিয়া দাঁড়াইলেন; উহার ভগ্ন নাসা, কূপচক্ষু, আকর্ণ বিস্তৃত দন্তশ্রেণী দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এই দেখ, আমিও হাসিতে জানি, আমি এখনও হাসিতে পারি, কেন হাসিব না? তোমার কি হইয়াছে? কিছুই নহে বল, তুমি হাস কেন? তুমি কোন্ যন্ত্রণা লুকাইয়া হাসিতেছ? তোমার হাসির মর্ম্ম কি? আমার অদৃষ্ট দেখিয়া হাসিতেছ? তুমি স্ত্রীলোকের স্কন্ধে শোভা পাইয়াছিলে, তাই তোমার এত হাসি; তোমার দেহ গিয়াছে, প্রাণ গিয়াছে, তবু হাসি যায় নাই; এই যাউক"—বলিয়া শবমস্তকে পদাঘাত করিলেন। শবমস্তক গড়াইতে গড়াইতে জলে পড়িল। বিনোদ দেখিলেন যে, মড়ার মাথা গড়াইতে গড়াইতেও তাঁহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া হাসিতে লাগিল; একবার তাঁহার দিকে দন্তবিদারণ করিয়া হাসে, আবার বালুকায় মুখ লুকায়, আবার ফিরিয়া হাসে। যে স্থানে শবমস্তক ডুবিল, সেই স্থান হইতে দুই চারিটী জলবিন্দু নদীতে উঠিল—ফাটিল, মিশাইয়া গেল। বিনোদ আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া অন্যদিকে দৌড়িতে লাগিলেন। সম্মুখে পথিপ্রান্তে একখানি ভগ্নশকট পড়িয়াছিল, বিনোদ দৌড়িয়া সেই শকটে স্কন্ধ দিলেন; বিনা কষ্টে শকট স্থানান্তরিত করিলেন। শারীরিক শ্রমে তাঁহার উপকার হইল। ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, যেখানে যুবতীকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন, সেইখানে সে দাঁড়াইয়া মাধবীপত্র লইয়া ছিঁড়িতেছে। বিনোদ তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না, চলিয়া গেলেন; আবার কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, "আমি তোমায় বড় কড়-কথা বলিয়াছি, আমি দুর্ভাগা, আমার উপর অভিমান করিও না, আমি বড় দুঃখী, এখন হইতে চিরদুঃখী হইলাম, আমার আর এ জন্মে কোন আশা-ভরসা রহিল না।" এই বলিয়া বিনোদ মুখ ফিরাইলেন; তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া যুবতীর নয়নাশ্রু মাধবীপত্রে পড়িতে লাগিল। বিনোদ গৃহপ্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, আর যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে ঘটনা বিবরিত হইয়াছে, তাহার প্রায় দশ বার দিবস পূর্ব্বে মোহান্ত আপন কুটীরে বসিয়া একখানি পত্র পড়িতেছিলেন, সেখানে রামদাস-সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। পত্রখানি শম্ভু কয়েদী লিখিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে মোহান্ত সচরাচর যেরূপ ক্ষুদ্র পত্র পাইতেন, তদপেক্ষা এ পত্রখানি অনেক দীর্ঘ

মোহান্ত এই পত্রের যে যে অংশ রামদাস-সন্ন্যাসীকে শুনাইলেন, আমরা সেই সেই অংশ নিম্নোদ্ধৃত করিলাম।

"আমার এ অবস্থা আর ভাল বোধ হয় না; অবস্থান্তরিত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। এক্ষণে মৃত্যুই প্রার্থনীয়; অতএব যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহা আমার বিশেষ বিশেষ আত্মীয়গণকে জানাইবেন। এখানকার জেলদারোগা ছুটি লইয়াছেন, শীঘ্র বিলাত যাইবেন। আমার এক্ষণে আর আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় হইবে না। এই সময় আর একটী কথা বলিয়া রাখি, যেরূপ অপরিমিত দান করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে বিরত হইলে ভাল হয়। আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এরূপ দানে কোন বিশেষ ফল নাই। বহুকালাবধি রাজারা দান করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার কি উপকার হইয়াছে? বাঙ্গালার দৈন্য-দশা সমভাবেই আছে। দুই চারি জন দরিদ্রকে অদৈন্য করিলে সমাজের কি উপকার হইবে? দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, জেলখানায় আর কয়েদী ধরে না। দানে ধন হস্তান্তরিত হয় বটে, কিন্তু ধনবৃদ্ধি হয় না, এক্ষণে যাহাতে বাঙ্গালার ধন-বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। ধনবৃদ্ধি করিতে গেলে ধনের সৃষ্টি করিতে হইবে। অতএব তাহার ব্যবস্থা করিবেন, এবং সে বিষয়ে আমার যাহা মত, তাহা পরে লিখিব।

"সাগরসুতকে বলিবেন যে, বাঙ্গালায় একটী শুভানুধ্যায়ী সম্প্রদায় হওয়া আবশ্যক। স্বার্থপরতা-শূন্য, পরোপকারী, ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সত্যবাদী লোক এই নিমিত্ত অতি সাবধানে বাছিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। আপাততঃ দ্বাদশ জন হইলেই যথেষ্ট। উহাদের চিনিবার নিমিত্ত একটী চিহ্ন আবশ্যক। সেই চিহ্ন উহাদের অঙ্গুরীতে অঙ্কিত থাকিবে, আর ইহাদের একটী উপাধি দিতে হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ যিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তিনিই এই উপাধি গ্রহণ করিবেন; কিন্তু এই উপাধি গ্রহণ করিলে যে পূর্ব্ব উপাধি ত্যাগ করিতে হইবে, এমত নহে; কেবল আপনাদিগের সম্প্রদায়-মধ্যে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

"এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে মহাকুলীন বলিলে ক্ষতি নাই। যদি তাঁহারা যথার্থই স্বার্থপরতাশূন্য, পরোপকারী, সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ক্লেশসহিষ্ণু হন, তবে যে তাঁহারা বল্লালসেনের কুলীন অপেক্ষা মহাকুলীন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। মহাকুলীনের যে পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা একাধারে পাওয়া সুকঠিন; কিন্তু তাহা না পাইলে কদাচ মহাকুলীন করা হইবে না; যদি এক ব্যক্তির ইহার কোন লক্ষণের সামান্য ব্যতিক্রম থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়কে যে গুরুতর ভার লইতে হইবে, তাহার বিঘ্ন ঘটিবে। তদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের গৌরব থাকিবে না। একজনের নিমিত্ত সকলকে অবনত হইতে হইবে, শেষে সম্প্রদায় নষ্ট হইবে। অতএব মহাকুলীন মনোনীত করা বড় গুরুতর কার্য্য। এই কার্য্য আপাততঃ আমি সাগরসুত-হস্তে ন্যস্ত করিলাম। এই কয়েকটী গুণ তাঁহাতে আছে, তিনি অদ্য হইতে মহাকুলীন হইলেন। কিন্তু আমার আক্ষেপ রহিল যে, আমি স্বয়ং যাইয়া বাঙ্গালার এই শুভ অনুষ্ঠান করিতে পারিলাম না, আর কিছু না হউক, আমার ইচ্ছা ছিল, এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটী অঙ্গুরী স্বহস্তে সাগরসুতের অঙ্গুলিতে পরাইতাম এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিতাম। তাহা না হউক, এক্ষণে একদিন উত্তম সময়ে আপনারা সকলে প্রসন্নচিত্তে বসিয়া সাগরসুতের অঙ্গুরীয়ধারণ দেখিবেন। অঙ্গুরীতে যেন এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। কি চিহ্ন মনোনীত হয়, তাহা আমায় লিখিবেন। আমার মতে ধানের শীষ মনোনীত করিলে ভাল হয়। যে মূর্ত্তি বা চিহ্ন গ্রাহ্য হয়, তাহা অঙ্গুরীতে অঙ্কিত করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পরিতে হইবে। ব্রাহ্মণের যেরূপ যজ্ঞোপবীত, মহাকুলীনদিগের সেইরূপ এই অঙ্গুরী থাকিবে।

"সাগরসুতকে এ অঞ্চলে যেরূপ মহাকুলীন করিলাম, এইরূপ স্থানে স্থানে আর দুই এক জনকেও অদ্য করিলাম। তাঁহারাও পরস্পর সম্প্রদায়-বৃদ্ধি করিবেন। তাঁহাদের সহিত কখন সাগরসুতের সাক্ষাৎ হইলে বীজমন্ত্রের দ্বারা পরিচয় হইবে।

"মহাকুলীনেরা প্রতিবৎসর দেবীপক্ষের দশমী-রাত্রে সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিবেন। পরস্পরের নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান যিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবেন। কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ রাত্রে তাঁহাকে ব্রতগ্রহণ করাইবেন।

"মহাকুলীনেরা ব্রত গ্রহণ করিবার সময় একটী প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে যে পাঠ

লিখিত হইবে, তাহা তাঁহারা আপনারাই বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন। 'স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া সাধ্যানুসারে পরোপকার করিবেন', এ কথা সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে অবশ্য লিখিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন আপনাদিগের মধ্যে 'সর্ব্বস্ব দিয়া পরস্পরের উপকার করিতে হইলে তাহাও করিবেন,' এ কথাও থাকিবে। কিন্তু উপকার করিবার নিমিত্ত যদি সত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হয়, তাহা করা হইবে না।

"মহাকুলীনের পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যদি কেহ স্ত্রীর অসঙ্গত বশতাপন্ন হয়েন, তবে তাঁহাকে সম্প্রদায়ভুক্ত করা হইবে না। তাঁহার যতই গুণ থাকুক, তিনি দীর্ঘকাল আপন ব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার গুণ ক্রমে ক্রমে স্ত্রীতে লয়-প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব লোপ হইয়া ক্রমে তিনি স্ত্রীর ছায়াস্বরূপ হইবেন। স্ত্রীর মত কথা কহিবেন, স্ত্রীর মত কার্য্য করিবেন; অতএব তাঁহাকে কদাচ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তবে যাহাদের স্ত্রীও এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্তা, তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার আপত্তি নাই, তাঁহাদের এই গুণ লোপ হইবে না, বরং আরও পুষ্টই হইবে।

"আর যাঁহারা মাদকসেবন করেন, তাঁহাদি-কেও সমাজভুক্ত করা না হয়। ইহাদের দ্বারা কোন উপকার হইবে না, বরং ভবিষ্যতে উপহাস্য হইতে হইবে।

"কি উদ্দেশে এই মহাকুলীনের দল বদ্ধ করা আবশ্যক এবং তাহাদের কি করিতে হইবে, তাহা আর এক সময়ে বলিব।

"এইরূপ সম্প্রদায় যে শীঘ্র বাঙ্গালায় সৃজিত হইতে পারে, এরূপ আমার বিশ্বাস আছে। পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি যে একেবারে বাঙ্গালায় নাই, এ কথা মিথ্যা, আমি স্বয়ং দুই তিন জনকে জানি, আপনারা তাহার মধ্যে একজন। যদি আমার পরিচয়ের মধ্যে এই দুই তিন জন থাকে, তবে অনেক আছে, অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। এই সম্প্রদায় বাঙ্গালায় যে অগ্রাহ্য হইবে কি উপহাস্য হইবে, এমত ভয় আমার নাই। পূর্ব্বে কুলীনসম্প্রদায় মনুষ্যকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, আর এই মহাকুলীন-সম্প্রদায় ঈশ্বর-কল্পিত। যাঁহারা এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, তাঁহাদিগকে মহাকুলীন ঈশ্বর করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বত্র। তাঁহাদের লোকে মহাকুলীন বলুক আর নাই বলুক, তাঁহারা পরোপকারী বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভালবাসে, সত্যবাদী বলিয়া সকলেই মান্য করে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভয় করে। এক্ষণে 'মহাকুলীন' উপাধি দিয়া লোকের নিকট তাঁহাদের নিমিত্ত নূতন সম্মান ভিক্ষা করিতে হইবে না, সম্মান তাঁহাদের আছেই, কেবল তাঁহাদের এক্ষণে পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া দিতে হইবে। এক্ষণে আমাদের মধ্যে ছোট-বড় সকলের কর্ত্তব্য, এই মহাকুলীন দলের কিসে পরস্পর সদ্ভাব হয়, তাহার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা।

"অদ্য এই পর্য্যন্ত। আমি যে মরণেচ্ছুক, ইহা ভুলিবেন না। ইতি।"

শম্ভু-কয়েদীর এই পত্র সমস্ত পাঠ শেষ হইলে রামদাস বলিলেন, "এ আবার কি ভাব?" মোহান্ত বলিলেন, "সে যাহাই হউক, এখনই উদ্যোগ আরম্ভ করিতে হইবে। তুমি যাও, সকলকে সমাচার পাঠাও।" "কাজেই" বলিয়া রামদাস উঠিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু-কয়েদী, জেলখানায় হাসিয়া গীত গাইয়া ঘানি ফিরাইয়া দিনপাত করিতেছে। রামদাস-সন্ন্যাসী কি মোহান্তের সম্মুখে শম্ভু যেরূপ গম্ভীর, শৈলের সম্মুখে যেরূপ ভয়ানক, জেলখানায় তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। শম্ভু ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, আপনি হাসিতেছে, সকলকে হাসাইতেছে। জেলখানায় শম্ভু যেন আর এক প্রকৃতির ব্যক্তি।

কোন্ কয়েদীর কি কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, শম্ভু তাহা সকলই জানিত; আবার কোন্ কয়েদী কি কর্ম্মে অপটু, তাহাও শম্ভু জানিত। সর্ব্বদাই শম্ভু তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া কর্ম্ম দেখাইয়া দিত, গল্প করিয়া তাহাদের শ্রান্তিদূর করিত, আবার সময়ে সময়ে তাহাদের কর্ম্ম আপনি লইয়া আশ্চর্য্য কৌশলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমাপন করিয়া দিত। শম্ভুকে তাহারা সকলেই ভালবাসিত, শম্ভুও তাহাদের ভালবাসিত। কোন্ কথায় কোন্ কয়েদীর মনোবেদনা হয়, তাহা শম্ভু জানিত, আবার কোন্ কথায় কে সুখী হয়, তাহাও শম্ভু বুঝিত। অতএব কয়েদীদিগের উপর শম্ভুর একাধিপত্য হইয়াছিল। তাহাদের বিপদে শম্ভু পরামর্শী; সম্পদে শম্ভু সুখ-ভোগী। যাহারা খালাস হইত, শম্ভু তাহাদের গোপনে অর্থদান করিত, সদুপদেশ দিত। যাহার

খালাস হইবে, তাহারা গৃহে যাইয়া কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহা শম্ভুর সহিত পরামর্শ করিত। কয়েদীর মধ্যে কেহ গৃহসংবাদ না পাইয়া ব্যস্ত হইলে শম্ভু তাহাকে সংবাদ আনাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিত, শম্ভুর গুণে সকলেই শম্ভুর বশতাপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু কয়েকটী দায়মালী কয়েদী সম্বন্ধে শম্ভু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিল। তাহাদের সহিত শম্ভু আলাপ করিতে গেলে তাহারা বৈরক্তি প্রকাশ করিত, তাহারা দূরে থাকিয়া শম্ভুর প্রতি ঈর্ষাভাবে কটাক্ষ করিত। শম্ভু কোন কারণ অনুভব করিতে পারিত না, কোনপ্রকারে তাহাদের উপকারও করিতে পারিত না।

মনুষ্য যতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হউন, কেহ না কেহ তাঁহার বিদ্বেষ করে—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই তাঁহার বিদ্বেষ করে। পরোপকার যেমন কাহার কাহার স্বভাবসিদ্ধ, বিদ্বেষও সেইরূপ কাহার কাহার স্বভাবসিদ্ধ। যাহারা শম্ভুর বিদ্বেষী, তাহারা একদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে একত্রে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া জেলখানার প্রাচীরসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল, "প্রাচীর ১২ হাত উচ্চ হইবে", কেহ বলিতেছিল,"এত হইবে না।" এই সময় আর একজন ক্ষুদ্রকায় কয়েদী সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিল, প্রাচীর যত হাত উচ্চ হউক, ইহা কেবল শম্ভু পার হইতে আর কাহার কর্ম্ম নহে। এই কথায় দায়মালীরা ক্ষুদ্রকায় কয়েদীকে আক্রমণ করিতে গেল, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় অতি চতুর, হাসিতে হাসিতে বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিল। দায়মালীরা ইহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শম্ভুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। শম্ভু তখন জেলদারোগার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে যে উদ্যোগ হইতেছিল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

শম্ভু হাসিয়া জেলদারোগাকে বলিতেছিল, "আমি কয়েদী না হইলে আপনার সঙ্গে বিলাত যাইতাম।" জেলদারোগা বলিল, "আমারও বড় সাধ যে, একবার তোমাকে আমাদের দেশে লইয়া যাই।"

শ। আমাকে লইয়া যাইতে আপনার সাধ কেন?

জে। বিলাতে সকলের বিশ্বাস আছে যে, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, একবার তোমাকে দেখিলেই তাহারা আশ্চর্য্য হইবে।

শ। যাহারা সমুদ্র দেখে নাই, তাহাদের এক বিন্দু জল দেখাইলে কি হইবে? প্রত্যেক বাঙ্গালী জলকণামাত্র, কেবল পরস্পরের সমষ্টিতে সমুদ্রবৎ হইতে পারে। জলকণা যতদিন একত্রিত না হয়, ততদিন কে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে?

জে। কেবল সমষ্টি নহে; তোমাদের সাহস আবশ্যক।

শ। ভয় আর সাহস এই দুই কথা যত প্রভেদ বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে, আমার ততটা বিশ্বাস নাই। আমাদের বাঙ্গালীকে ভীরু বলিয়া কখন আমি নিন্দা করি না। বাঙ্গালী প্রণয়ী, বাঙ্গালী অন্যের নিমিত্ত এ দেহের বোঝা বহিয়া বেড়ায়, তাহাতেই মরিতে চাহে না, তাহাতেই মরিতে ভয় পায়। বাঙ্গালী ভাবে, 'আমি গেলে আমার স্ত্রীর দশা কি হইবে?' ইংরাজ ভাবে, 'আমি গেলে আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করিবে', ভয় ও সাহসের মূল কেবল এই।

এই সময়ে জনেক প্রহরী আসিয়া বলিল, "সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। আহার প্রস্তুত, কয়েদীরা শম্ভুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে।"

জেলদারোগা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন অপেক্ষা করিতেছে?" প্রহরী কোন উত্তর দিতে না দিতেই শম্ভু বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ, এইজন্য আহারের পূর্ব্বে অনেকেই আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করে। অতএব অনুমতি হয় ত আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

জেলদারোগা সম্মানপুরঃসর শম্ভুকে বিদায় দিলে, শম্ভু অন্যমনস্কে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। এই সময় অন্ধকারে একজন অপরিচিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া শম্ভুর কর্ণে বলিল, "সাবধান!" শম্ভু ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পূর্ব্বরূপ সোপান অবতরণ করিয়া চলিয়া গেল।

এই সময় জেলদারোগা আপনার ভোজনগৃহ হইতে মহাকলরব শুনিতে পাইলেন। ক্রমে সেই কোলাহল ভয়ানক হইয়া উঠিল। জেলদারোগা ব্যস্ত হইয়া গৃহবহির্গত হইলেন, কিন্তু প্রহরীদিগের ছুটাছুটি দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন। যাহারেই জিজ্ঞাসা করেন, কেহই উত্তর দেয় না, সকলেই উদ্যানের দিকে দৌড়িতেছে। জেলদারোগা সোপান অবতরণ করিয়া অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিতে পাইলেন, উদ্যানের মধ্যস্থলে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। চারি পার্শ্বে কতকগুলা লোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে

আর দূরে দুই একটা মশালের আলোক ছুটিতেছে।

জেলদারোগা সত্বর সসজ্জ হইয়া যাইতেই গোলমাল থামিয়া গেল। একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "শম্ভু-কয়েদী খুন হইয়াছে।"

রাত্রি প্রহরেক সময় ডাক্তার-সাহেব তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, শম্ভু-কয়েদী অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। কে তাহাকে খুন করিল, তদন্তে তাহার কোন প্রমাণ হইল না। মেজেষ্টার-সাহেব স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। কেবল তাহাতে এইমাত্র প্রকাশ হইল যে, শম্ভু-কয়েদী নিজের দোষে কয়েদ হয় নাই, তাহার প্রকৃত নাম কি, তাহাও প্রকাশ পায় নাই।

ঘটনাটী এইরূপ। রামদাস নামে এক জন, জাতিতে ব্রাহ্মণ,পূর্ব্বে মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে নিযুক্ত ছিলেন। যৎকালে মহারাণী পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, রামদাস তাঁহার সঙ্গে থাকেন। লোকে বলিত, রামদাসের পরামর্শানুসারে মহারাণী গৃহ-ত্যাগিনী হয়েন; সে কথা কতদূর সত্য,প্রকাশ নাই।

একটী চটিতে মহারাণীকে তিন চারি দিবস থাকিতে হইয়াছিল, শেষদিন রাত্রে একদল ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করে, সেই দলের মধ্যে রামদাস ছিলেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া রামদাসের সহিত ডাকাতদিগের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদসূত্রে ডাকাতেরা তাঁহাকে সঙ্গী বলিয়া পরিচয় দেয়। রামদাস ধরা পড়িয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়ায়, জজ-সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারা-বাসের আজ্ঞা দিলেন। যে ডাকাতদিগের সহায়তায় রামদাস দণ্ড পাইলেন, তাহারা রামদাসের প্রকৃত নাম জানিত না। রামদাস আপনাকে শম্ভু বলিয়া তাহাদের নিকট পরিচয় দিয়াছেন। সেই অবধি [illegible] শম্ভু বলিয়া তাঁহাকে জানিত। নথিতেও [illegible]াস নাম উল্লেখ ছিল না। জজ-সাহেবও রামদাসকে শম্ভু বলিয়া দণ্ড দেন।

আজ্ঞার পর যখন রামদাসকে জেলে লইয়া যায়, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রামদাস কনেষ্টবল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশব্দে যাইতেছেন, এমত সময় একজন কনেষ্টবল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছে?" রামদাস কহিলেন, "আমার আর কেহই নাই, থাকিলে আমি জেলে যাইতে সম্মত হইতাম না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, জেল আমার পক্ষে মন্দ নহে; আর আমাকে অন্নচিন্তা করিতে হইবে না, যাবজ্জীবন একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে থাকিব।"

আর একজন কনেষ্টবল জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি এ ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলে না?" রামদাস কেবলমাত্র বলিলেন, "না।" আর কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কতকদূর আসিয়া রামদাস উদরের উপর হস্ত রাখিয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটে পুষ্করিণী আছে?" এক জন বলিল, "আছে।" রামদাস বলিলেন, "সত্বরে সেই দিকে চল।" পরে তথায় উপস্থিত হইয়া কনেষ্টবলগণ হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া পথে দাঁড়াইল; রামদাস নিকটেই বসিলেন। প্রহরিগণ অন্যমনস্ক হইলে রামদাস বেগে পলাইলেন। "আসামী ভাগা" বলিয়া দুই এক জন কনেষ্টবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। আরও অনেকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল, কিন্তু রামদাস দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; কনেষ্টবলগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে, এমত সময় কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছিল। তাহারা দূরে কনেষ্টবলদিগকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আসামী এই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" রামদাস বাস্তবিক সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তথায় এক ব্রহ্মচারী বসিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রামদাস তাঁহার গৈরিকবেশ দেখিবামাত্র পাদমূলে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আমি কয়েদী, আমার পশ্চাতে কনেষ্টবল আসিতেছে।" ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে উঠিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। রামদাস অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন, "আমাকে শম্ভু-ডাকাত মনে করিয়া জজ-সাহেব অন্যায়পূর্ব্বক কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। আমি জেলে যাইতে যাইতে পলাইয়াছি। আমি শম্ভু নহি, আমার নাম রামদাস; মহারাজ মহেশচন্দ্রের ভৃত্য ছিলাম। এক্ষণে পথে পথে ভিক্ষা করি।"

ব্রহ্মচারী আপন পরিচ্ছদ রামদাসকে পরাইয়া বলিলেন, "তুমি অদ্যাবধি রামদাস-সন্ন্যাসী হইলে।" আপনি রামদাসের পরিচ্ছদ পরিয়া ঈষৎ হাসিয়া

বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি শম্ভু-কয়েদী হইলাম।" এই সময় কনেষ্টবলগণ দ্বারে প্রহার করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী রামদাসের কর্ণে দুই চারিটী কি কথা বলিয়া একটী গুপ্ত সুরঙ্গ দেখাইয়া দিলেন। রামদাস সেই অবধি মোহান্তের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এদিকে কনেষ্টবলেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া শম্ভু-কয়েদীকে লইয়া গেল। কতক পথে গিয়া আপনাদের ভ্রম জানিতে পারিল। ব্রহ্মচারী তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তোমরা চল, এখন আমিই শম্ভু-ডাকাত।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই এক দিবসের মধ্যে জেলদারোগা পদচ্যুত হইলেন। অযোগ্য দোষ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত তিনি পুনঃ পুনঃ জানাইলেন যে, প্রহরিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া অপর কোন ব্যক্তির মৃতদেহ আনিয়া জেলখানায় ফেলিয়াছিল; শম্ভু-কয়েদী মরে নাই, পলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এ কথা কর্ত্তৃপক্ষ কেহ বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত্তরে জেলদারোগাকে বলা হইল যে, এ কথা সত্য হইলেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, যে জেলখানা হইতে কয়েদী পলাইতে পারে, তাহার দারোগা অযোগ্য। অগত্যা একদিন অপরাহ্ণে জেলদারোগার মেম আপনার শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে স্বামীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ওয়ান কোচবাক্স হইতে টিটকিরি দিয়া ঘোড়া চালাইতে লাগিল, ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। জেলদারোগা গলায় কম্ফোর্টর জড়াইয়া উরুর উপর একটী সন্তানকে বসাইয়া, জেলখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে [illegible]লিলেন। যতক্ষণ জেলখানা দেখা গেল, ততক্ষণ আপনার স্ত্রীর প্রতি না চাহিয়া কি অন্য কাহার সহিত কথা না কহিয়া কেবল জেলখানার উচ্চ প্রাচীর, কারনিস, রুদ্ধ খড়খড়ি দেখিতে লাগিলেন; যখন আর তাহা দেখা গেল না, তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উনিশ বৎসর আমি ঐ বাটীতে ছিলাম, উনিশ বৎসরের বসবাস সহজে ভুলা যায় না।" এই কথায় তাঁহার মেম কাঁদিয়া উঠিলেন, জেলদারোগার বক্ষে মাথা রাখিয়া সজলনয়নে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার এই সন্তানসন্ততিদিগের উপায় কি হইবে? তুমি কেন শম্ভু-কয়েদীকে বিশ্বাস করিয়াছিলে? বাঙ্গালী অবিশ্বাসী চিরকাল; দেখ দেখি, সে তোমার কি দশা করিল।"

জেলদারোগা বলিলেন, "যে যাহা বলিতে চাহে, বলুক, কিন্তু শম্ভু যে অবিশ্বাসী, এ কথা আমি শুনিব না। শম্ভু পলায় নাই, মরিয়াছে নিশ্চয়; তবে যে তাহার মৃতদেহ কেন পাওয়া গেল না, তাহা বলিতে পারি না। প্রহরীরা যে মৃতদেহ শম্ভুর বলিয়া এজাহার দিল, সে দেহ শম্ভুর নহে, অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির হইবে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ কিরূপে জেলখানায় আসিল, কেনই বা ঐ দেহ শম্ভুর বলিয়া প্রহরীরা পরিচয় দিল, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা যেন সকলই ভোজবাজী বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এই সময় হঠাৎ গাড়ী থামিল। জেলদারোগা গাড়ী হইতে মাথা বাহির করিয়া দেখিলেন যে, একজন অস্ত্রধারী পুরুষ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর একজন পথিপার্শ্বস্থ-বনমধ্যে লুক্কায়িতভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অস্ত্রধারীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া জেলদারোগা একটী পিস্তল হস্তে তুলিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মেম ভয়ে ক্রোড়স্থ শিশুকে বক্ষোপরে টিপিয়া ধরিলেন; শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময় অস্ত্রধারী পুরুষ সাহেবকে সেলাম করিয়া একখানি পত্র দিল। পত্রখানি এই—"মহাশয়ের পদচ্যুতি-সংবাদ শুনিয়া শম্ভু-কয়েদীর কোন বিশেষ আত্মীয় এই পত্রমধ্যে লক্ষটাকার নোট পাঠাইতেছেন। তাঁহার আন্তরিক প্রত্যাশা যে, আপনি এক্ষণে জেলদারোগাগিরি পদের আর আকাঙ্ক্ষা করিবেন না।" জেলদারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কে পাঠাইয়াছে?" অস্ত্রধারী বলিল, "সে কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

জেলদারোগা একে একে নোট গণিতে লাগিলেন। গণনা সমাধা হইলে মস্তক তুলিয়া দেখিলেন, অস্ত্রধারী পুরুষ আর সেখানে নাই। জেলদারোগা তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া বনের দিকে ছুটিলেন। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, এক দীর্ঘাকার পুরুষ অস্ত্রধারী ব্যক্তির সহিত অস্পষ্টস্বরে কি কথা কহিতেছে। জেলদারোগা তাহাকে শম্ভু বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ হইতে যাইয়া হঠাৎ সবলে ধরিলেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শম্ভু, তুমি অবিশ্বাসী, তুমি জেল

হইতে পলাইয়াছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব, তোমার নিমিত্ত আমি অপমানিত হইয়াছি ।"

দীর্ঘাকার পুরুষ ভ্রুকুটী করিয়া সাহেবের দিকে ফিরিলে সাহেব বুঝিলেন যে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, এ ব্যক্তি শম্ভু নহে। জেলদারোগা অপ্রতিভ হইয়া শ..র বার্ত্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত পুরুষকে যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ জেলদারোগা তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ যখন তাহাকে আর দেখা গেল না, তখন জেলদারোগা মাথা নাড়িয়া অস্ফুট বাক্যে বলিলেন, "তুমি শম্ভু না হও, তাহার কোন আত্মীয়-স্বজন হইবে, ভাল, আবার যদি কখন সাক্ষাৎ হয়, দেখা যাবে, তোমার চক্ষে কি আছে ।" এই অপরিচিত ব্যক্তি যে দিকে গিয়াছে, সেই চাহিয়া মাথা নাড়িয়া ফিরিলেন; ফিরিয়াই র সেই দিকে চাহিয়া পকেট হইতে নোটের হির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিলেন; গণিতে এক একবার সহাস্যবদনে অপরিচিত ব্যক্তির দিকে চাহিতে লাগিলেন; শেষ গণনা সমাধা , নোটগুলি সযত্নে আবার পকেটে রাখিলেন। তাহার পর একটী "চুরুট" বাহির করিয়া, তাহার দুই অগ্র দুই হস্তে ধরিয়া, ছিদ্র আছে কি না, নয়নাগ্রে তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে গাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলেন।

গাড়ীতে মেমসাহেব অতি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে বনমধ্যে অপরিচিত অস্ত্রধারীকে দেখিয়া, তাহার ভয় হইয়াছিল; তাহার পর পত্র এবং সেই সঙ্গে ...কার নোট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সেই নোট সম্বন্ধে সাহেবকে দুই একটী কথা ..., সাহেব তাহার কোন উত্তর না দিয়া ... গিয়াছিলেন। মেমসাহেব এই স... কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড়ই ব্যস্ত ..., নিজ শ্বেতশরীরের অর্দ্ধাংশ গাড়ী হইতে ...র করিয়া যমের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। এমত সময়ে সাহেবকে আসিতে দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে শরীর কুঞ্চিত করিয়া যথাস্থানে স্থির হইয়া বসিলেন।

সাহেব গাড়ীর নিকট আসিয়া চুরুটের এক অগ্র দন্তমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। তাহার পর বিলাতী দীপশলাকা দ্বারা অগ্নি জ্বালিত করিয়া চুরুটের অপর অগ্রে ধরিলেন। এই সময় মেম সাহেব উপর্য্যুপরি কত প্রশ্নই করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া সাহেব একদৃষ্টে চুরুটে অগ্নিসংস্কার হইল কি না, দেখিতে দেখিতে টানিতে লাগিলেন। চুরুট ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অগ্নিসংস্কার করিতে লাগিলেন; শেষ যখন দেখিলেন যে, চুরুট আর নির্ব্বাণের সম্ভব নাই, তখন দীপশলাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া মেমসাহেবের দিকে চাহিলেন। মেমসাহেব আবার পূর্ব্বমত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সাহেব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, "সকল প্রশ্নের উত্তর একবারে হয় না, একে একে বলিতেছি।" এই বলিয়া গাড়ী হইতে মাথা বাহির করিয়া গাড়ওয়ানকে বলিলেন "ঘোড়া বড় ধীরে ধীরে চলিতেছে, শীঘ্র চালাও।" তাহার পর ভস্ম ঝাড়িয়া চুরুটটী আবার সযত্নে মুখমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, দুই হস্ত দুই পকেটের মধ্যে রাখিয়া পদদ্বয় বিস্তার করিয়া অতি প্রশান্তভাবে মেমসাহেবের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র কে লিখিয়াছে, নোট কাহাকে দিতে হইবে, কত টাকার নোট ?"

সাহেব দুই অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠ হইতে চুরুট লইয়া একবার তাহার অগ্রভাগ দেখিলেন; তাহার পর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমার তিন প্রশ্নের একে একে উত্তর দিই—প্রথম কথা কাহার পত্র ? উত্তম প্রশ্ন, সঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, কেন না, যে এ পত্র লিখিয়াছে, সে আপন নাম স্বাক্ষর করে নাই ।"

মেম। পত্রবাহককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে না কেন ?

সাহেব। একে একে প্রশ্ন কর; যে তিন প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার অগ্রে উত্তর দিই—তাহার পর নূতন প্রশ্ন করিও।

মেমসাহেব অগত্যা আপন কৌতূহল সংবরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সাহেব তখন বলিতে লাগিলেন, "তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে;

দ্বিতীয় প্রশ্ন, নোট কাহাকে দিতে হইবে? ভাল, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, নোট কাহাকেও দিতে হইবে না, আমাদের নিকট থাকিবে।"

মেম। আমাদের নিকট থাকিবে? সে কি! কেন? তবে কি ঐ নোট কেহ আমাদের দিয়াছে?

সাহেব। "থাম, থাম, এখনও এ সকল বলিবার সময় হয় নাই। তোমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এখনও বাকী আছে। তৃতীয় প্রশ্ন কত টাকার নোট? এ কথা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তুমি আমার স্ত্রী, প্রিয়া, প্রাণাধিকা, অন্তরের অন্তর, তুমি এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমিও অবশ্য উত্তর করিতে পারি, অতএব উত্তর করি।" এই বলিয়া দুই চারি বার চুরুট টানিলেন, চুরুটের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, আবার দীপ-শলাকা বাহির করিয়া চুরুট পুনর্জ্বলিত করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় মেমসাহেব আবার বলিলেন, "কত টাকার নোট, একবার বল না।" সাহেব কিঞ্চিৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না, এ সকল ব্যস্তের কর্ম্ম নহে, সকলই সময়ে শুনিতে পাইবে।" এই বলিয়া সাহেব পুর্ব্ববৎ দুই পকেটে দুই হাত দিয়া গাড়ী ঠেস দিয়া পদদ্বয় ঈষৎ বিস্তার করিয়া চুরুট টানিতে টানিতে মেমসাহেবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেমসাহেব দেখিলেন যে, এ সময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা, অতএব অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শেষ, সাহেব মুখ হইতে চুরুট বহির্গত করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া চুরুটের ভস্ম ঝাড়িয়া বলিলেন, "তোমার তৃতীয় প্রশ্ন, কত টাকার নোট," এই বলিয়া সাহেব এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া মাথা নামাইয়া মেমসাহেবের মুখের নিকট মুখ আনিয়া কিঞ্চিৎ অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "লক্ষ টাকার নোট—এ নোট আমাদের হইল।" মেমসাহেব আহ্লাদে স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সাহেব চুরুট টানিতে টানিতে সস্নেহে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; চুরুট হইতে দুই এক বিন্দু ছাই মেমের মাথায় পড়িতে লাগিল, সাহেব তাহা যত্নে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। সাহেব-বিবির দাম্পত্যপ্রণয়ের আর সীমা রহিল না।

কিঞ্চিৎ পরে মেমসাহেব স্বামীর অঙ্গ হইতে মাথা তুলিয়া যথাস্থানে বসিলেন; বসিয়া আপনার সন্তানসন্ততিদিগের মুখচুম্বন করিয়া একে একে স্বামীর ক্রোড়ে দিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের সহিত যে যুবতীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার নাম মাধবী। রামদাস সন্ন্যাসীর আদেশমত মাধবী তাঁহার নিকট গিয়াছিল। প্রত্যাগমন করিলে রামদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

মাধ। হইয়াছিল।

রাম। কেমন দেখিলে?

সন্ন্যাসী এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিবামাত্র যুবতীর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল, দৃষ্টি নত হইল। রাত্রিকাল বলিয়া রামদাস এ সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

রাম। আমি যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহা সকলই করিয়াছ?

মাধ। করিয়াছি।

রাম। মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি যাহা তোমায় দিয়াছিলাম, তাহা কই? সঙ্গে আনিয়াছ?

মাধ। আনিয়াছি; কিন্তু মহাশয়ের যদি আর প্রয়োজন না থাকে, তবে প্রতিমূর্ত্তিখানি আমি রাখিতে অভিলাষ করি।

রাম। এক্ষণে উহা আমাকে দেও, পরে মোহান্তের অনুমতি লইয়া তোমাকে দিব।

মাধ। তবে আমি এক্ষণে যাই।

রাম। এত শীঘ্র কেন যাইবে? বিনোদকে দেখিয়া আসিলে, একবার শৈলকে দেখ; তাহাকে বালিকাকালে দেখিয়াছিলে, একবার তাহাকে এ সময়ে দেখ।

মাধ। শৈল কোথায়?

রাম। তাহা এক্ষণে বলিব না; কল্য অতি প্রত্যূষে যদি আসিতে পার, তবে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে আবদ্ধ রহিয়াছে।

মাধ। এ যন্ত্রণা তাহাকে কে দিতেছে?

"সে সকল কথা কল্য জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া রামদাস সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মাধবী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রামদাস অদৃশ্য হইলে মাধবী ভাবিতে ভাবিতে তরুমূল হইতে চারিদিক্ অবলোকন করিতে লাগিল। সম্মুখে শ্বেত দেবমন্দির, জ্যোৎস্নালোকে আরও শ্বেত দেখাইতেছে; তাহার ছায়া অন্ধকারময় হইয়া পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের ছায়া অপেক্ষা চন্দ্রালোকের ছায়া কালিমাময়। এই জন্য চন্দ্রালোকের পার্শ্বে সেই ছায়া

মনোহর। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। বাতাস নাই, কোন শব্দও নাই; কেবল একটী শব্দ অনুভব হয়, তাহা কর্ণ স্পর্শ করে না, অথচ অন্তর স্পর্শ করে। সে শব্দ রাত্রির, রাত্রির নিজের—অতি গম্ভীর, অতি ভয়ানক, অতি নিঃশব্দ। রাত্রির কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যায় না, অথচ সেই কণ্ঠে অঙ্গ কণ্টকিত হয়। যে বলিয়াছে রাত্রি ঝম্ ঝম্ করিতেছে, সে কতক বুঝিয়াছে।

মাধবী একা দাঁড়াইয়া শৈলের কথা ভাবিতেছে। একবার শিহরিয়া বলিল, "যদি আমায় এই মৃত্তিকার নীচে রাখিত, তবে আমি কি করিতাম? চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতাম? আমার কে আছে? ডাকিলেই বা কে শুনিত? শৈলের কি কঠিন প্রাণ, এখনও শৈল জীবিত আছেন! সেই শৈল! তখন শৈল কত সুন্দর, কত কোমল, কত আদরের ধন ছিলেন, এখন সেই শৈল ময়ত্নে মৃত্তিকার নীচে একাকিনী কাঁদিতেছেন! আমি তাঁহার সঙ্গে কাঁদিব—আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিব।" এই বলিয়াই মাধবী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে চলিল। তাঁহার দ্বারে যাইয়া মৃদু মৃদু সারঙ্গ-রব করিল। সন্ন্যাসীর তখন অল্প নিদ্রা আসিয়াছিল; সারঙ্গ-রবে আরও তাঁহার নিদ্রা গাঢ় হইল। মাধবী অনন্যোপায় হইয়া দ্বারে আঘাত করিল। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দ্বারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আঘাত করিল?" মাধবী বলিল, "আমি।" সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

মাধ। এক্ষণে আমার মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।

রাম। কাহার নিমিত্ত?

মাধ। শৈলের নিমিত্ত।

রাম। আমি বলি বা আমার নিমিত্ত। শৈলের জন্য! তা ভাল, কল্য অতি প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

মাধ। অদ্যই ভাল, কল্য কেন?

রাম। এক্ষণে শৈল নিদ্রা গিয়া থাকিবে।

মাধ। আমি তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইব।

রাম। তুমি তাহার ঘরে যাইতে পাইবে না। একটী প্রতিজ্ঞা যদি কর, তবে দেখা করিতে দিতে পারি। অর্থাৎ—অর্থাৎ—যদি—আমায় বিবাহ কর। আমিও ব্রাহ্মণ, আমারও বিবাহ হয় নাই, তোমারও বিবাহ হয় নাই। মহারাজের সমুদয় টাকা, ধন-দৌলত আমারই হাতে বলিতে হইবে। মোহান্ত কেহই নহে, আমি মনে করিলেই তাহাকে বৈতরণী নদী পার করিয়া দিতে পারি। কি বল?

মাধবী প্রথমে বিবাহের কথা উপহাস মনে করিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে ভ্রান্তি গেল। মাধবী কোন উত্তর না করিয়া ফিরিলেন। রামদাস দেখিলেন, কথাটা অসময়ে প্রস্তাব করা হইয়াছে; অতএব বলিলেন, "আমি তামাস করিতেছিলাম, এখন চল, শৈলের নিকট চল।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবিত কিছু দেখিতে না পাইলে যে কি কষ্ট, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারি না। যে নির্জ্জনে কখন আবদ্ধ থাকিয়াছে, সেই কেবল এই কষ্ট জানে। মনুষ্য-অভাবে যদি বিড়াল-কুক্কুর বা পক্ষীকে পাওয়াও যায়, তবুও নির্জ্জনবাসের অসহনীয় কষ্ট কিছুদিন একপ্রকার সহা যায়। বিড়াল আমার কথা বুঝিতে পারুক, বা না পারুক, তবু কথা কহিবার সময় সে আমার মুখপ্রতি চাহিবে;—আদর করে আমার ক্রোড়ে আসিয়া বসিবে, এই যথেষ্ট। বিড়ালের পরিবর্ত্তে এই অবস্থায় কুক্কুর পাইলে আরও সুখ। বিড়াল অপেক্ষা কুক্কুরের সহিত আমাদের সহৃদয়তা অধিক। যেখানে বিড়াল কি কুক্কুর নাই, সেখানে একটী পক্ষী পাইলেও কষ্ট নিবারণ করা যায়। পক্ষী তোমাকে দেখিতেছে, তোমার কথা শুনিতেছে, তোমার কথা শুনিবে বলিয়া একবার বামভাগে মাথা হেলাইয়া আবার দক্ষিণভাগে মাথা হেলাইয়া তোমাকে দেখিতেছে অথবা তোমার কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। তুমি কথা কহিলে না, পক্ষী আপনি কলকল করিতে লাগিল, আবার আপন কণ্ঠরোধ করিয়া, তোমার কণ্ঠ শুনিবে বলিয়া মাথা হেলাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তুমি তথাপি কথা কহিলে না। পক্ষী আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তুমি বুঝিলে যে, সে তোমায় তিরস্কার করিতেছে—তুমি বুঝিলে যে, তুমি একা নহ।

একা, অসহ্য, অস্বাভাবিক। পশুরাও একা থাকিতে পারে না। যেখানে সজাতি না পায়, সেস্থলে অপর জাতিকে সঙ্গী পাইলেও শান্ত থাকে। এক সময় একটী অশ্ব একা আবদ্ধ ছিল। ক্রমে তাহার সেই অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল; শেষ একটী হংস তথায় আগত হওয়ায় অশ্ব যেন প্রাণ পাইল।

অশ্ব মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত আর হংসের নিকট ছাড়া থাকিতে পারিত না। হংস অশ্বের স্বজাতি নহে, হংসকে পাইয়া কেন অশ্ব প্রাণ পাইল? হংস আসিয়া তাহার কি উপকার করিল? অশ্ব কি ভয় পাইয়াছিল? কিসের ভয়? হংস কি তাহা হইতে অশ্বকে উদ্ধার করিতে সক্ষম?

একা থাকিলে একপ্রকার ভয় হয়, নিকটে কেহ সঙ্গী থাকিলেই আবার সে ভয় যায়। ভয়ের কারণ হইতে সঙ্গী উদ্ধার করিতে পারগ কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে না। অনেক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা রাত্রে একা এক ঘরে বাস করিতে পারে না, কিন্তু একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু নিকটে শয়ন করিয়া থাকিলে নির্ভয়ে বাস করিতে পারে। তাহাদের এ কিসের ভয়? কোন বিপদের ভয় নহে, কেন না, তাহা হইলে দুগ্ধপোষ্য বালক উপলক্ষে সে ভয় যাইত না—শিশু কোন বিপদ্ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে? এ ভয় ভৌতিক নহে, কেন না, দুগ্ধপোষ্য বালক সহায় হইলে কিরূপে ভূতনিবারণ হইবে?

এ ভয় পশুদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ আছে—পশুদিগের মধ্যে ভৌতিক ভয় অসম্ভব। বিপদের ভয়ও নহে, হংস অশ্বকে কোন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তবে ইহা কোন্ বিষয়ের ভয়? মনুষ্য, পশু, সকলেই এই করে, অথচ কিসের ভয়, কেহ জানে না, কেহ অনুভব করিতে পারে না।

দেঁতোর মা হয় ত বলিবে, ইহা একা থাকিবার ভয়। তাহা সত্য, কিন্তু একা থাকিতে ভয় কেন হয়, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। মূল কথা, ইহা যে ভয়ই হউক, অতি আশ্চর্য্য ভয়।

হয় ত ইহা ভয় নহে, ইহা আর কিছু। কে জানে, কে বলিতে পারে?

শৈল জীবিত কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, তথাপি শৈল নিদ্রা যায় নাই। তাহার আর নিদ্রা যাইবার কোন নিয়ম নাই, কখন দিবসে নিদ্রা যায়, রাত্রে বসিয়া কাঁদে, কখন রাত্রে নিদ্রা যায়, দিবসে বসিয়া গবাক্ষদ্বার প্রতি চাহিয়া থাকে। কখন একটী পতঙ্গ উড়িয়া আসিবে, এই প্রত্যাশায় সেই দিকে চাহিয়া থাকে। জীবিত কীটপতঙ্গ দেখিবার তাহার এক্ষণে একমাত্র অভিলাষ; দেখিতে পাইলে স্বর্গ বোধ করে, দেখিতে না পাইলে কাঁদিতে থাকে। একবার একটী মাছি ধরিতে মাছিটী মরিয়া গিয়াছিল; শৈল তাহার নিমিত্ত কতই কাঁদিল।

আর একবার একটী প্রজাপতি গবাক্ষদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, সেজন্য শৈল কতই ব্যথা পাইয়াছিল; নায়ক ফিরিয়া গেলে, নায়িকা কখন তত ব্যথা পায় নাই। শৈল ঊর্দ্ধমুখে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া মনে করিতে লাগিল, "প্রজাপতি আবার আসিবে, এইখানেই আছে, এই দ্বারের পার্শ্বে উড়িতেছে, পার্শ্বে কোথায় কি আছে, তাহা দেখিয়া আসিতেছে, প্রজাপতির এইরূপ স্বভাব, উড়িতে উড়িতে চারিদিকে দেখে, সকল দেখা হইলেই আসিবে। কই, এখনও ত আসিল না, তবে কি উড়িতে উড়িতে দূরে গেল! গবাক্ষ কি ছাড়াইয়া গেল? তবে ত আর খুঁজিয়া পাইবে না, প্রজাপতিকে কে পথ বলে দিবে, আমি কেমন করে তারে ফিরাব, আমি কি বলে তাহারে ডাকিব, ডাকিলে কি সে শুনিতে পাবে? এই আমি এখানে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া শৈল প্রজাপতিকে ডাকিতে লাগিল, ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু প্রজাপতি ফিরিল না।

তার পর শৈল ভাবিল, "আমি চীৎকার করিয়াছি বলিয়া হয় ত প্রজাপতি ভয় পাইয়াছে—শব্দ না করিলে আবার আসিবে"; অতএব নীরব হইয়া শৈল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গবাক্ষ প্রতি চাহিয়া রহিল, তথাপি প্রজাপতি আসিল না; তখন আবার চীৎকার করিয়া শৈল কাঁদিয়া বলিল, "কে হয় ত আমার প্রজাপতিকে মেরে ফেলেছে, তাহা না হইলে সে আসিত—অবশ্য আসিত—অভাগিনীকে দেখা দিতে সে আবার আসিত। এখনও হয় ত সে মরে নাই, হয় ত প্রাচীরের মূলে পড়ে আছে, পাখা যোড় করিয়া উঠিতে উঠিতে টলিয়া পড়িতেছে, আমি গেলে এখনও [illegible] কে তারে বাঁচাবে? সে আমার কাছে আসিতেছিল—দুঃখিনীর দুঃখ ভেবে আসিতেছিল, কে এ বাদ সাধিল?"

শৈল আর পাষাণী নাই, পাষাণ গলিয়াছে বলিয়া সে এখন বালিকার মত এত কাঁদে। পূর্ব্বে কখন শৈল কাঁদে নাই। যে স্বামীর মরণ দেখিয়া কাঁদে নাই, সে এক্ষণে একটা পতঙ্গ কি প্রজাপতির নিমিত্ত কাঁদে। বিনোদকে দেখিবার নিমিত্ত যে শৈল কখন চক্ষু ফিরায় নাই, সেই শৈল এক্ষণে অতি কদাকার মনুষ্য দেখিতে পাইলে স্বর্গভোগ মনে করে। রামদাস-সন্ন্যাসী অতি কুরূপ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার,

অস্থিময়, রুক্ষ, কপর্দ্দক, তাহাতে কতকগুলা পক্ক ভ্রূকেশ জঞ্জালবৎ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, শৈল এই কদাকার পুরুষকে দেখিবার নিমিত্ত কত ব্যাকুলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসী কখন দেখা দিত না, শৈল কতবার কাঁদিয়া বলিয়াছে, "একবার দেখা দেও, না হয়, একবার কথা কও, তাহাও না হয়, একবার তোমার ছায়া দেখিতে দেও।" সন্ন্যাসী পাষাণ, ইহার কোন কথাই শুনিত না। মনুষ্যকণ্ঠ শুনিবে বলিয়া শৈল পাগল হইয়া ফিরিত; মনুষ্যকণ্ঠ কেন? কোন কণ্ঠ শুনিতে পাইত না।

শৈল কেবল মনুষ্য দেখিতে চায়, মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে চায়; আর কিছুই চায় না। একদিন শৈল বসিয়া প্রতিবাসীদিগের আকৃতি, তাহাদের স্বর, তাহাদের হাসি, তাহাদের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোনপ্রকারে স্পষ্ট স্মরণ হইল না; শেষে যন্ত্রণায় শৈল অমনি আপন গলদেশ টিপিয়া ধরিল। আবার এক একদিন শৈল ভাবিত,"আমার চারিদিকে এত লোক ছিল, আমি কেন তাহাদের ভাল-বাসি নাই, কেন তাহাদের আদর করি নাই, কেন দিবারাত্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরি নাই?"

এই অবস্থায় একদিন শৈল আহারান্তে অপর রে আসিয়া দেখে, সন্ন্যাসী একখানি স্বর্ণপাত্রে নাবিধ হীরক ও মুক্তা-খচিত অলঙ্কার রাখিয়া গয়াছে। শৈল তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়া লিল, "আর কেন আমায় যন্ত্রণা দেও, আমি এ কল আর কিছুই চাই না, আমায় একবার দেখা দও, একবার আমায় শৈল বলে ডাক, অনেকদিন মায় কেহ ডাকে নাই।"

সড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, রাত্রি দুই প্রহর, [illegible]াপি শৈল নিদ্রা যায় নাই, বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। [illegible]ন পূর্ব্বাবস্থা, কখন বর্ত্তমান অবস্থা, কখন মেঘ-[illegible], কখন রন্ধনকার্য্য ভাবিতেছে; একবার মনে [illegible]ল যেন, সম্মুখে হু হু করিয়া চুল্লী জলিতেছে, তাহার [illegible] কৃষ্ণবর্ণ হাঁড়িতে অন্নপাক হইতেছে; শৈল [illegible]ক দিন অন্ন খায় নাই, অতএব মনে মনে অন্ন-পা[illegible] করিতেছে। মনে মনে দেখিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ একটী দুইটী করিয়া গ্রথিত মুক্তামালার ন্যায় হাঁড়ির অঙ্গে লাগিতে লাগিল। তাহার পর অসংখ্য বুদ্বুদ, বুদ্বুদের উপর বুদ্বুদ উঠিতে লাগিল। আর তাহাদের স্থান হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদেরা যেন পরামর্শ করিয়া পরস্পর পরস্পরে মিলিতে লাগিল। চারি পাঁচটী একত্রে এক একটী বড় বুদ্বুদ্ হইয়া ফুটিতে লাগিল, ক্রমে স্ফীত হইয়া হাঁড়িতে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। শৈল মনে মনে অন্নযষ্টি দ্বারা তাড়না করিল; করিবামাত্র বুদ্বুদ্ অদৃশ্য হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত জল টগ বগ্ করিয়া স্থানে স্থানে লাফাইতে লাগিল। শৈল একটু সরিয়া বসিল; ভাবিল, "অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, এখন দেঁতোর মা কোথায়? আহারের স্থান পরিষ্কার করুক।"

দেঁতোর মার নাম মনে আসিবামাত্র সকল স্মরণ হইল। শিহরিয়া নতশিরে শৈল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। আপনার হৃদয়াঘাত আপনি শুনিতে পাইতে লাগিল।

তাহার পরে ভাবিতে লাগিল, "সে কত দিন হবে। কত দিন হবে, আমি এখানে এসেছি? কত দিন, কি কত বৎসর! অধিক বৎসর হবে না, অধিক বৎসর হইলে আমি বুদ্ধ হইতাম, বোধ হয়, আমি বুড়ী হই নাই। আজ কি বার? জানি না। কি মাস, তাহাও জানি না, দিন গিয়াছে, দিন এসেছে, এমনি করে কত দিন গিয়াছে, হয় ত কত মাসও গিয়াছে। ফাল্গুন মাসে এখানে এসেছি, এখন কি মাস? আর মাস জানিয়াই বা আমার কি হইবে? এক্ষণে আমার পক্ষে সকল মাস, সকল বার, সকলস ময় সমান হইয়া পড়িয়াছে। তবু কোন্ মাস জানিলে সুখ আছে। ফাল্গুনমাসে যখন আমি এখানে আসি, তখন বৎসরের কি সুখের দিন ছিল! বৈকালে মেয়েরা মুখ মুছে গাল ভরে পান খেয়ে কলসী কাঁকে আঁচল ধরে জল আনিতে যাইত; আর সেই সময় মধুর বাতাস কেমন অল্পে অল্পে কাণের পাশ দিয়া যাইত; সুখে শরীর রোমাঞ্চিত হইত। আজও মেয়েরা কি সেইরূপ সুখে হাসিতে হাসিতে নদীতে যায়? যায় বই কি। তাহারা কত সুখে আছে; যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতেছে, যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা কহিতেছে, পৃথিবীর কুৎসিত সামগ্রীর উপর তাহারা দৃষ্টিপাতও করে না, সুন্দর সামগ্রী তাহারা দেখি-য়াও ফুরাইতে পারে না। আর আমি? কুৎসিতেও বঞ্চিত। সুন্দর-কুৎসিত কিছুই দেখিতে পাই না, এ পোড়া চক্ষু তবে কেন হইয়াছিল? ইচ্ছা করে, নখ বিঁধিয়া তুলিয়া ফেলি। আর কাণই বা আমার

কেন ? আমি ত আর কিছুই শুনিতে পেলেম না। একদিন যদি মেঘ ডাকিত, তাহা হইলে হয় ত এখান হইতে শুনিতে পাইতাম। মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন সকলের শয়নঘরে যায়, তবে আমার ঘরে কেন আইসে না ? মেঘের শব্দ কি মধুর ! কি গম্ভীর ! শব্দ কেমন আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া বেড়ায়, আবার কেমন ধীরে ধীরে দূরে মিলাইয়া যায়। যখন মেঘের ডাক শুনিতে পেতাম, তখন তাহা শুনি নাই, তাহা বুঝি নাই। তিনি কত বলিতেন, 'একবার শুন।' একবারও কাণ পাতিতাম না ; তিনি বলিতেন বলিয়াই হয় ত শুনি নাই। এখন যে আমার বুকের ভিতর কেমন করে। আবার কি কখন সেই মেঘের ডাক শুনিতে পাব ? যখন শুনিতে পেতাম, তখন শুনি নাই।"

এই সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। শৈল চমকিয়া কর্ণে হাত দিল। উৎকট শব্দ শুনিয়া বাদ্য যেন অপ্রতিভ হইয়া আপনিই থামিল। শৈল সভয়ে মা। ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না ; কেবল এইমাত্র বোধ হইল, যেন পশ্চিমদিকের লৌহদ্বার ঈষদুন্মুক্ত রহিয়াছে। শৈল সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত উঠিল, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেই শব্দ আবার আরম্ভ হইল, এবার শব্দ অতি কোমল, অতি মনোহর ; তথাপি শৈলের অসহ্য হইয়া উঠিল। শৈল অনেকদিন কর্ণে কিছুই শুনে নাই, এখন অল্প শব্দই কর্ণের কষ্টকর হয়। তাহাতে আবার যে স্থানে হইতে শব্দ বিনির্গত হইতেছিল, তথায় ছাদ নাই, সমুদায় খিলান। সেই স্থানের সামান্য শব্দের প্রতিধ্বনিতে ঘর পূরিয়া যায়।

শৈল কাতরস্বরে বলিল, "সন্ন্যাসি, তুমি আমায় কি বলিতেছ, স্পষ্ট করে বল—মৃদুস্বরে বল ; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

এ কথার কেহ কোন উত্তর দিল না। শৈল ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখিল, আর কোন শব্দ হইল না। তখন শৈল পুনর্ব্বার কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে কথা কহিলে, কি শব্দ করিলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসি ! আমি অনাথা—আমার আর কেহ নাই, আমায় রক্ষা কর। ধীরে একটী কথা কও, কথা না কও, একবার কোনপ্রকারে জানাও যে, তুমি ঐখানে আছ। নিকটে মানুষ আছে জানিলেই আমি আর কাঁদিব না, আর তোমায় বিরক্ত করিব না, আমায় এখানে যতদিন রাখিবে, ততদিন থাকিব, কিন্তু আর একা থাকিতে পারিব না। আমার ভয় করে।"

এই সময় একটী গীত আরম্ভ হইল। নির্জ্জনে শোকাতুর ব্যক্তি সুখী তারা যদি কখন দূর হইতে চুপি চুপি কাঁদিয়া থাকে, তবে সে যে ম্লান মৃদুস্বরে কাঁদিয়াছিল, গীতটী সেই সুরে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। গীতটী এই—

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার।
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার॥
যত পেলে আঁখিজল,
তত সে হ'ল প্রবল ;
এখন লতা-ভরে তরু মরে, কে করে প্রতিকার॥

গীতটী পূর্ব্বে শৈল শুনিয়াছিল, কিন্তু তখন ইহার মর্ম্ম বুঝে নাই, কর্ণপাতও করে নাই ; কিন্তু এক্ষণে শুনিয়া শৈল দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া নতশিরে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। যে গাইতেছিল, সে-ও গাইতে গাইতে কাঁদিয়া ফেলিল, আর গাইতে পারিল না। অশ্রুসংবরণ করিয়া গায়ক আর একটী গীত স্বতন্ত্র সুরে গাইল।

প্রণয় মোর সাগর-তুল,
সে কি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি,
না তাতয়ে সাগরমাঝার॥
সখি ! কত দূরে ভানু রয়,
সাগর তাহে কাতর নয়,
পসারি সে অগাধ হৃদয়,
তবু তারে দেয় উপহার॥

এ গীতে শৈল কাঁদিল না ; মুখ তুলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ? তুমি কোথায় ? একবার আমার কাছে এসো, একবার তোমার গায়ে হাত দিয়া দেখি, সত্য কি মিথ্যা। আমায় বাঁচাও।"

"যাইতেছি" এই মধুর উত্তর একটী স্ত্রীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের নিকট বসনঘর্ষণের মরমর শব্দ হইল ; তাহার পর পবিত্র পদ্মগন্ধ, তাহার পর একটী রূপবতী আসিয়া শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল, শৈলকে বুকে করিয়া ডাকিতে লাগিল, "শৈল ! ভগিনি ! রাজনন্দিনি ! অভাগিনি !" ডাকিতে ডাকিতে অপরিচিতা কাঁদিয়া ফেলিল, আর কথা কহিতে পারিল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে বুকের উপর টিপিয়া ধরিয়া কে কাঁদিল, শৈল তাহা একবারও ভাবিল না; তাহাকে আদর করিয়া ভগিনী বলিয়াছে, এই বিপৎকালে তাহাকে বুকে করিয়াছে, ইহাতেই শৈল গলিয়া গেল। অপরিচিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া শৈল নিঃশব্দে কাঁদিল এবং নয়নজলে অপরিচিতার বাহুমূল আর্দ্র করিতে লাগিল। অদ্য শৈল এই প্রথম সুখী হইল; সুখে কাঁদিল।

ক্ষণেক পরে শৈল সরিয়া বসিয়া চক্ষের জল মুছিল। অপরিচিতাও চক্ষের জল মুছিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল, পরস্পরে কি ভাবিতে লাগিল। একবার শৈল দুই হস্ত অপরিচিতার অঙ্গে হঠাৎ দিয়া অতি ব্যগ্রভাবে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "এ কি সত্য? হয় ত আমার ভ্রম। তুমি একবার কথা কও, আমার ভ্রম কি না, একবার বুঝাইয়া দেও; কেমন করিয়া বুঝা-ইয়া দিবে? আমি কেমন করে বুঝিব? এই সুখ কতবার ভেবেছি। কে যেন আসিতেছে, কে যেন আসিল, এ আমি কতবার দেখিয়াছি। এখনও কি তাই? বল, কেমন করে বুঝাইয়া বলিবে, একবার বল। আমি একা থেকে, একা ভেবে, কেমন হইয়াছি; আমার জ্ঞানবুদ্ধি, সকল গিয়াছে; চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, সকলেই এখন আমায় ঠকায়। এক-বার ভাবি ধরেছি, আবার ভাবি কই? না একবার ভাবি, এই দেখিতেছি, আবার ভাবি কই? না। এই আমি তোমায় ধরে আছি, আবার ভাবিতেছি, হয় ত এ সকল ভ্রম।"

অপরিচিতা কোন উত্তর না করিয়া শৈলের মস্তক আপন বুকে লইয়া শৈলের কেশগুচ্ছ মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শৈল বুঝিল।

গবাক্ষদ্বার দিয়া চন্দ্রকিরণের অল্প আভা আসিয়া-ছিল; সেই আলোকে শৈলের আকার একপ্রকার অনুভব হইতেছিল। অস্থিময় ক্ষুদ্রদেহ, রুক্ষ কেশ। শৈল যখন বিলক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, সত্য সত্যই বুকে তাহার মাথা রহিয়াছে, তখন হঠাৎ দুই হস্তে রুক্ষ কেশরাশি সরাইয়া উন্মাদিনীর চিন্তায় মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। অন্ধ-থাকিয়া শৈলের দৃষ্টিশক্তি বড় তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, অন্ধকারে অন্য কেহই দেখিতে পায় না, সে অন্ধ-শৈল সকলই দেখিতে পাইত। এক্ষণে জ্যোৎ-স্নায় প্রতিবিম্ব আসিয়াছিল; অপরিচিতার মুখ-মাধুরী শৈল বিলক্ষণ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কিন্তু দেখিয়া চিনিতে পারিল না।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অপরিচিতা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া চক্ষের জল কষ্টে সংবরণ করিয়া বলিল, "আমি অনাথিনী, তোমার মত অভাগিনী।" উত্তর শুনিয়া শৈলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হইতে লাগিল; তাহার পর শৈল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কে আছে?" অপরিচিতা অনেকক্ষণ পরে উত্তর করিল, "আমার কেহই নাই, আমি একাকিনী।" শৈল ভগ্নস্বরে বলিল, "বুঝেছি, তোমার কেহ থাকিলে তোমায় কেন এখানে আসিতে দিবে; তুমিই বা কেন আসিবে; অনাথিনী না হইলে কেন অনাথিনীর দুঃখ ভাবিবে?" এই বলিয়া শৈল আবার নীরব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" অপরিচিতা মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আমার নাম মাধবী।" শৈল চিনিতে পারিল না।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতে পাও? তোমায় কেহ বারণ করিতে পারে না?"

মাধ। আমায় কে বারণ করিবে?

শৈল। গত রাত্রে কোথায় ছিলে?

মাধবী উত্তর করিল, "নূরপুরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না, কিঞ্চিৎ ভীতা এবং লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল। মাধবী তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিল, "নূরপুরে আমার সহিত কাহারও আলাপ নাই, তথায় আর কখন যাই নাই, এই প্রথম গিয়াছিলাম। নূরপুরে গিয়া কোথাও স্থান পাই নাই, শেষ তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। প্রতিবাসীরা তোমার সংবাদ কিছুই জানে না, তাহারা বলিল, ঘরদ্বার, গহনাপত্র, সকল ফেলিয়া শৈল একা পলাইয়া গিয়াছে; কখন গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, তাহারা জানে না।"

এই কথায় শৈলের ভয় গেল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কে কে এ কথা তোমায় বলিল?"

মাধ। আমি তাহাদের নাম জানি না, তাহারা তোমার প্রতিবাসী।

শৈ। নূরপুরে যত লোক দেখিলে? অনেক?

মাধ। অনেক।

শৈ। তাহারা কি পুরুষের মত আছে

মাধ। আগে তাহারা যেমন ছিল, এখনও সেই-মত আছে।

শৈ। সেইমত হাসে, গল্প করে, বেড়িয়া বেড়ায়?

মাধ। সেইমত।

শৈ। আর গাছপালা সেইমত আছে? বাতাস আসিলে সেইমত দোলে? চন্দ্রের আলোতে সেই-মত চক্‌চক্‌ করে?

মাধ। ঠিক সেইমত করে।

শৈ। আর আকাশ? যে দিকে যত দূরদৃষ্টি দেও, ততদূর দেখা যায়?

মাধ। যায়।

শৈ। আমার একবার তাই দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহা আর কি দেখিতে পাইব? আর ঘুম ভাঙ্গিলে ভোরে সেখানে সেইমত পাখী ডাকে?

মাধ। ডাকে।

শৈ। এখানে ডাকে না। সুরপুরে লোকে এখন আর কোঁদল করে?

মাধ। করে।

শৈ। আহা! কেন করে? মানুষের পক্ষে মানুষ যে কি, তা তারা এখনও বুঝিল না। তুমি সুরপুরে কেন গিয়াছিলে?

মাধ। আমার কোথাও মন স্থির হয় না, এখানে সেখানে ফিরিয়া বেড়াই।

শৈ। পূর্ব্বে তোমার কে কে ছিলেন?

মাধ। ঈশ্বর জানেন, আমি ত কাহারেও দেখি নাই।

শৈ। মা, বাপ?

মাধ। কেহই না। এক একবার ভাবি, আমি আকাশ হতে পড়িয়া থাকিব।

শৈ। তবে কি তোমার কেহই নাই, কেহই ছিল না?

মাধ। কেহই না।

শৈ। আমার সকলই ছিল, কেবল চক্ষু ছিল না। এই বলিয়া শৈল অন্যমনস্ক হইল। মাধবী বলিল, "শয়ন কর, রাত্রি আর বড় নাই, ঘুম না হইলে অসুখ হবে।" শৈল বিকট হাসি হাসিয়া ঐ কথা পুন-রুক্ত করিল, "কষ্ট হবে! শৈলের কষ্ট হবে!" আবার ক্ষণেক বিলম্বে ধীরে ধীরে বলিল, "কষ্ট হবে, এ কথা আমি অনেক কালের পর শুনিলাম।"

মাধবী শয়ন করিতে পুনরায় অনুরোধ করিল। শৈল অঙ্গীকার করিয়া বলিল, "এখনও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তুমি কেমন করে আসিলে? সন্ন্যাসী জানে কি না? কেন আসিলে? এ সকল না শুনিয়া আমি ঘুমাইব না।"

মাধ। আমি একটু না ঘুমাইয়া আর কোন কথার উত্তর দিব না।

শৈ। তবে তুমি ঘুমাও, আমি এখানে বসিয়া থাকি।

মাধ। কেন?

শৈল। আমি ঘুমাইলে পাছে তোমায় হারাই।

মাধ। সে বিষয়ে কোন ভয় নাই। আমি কোথাও যাব না।

শৈল আর কোন আপত্তি না করিয়া মাধবীর পার্শ্বে শয়ন করিল, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন, পার্শ্বে নহে, বালিকার ন্যায় শৈল মাধবীর ক্রোড়ে শয়ন করিল। পাছে মাধবীকে হারায়, এই ভয়ে শৈল মাধবীর অঞ্চল ধরিয়া নিদ্রা গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। গবাক্ষদ্বার দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিয়া শৈলের মুখে পড়িয়াছে। শৈল তখনও নিদ্রা যাইতেছে, তখনও শৈলের হস্তে মাধবীর অঞ্চল রহিয়াছে। শৈল নিদ্রাবেশে কি স্বপ্ন দেখিতেছে; ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিতেছে, যেন কি বলিতেছে। ক্রমে মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল, শৈল রোদনোন্মুখী, হইল এমত সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল, শৈল বিস্ফারিত-লোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল, যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিতে লাগিল, এবার নিশ্চয়ই বুঝিল, স্বপ্ন মিথ্যা, সেই ঘর, সেই খিলান, সেই গবাক্ষ, সেই প্রস্তরময় প্রাচীর, সেই সকল রহিয়াছে, শৈল পূর্ব্বমত বন্দী। মর্ম্মযন্ত্রণা তাহার দ্বিগুণ বাড়িল, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বসিবা-মাত্র নিদ্রিতা মাধবীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অমনি শৈল হঠাৎ পলায়নোন্মুখীর ন্যায় শরীর বামে হেলা-ইয়া, আবার বিস্ময়াপন্নের ন্যায় দক্ষিণে মাথা ফিরা-ইয়া দেখিতে লাগিল। রাত্রির কথা অল্পে অল্পে মনে আসিল।

এই সময় মাধবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া বলিল, "ও আমার দিদি রে! এখনই উঠেছ? তবে ঘুমুলে কই?" শৈল এ কথায় উত্তর না দিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "তবে রাত্রের কথা সত্য? স্বপ্ন নহে।"

মাধ। না দিদি, স্বপ্ন নহে। তুমি একা ছিলে, এখন আমরা দুই জন হইলাম, আর আমাদের ভাবনা কি? এখন দুই জনে একত্রে ঘুমাব, একত্রে জাগিব, একত্রে গল্প করিব, একত্রে হাসিব, একত্রে কাঁদিব, আর আমাদের ভয় কি?

শৈ। তবে কি তুমি আমার সঙ্গে এইখানেই থাকিবে? তুমি কি আর যাবে না?

মাধ। এ জন্মে নহে। আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? যতকাল তুমি এখানে থাকিবে, ততকাল আমিও এখানে থাকিব।

শৈল উপাধানে মুখ লুকাইল—নিঃশব্দে কাঁদিল। অনেক পরে চক্ষু মুছিয়া মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, মাধবী তখন মুখ নত করিয়াছিল। একবিন্দু নয়নজল মাধবীর নাসাগ্রে মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, মাথা তুলিলে তাহা হর্ম্ম্যপ্রস্তরে পড়িয়া গেল। কিন্তু শীঘ্র শুকাইল না, পাষাণে নয়নজল কেন শুকাইবে? কোমল মৃত্তিকা সে জল পাইলে লইত, পাষাণে সে জল অমনি পড়িয়া রহিল। শৈলা তাহাতে অঙ্গুলি লিপ্ত করিয়া একটী চক্ষু অঙ্কিত করিতে করিতে বলিল,"আমি এখানে থাকিব চিরকাল থাকিব, তুমি ভিন্ন আর কেহই আমাকে আমার নিকট-ছাড়া করিতে পারিবে না, সন্ন্যাসী কেহই পারিবে না, কিন্তু—"

শৈ। না, না, সন্ন্যাসী জানিতে পারিলেই আমায় লইয়া যাইবে; এখন তোমায় কোথায় রাখি?

মাধ। আমায় লুকাইতে হইবে না, আমি যে এখানে আসিয়াছি, সন্ন্যাসী জানেন; সন্ন্যাসী আপনিই আমায় সঙ্গে করে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার রাত্রে আমায় লইতে আসিবেন। কিন্তু আমি যাব না।

শৈলের মুখ শুকাইয়া গেল, আর কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক হেলিয়া বেদির উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল।

শৈলের দৃষ্টি পূর্ব্বমত আর প্রখর নাই, এখন স্নিগ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বদীপ্তি যেন মেঘে ঢাকিয়াছে। শৈলের কাতরতা দেখিয়া মাধবী বুঝিল যে, সন্ন্যাসী তাড়না করিলে আমি যে যাব না, এ কথায় শৈলের বিশ্বাস নাই। মাধবী নানাপ্রকারে তাহা বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে শৈলের ভয় গেল, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যে এখানে এই অবস্থায় আছি, তাহা তুমি কেমন করিয়া সন্ধান পাইলে? আমায় আর কখন দেখ নাই, আমার কথা কখন শুন নাই, আমার তত্ত্ব কি প্রকারে পাইলে?"

মাধ। সে অনেক কথা, তাহা আর এক সময়ে বলিব। আমি তোমায় বালিকাকাল অবধি ভালবাসি; পূর্ব্বে তোমায় কোলে করে বেড়াইতাম, তুমিও আমার কোলে থাকিতে ভালবাসিতে। আমায় দিদি বলে ডাকিতে। সেই বয়সেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। তুমি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি ভুলি নাই। তাহার পর কত দিন গেল, কত কাণ্ড হল, আমিও কত দেশে বেড়াইলাম, তোমার কত সন্ধান করিলাম, কোথাও তোমার সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি শুনিলাম যে, তোমার সুখপুরে বিবাহ হইয়াছিল।

শৈল। বালিকাকালের কত কথাই মনে আছে, কিন্তু তোমার আকার ত ভাল মনে হয় না।

মাধ। মহারাজকে মনে পড়ে?

শৈল। কে মহারাজ?

মাধ। বটে? সত্য সত্যই তবে তুমি কিছুই জান না। তা তোমারও দোষ নাই, তুমিও তখন তিন বৎসরের।

শৈল। মহারাজের বিষয় কি, বল না?

মাধ। স্নানাদির পর বলিব। এখানে কোথায় স্নান কর?

"এই পার্শ্বের ঘরে স্নান-আহারের সকল আয়োজন থাকে।" এই বলিয়া শৈল সেই ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে, সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। তোমার আহারের বড় কষ্ট হবে, আমি ফলমূল খাইয়া থাকি, তোমার নিমিত্তও যদি তাহাই আনিয়া থাকে।

মাধ। তুমি অন্ন খাও না কেন?

এই কথায় শৈল কোন উত্তর না দিয়া অপর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মাধবীর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জন পৃথক্ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। উভয়ে স্নানাদি করিয়া আহার করিতে বসিল। এই সময় মাধবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি অন্নত্যাগ করিয়াছ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে কি?"

শৈল। পীড়া কিছুই নহে কে পাক করে, তাহা জানি না, এই জন্য খাই না।

মাধ। কেন? ব্রাহ্মণে পাক করে, দেখিতেছি, ইহা দেবতার প্রসাদী ভোগ।

শৈ। তথাপি আমার স্বপাক আহার করা উচিত।

মাধ। কেন?

শৈল। আমি বিধবা।

মাধবী আর কোন উত্তর করিল না। আহারান্তে অপর ঘরে গিয়া আবার সেই কথা উত্থাপন করিল।

মাধ। তোমায় কে বলিল যে, তুমি বিধবা?

শৈল। এ কথা কে আর বলে থাকে? লোকে আপনিই জানিতে পারে।

মাধ। অমন অকল্যাণের কথা আর মুখে এন না, সাধ করে এ সকল কথা বলিতে নাই।

শৈল। আমি সাধ করে বলি নাই বিধবা হতে কার কবে সাধ গিয়া থাকে?

মাধ। তবে তোমার ভ্রম হইয়াছে।

শৈল। ভ্রম নহে, তাঁর মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

মাধ। আমি তা জানি, তুমি মনে করিয়াছিলে, বিনোদবাবু মরিয়াছেন; কিন্তু তিনি তখন বাস্তবিক মরেন নাই, তাঁহার কেবল বাক্‌রোধ হইয়াছিল, তিনি মৃতবৎ পড়িয়া ছিলেন মধ্যে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এখন তিনি ভাল হইয়াছেন, শরীরে আর কোন পীড়া নাই।

শৈল অবাক্ হইয়া মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল। একবার ভাবিল, "মাধবী উপহাস করিতেছে," আবার ভাবিল "মাধবীর মুখভঙ্গী সেরূপ নহে। মাধবীর ভ্রম হইয়া থাকিবে, বোধ হয়, আর কাহাকে দেখিয়া থাকিবে"

শৈলের সন্দেহ মাধবী বুঝিতে পারিল। মাধবী বলিল, "সন্দেহ করিও না; বিনোদবাবু নিশ্চয় জীবিত আছেন; যে বেহারা তাঁহাকে তোমার বাটী হইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সহিত আমার আলাপ আছে। আর অন্য কথা কি? তোমার দেওর মা সে দিন আমার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কেঁদে মরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না, নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ভাল হইয়া বসিল, একবার আপনার শীর্ণ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরিধেয় ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্ত্র টানিয়া অঙ্গাবরণ করিল, রুক্ষকেশে একবার হাত দিল, তাহার পর কি বলিবে মনে করিয়া মাধবীর দিকে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। মাধবী এই সময় শয়ন করিয়া অন্যমনস্কে প্রস্তরের সংযোগস্থানে নখদ্বারা মৃত্তিকা-খনন করিতেছিল। কি বলিবে ভাবিয়া তাহার প্রতি শৈল যে চাহিতেছিল, তাহা মাধবী দেখিতে পাইল না। শৈল মুখ ফিরাইল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে শৈল আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া মাধবীর দিকে চাহিল। মাধবী তখনও অন্যমনস্ক। এই সময় শৈল কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার শব্দ করিল। মাধবী তখন মাথা তুলিল। শৈল এইবার সাহস করিল; দুই তিনবার উদ্যমের পর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা কিছু হইয়াছিল?" মাধবী গম্ভীর হইয়া ক্ষণেক থাকিয়া বলিল, "তোমার কি কথা?" শৈল আর কোন উত্তর করিল না। উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক রহিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল, তখনও উভয়ে অন্যমনস্ক। শৈল কেন অন্যমনস্ক হইল, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মাধবী কেন অন্যমনস্ক হইল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। বিনোদ জীবিত আছেন, শৈলের ইহা প্রতীতি করাইয়া অবধি মাধবী অন্যমনস্ক। রাত্রি হইল; পরস্পর কেহ কাহাকেও আর ভাল দেখিতে পাইতেছে না, তখনও উভয়ে নীরব।

সেই সময়ে পশ্চিমদিকের দ্বার দিয়া ঘরে দীপালোক আসিল। আসিবামাত্র শৈল চক্ষু আবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, ও কি?" শৈল অনেক কাল আলোক দেখে নাই, সামান্য আলোকও আর তাহার চক্ষে সহে না।

মাধবী আলোকের দিকে চাহিয়া দেখিল, রামদাস-সন্ন্যাসী প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাধবী আর কিছু বলিল না; শৈল সেই দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, আলোক বড় তীব্র বলিয়া বোধ হইল। আবার মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিল। এবার মাধবী বলিল, "সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।" শৈল অমনি দুই বাহু দ্বারা মাধবীকে দৃঢ়রূপ বন্ধন করিয়া ধরিয়া বলিল, "সন্ন্যাসি, আগে আমায় খুন কর, তবে দিদিকে লইয়া যাইও।" সন্ন্যাসী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাধবীকে উঠিতে বলিল। মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছা করে, আমি এইখানে থাকি।"

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা করিলেই থাকিতে পাবে না।

মাধ। এখানে থাকিলে আপনার কি ক্ষতি?

সন্ন্যা। ক্ষতি থাকু আর নাই থাকু, তুমি বাহির হও। তুমি একবার দেখা করিতে আসিয়াছিলে, এখানে থাকিতে আইস নাই।

মাধ। আপনার পায়ে ধরি, আমাকে এখানে থাকিতে দেন, আমি বাহিরে ঘুরে ঘুরে জ্বালাতন হয়েছি, এখন দু'দিন এখানে থাকি। এ উত্তম স্থান, আমার মত দুঃখিনীর পক্ষে এই স্থানই ভাল।

সন্ন্যা। কেন, আমি ত তোমার দুঃখমোচনের প্রস্তাব করেছি, সম্মত হও, রাজরাণী হবে।

মাধ। কেন সে কথা মুখে আনিয়া যন্ত্রণা দেন? আপনি বৃদ্ধ, আবার তাহে সন্ন্যাসী, এ সকল কথা আপনার মত পবিত্র ব্যক্তির উপযুক্ত নহে।

সন্ন্যা। বুঝেছি। তাহা যাহাই হউক, সম্মত হও, ঠকিবে, এই শৈলের মত কষ্ট পাইবে, বিপাকে হয় ত প্রাণ হারাবে।

মাধ। তাতে আমার ভয় নাই।

সন্ন্যা। তা আমি পরে বুঝিব। এখন এখান হইতে বাহির হও। মহারাজের হুকুম, শৈলকে একা এখানে বদ্ধ রাখিতে হইবে। তবে যে তোমায় আসিতে দিয়াছি, তাহা কেবল তোমার প্রতি দয়া। তুমি অপাত্র, আমার দয়া বুঝিলে না, সুতরাং এখনই বাহির হও।

মাধ। আমি শৈলকে একা রাখিয়া যাব না।

সন্ন্যা। সহজে না যাও, বাহির করিয়া দিব।

মাধবী এ কথা শুনিবামাত্র মস্তক নত করিল, পরে আবার মাথা তুলিয়া বলিল, "কেন এ সকল কথা মুখে আনেন?"

সন্ন্যা। আমাকে রাগাইও না, রাগিলে তোমার ক্ষুদ্র প্রাণটী এইখানেই টিপিয়া বাহির করিব।

মাধ। "আমার প্রাণ বাহির করা বড় শক্ত নহে। জলবিম্ব হইতে বাতাস বাহির করা বরং শক্ত। এ প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? কার জন্য বাঁচিব? আপনি এখনই আমার প্রাণ বাহির করুন, কোন আপত্তি নাই।" "এখনই বাহির করিব", এই বলিয়া সন্ন্যাসী ক্রোধভরে চলিয়া গেল। দ্বার খোলা রহিল, প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। মাধবী তখন শৈলের দিকে চাহিয়া দেখে, শৈল পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমে শৈল সবলে মাধবীকে ধরিয়াছিল, ক্রমে অবসন্ন হইয়া শিথিল হস্তে সরিয়া পড়িয়াছিল।

মাধবী সযত্নে শৈলকে তুলিয়া শয়ন করাইল; "ভয় কি দিদি, সন্ন্যাসী গিয়াছে," এই বলিয়া শৈলকে বুঝাইতে লাগিল। শৈল কোন উত্তর না দিয়া চাহিয়া রহিল। শৈলের রুক্ষ কেশরাশি পাষাণময় হর্ম্ম্যোপরে পড়িয়াছিল, মাধবী তাহা তুলিতেছে, এমত সময় সন্ন্যাসী আবার আসিল। এবার সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ভয়ানক, হস্তে শূল; সদর্পে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাধবীর সম্মুখে দাঁড়াইল, একবার বলিল, "এখনও বাহির হও।"

মাধবী কোন উত্তর করিল না। তখন সন্ন্যাসী শূল উত্তোলন করিয়া মাধবীর বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া পুনরপি বলিল, "এখনও বাহির হও।" মাধবী আপন হৃদয়োপরি স্থাপিত শূল-ফলকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সন্ন্যাসীর মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিল। "এখনও বাহির হও" বলিয়া সন্ন্যাসী শূলে শক্তি সংযুক্ত করিল। মাধবীর মুখ ম্লান হইয়া গেল; শূলের অগ্রভাগ বস্ত্রের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল, হঠাৎ বস্ত্রে রক্ত দেখা দিল; মাধবী সন্ন্যাসীর দিকে মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। সন্ন্যাসী রক্ত দেখিতে পাইল। অমনি তুলিয়া লইল; শূলাগ্রের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত আরও ছুটিয়া বাহির হইল। বাম্‌দাস শূল তুলিয়া চলিয়া গেল, আর মাধবীর দিকে চাহিল না। প্রদীপ পূর্ব্বমত জ্বলিতে লাগিল।

মাধবী কিয়ৎক্ষণ নতমুখে আপনার রক্তাক্ত বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর অঞ্চল দিয়া হৃদয়ের বস্ত্র আবরণ করিয়া শৈলকে তুলিল। শৈল নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চারিদিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, সন্ন্যাসী কি গিয়াছে?" মাধবী বলিল, "গিয়াছেন।" পশ্চিমদিকের দ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "দ্বার খোলা কেন? তবে কি সন্ন্যাসী আবার আসিবে?" মাধবী বলিল, "জানি না, কিছু ত বলিয়া যান নাই।"

শৈলের তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; জলের কথা স্মরণ হইবামাত্র দক্ষিণদিকের দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দক্ষিণদ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া, শৈল অপর কক্ষে জলপান করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে উঠিল। মাধবীরও পিপাসা হইয়াছিল, কিন্তু মাধবী উঠিল না। মাধবী ধীরে ধীরে সারঙ্গটী ক্রোড়ে লইল একে একে সকল তন্ত্রীগুলিতে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া দেখিল। তাহার পর সারঙ্গ বাজিয়া উঠিল, কতক্ষণ বাজিল, তাহা মাধবী আপনিই জানিতে পারে নাই।

মাধবী সারঙ্গ রাখিয়া ভাবিল, "শৈল ও ঘরে এতক্ষণ কি করিতেছে?" ও ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। শৈল তথায় প্রবেশ করিবা-

অমনেই দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় বাদ্য আরম্ভ হওয়ায় শৈল একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতেছিল, দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বাদ্য শৈলের কর্ণে সহ্য হইয়াছিল। বাদ্য থামিলে শৈল জানিল যে, দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তখন শৈল চীৎকার করিয়া মাধবীকে ডাকিল; মাধবী উঠিয়া দ্বার খুলিতে গেল; কিন্তু এই দ্বারের কৌশল কিছুই জানিত না, বৃথা যত্ন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষত হইতে আবার রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, মাধবী পড়িয়া অচেতন হইল। শৈল প্রথমে চীৎকার করিয়া মাধবীকে ডাকিতেছিল, তাহার পর কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার ভগ্নস্বর শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই ভগ্নস্বর আরও মৃদু হইয়া পড়িল। রাত্রিশেষে আর তাহা শুনা গেল না। শৈল তখনও মাধবীকে ডাকিতেছে, কিন্তু স্বর ফুটিতেছে না, অথচ ডাকিতেছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন রামদাস শূলহস্তে দর্পিতভাবে সুরঙ্গ অতিবাহিত করিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার সম্মুখস্থ পথ, এক লৌহকবাট দ্বারা রোধ হইল। সন্ন্যাসী বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া বিদ্যুদ্বেগে পশ্চাৎ ফিরিল, কিন্তু সে দিকেও সেইরূপ কবাট রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিল যে, মাধবীর প্রতি অত্যাচারের নিমিত্ত সে শৈলের ন্যায় বন্দী হইল। তখন নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছে, এমত সময় তাহার পদতলস্থ ভূমি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ভূমি ক্রমে নিম্নে নামিতে লাগিল।

ক্ষণপরে সন্ন্যাসী দেখিল, নিম্নস্তরে একটী ক্ষুদ্র ঘরে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। তথায় একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে, পার্শ্বে একজন বৃদ্ধা বসিয়া মালা জপিতেছে। তাহাকে সন্ন্যাসী ইতিপূর্ব্বে কখন দেখে নাই, এখন দেখিয়াও উৎসাহিত হইল না। বৃদ্ধা কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্মা, কিন্তু তাহার দৃষ্টি অতি প্রখর, অতি ভয়ানক। রামদাসকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, পরে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিল, "আইস, কি ভাবিতেছ? আমি তোমার প্রহরী, তোমায় যত্ন করিয়া রাখিব, শৈলের প্রতি তুমি যেমন নিষ্ঠুর ছিলে, আমি সেরূপ হইব না।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আবার হাসিয়া উঠিল। সে হাসি দেখিয়া সন্ন্যাসীর অঙ্গ কণ্টকিত হওয়ায় সে মুখ ফিরাইল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিতেছ? তুমি কোন্ ঘরে থাকিবে, তাহাই খুঁজিতেছ? ঐ তোমার ঘরের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, সত্বর যাও, বিলম্ব করিলে তোমায় আবার আর এক স্তর নিম্নে নামিতে হইবে, সেখানকার প্রহরী অতি নিষ্ঠুর, অতি ভয়ানক। শূলটী এখানে আমার নিকট রাখিয়া যাও। শূল কেন? শূলে আবার রক্ত কেন? কাহার রক্ত? মাধবীর রক্ত? যাহাকে বিবাহ করিবার এত সাধ, তার বুকে শূল মারিলে কিরূপে? তোমার সকল ব্যবহার কি এইরূপ?"

রামদাস সাহস করিয়া বলিল, "আপনি আশ্চর্য্য ব্যক্তি; এইমাত্র যাহা অন্তরে ঘটিয়াছে, আপনি এখানে বসিয়া তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন? আপনি কে? কোন দেবী?"

বৃদ্ধা। পরে পরিচয় হইবে। ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্র তোমার ঘরে যাও, নতুবা এখনই প্রতিফল পাইতে হইবে।

রামদাস এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিল, অতএব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিল; তৎক্ষণাৎ দ্বাররোধ হইয়া গেল। বৃদ্ধা আবার হাসিয়া উঠিল।

কিঞ্চিৎ পরে অপর এক দ্বার দিয়া শম্ভু-কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শম্ভু। আপনি বসুন, আমি তখন বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সম্প্রতি আকাল পড়িয়াছে; আপনার কালীপ্রতিষ্ঠায় বিলম্ব ঘটিল।

বৃদ্ধা। তা বিলম্ব হোক, ক্ষতি নাই, শৈলকে কোথায় পাঠাইলেন?

শম্ভু। বৃন্দানদীর তীরে সম্প্রতি একটী পরিষ্কার কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তথা হইতে নূরপুর বড় দূর নহে। স্থানটী মনোহর, কিন্তু নির্জ্জন। শৈলকে সেইখানে পাঠাইয়া আসিলাম।

বৃদ্ধা। তবেই তো। নির্জ্জন হইতে নির্জ্জনে রাখা কি ভাল হইল?

শম্ভু। ভাল হইল না সত্য, কিন্তু আপাতত আর কি করি। পূর্ব্বে শৈলের অবস্থা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তখন মধ্যে মধ্যে শৈলকে দেখিতে আসিতাম, ভাবিতাম, নির্জ্জনের ফল কিছুই ফলিতেছে না, তাহার পর গত পরশ্ব যখন মাধবীর সঙ্গে শৈলের কথাবার্ত্তা হয়, তখন আমি সেখানে গোপনে উপস্থিত ছিলাম, সেই সময় বুঝিলাম, এত

দিন শৈলকে নির্জ্জনে রাখা অতিরিক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, মাধবী সঙ্গে আছে, এখন শৈল যে স্থানে থাকুক, আর তাহার তত নির্জ্জন বলিয়া বোধ হবে না। সন্ন্যাসীর সংবাদ কি?

বৃদ্ধা। আপনার রামদাস অতি নম্রভাবে নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হয়, সে খালাস পাইলে আপনার কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইবে।

শম্ভু। সে অনেকবার আমার অনিষ্ট করিয়াছে। যতবার সে আমার অপকার করিয়াছে, আমিও ততবার তাহার উপকার করিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও তাহার চরিত্র শুদ্ধ হয় নাই।

বৃদ্ধা। আত্মাশক্তি যাকে মন্দ স্বভাব দিয়াছেন, মানুষ কি উপকার ক'রে তাহার সেই স্বভাব বদলাইতে পারে?

শম্ভু। সে বিষয়ে আমি এখনও পরীক্ষা শেষ করি নাই। যত্নে, দয়ায়, ক্ষমায়, মিষ্ট কথায়, অনেক লোকও পণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু আবার কোন কোন লোকের তাহাতে কিছুই হয় নাই। সেই সকল লোকের পক্ষে নির্জ্জনবাস উপকারদায়ক বলিয়া আমার বোধ হয়। শৈলকে সেই জন্য নির্জ্জনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দণ্ডটা মাত্রায় অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন পাছে সে পাগল হয়, এই ভয়। পাগল না হয়, তবে শৈল স্ত্রীলোকের পদ পাইবার যোগ্য হইবে।

শম্ভু-কয়েদী উঠিয়া যাইবার পরে রাত্রি প্রায় দ্বি প্রহরের সময় রামদাস-সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্ষণবিলম্বে তাহার সন্দেহ হইল যেন তাহার ঘরে কে আসিয়াছে। রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে?" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। পরে বলিল, "যেই আসিয়া থাক, অনর্থক কষ্ট করিতে আসিয়াছ। যদি আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়া থাক, তাহা ভুল, আমি বালক নই।" রামদাসের এই কথা শেষ হইলে, আলোকের একটি অতি অস্পষ্ট আভা ঘরে ভাসিতে লাগিল; তাহা কোথা হইতে আসিল, তাহা বুঝা যায় না; ঘরে দীপ নাই, অগ্নি নাই, অথচ আলোকের আভা প্রাচীরে, ছাদে, সর্ব্বত্র লাগিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে রামদাস দেখিল, একজন স্ত্রীলোক পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া আছে। কুঞ্চিত রুক্ষ কেশরাশি তাহার বাহুমূল ও পৃষ্ঠদেশ লুকাইয়া রাখিয়াছে তার কতকগুলি কেশ অযত্নে হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া দুলা রাখিয়াছে।

কে এ স্ত্রীলোক! রামদাস তাহা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। প্রগল্ভা পূর্ব্ববৎ বসিয়া থাকিল। রামদাস উঠিল, দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া পার্শ্ব হইতে বামগণ্ড, বামকর্ণ, ওষ্ঠাদি দেখাইয়া চিনিল যে, সুন্দরী মহারাজ মহেশচন্দ্রের রাজ্ঞী; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল যে, রাজ্ঞী গতকাল মরিয়াছে, রামদাস স্বয়ং সে মৃত্যুর হেতু। তাহারই অস্ত্রাহত হইয়া জাম-তলি গ্রামে রাণী গদাধারের ন্যায় প্রাণ-ত্যাগ করেন। কেহ তখন নিকটে ছিল না, কেহ তাঁহার সৎকার করে নাই। রামদাস অলক্ষ্যে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছে, শবভুক্ একটা কুকুর আসিয়া প্রথমে রাণীর দক্ষিণগণ্ডের মাংস একগ্রাসে ধরিয়া ছিঁড়িয়া তোলে, সেই সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণের মাংস কতকটা উঠিয়া পড়ে।

সুতরাং রামদাস ভাবিল, "এ স্ত্রীলোকটী রাণীর ন্যায় অবিকল আর কেহ হইবেন।" অতএব তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য তাহার সম্মুখে গেল, গিয়াই চীৎকার করিয়া ভূমে পড়িল। স্ত্রীলোকটীর দক্ষিণ গণ্ডে, চক্ষুতে মাংস নাই, শুষ্ক অস্থি বাহির হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটী শব! মহারাজ মহেশচন্দ্রের মৃতা রাণী!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে এক দিবস প্রাতে সুরগ্রামবাসীরা সুসজ্জ হইয়া নগরাভিমুখে দলে দলে যাত্রা করিতেছে; তথায় বিলাসবাবুর বিচার হইবে—বড় সমারোহ। পথিমধ্যে একদলের কেহ বলিল, "বিলাসের নিশ্চয় ফাঁসি হইবে।" কেহ বলিল, "ফাঁসি কি মুখের কথা! বিলাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ কি আছে?" প্রথম বক্তা বলিল, "প্রমাণ অবশ্যই আছে, প্রমাণ না থাকিলে কি মেজেষ্টার-সাহেব দায়রা-সোপর্দ্দ করেন? বিলাস আপনিই স্বীকার করিয়াছে, আবার চৌকিদার খুন করিতে দেখিয়াছে।" দ্বিতীয় বক্তা বলিল, "সহস্রবার দেখুক, প্রমাণ না থাকিলে কিছুই হইবে না; এক্ষণকার আইন বড় শক্ত।" প্রথম বক্তা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমি কি মূর্খ! আবার কি প্রমাণ চাও?"

এই সময় আর এক দলের মধ্যে মহাবাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "বিনোদকে শাবল ফেলিয়া মারিয়াছে।" কেহ বলিতেছে, "মুখে বালিস

চাপিয়া মারিয়াছে।" ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধ হইতে মল্লযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া আর সকলে যোদ্ধাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিল। সকলেই অনেককাল পরস্পর আপনাপন মনে বিনোদের কথা, শৈলের কথা বা অন্য কোন কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁদের সঙ্গে একটী বালক মাত্র দুইটী পয়সা লইয়া, ক্রীড়া করিতে করিতে যাইতেছিল। সকলে নিরস্ত হইলে বালকটী আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এই পয়সায় কি কিনিব?" পিতা উত্তর করিলেন, "সন্দেশ কিনিও।" বালক "আচ্ছা" বলিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে নাচিতে নাচিতে চলিল। কতকদূর গিয়া বালকটী আবার পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবা! দুই পয়সায় ফাঁসি কিনিতে পাওয়া যায় না?" পিতা বলিলেন. "না পুত্র" পুনরায় প্রতি স্নেহস্বরে বলিল, "বিলাসবাবুর ফাঁসি হবে বাবা, তোমার কবে হবে?" বালকের এই প্রশ্নে সকলে হাসিয়া উঠিল। পিতা অপ্রতিভ ও রাগান্ধ বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন। বালকটী কি অপরাধ করিয়াছে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পিতা আরও প্রহার করিতে লাগিলেন। সঙ্গিরা আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা করিলে, বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী ফিরিয়া চলিল। পিতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য না করিয়া বিচার দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা বালককে দুই একবার ডাকিয়া বালকের পিতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা কতদূর গেলে একটী স্ত্রীলোক অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিল, কিন্তু চকিতের মধ্যে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটী যুবতী, কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী; শীর্ণা অথচ বলিষ্ঠা; কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে সকলে একত্রে বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সেই জনতামধ্যে অবগুণ্ঠনবতীও দাঁড়াইয়া আছে। বিচার তখন আরম্ভ হইয়াছে। বিলাসবাবু যোড়করে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছেন; চারিদিকে কনেষ্টবলগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রামবাসীরা বড় যত্ন করিতে লাগিল।

সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেলে বিলাসবাবুকে জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" বিলাসবাবু একবার বামপদে, একবার দক্ষিণপদে ভর দিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ অস্থির হইলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। অনেক কর্ম্মচারীর দ্বারা জজসাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে?" বিলাসবাবু ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া জজসাহেবের দিকে চাহিলেন, কিন্তু জজসাহেব তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অমনি নতশির হইয়া দাঁড়াইলেন। জজসাহেব ভাবিলেন "এ ব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী, তাহাতেই আমার দিকে চাহিতে পারিতেছে না।"

কর্ম্মচারী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিনোদবাবুকে হত্যা করিয়াছ?"

বিলাস প্রথমতঃ মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলেন; পরক্ষণে স্পষ্টস্বরে বলিলেন, "হুঁ, খুন করিয়াছি—অন্ধকার-রাত্রে খুন করিয়াছি।"

জজ। কিরূপে খুন করিলে?

বি। যেরূপে লোকে খুন করে, অর্থাৎ—অর্থাৎ—

জজ। কোন অস্ত্রদ্বারা খুন করিয়াছিলে?

বি। না অস্ত্র নহে—হাঁ, অস্ত্র বই কি—শাবল দ্বারা—

জজ। শাবল দ্বারা কোথা আঘাত করিয়াছিলে?

বি। শাবল দ্বারা কোথায়ও আঘাত করি নাই।

জজ। তবে কিরূপে খুন করিলে?

বি। পদদ্বারা তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিলাম।

জজ। তবে শাবলের কথা কেন বলিতেছিলে?

বি। শাবল তখন আমার হাতে ছিল।

জজ। তোমায় তৎকালে কেহ দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল।

জজ। কে দেখিয়াছিল?

বি। তাহা জানি না।

জজ। এই চৌকিদার দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল, ঐ ত আমায় বাঁচায়।

জজ। কেন, তোমার কি হইয়াছিল?

বি। আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম।

জজ। কেন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?

বি। ভয়ে।

জজ। কিসে ভয় পাইয়াছিলে?

বি। প্রাচীরের উপর চৌকিদারকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম।

জজসাহেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই সময় অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ অগ্রসর হইয়া, আপন মুখাবরণ মুক্ত করিয়া, অতি পরিষ্কারস্বরে বলিল, "খুন আমি করিয়াছি।"

"হাঁ হাঁ, খুন এই করিয়াছে, এই শৈল।" নামমাত্রে সকলের দৃষ্টি শৈলের উপর পড়িল; শৈল পাণ্ডুবর্ণা ভয়ঙ্করা, শীর্ণা, সুন্দরী। শৈলের পরিচয় পূর্ব্বে রাষ্ট্র হইয়াছিল, সেই রাক্ষসীকে দেখিবার নিমিত্ত একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। শত শত লোক তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, শৈল দৃক্পাতও করিল না। কনেষ্টবলদিগের তাড়নায় কলরব কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে,শৈল পূর্ব্বমত আবার বলিল, "খুন আমি করিয়াছি, আমার প্রতি ফাঁসি আজ্ঞা হউক।"

জজসাহেব একাল পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে শৈলের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে বহুদিবসাবধি বাস করিয়া বিবর্ণা হইয়া গিয়াছিল। জজসাহেব সেরূপ বর্ণ কখন মনুষ্যের দেখেন নাই। মনুষ্যের এই নূতন বর্ণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। শৈলের পুনরুক্তি শুনিয়া মোকদ্দমার দিকে আবার মনোনিবেশ করিলেন।

জজ। কে তুমি, তোমার নাম কি?

শৈ। আমার নাম শৈল দেবী।

জজ। যিনি হত হইয়াছেন, তিনি তোমার কে ছিলেন?

শৈ। আমার স্বামী ছিলেন।

জজ। তাঁহাকে কে খুন করিয়াছে?

শৈ। আমি খুন করিয়াছি।

"মিথ্যা কথা! আমি হত হই নাই, আমি এই জীবিত রহিয়াছি" বলিয়াই আর এক ব্যক্তি জজসাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার গ্রামবাসীরা চিনিতে পারিয়া, একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমাদের বিনোদ!" আবার বিচারগৃহে কলরব পড়িয়া গেল। কেহ আর নিবারণ করিল না।

আগন্তুক ব্যক্তির নাম-ধাম-পরিচয় লইয়া জজসাহেব মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন। এ মিথ্যা মোকদ্দমা কেন উপস্থিত হইল, তাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। বিলাসবাবুকে বিদায় দিবার সময় জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছিলে কেন?

ফাঁসিতে আমার বড় ভয়।

। তবে কেন খুন করিয়াছি বলিতেছিলে?

। তাহা আমি জানি না।

এইরূপ শৈলকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখেন, শৈল সেখানে আর নাই।

মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে, গুরুগ্রামবাসীরা অপরাহ্ণে আপনাদিগের গ্রামাভিমুখে যাইতেছে, এমত সময় মাঠের মধ্যে একজন সঙ্গী বলিল, "বুঝি শৈল আসিতেছে।" সকলেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, সত্যই শৈল আসিতেছে। আর অবগুণ্ঠনবতী নাই, শৈল ফণিনীর ন্যায় সদর্পে ক্রমে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল; একবার তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষও করিল না। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কেহ সাহস করিল না।

দেখিতে দেখিতে শৈল দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বৃন্দানদীর কূলে উপস্থিত হইয়া একটী নির্জ্জন কুটীরে প্রবেশ করিল। আর একটী স্ত্রীলোক সেই কুটীরের কক্ষান্তরে গৃহকার্য্য করিতেছিল; শৈলকে ক্লান্ত দেখিয়া ব্যজনহস্তে অতি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শৈল শয্যায় বসিয়া স্থিরনেত্রে দীপশিখ দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়াছিলে?" শৈল দীপ দেখিতে দেখিতে উত্তর দিল, "নগরে—সাহেবের কাছে।"

সঙ্গিনী। কেন?

শৈ। মরিবার নিমিত্ত।

স। ও সকল কথা মুখে আনিও না, কোথায় গিয়াছিলে?

শৈ। আমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত জজসাহেবের কাছারিতে গিয়াছিলাম, অদ্য একজনের ফাঁসি হবে, তাই সেখানে গিয়া বলিলাম।

স। কি বলিলে?

শৈ। বলিলাম, 'আমি খুন করিয়াছি।'

স। তাহার পর?

শৈ। আর একজন বলিল, 'না, শৈলই খুন করিয়াছে।'

স। তাহার পর?

শৈ। তাহার পর আর যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তুমি দেবতা চিনিতে পার?

স। কে দেখেছে যে চিনিতে পারিবে?

শৈ। লোকে বলে দেবতারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মান।

স। সেকালে তাহা হইত, এখন আর সেকাল নাই।

শৈল অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কালসাপ কি উদ্ধার হয়?"

স। হয়।

শৈ। অদ্যাপি অনেক মনুষ্যে মানুষ নহে, দেবতা।

স। হাঁ, মানুষ না কি দেবতা?

শৈ। তবে কি?

শৈল এই কথাটী চীৎকার করিয়া বলিল। সঙ্গিনী মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, শৈলের চক্ষুদ্বয় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে; অতি বিকটভাবে দীপের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সঙ্গিনী অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শৈল, ভগিনি, কি দেখিতেছ? অমন করিয়া রহিলে কেন? ছি দিদি! মুখ ফিরাও।" সঙ্গিনী দেখিল, শৈল কোন কথাই শুনিতেছে না, চক্ষের পলকও ফেলিতেছে না; চক্ষু ক্রমে বিকৃত হইতেছে। সঙ্গিনী অতি ভীতা হইয়া উঠিয়া গেল, কক্ষান্তরে গিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে শৈলের ঘরে অতি উচ্চ হাসি শুনিয়া সঙ্গিনী আবার দৌড়িয়া আসিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখে, শৈল শয়ন করিয়াছে। সঙ্গিনী চক্ষের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন আছ?"

শৈ। বেশ আছি।

স। বাতাস দিব?

শৈ। দেও।

সঙ্গিনী নিঃশব্দে বাতাস দিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন, সঙ্গিনী পূর্ব্বপরিচিতা মাধবী

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে মাধবী দেখিলেন, শৈলের অবস্থা বড় ভাল নহে। পূর্ব্বরাত্রে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শৈল প্রাতে উঠিয়া অতি নিভৃত স্থানে অন্যমনে বসিয়া আছে। মাধবী তথায় গিয়া দেখিলেন, শৈল ডাকিলে উত্তর দেয় না, শব্দ করিলে ফিরিয়া চায় না। সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে পর, শৈল একবার মাথা তুলিয়া মাধবীর প্রতি চাহিল, কিন্তু মাধবীকে চিনিতে পারিল না। পরে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল। মাধবী সে দিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; অথচ সেই দিকে শৈলের একাগ্র-দৃষ্টি রহিয়াছে। ক্ষণেক পরে শৈলের দৃষ্টিতে বোধ হইতে লাগিল, যাহার প্রতি শৈল চাহিয়াছিল, তাহা যেন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শৈলের মুখে অল্প ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হইল, ক্রমে সেই চিহ্ন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আকাশের দিকে এক স্থানে শৈলের দৃষ্টি স্থির রহিয়াছে, অথচ তাহার শরীরে পলায়নের উদ্যম লক্ষিত হইতেছে। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে, শৈল চীৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। মাধবী "ভয় কি, ভয় কি" বলিয়া তাহাকে বাহুবদ্ধ করিলেন। শৈল তখন মাধবীর বক্ষমধ্যে মুখ লুকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ক্রমে সেই স্থানে নিদ্রা গেল। কিন্তু নিদ্রায় আবার ভয় পাইয়া উঠিল। এইরূপ কখন চীৎকারে, কখন নিঃশব্দে শৈলের কালাতিপাত হইতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে নদীকূলে শৈলের সম্মুখে বসিয়া মাধবী সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন; শৈল নিঃশব্দে তাহা শুনিতেছিল। বাদ্য শেষ হইলে, শৈল কথা কহিতে লাগিল। মাধবী বুঝিলেন, সে তাঁহার সহিত নহে।

কাহাকে উদ্দেশ করিয়া শৈল কত সাধিতে লাগিল, শেষ রাগ করিয়া উঠিল, আবার তৎক্ষণাৎ বসিয়া যোড়করে মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল, "একবার ফিরিয়া চাও। একবার মাত্র, আর আমি কিছুই চাই না! কেন? কি ক্ষতি? আর আমার প্রতি চাইবে না? তবে আমায় একবার ডাক, 'শৈল বলে' ডাক, আমার নাম শৈল। না, না, আমার নাম শৈল নয়, আমার নাম আর কিছু, আমার নাম বিনোদ।" শৈল এই কথা শেষ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "কই, কথা কহিলে না, আমার দিকে ফিরে চাহিলে না, আমায় আদর করিলে না? চলিয়া গেলে? কই, আর যে তোমায় দেখিতে পাই না।" মাধবী এই সময় শৈলের হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং আর কোন কথা না বলিয়া গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। শৈল অন্যমনে সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কতকদূর যাইয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, "সাপ, সাপ, ঐ সাপ, ফণা বিস্তার করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে! আমি ও দিকে আর যাইব না।" এই বলিয়া শৈল পলাইল।

মাধবীর হস্ত হইতে পলাইয়া শৈল রুদ্ধশ্বাসে পুরগ্রামাভিমুখে ছুটিল। তাহার গতি ও ভঙ্গী দেখিয়া পথে গোবৎসাদি ভয়ে ঊর্দ্ধমুখে পিছাইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দুই একটী বলিষ্ঠা গাভী অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিল। শৈল গ্রামে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিলাসবাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বিলাসের শয়নঘরে উপস্থিত হইল। বিলাস তৎকালে একা অন্তমনে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, হঠাৎ শৈলের সেই ভয়ানক মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে ছাদে পলাইয়া গেলেন। রঙ্গিণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় দৌড়িল। বিলাসবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে একটা প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। এই সময় শৈল বলিয়া উঠিল, সাপ, সাপ, আবার এই সাপ! দাঁড়াইয়া আসিতেছে।" সাপের ভয়ে বিলাসবাবুর পদস্খলন হইল, তিনি পড়িয়া গেলেন। শৈল অঙ্গুলী তুলিয়া বিলাসবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চলিয়া গেল। তাহার আগমনির্গম কেহ জানিতে পারিল না, কেবল একটী বালক তাহাকে ছাদে দেখিয়া পলাইয়াছিল। রুক্ষ শরীরের উপর রুক্ষ কেশ-রাশি নানাভঙ্গীতে চারিদিকে পড়িয়া চক্ষু, মুখ বাহু-পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছিল। বালক মনে করিল, "এই প্রেতিনী হইবে।" এই সময় বিনোদবাবুর বাটী হইতে একটী পেচক উড়িবায় কাকেরা চীৎকার করিতেছিল। বিনোদবাবুর বাটী শূন্য পড়িয়া আছে, প্রাঙ্গণে লতা উঠিয়াছে, রন্ধনশালা পড়িয়া গিয়াছে, তথায় শৃগালেরা বাস করিতেছে। উঠানের সর্ব্বত্র তৃণাদিতে ব্যাপিয়াছে, কেবল বিনোদের নিমিত্ত বিলাসবাবু যে গর্ত্ত কাটিয়াছিলেন, তাহাই পরিষ্কার রহিয়াছে, তথায় একটী তৃণও জন্মে নাই।

পুরগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শৈল অতি ধীরে ধীরে কুটীরাভিমুখে আসিতেছিল; পথিমধ্যে দেঁতোর মার সহিত সাক্ষাৎ হইল, সাক্ষাৎ মাত্রেই শৈল বলিল, "দেঁতোর মা! বেলা যে অনেক হই-য়াছে, এখনও উনানে আগুন দিলি না, তিনি যে আসিয়াই আহার করিবেন!" দেঁতোর মা পূর্ব্ব অভ্যাসানুসারে উত্তর দিল "এই যাই," কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া শৈলের প্রতি চাহিয়া রহিল। শৈল পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল। দেঁতোর মার প্রতি আর দৃষ্টিপাতও করিল না। দেঁতোর মা যে কি উত্তর দিল, হয় ত তাহা শৈলের কর্ণে প্রবেশও করে নাই।

দেঁতোর মার সহিত সাক্ষাতের পর শৈল কতক-দূর গিয়া মুখ আবরণ করিল। মধ্যবধূর ন্যায় অব-গুণ্ঠনবতী হইয়া চলিতেছিল, এমত সময় পথে মাধবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাধবী কোন কথাই আর জিজ্ঞাসা না করিয়া, শৈলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া শৈল বলিল, "আমার বেশভূষা করিয়া দেও, তিনি আমায় ডেকে-ছেন!" "দিই" বলিয়া মাধবী বাতাস করিতে লাগি-লেন। শৈল কতকটা শ্রান্ত হইয়াছিল, অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রা গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে আহারাদির পর মাধবী বলিলেন, "আয় দিদি, তোর চুল বেঁধে দিই—ভাল করে বেশভূষা করিয়া দিই।" শৈল বলিল, "কেন?" মাধবী বলিলেন, "এই যে তখন তুমি বেশভূষা করে দিতে বলিতেছিলে, তোমায় যে তিনি ডেকেছেন।" শৈলের মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। মাধবী শৈলের চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন এবং শৈলকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গীত গাইতে লাগিলেন। মাধবী দেখিয়াছিলেন, তাঁহার গীতে শৈল অনেক সময় কতকটা বশতাপন্ন হয়। তাহাই মনে করিয়া গাইতে লাগিলেন;—"কাহা রে মেরে প্যারে।" বেশবিন্যাস শেষ হইলে শৈল বলিল, "দিদি! আমার হাতের গহনা কই? হাতে চুড়ি কি বালা না পরিলে তিনি আমায় সুন্দরী বলিবেন না।" মাধবী কি উপায় করিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময় শৈল আপন পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে ছিন্ন করিয়া বলিল, "দিদি, এই সকল গহনা আমার হাতে পরাইয়া দাও।" মাধবীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তাহা কষ্টে সংবরণ করিয়া ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডগুলি একে একে শৈলের হাতে বাঁধিয়া দিলেন। শৈল হস্ত ফিরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল, "বেশ হইয়াছে, এখন তবে যাই।" দুই চারি পদ গিয়া আবার ফিরিয়া বলিল, "কই আমার চুলে ফুল কই?" নিকটে যূথিকা, মল্লিকা, আর কৃষ্ণকলি ফুটিয়াছিল, মাধবী তাহাই কতকগুলি কেশে পরাইয়া দিয়া, আদরে শৈলের মুখচুম্বন করিলেন। অনেক সময় সামান্য বিষয়ের ফল অতি গুরুতর দাঁড়ায়, অতি সামান্য কথায় লোকের জীবনস্রোত একেবারে ফিরিয়া যায়। মাধবীর আদরে কিছুই বিশেষ

চমৎকারিত্ব ছিল না, কিন্তু তাহার ফল চমৎকার হইল। শৈল যেন হঠাৎ মাধবীর আদর বুঝিতে পারিল, তাহার নাসাগ্র দুই একবার কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "আমি কি আর আদরের যোগ্য, আমায় আর স্পর্শ করিও না, তবু ইচ্ছা হয়"—এই বলিয়া মাধবীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া শৈল কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদিলে পর মাধবী বলিলেন "কেন দিদি কাঁদ?" তখন শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মাধবীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া, তাঁহার মুখপ্রতি অতি কাতরভাবে একবার চাহিল। মাধবী সে মৃদু, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময়াপন্না হইলেন। শৈল পাষাণী, এরূপ মোহিনী দৃষ্টি কোথা পাইল? শৈল উন্মাদিনী—তাহার দৃষ্টি সতত বিচলিত—ভ্রান্ত, সে এ নবপ্রসূতির কোমল দৃষ্টি কোথা পাইল? শৈল কি তবে আর উন্মাদিনী নাই? এই সকল কথা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মাধবী ভাবিতেছিলেন, এই অবকাশে শৈল চলিয়া গেল। অতি গম্ভীরভাবে জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। মাধবী তাহার অনুসরণ করিলেন।

অপরাহ্নে পশ্চিম দিকে গাঢ় মেঘাড়ম্বর হইতেছিল, শীঘ্র ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, মাধবী শৈলকে নিকটে কোথাও আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিবেন মনে করিয়া, অগ্রসর হইতেছিলেন, এমত সময় শৈল একটী ঘাটে গিয়া বসিল। মাধবীও বসিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শৈলকে ভুলিয়া একদৃষ্টে মেঘের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময় শম্ভু-কন্ফো শৈলের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। একাল পর্য্যন্ত সে শৈলের সহিত আলাপ করে নাই, কখন যে করিবে, এমতও তাহার ইচ্ছা ছিল না। পরে শৈলের পরিবর্ত্তন যাহা দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহার স্নেহস্রোত ক্রমে ফিরিতেছিল। শৈলের সঙ্গে কথা কহিবে বলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইল। তাহার অনুসন্ধান জন্য শম্ভু নদীর কূল অনুসরণ করিয়া চলিল। এ দিকে মেঘ ক্রমে গাঢ় হইতে লাগিল, বায়ু ক্রমে মন্দীভূত হইল; সর্ব্বত্র যেন স্পন্দনরহিত হইল। মেঘ আরও গম্ভীর হইতে লাগিল। বর্ণ আরও গাঢ় হইতে লাগিল। শেষে মেঘের বর্ণে বৃক্ষ ও প্রান্তরের শ্যামল শোভা যেন একেবারে ফুটিয়া উঠিল। মাধবী ভাবিলেন, "পৃথিবীর এ কোমল শ্যামল শোভা কোথা ছিল!" প্রান্তর হইতে একে একে বক উড়িতে লাগিল, সেই গম্ভীর মেঘের কোলে বকের অমল-শ্বেত শোভা দেখিয়া মাধবী আরও মোহিত হইলেন, সুখে উন্মত্ত হইয়া গাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া শৈলের দিকে চাহিলেন। শৈল তাঁহার গীতোদ্যম শুনে নাই, কেবল একাগ্রচিত্তে মেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মাধবী ধীরে ধীরে শৈলের আরও নিকটে গিয়া বসিলেন। শৈল তখন আদরে মাধবীর একটী হস্ত আপনার ক্রোড়ে লইয়া বলিল, "দিদি! আজ আমার ফুলশয্যা।" মাধবী উত্তর করিলেন, "তবে আর এখানে কেন? চল, তাঁহার কাছে যাই।" শৈল বলিল, "না, এখনও তিনি আমায় ডাকেন নাই।"

এতক্ষণ প্রকৃতি যেন মেঘের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, মেঘ কখন বর্ষিবে, কখন ডাকিবে। অকস্মাৎ মেঘ অতি বিকট শব্দ করিয়া উঠিল; শব্দে প্রকৃতি শিহরিল। শৈল অহ্লাদে দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদি, ঐ তিনি আমাকে ডাকছেন" এই বলিতে বলিতে অগ্নিস্রোত আকাশ-পৃথিবী ব্যাপিয়া আবার ঝলসিল। অশনিপাতশব্দে শৈল উঠিল, "ঐ দেখ, আবার আমায় ডাকিতেছেন, আর আমার থাকা হইল না।" এই বলিয়া মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে নদীতে নামিল। আবক্ষ জলে নিমজ্জন করিয়া একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি তুলিয়া মাথা হেলাইয়া মাধবীর প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিল। আবার আকাশ-মর্ত্ত্য ভেদ করিয়া শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর পারের এক উচ্চ বৃক্ষ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর মাধবী জলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শৈল নদীতে নাই। কেবল তাঁহার কেশের ফুলগুলি জলে ভাসিতেছে। "কি হইল, কি হইল" বলিয়া মাধবী চীৎকার করিতে করিতে জলে পড়িলেন। শৈল যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে জল তখনও উছলিতেছে।

এই সময় শম্ভু শোকাকুল সিংহের ন্যায় লাফাইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিল, ক্ষুদ্র নদী ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। শম্ভু এক একবার জল হইতে মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে, "শৈল!" সে চীৎকার যেন প্রান্তর পার হইয়া মেঘে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শম্ভু আবার ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার ডাকিতেছে, "আমার শৈল!" শেষ শম্ভু শৈলকে পাইল, বুকে করিয়া কূলে উঠিল। শৈলের মাথা ঝুলিতেছে, পা দুলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হইতে জল ঝরিতেছে

শম্ভু অতি যত্নে শৈলকে কূলে শয়ন করাইয়া আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাধবী অতি কষ্টে চীৎকার সংবরণ করিতে লাগিল। শম্ভু শেষ বলিয়া উঠিল, "শৈল আর নাই!"

এই সময় একজন ধীবর আসিয়া বলিল, আপনি ছাড়ুন।" শম্ভু তাহাকে অনুমতি দিতে না দিতে সে শৈলকে শূন্যে ঘুরাইয়া তাহার উদরস্থ জল বাহির করিয়া দিল। মাধবীর ফুৎকারে নিশ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চার হইল। তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, কেবল ঝড় হইতেছিল। শম্ভু লোক ডাকাইয়া খাটে করিয়া শৈলকে কুটীরে লইয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে শয্যায় শয়ন করাইয়া শম্ভু এবং মাধবী উভয়ে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, তখন শৈলের চেতনা হয় নাই, রক্ষা পাইবার কোন ভরসাও নাই। শম্ভু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" পরে রাত্রি প্রভাত হইল, মাধবী ব্যাকুল হইয়া শম্ভুকে বলিলেন, "এখন ও উপায় হইতে পারে।" শম্ভু বলিল, "উপায় না হউক, চেষ্টা হইতে পারে।" এই বলিয়া শম্ভু উঠিল এবং ইতস্ততঃ না করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

বেলা দুই প্রহরের সময় কতকগুলি পরিচারক-পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শম্ভু ফিরিয়া আসিয়া একবার শৈলকে দেখিল, তাহার পর মাধবীকে নিভৃত-স্থানে লইয়া গিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "শৈল যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা সমাধা করিল, তাহাকে আর ফিরাইতে পারা গেল না।"

মাধবী। চিকিৎসক—

শম্ভু। "চিকিৎসক আসিতেছে, কিন্তু বোধ হয় তাহার আসিবার অপেক্ষা সহিবে না।" অমনি মাধবীর চক্ষু অমলজলপূর্ণ হইল। শম্ভু তাহা দেখিয়া [illegible]ল, "শৈলের জন্য কাঁদিবার আর কেহ নাই।" [illegible]বী অঞ্চল দ্বারা মুখাবরণ করিয়া ঈষৎ কাঁদিতে [illegible]গল। শম্ভু অনেককাল মাধবীর শব্দহীন ক্রন্দন দেখিল, পরে বলিল, "অধিক কাতর হইও না, তুমি [illegible] স্ত্রীলোকের ন্যায় অজ্ঞান নও, মৃত্যু কেবল পর-[illegible]র পূর্ব্বক্রিয়া—গর্ভমুক্তিমাত্র। মাতৃগর্ভে দেহ [illegible] হয়, তাহার পর দেহ ভূমিষ্ঠ হইলে দেহের মধ্যে দেহীর গঠন হইয়া থাকে সুতরাং দেহ দ্বিতীয় গর্ভ। সেই দ্বিতীয়-গর্ভ-মোচনের নাম মৃত্যু। শৈলের দেহমুক্তি হইতেছে, তোমারও একদিন হইবে। তাহাতে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কষ্টও নাই। মাতৃগর্ভ হইতে যে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার ভয় কি, ভাবনা কি, কষ্টই বা কি হইয়া থাকে? যে কিছু কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রসববেদনাস্বরূপে মাতৃগর্ভের। মৃত্যুর সময়ও সেইরূপ যে কিছু কষ্ট হয়, তাহা দেহীর নহে, কেবল দেহের অর্থাৎ দ্বিতীয় গর্ভের। সে কষ্টও অতি সামান্য, শিশুদের উপযোগী। এ সকল কথা উল্লেখ করা বাহুল্য। এক্ষণে আমি চলিলাম, পরে দেখা হবে।"

এই বলিয়া শম্ভু সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে নদী-কূল অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল। প্রায় ক্রোশাধিক গিয়া শম্ভু এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল; তথা হইতে শৈলের কুটীর অল্প দেখা যায়। শম্ভু তথায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বামহস্তের উপর মাথা রাখিয়া সেই কুটীর দেখিতে লাগিল। অপরাহ্নে বোধ হইল, যেন সেই কুটীর হইতে অল্প অল্প ধূম উদ্গত হইতেছে শম্ভু উঠিয়া বসিল, একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিল, তাহার পর সেই ধূম হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া পুঞ্জে পুঞ্জে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শম্ভু বুঝিল, শৈলের অগ্নিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

রাত্রি প্রহরেকের সময় মহান্তের কুটীরে বসিয়া শম্ভু কতকগুলি কাগজপত্র পড়িতেছে, আর মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। শেষ শম্ভু বলিল, "অদ্যাপি ধনদৌলত বিস্তর রহিয়াছে, অনর্থক এগুলা আর কেন?"

মহান্ত। এগুলা তবে কি হবে?

শম্ভু। যাহাতে ভাল হয়, আপনি তাহাই করিবেন।

ম। আমি কি করিব? টাকা দ্বারা কি ভাল হয়, তাহা মহারাজ জানেন, আমি কেবল মহারাজের ইঙ্গিতানুরূপ ব্যয় করিতে জানি।

শ। সে কথা এখন থাক্। আপাততঃ এক কর্ম্ম করুন, ভূগর্ভে যত লোক আবদ্ধ আছে, সকলকে খালাস দেন। আমি এই সকল লোককে অনর্থক কয়েদ করেছি—অনর্থক কয়েদ রেখেছি। কয়েদ রাখিবার আমার অধিকার কি?

ম। প্রজাশাসন করিতে রাজার সর্ব্বদা অধিকার আছে; এ কথা, সকল শাস্ত্রে বলে।

শ। আমি সে রাজা নহি। তদ্ব্যতীত দণ্ড দেওয়া

উচিত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ কোন দোষ সংশোধন জন্য কি দণ্ড দিতে হইবে, তাহা যে কোন রাজা বুঝেন, এরূপ আমি জানি নাই; আবার সেই দণ্ডের মাত্রা প্রয়োগ করা বড় কঠিন। দণ্ডের অতিমাত্রায় শৈলকে আমরা উন্মাদ করিয়াছিলাম।

ম। শৈলের বোধ হয় ভালরূপ চিকিৎসা হইতেছে।

শ। শৈল উন্মাদ-অবস্থায় আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

এই বলিয়া শম্ভু উঠিল, মহান্ত আর কিছু না বলিয়া আবদ্ধ ব্যক্তিদের খালাস করিতে গেলেন। শম্ভু ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্তরে অবতরণ করিল; তথায় পূর্ব্বপরিচিতা বৃদ্ধা একা বসিয়া মালা-জপ করিতেছে। শম্ভুকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধা উঠিয়া গলদেশে অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিল।

শ। মাতঙ্গিনি, তোমার নিজবেশ পরিয়া একবার মাধবীর নিকট যাও, তোমায় আর আমি আমার নিজকার্য্যে ব্যাপৃতা রাখিব না, আমার কার্য্য প্রায় ফুরাইল।

মাত। কেন মহারাজ? আমার কি কোন ত্রুটি হইয়াছে?

শ। ত্রুটি আমার হয়েছে, এইজন্য আমি সকল ছাড়িতেছি। পূর্ব্বে যে কুটীরের পরিচয় দিয়াছি, মাধবী সেইখানে আছে; তথায় তোমার যাওয়ার নিমিত্ত নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি আর বিলম্ব করিও না। রামদাসের সংবাদ কি?

মাত। রামদাস বড় কষ্ট পাইতেছে, মৃত যুবতীর যে প্রতিমূর্ত্তি তাহাকে দেখান হইয়াছিল, তাহাতে সে বড় ভয় পায়; এমন কি, প্রথমদিন মূর্চ্ছা গিয়াছিল, তাহার পর এখন আর প্রতিমূর্ত্তি দেখান যায় না, তথাপি রামদাস প্রতি রাত্রিতে অনবরত চীৎকার করিতে থাকে। বুড় বামুন যে এত ভীত তাহা আমি জানিতাম না।

শ। রামদাসের নিমিত্ত আর ভাবনা নাই। তুমি মাধবীকে সঙ্গে করে যাইট-পইঠার ঘাটে যাবে,সেইখানে তোমার কালীর মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছি, আর তোমার থাকিবার একটী বাড়ীও নির্ম্মিত হইয়াছে। সেইখানে বিনোদবাবু আছেন, আমি যে পর্য্যন্ত না যাই, সে পর্য্যন্ত সেখানে তাঁকে থাকিতে বলিবে।

মাত। শৈল কি একা এখানকার কুটীরে থাকিবেন?

শ। শৈল আর নাই।

মাত। ইহার মধ্যে কি ঘটনা হয়েছিল?

শ। শৈল গতকল্য জলে ডুবেছিল,অদ্য মরেছে। এতক্ষণ তাহার দাহ শেষ হইয়া থাকিবে। শৈলের অন্য মাধবী বড় শোকাকুল হইয়াছে, কিছুদিন পরে অবস্থা বুঝিয়া তাহার নিকট একটা কথা প্রস্তাব করিতে হইবে।

মাত। কি কথা?

শ। আমার ইচ্ছা, বিনোদের সহিত তাহার বিবাহ দিই।

মাত। এই বয়সে?

শ। ক্ষতি কি?

মাত। বিনোদ কি আর বিবাহ করিবেন?

শ। আমি তাহাকে সম্মত করিব। তুমি মাধবীকে সম্মত করিলেই হইবে।

মাত। যদি অভয়দান করেন, তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে সাহস করি।

শ। বল শুনি।

মাত। আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বিনোদবাবু এ বিবাহে সুখী হইবেন না। তিনি অসুখী হইলে আমার মাধবীও অসুখী হইবে। আমি মাধবীকে লালন-পালন করেছি, তাহার শুভাশুভ সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে দাবি রাখি।

শ। সেইজন্যই তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিলাম। এখন আমার একমাত্র কামনা,মাধবী ও বিনোদ, এই উভয়ের সুখ। আমার দুর্ভাগ্য, আমি যাহাকে সুখী করিতে গিয়াছি, তাহাকেই দুঃখে ডুবাইয়াছি। বোধ হয়, এবারও তাহাই হইবে, কিন্তু আমি উভয়ের প্রকৃতি জানি, তাহাই আমার আশা হইতেছে।

মাত। উভয়ের প্রকৃতি চমৎকার বটে, কিন্তু অদৃষ্ট তেমন হলে। বলিতে লজ্জা করে, বিনোদ বাবু একবার ঠকিয়াছেন। যদি মাধবীর অন্তঃকরণ দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস ফিরিয়া আইসে, হয়ত মাধবীর বয়স আলোচনা করিয়া একসময় সে বিশ্বাস নষ্ট হইবে। মহারাজ স্পর্দ্ধা দিয়াছেন বলিয়া এতটা বলিলাম। দাসীকে ক্ষমা করিবেন।

শ। কোন চিন্তা করিও না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা করিলে মঙ্গল সম্ভব, এখন প্রস্তুত হও

মাতঙ্গিনী কক্ষান্তরে গিয়া বৃদ্ধার বেশ ত্যাগ

করিবার জন্ম কেশ ধৌত করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, "মহারাজের নিকট মৃত্যু আর বিবাহ তুল্য-কথা। এই শোকের সময় বিবাহের কথা কিরূপে মহারাজের অন্তঃকরণে আসিয়াছে? আশ্চর্য্য অন্তঃকরণ! কেবল পাথর! তাই বুঝি কন্যার নাম শৈলকুমারী হইয়াছিল?"

প্রায় দশ বার দিবস পরে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাতঙ্গিনী এবং মাধবী উভয়ে ষাইঠ-পই-র ঘাটে বসিয়া নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সর্ব্বত্র ছায়া পড়িয়াছে, নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে, বায়ু অন্যমনস্কে বহিতেছে, নিকটে আর কেহ নাই, তথাপি উভয়ে চুপিচুপি কথা কহিতেছেন।

মাধবী। আমি আর এখানে অধিকদিন থাকিতে পারি না।

মাতঙ্গিনী। কেন? তোমার এখানে কি ভাল লাগে না?

মাধ। কি ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, জানি না। হয় ত অনেকদিন আসিয়াছি বলে বুঝি এস্থান আর ভাল লাগে না।

মাত। এই সামান্য কথা বলিবার জন্য এত চুপি চুপি কথা কহিতেছ কেন? তোমার এ কথা যদি শুনে, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি?

মাধ। কোন ক্ষতির ভয়ে কথার স্বর নীচু করি চারিদিকের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কথা কহিতেছি। দেখিতেছ না, সর্ব্বত্র ছায়া পড়িয়াছে, ... র সুর অতি মৃদু, প্রায় শব্দহীন। জড়-জঙ্গম ... সেই এই ছায়ার সঙ্গে সুর মিলাইতেছে; ঐ ... নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে, বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে, বক সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতেছে। মাছরাঙ্গা পালক মুড়ি দিয়া শুষ্ক ডালে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। পৃথিবীর গোলমাল একেবারেই থামিয়া গিয়াছে, আমিও তাই চুপিচুপি কথা কহিতেছি, এখন ... ?

মাত। তা বুঝিলাম, তুমি নিজে গায়িকা, ... গাছপালার, নদ-নদীর সুর ভাল চিনিতে ... এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার মুখ নিত্য ... তেছে কেন?

... সন্ধ্যা হলো, এখন ঘরে চল।

... তোমার আমার আবার সন্ধ্যার ভয় কি? হতভাগ্য সংসারীরা করুক।

... সংসারীদের উপর এত রাগ কেন? ... দিন বলেছিলে, 'এ পৃথিবীর যত সুখ যেন সংসারীর জন্য হয়েছে, তোমার আমার জন্য যেন কিছুই হয় নাই। সংসারীরাই যথার্থ সুখী।'

মাত। তোমার কি তাই বোধ হয়?

মাধ। আমারও সেই মত। সংসার না থাকিলে রাজ্য থাকিত না, রাজ্যের কোন উন্নতি হইত না।

মাত। বাছা! তবে এ সংসার হইতে কেন তার বঞ্চিত থাক?

মাধ। সংসারীরা আমাদের মত সুখের জ... করিতে পায় না। তাদের জপ-তপ—'হরে কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ, বড় কষ্ট, আমার ভাল কর, আমার ছেলের ভাল কর, আর যদি পার, শত্রুর মরণ কর।'

মাত। আর যাদের সংসার নাই, তাদের জপ-তপ?

মাধ। কেন? তুমি কি তা জান না? তোমারও তো সংসার নাই।

মাত। আমি শূদ্রা। তুমি তোমার নিজের কথা বল।

মাধ। আমার গুরুদেব শিখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতে তৃণ-আদি পর্য্যন্ত যে জগৎ, তাহার মঙ্গল হউক। 'আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।' আমার স্তব-স্তুতি, কামনা-প্রার্থনা, সকলই এই। আমার কে আছে যে, তার জন্য আমি এই জগৎ ভুলিব? আমার কেহ নাই। কিন্তু বল দেখি, কেন আমি আমাকে ভুলিতে পারি না, এখন আমার আর ভুলিবার সাধ্য নাই, আমি গুরুদেবকে তাহা বলেছি। তাই বলিতেছিলাম—

এমন সময় হঠাৎ বিনোদবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধবী ঈষৎ লজ্জাবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন, যাহা বলিতেছিলেন, তাহা আর বলিলেন না। বিনোদ মাধবীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধবি, তুমি দিন দিন ম্লান হইতেছ কেন? তোমার আর সে হাসি নাই।" মাধবী আরও অবনতমুখে নখদ্বারা অঞ্চলাগ্র ছিঁড়িতে লাগিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

বিনোদ। আর একটী নূতন দেখিতেছি, তুমি আমার সাক্ষাতে একদিন গীত গাইয়াছিলে, এখন আমার সাক্ষাতে একটী কথাও কও না—একবার দেখাও কর না, ইহার তাৎপর্য্য কি? এই দশ বার দিন আসিয়াছ, আমার সঙ্গে এক বাটীতে আছ, অথচ আমাকে মাত্র দুইবার দেখা দিয়াছ। প্রথম আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'আপনার শরীর কেমন

আছে?' দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইলে তুমি সরিয়া গেলে, একটী কথাও কহিলে না, ইহার হেতু আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না।

অবনতমুখে মৃদুস্বরে মাধবী উত্তর করিলেন, "হেতু কিছুই নাই।"

বিনোদ। তুমি একদিন আমায় যে সুখী করেছিলে, তাহা এ জন্মে ভুলিবার নহে, এ জন্মে আমি কখন তোমায় ভুলিতে পারিব না। তোমায় ভুলা দূরে থাক্, সেই দিন অবধি তোমার নামের লতাটীকে পর্য্যন্ত ভালবাসিয়াছি; যেখানে সে লতা দেখি, সেইখানেই তাহার পবিত্র ছায়ায় দাঁড়াইয়া যাই—কোন পাপিষ্ঠ যদি তার পাতা ছেঁড়ে, আমি তাকে গালি দিই।

মাতঙ্গিনী। আপনি কি কতকগুলা বলিলেন, মাধবী যে লজ্জায় চলিয়া গেল। অমন করে কি বলিতে হয়? ওরূপ কথায় স্ত্রীলোক মাত্রেই লজ্জা পায়।

বিনোদ। কিন্তু কি অন্যায় বলিয়াছি? যাহা সত্য, তাহাই বলিয়াছি, তাহাতে কণা মাত্র অসত্য নাই।

মাতঙ্গিনী। যাহা সত্য, তাহাই কি সকল সময় সকলের সাক্ষাতে বলিতে হয়? আর আপনি সত্য বলেন নাই; আপনি কি সত্যই মাধবীকে ভালবাসেন?

বিনোদ। আমি সত্যই ভালবাসি।

মাতঙ্গিনী। মিথ্যা কথা। আপনি কৃতজ্ঞতাকে ভালবাসা মনে করিতেছেন। একদিন মাধবী আপনার অন্তরবেদনা ক্ষণকালের নিমিত্ত শান্তি করেছিল, সেইজন্য আপনি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হয়েছেন। তাহাকে ভালবাসেন নাই। কৃতজ্ঞতা হইতে ভালবাসা স্বতন্ত্র।

বিনোদ। কৃতজ্ঞতা হইতে ভালবাসা জন্মে।

মাতঙ্গিনী। ও সর্ব্বনাশ! ঠিক উল্টা। যে আমার উপকার করে, তারে দেখিলে নূতন নূতন আমার একটু লজ্জা হয়, তার সহিত দেখা না হলেই ভাল। যদি দেখা হয় ত মনে যেন একটু ভয় আইসে; শেষ তার সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, তাহারই চেষ্টা জন্মে। এই যদি ভালবাসা হয়, তবে কৃতজ্ঞতা হইতে নিশ্চয়ই ভালবাসা জন্মে। আপনি কত লোককে এরূপ ভালবাসেন?

বিনোদ। আমি অত বুঝি না, আমার বুদ্ধি গতি সামান্য। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, এবং তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি মাধবীকে আন্তরিক ভালবাসি, কেন ভালবাসি, তা বলিতে পারি না। কেহ অন্তর দেখে ভালবাসে, কেহ গুণ দেখে ভালবাসে, কেহ শরীর দেখে ভালবাসে, আমার ভালবাসা যে কি দেখে, তাহা পরিষ্কার করে বুঝিতে পারি না।

মাতঙ্গিনী। বোধ হয়, তার গীত শুনে আপনি ভালবেসেছেন। মালাগাঁথা দেখে বিদ্যা যদি সুন্দরকে ভালবেসে থাকে, তা আপনি গীত শুনে ভালবাসিবেন, ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

বিনোদ। ভারতচন্দ্র গাঁজাখোর ছিল, তাই শিল্পকে প্রেমের বীজ করেছে। তুমি কি আমায় উপহাস করিতেছ?

মাতঙ্গিনী। আমি উপহাস করি নাই, গীত শুনে স্ত্রীলোকে ভালবাসে, কিন্তু পুরুষে ভালবাসে কি না, তা জানি না। তা যাহাই হউক, আপনি যদি মাধবীকে ভালবাসিয়া থাকেন, তবে কেন তাকে বিবাহ করুন না? মাধবী অবিবাহিতা।

বিনোদ। ও কথা মুখে আনিও না, আমার ভালবাসা বিবাহের জন্য নহে।

এই বলিয়া বিনোদ কিঞ্চিৎ চঞ্চলভাবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্ষণেক বিলম্বে মাতঙ্গিনীও গৃহে আসিল। মাতঙ্গিনী শয়ন করিয়া মাধবীকে বলিল, "বিনোদ যে সত্যসত্যই তোমায় ভালবাসে; তোমার কথা কহিতে কহিতে তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। বিনোদবাবু তোমার উপযুক্ত বরপাত্র। তাঁহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।" মাধবী উত্তর করিল, "ছি! ও কথা মুখে আন কেন? যদি তিনি আমায় ভালবাসেন, তবে আমায় তাহা বলা ভাল হয় নাই। আমি অনাথা, আমার রক্ষক কেহ নাই, তুমিই আমার রক্ষক, তুমিই আমার মা। তুমি আমায় ডুবাইলে কাহাকে ধরিয়া আমি সাঁতার দিব?"

মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "কি লা মাধবি! আমি কি তোকে কোন অসঙ্গত কথা বলিলাম? আমি কি আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কথা বলিলাম? তোর কি আর একটা বিবাহ হয়েছে যে, আবার বিবাহ করিতে বলায় তোর রাগ হলো?" মাধবী নিঃশব্দে অনেকক্ষণ কাঁদিল, তার পর চক্ষু মুছিয়া মাতঙ্গিনীর মুখপ্রতি কাতরভাবে চাহিয়া থাকিল।

মাতঙ্গিনী। অমন করে চাহিয়া আছ যে—কি হয়েছে তোমার?

মাধবী। কিছু হয় নাই, বিবাহের কথা আর আমায় বলো না। বিবাহ আমি করিব না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে এক দিবস প্রাতে যখন মাধবী শয্যা হইতে উঠিলেন, তখন বড় দুর্ব্বল। বিনোদবাবু বলিয়াছিলেন, মাধবী দিন দিন ম্লান হইতেছেন, এ দিন তাঁহাকে আরও ম্লান বোধ হইল। পরিচারিকা অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। সকলেই ভাবিল, তাঁর কোন পীড়া হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে মাধবী শয্যাগত হইলেন, তাঁহার চলনশক্তি একেবারে গেল। জিজ্ঞাসা করিলে মাধবী উত্তর দেন, "আমার যে কোন পীড়া হইয়াছে, এরূপ ত আমি বুঝিতে পারি না, আমার শরীরে কোন গ্লানি নাই—কেবলমাত্র দুর্ব্বল।" চিকিৎসকেরা নানা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কেহ পীড়া কি, অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন মাতঙ্গিনী বিনোদবাবুকে বলিলেন, "এই সময় মহারাজ একবার এখানে আসিলে ভাল হইত। তিনি শীঘ্র আসিবেন বলিয়াছিলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত আসিলেন না, কোথায় বা তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়।" মাতঙ্গিনী বহির্গত হইল।

প্রথমে মহান্তের নিকট গিয়া মাতঙ্গিনী মহারাজের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিল। মহান্ত বলিলেন, "অদ্য দুই চারি দিবস হইল, মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন, তার পর কোথায় গিয়াছেন, জানি না।"

মাত। তিনি এখানে কতক্ষণ ছিলেন?

মহান্ত। তিনি প্রাতঃকালে আসিয়া কখন গিয়াছেন, তাহা জানি না।

মাত। এখানে আসিয়া কি করিয়াছিলেন?

মহান্ত। তিনি এখানে আসিয়া আমার নিকট কতকগুলি রত্নালঙ্কার চাহিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে রামদাসের সংবাদ দিলাম।

মাত। রামদাসের সংবাদ কি?

মহা। তুমি ত জান, মহারাজ যে দিবস রাত্রিতে আসিয়া তোমায় এখান হইতে লইয়া গেলেন, সেই দিবস কারাবদ্ধদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়া যান। আমি তদনুসারে সকলকে একে একে কারামুক্ত করিলাম, শেষ রামদাসের ঘরে গেলাম। তখন রামদাস জপ করিতেছিল, জপ সমাধা করিয়া সে অতি কাতরস্বরে এক প্রেতিনীর গল্প করিল। বলিল, নিত্য প্রেতিনী আসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া যায়। আমি তখন হাসিয়া তাহার ভয় দূর করিলাম, বলিলাম, যাহাকে রামদাস প্রেতিনী মনে করিয়াছে, তাহা পুত্তলিকামাত্র, এবং সে পুত্তলিকায় যে সকল কলকৌশল ছিল, তাহাও সমুদয় বলিয়া দিলাম। রামদাস তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি কি মূর্খ! এই সামান্য বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি নাই, ভয়ে একেবারে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলাম।' তাহার পর রামদাসকে কারামুক্তির সংবাদ দিলাম, সে তাহাতে আহ্লাদিত হওয়া দূরে থাক্, স্পষ্ট বলিল, 'মহারাজ যখন নিজে আমায় কারাবদ্ধ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজে আসিয়া কারামুক্ত না করিলে, আমি এখান হইতে বহির্গত হইব না।' আমি আর কি করি, শেষ চলিয়া আসিলাম। পরে সে দিবস মহারাজ এখানে আসিলে, আমি সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করিলাম। তিনি ঈষৎ হাসিয়া আমার নিকট হইতে চাবি লইলেন, এবং স্বয়ং গিয়া রামদাসকে খালাস দিলেন।

মাত। রামদাস এখন কোথায়?

মহা। তাহার কুটীরে আছে।

মাত। তার পর রামদাসকে খালাস দিয়া মহারাজ আপনকার নিকট হইতে রত্নালঙ্কার লইয়া গিয়াছেন?

মহা। না, তাহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। রামদাসের হাতে চাবি দিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবেন।

মাত। চাবিসমুদয় আপনি গণিয়াছেন?

মহা। না। গণনার বড় প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

মাত। বিলক্ষণ প্রয়োজন ছিল। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গণিয়া দেখুন।

মহা। কেন?—তাহাতে কি লাভ হইবে?

মাত। আমি পরে নিবেদন করিব। আপনি সত্বর একবার চাবিগুলি গণনা করুন।

মহান্ত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চাবিগুলি মাতঙ্গিনীর সম্মুখে আনিয়া গণনা করিলেন, গণনায় ঠিক হইল।

তখন মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি চাবির সকলগুলি চেনেন?"

মহা। না।

মাত। তবে একবার ভূগর্ভে চলুন। এই চাবিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে; আমার সন্দেহ হইতেছে, ইহার মধ্যে দুই একটি আসল চাবি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য চাবি রক্ষিত হই-

মহা। অনর্থক তোমার সন্দেহ।

মাত। বোধ হয়, অনর্থক নহে। আপনি তাহা পরে জানিতে পারিবেন, একবার চলুন।

মহা। ভাল, যদি কৃত্রিম চাবিই ইহার মধ্যে থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যেরূপ মহারাজের ভাবভঙ্গী দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, কস্মিন্-কালে এ ভূগর্ভে আর কেহ রক্ষিত হইবে না। চাবিরও প্রয়োজন হইবে না।

মাত। তথাপি একবার চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না, আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি।

মহা। কেন? তোমার কি সন্দেহ, তাহা তুমি স্পষ্ট করিয়া আমায় বল।

মাত। সন্দেহ প্রকাশ করিতে নাই। আপনি আর বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিবেন না। তাহা হইলে আমার সন্দেহ অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইবে, আসুন।

দুই এক পদ গিয়া মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ঘরে ভাল কুলুপ পাইব?" মহান্ত উত্তর করিলেন, "পাইবে।"

মাতঙ্গিনী তখন মহান্তের কুটীর হইতে কুলুপ লইয়া পক্ষীর ন্যায় বেগে রামদাসের দ্বার রোধ করিয়া আসিল, রামদাস তখন পূজায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিল, কিছুই জানিতে পারিল না।

যে মন্দিরের মধ্য দিয়া ভূগর্ভে যাইতে হয়, তাহার সোপান অবতরণ করিবার সময় মহান্ত আলোক জ্বালিলেন। সেই স্থানেই আলোক জ্বালিবার উপকরণ প্রস্তুত থাকিত। তাহার পর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া সকল কক্ষ অনুসন্ধান করিলেন। অধিকাংশ ঘর অনাবদ্ধ ছিল। যে দুই একটি ঘর রুদ্ধ ছিল, চাবি ব্যবহার করায় তাহা খুলিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটী ঘর কোনমতে খোলা গেল না, তাহার কুলুপে কোন চাবি লাগিল না। তখন আশ্চর্য্য বোধে মাতঙ্গিনীকে মহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এরূপ হইল? তুমি যে সন্দেহ করিয়াছিলে, তাহা যে সত্য হইল দেখিতেছি, ব্যাপার কি?"

মাত। মহারাজ এই কক্ষে আবদ্ধ আছেন, রামদাস আবদ্ধ করেছে। এখন শীঘ্র রামদাসের কুটীরে চলুন। আপনার অধীনে কয়জন সন্ন্যাসী আছেন? তাঁহাদের মধ্যে কয়জনকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন?

মহা। সকলকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকি।

মাত। সর্ব্বনাশ! এখন উদারতার সময় নহে। রামদাসের বিপক্ষে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারে, এরূপ অন্ততঃ পাঁচজন শীঘ্র আনয়ন করুন।

মহান্ত একটু ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মহান্ত দুই জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে আনিয়া বলিলেন, "ইহারা যোগ অভ্যাস করিতেছে, নিত্য নানা আসন করে, সুতরাং বলে ইহারা অসাধারণ; আর যে কার্য্য বলিবে, সেই কার্য্যই এই দুই জন দ্বারা উদ্ধার হইবে।"

মাতঙ্গিনী। ইহারা ব্রহ্মহত্যা করিতে পারেন।

যুবা সন্ন্যাসী একজন। স্বচ্ছন্দে পারি, যদি আবশ্যক বোধ হয়।

মাতঙ্গিনী। তবে আইস।

প্রথম সন্ন্যাসী। একটু দাঁড়াও। আমি বলিয়াছি, 'যদি আবশ্যক বোধ হয়,' এক্ষণে ব্রহ্মহত্যার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেও, তার পর যাইব।

মাতঙ্গিনী। আমি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখনও বলি নাই। রামদাস-সন্ন্যাসী এই মহান্ত মহাশয়কে বঞ্চনা করিয়া একটী চাবি চুরি করিয়াছে। সেই চাবিটী রামদাসের নিকট হইতে, বলে হউক কৌশলে হউক, উদ্ধার করিতে হইবে। সহজে রামদাস তাহা দিবে না। এইজন্য হঠাৎ তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দৃঢ় বন্ধন করিতে হইবে। এখন বলের আবশ্যক—এই পর্য্যন্ত।

প্রথম সন্ন্যাসী। একটা চাবির জন্য এত ধূম ধাম কেন? কামার ডাকাইয়া এক সময় গড়াইয়া লইলেই তো হয়।

মতঙ্গিনী। সে চাবি এখানকার কোন কর্ম্মকার গড়িতে পারিবে না; যদিই পারে, তথাপি গড়িবার বিলম্ব সহিবে না; এই দণ্ডে সে চাবি না পাইলে একজন মহাপুরুষের প্রাণত্যাগ হইবে। রামদাসকে আমি ঘরে বন্ধ করে আসিয়াছি, এই তার ঘরের চাবি নাও। তথায় গিয়াই হঠাৎ তাকে বাঁধিতে হইবে, স্মরণ থাকে যেন, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে গেলে সকল বিফল হইবে। দড়ি সংগ্রহ করিয়া চল।

রামদাস সন্ধ্যা-আহ্নিকের পর আহারের

উদ্যোগ করিতেছিল, এমত সময় যুবা সন্ন্যাসিদ্বয় হঠাৎ চাবি খুলিয়া গৃহ-প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিল। তাহা বুঝিয়া রামদাস যেগে যেমন বাহিরে আসিবে, তথায় মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া ছিল, তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার কেশগুচ্ছ ধরিল। যুবা সন্ন্যাসীরা আসিয়া রামদাসকে বন্ধন করিল।

রামদাস। তোমরা অনুগত ও আত্মীয় হইয়া কাহার কথায় আমায় বাঁধিলে?

সন্ন্যাসিদ্বয়। এই স্ত্রীলোকটীর কথায়।

রামদাস। কে এই স্ত্রীলোক যে তাহার কথায় আমাকে বন্ধন কর? আমি রামদাস, মহারাজের মহাপ্রিয়, আমায় বন্ধন?

মাতঙ্গিনী। তোমায় আপাততঃ বন্ধন করা গেল। পরে প্রয়োজন হইলে হত্যা পর্য্যন্ত করা যাইবে। এখন অন্য কথা যাক। চাবিটী কোথায়?

রামদাস। কোন চাবি?

মাতঙ্গিনী। তুমি বিলক্ষণ জান, আমি কোন চাবির কথা বলিতেছি। বাক্‌চাতুরীর আর সময় নাই।

তার পর যুবা সন্ন্যাসীদের প্রতি চাহিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "রামদাসকে নদীকূলে লইয়া চল, গড়ীর খোলের উপর যে স্থানে সব বৃক্ষ উচ্চ হইয়া রহিয়াছে, ঐ স্থানে গিয়া উহাকে রাখ। ঐ স্থান হইতে উহাকে নিক্ষেপ করিলে একেবারে অগাধ জলে পড়িবে।"

রামদাস। ওহে স্ত্রীলোক! তুমি কাহাকে ভয় দেখাইতেছ? বুঝি তুমি আমায় জান না, তাই আমার সম্মুখে এ কথা বলিতে সাহস করিতেছ।

মাতঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না। যুবা সন্ন্যাসীরা রামদাসকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া রাখিল, তাহার পর মাতঙ্গিনীর আদেশমতে রামদাসের আপাদমস্তক একখণ্ড বাঁশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তাহার স্থানে স্থানে বহুভারের প্রস্তর ঝুলাইয়া দিল। রামদাস ভাবিল যে, এই সকল উদ্যোগ কেবল ভয়-প্রদর্শনের নিমিত্ত হইতেছে, অতএব নিজের নির্ভীকতা দেখাইবার নিমিত্ত উদাস ও নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিল। শেষ যখন মাতঙ্গিনীর অনুমতি অনুসারে সন্ন্যাসীরা অতি দীর্ঘ রজ্জু আনিয়া তাহার একাগ্র রামদাসের দেহবদ্ধ বাঁশে বাঁধিয়া অপরাগ্র জলসন্নিহিত এক বৃক্ষস্কন্ধের উপর দিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, তখন রামদাসের দেহ ক্রমে মৃত্তিকা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। শেষ শূন্যে গিয়া দুলিতে লাগিল; একবার নদীবক্ষে ছুটিয়া যায়, আবার কূলের দিকে ফিরিয়া আইসে। ভয়ে তখন রামদাস চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। রামদাস বলিতে লাগিল, "এখনই ছিঁড়িয়া যাবে, দড়ি বড় সরু, এ তামাসা ভাল লাগে না, শীঘ্র নামাও, আমি মেলাম, শীঘ্র নামাও। আমার শরীরের সকল গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আমার প্রাণ যায়, আমায় রক্ষা কর।"

মাতঙ্গিনী। চাবি কই? যতক্ষণ চাবি না পাওয়া যায়, অথবা যতক্ষণ তোমার প্রাণ বাহির না হয়, ততক্ষণ তোমায় এইরূপ দুলিতে হইবে।

রামদাস। আমায় শীঘ্র ভূমে নামাও। আমার মাথার ভিতর কি হইতেছে, বুঝি আমি অজ্ঞান হই।

সে কথায় মনোযোগ না করিয়া মাতঙ্গিনী যুবা সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা পাতরের ঘর ভাঙ্গিতে পার?"

যুবা সন্ন্যাসিগণ। পারি।

মাতঙ্গিনী। তবে মহান্তের নিকট যাও, তাঁকে বল গিয়া যে, যে ঘরের চাবি পাওয়া গেল না, সে ঘরের দ্বার অবিলম্বে ভাঙ্গিতে হইবে। তোমরা যত সন্ন্যাসী বা অন্য যে কেহ আছ, সকলে একত্র গিয়া দ্বারের পার্শ্বের পাতর খুলিতে আরম্ভ কর। অণুমাত্র বিলম্ব করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তোমাদের মহান্তকে বলিও যে, যে পর্য্যন্ত মহারাজকে উদ্ধার না করা হয়, সে পর্য্যন্ত আমার নিকটে তিনি না আসেন, আসিলেই বিনা বাক্যে তাঁহাকে আমি এই নদীগর্ভে প্রক্ষেপ করিব।

মাতঙ্গিনীর মূর্ত্তি এবং চক্ষু দেখিয়া যুবা সন্ন্যাসীরা আর কোন উত্তর করিতে সাহস করিল না; সত্বর মহান্তের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্বে মাতঙ্গিনী দেখিল, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সন্ন্যাসিগণ সমভিব্যাহারে মহান্ত মন্দিরের দিকে ছুটিতেছেন। সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিল দেখিয়া মাতঙ্গিনী রামদাসের দিকে ফিরিল। রামদাস তখন অজ্ঞান হইয়াছে। মাতঙ্গিনী তাহাকে নামাইয়া ভূমে ফেলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং একদৃষ্টে মন্দিরের পথে চাহিয়া থাকিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের কাহাকেও সে পথে আসিতে না দেখিয়া মাতঙ্গিনী সেই দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল। রামদাস চেতনা প্রাপ্ত হইয়া এ

পর্য্যন্ত অনবরত নিজ কৃতজ্ঞতা ও নির্দ্দোষিতার কথা বলিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে মাতঙ্গিনী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া রামদাস বলিতে লাগিল, "একটু দাঁড়াইয়া যাও, মহারাজ আসিবার পূর্ব্বে আমার একটা গতি করিয়া যাও; হয় আমাকে এই নদীজলে ফেলিয়া যাও, আমি আত্মা সাগরে মিশিয়া যাই, নতুবা আমাকে খুলিয়া দেও, আমি পলাই।"

মাতঙ্গিনী। মহারাজ নিজে আসিয়াও তোমার পক্ষে এই দুই আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন আজ্ঞা দিবেন না।

রামদাস। তা সত্য। তবে কি জান, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎটা বড় কঠিন ব্যাপার। তুমি একটা যাহা হয় করিলে, আমায় আর সে দায়ে ঠেকিতে হইবে না।

মাতঙ্গিনী। তিনি কি এতদিন বাঁচিয়া আছেন যে, তুমি সে দায়ের ভয় করিতেছ?

রামদাস। তিনি ওরূপ ঘরে দশ দিন অনাহারে থাকিলেও তাঁহার কিছুই হয় না। আমার তাহা পুনঃ পুনঃ দেখা আছে। সমাধি যাঁহার অভ্যাস থাকে, অনাহারে তাঁহার কি করিতে পারে? তুমি সে কথার পরিচয় এখনই পাইবে। তদ্ব্যতীত সে ঘরে আমি প্রচুর সামগ্রী রাখিয়া আসিয়াছি।

মাতঙ্গিনী। চাবিটা কোথা রাখিয়া আসিয়াছ?

রামদাস। চাবি আমি এই নদীজলে ফেলিয়া দিয়াছি; কি জানি, পাছে দায়ে পড়িয়া দ্বার খুলিয়া দিতে হয়, এই আশঙ্কায় সতর্ক হইয়াছিলাম। এখন আমায় ছাড়িয়া দেও, আমি পলাই। তোমার মঙ্গল হবে।

এই সময় সন্ন্যাসীরা কোলাহল করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইল। তাহাদের সর্ব্বপশ্চাতে মহান্তের সহিত মহারাজ বহির্গত হইলেন। নদীকূলে যেখানে মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া আছে, সেই দিকে সকলে আসিতেছেন দেখিয়া, মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল, মহারাজের সহিত আর সাক্ষাতের অপেক্ষা করিল না। মহারাজও কতকদূর আসিয়া ফিরিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদিকে তোমরা কোথায় যাইতেছ?"

সন্ন্যাসীরা। যেখানে রামদাস রজ্জুবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছেন।

মহারাজ। রামদাসের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করা ভাল হয় না। কি জানি, ক্রোধান্ধ হইয়া যদি তোমরা কোন অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া ফেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যে দিবস মাতঙ্গিনী নদীকূলে দাঁড়াইয়া রামদাস সন্ন্যাসীকে পীড়ন করিতেছিল, সেই দিবস মধ্যাহ্নকালে একজন বৃদ্ধ ভিখারী ভিখারিণী সমভিব্যাহারে যাইট-পইঠা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেখানে পূর্ব্বে কেবল মাঠ ছিল, সেখানে এক্ষণে রাজা মহেশচন্দ্র গ্রাম বসাইয়াছেন এবং বিখ্যাত ঘাটের নাম হইতে সেই গ্রামের নাম যাইট-পইঠা রাখিয়াছেন। ভিখারী ধীরে ধীরে মাতঙ্গিনীর গৃহদ্বারে গিয়া দ্বারপালকে মাতঙ্গিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, মাতঙ্গিনী স্থানান্তরে গিয়াছে শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, নিষেধ করিতে দ্বারপালের সাহস হইল না। গৃহাভ্যন্তরে সকলই স্থির, গম্ভীর, শব্দহীন। দাসদাসীর ছুটাছুটি নাই, ডাকাডাকি নাই, কলহ নাই, তাহারা সকলেই এক এক স্থানে বিমর্ষ ভাবে বসিয়া ভাবিতেছে। গৃহমার্জ্জারও কি ভাবিতেছে, আর হাই তুলিয়া এক এক বার দাসদাসীর মুখের প্রতি চাহিতেছে। ভিখারীকে দেখিয়া একজন ভৃত্য উঠিল এবং গৃহে প্রবেশ করিতে চুপিচুপি নিষেধ করিল। ভিখারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাধবী কোন ঘরে? কেমন আছে?" ভৃত্য অবাক্ হইয়া ভিখারীর প্রশান্ত মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। একজন পরিচারিকা বৃদ্ধা ভিখারিণীকে জিজ্ঞসা করিল, "মা! তোমরা কে, কোথা হইতে আসিলে, তোমরা কি হর-পার্ব্বতী, আমাদের মাধবীকে বাঁচাইতে আসিয়াছ? মাধবীর পীড়া লোকে বলে শিবের অসাধ্য। শিব তো আসিয়াছেন, তবে একবার মাধবীকে দেখিবে চল। শুনেছি তার আর কেহ নাই, তাকে দেবতায় রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে? আহা! মাধবী অনাথিনী বলিয়া বুঝি এত শান্ত, সকলকেই এত আদর করে, সকলের সঙ্গে এত মিষ্ট কথা কহে।"

পরিচারিকার সঙ্গে মাধবীর শয়নঘরের নিকট দাঁড়াইয়া ভিখারী দেখিল, মাধবী শয়ন করিয়া আছে, দেহ অস্থি-চর্ম্ম অবশেষ হইয়াছে, নাসা সূক্ষ্ম ও উন্নত হইয়াছে। দৃষ্টি পূর্ব্বের মত আর নাই, কিঞ্চিৎ প্রখর হইয়াছে।

পরিচারিকা ভিখারীর ইঙ্গিতমত দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। শব্দ শুনিবামাত্র মাধবী উৎফুল্ললোচনে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, যাহাকে খুঁজিতেছিল, সে নহে দেখিয়া মাথা ফিরাইল। পরিচারিকা বলিল,

"মা! তোমার চিকিৎসার জন্য দুই জন বুড়া-বুড়ী আসিয়াছেন, দেখিতে আসিবেন কি?" মাধবী উত্তর করিলেন, "আসিতে বল।"

তৎক্ষণাৎ ভিখারী ও ভিখারিণী উভয়ে মাধবীর উভয়পার্শ্বে আসিয়া বসিল। মাধবী মাথা ফিরাইয়া একবার ভিখারিণীকে, একবার ভিখারীকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

ভিখারিণী। বাছা! তোমার কি পীড়া?

মাধবী। কিছুই জানি না, সকলের মুখ ভাব দেখে বুঝেছি, আমি আর বাঁচিব না।

ভিখারিণী। তোমার আর কে আছেন?

মাধবী। কেহ না। কথা কহিতে আমার কষ্ট হয়।

ভিখারিণী। পূর্ব্বে কে ছিলেন, তাহা কিছু শুন নাই?

মাধবী। আমি না কি রাজকন্যা, শ্মশানে পড়িয়াছিলাম, এক মহাপুরুষের দ্বারা রক্ষিত হই।

"মাতঙ্গিনী কোথায়" বলিয়া ভিখারী হস্তপ্রসারণ করিয়া মাধবীর নাড়ী দেখিতে লাগিল। নাড়ী বড় দুর্ব্বল, কিন্তু তাহার গতির কোন দোষ নাই। এই সময় বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধবীর দুর্ব্বল-নাড়ী হঠাৎ অতি চঞ্চলা হইয়া উঠিল। একবার মাধবীর মুখপ্রতি, একবার বিনোদের প্রতি চাহিল, কোন কথাই বলিল না। এই সময় বিনোদবাবু বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

ভিখারী। আমি ভিখারী, কিছু ঔষধ জানি, রোগও কতক চিনি, তাই আসিয়াছি।

বিনোদ। আপনাকে এখানে কে ডাকিয়া আনিয়াছে?

ভিখারী। আমি আপনি আসিয়াছি। একটা দোয়াত-কলম, আর কাগজ আন, তোমার শস্তু-খুড়াকে একখান পত্র লিখিয়া যাই। পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিবে, তিনি আসিবামাত্র তাঁহাকে দিবে, কদাচ বিলম্ব না হয়।

কাগজ-কলম আনীত হইল। ভিখারী পত্র লিখিলেন। বিনোদের হাতে পত্র দিবার সময় আবার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, শস্তু আসিবামাত্র তাঁহাকে পত্র দিবে। পত্রে যে ঔষধ লিখিত থাকিল, তাহা এপীড়ায় অব্যর্থ। মাধবী রক্ষা পাবেন।

বিনোদ। নিশ্চয় রক্ষা পাবেন?

ভিখারী। নিশ্চয়ই অর্থাৎ এ সংসারের ঘটনা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে সাহস হয় না, তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, মাধবী রক্ষা পাইবেন। রক্ষা পাইলে মাধবীকে বিবাহ করিও। মাধবি! তোমাকেও বলিয়া যাই, তুমি লজ্জার অনুরোধে বিবাহে অসম্মত হইও না।

এই বলিয়া ভিখারী উঠিল। ভিখারিণী উঠিবার সময় মাধবীর কর্ণে বলিল, "মাতঙ্গিনীকে চুপি-চুপি বলিও, পিতম-পাগল আসিয়াছিলেন।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞানতঃ মাধবীর অন্তর বিনোদের পক্ষপাতী হইয়াছিল। বহুপূর্ব্বে যখন বিনোদের সহিত মাধবীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন বিনোদের যাতনা দেখিয়া মাধবী মনে মনে বলিয়াছিলেন, "আহা!" তাহার পর যতবার বিনোদের কথা মনে আলোচনা করিয়াছিলেন, ততবার শেষে বলিয়াছেন, "আহা!" দয়ার অন্তঃকরণের কথা, "আহা!" মাধবী তখন বুঝেন নাই যে, অন্তঃকরণ তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিতেছে, দয়ার পশ্চাতে ভালবাসাকে লুকাইয়া 'আহা!' বলাইতেছে। ক্রমে ভালবাসাকে অগ্রসর করিয়া দিল, ভালবাসার নাম প্রেম। মাধবী যখন তাহাকে চিনিলেন, তখন নবোঢ়ার ন্যায় লজ্জায় আপনা-আপনি যন্ত্রণা পাইলেন। ভালবাসাকে দমন করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে দমিত হইল না। নিরুপায় হইয়া মাধবী তাহাকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রণয় গোপন থাকিল সত্য, কিন্তু গোপনে বাড়িতে লাগিল, শেষ যখন যাইট-পাঁইটার ঘাটে স্বয়ং বিনোদ বলিলেন, "আমি মাধবীকে আন্তরিক ভালবাসি," তখন মাধবীর হৃদয়ে প্রলয় উপস্থিত হইল। সেই দিবস রাত্রে মাতঙ্গিনী বিবাহের কথা উপস্থিত করিলে আহ্লাদে মাধবীর অন্তঃকরণ উছলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জা হইল, শেষ মনে হইল, "স্ত্রীর এত বয়সে বিবাহ হইলে স্বামী সুখী হয় না, এক সময়ে না এক সময়ে স্ত্রীকে অপবিত্র ভাবিতে পারে। আমার অদৃষ্টে যদি তাই ঘটে!" এই আশঙ্কায় মাধবী মাতঙ্গিনীকে বলিয়াছিলেন, "বিবাহের কথা আর মুখে আনিও না।" এক দিকে এই আশঙ্কা, অপর দিকে বিবাহের জন্য ব্যগ্রতা। তুমুল বিরোধ। বিরোধই পীড়ার হেতু। সুতরাং চিকিৎসকেরা এ পীড়ার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

পিতম পত্রে যাহাই লিখুন, যখন তিনি কথায় বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন, তখন মাধবীর হৃদয়ে ঝড়

উঠিল নাড়ী ছিন্নাভিন্ন হইতে লাগিল, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণ নিবিতে চলিল। তাঁহার অবস্থা তখন কেহ দেখিল না। সকলেই ভিখারীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছিল, কেবল বিনোদ কতকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি মাধবীর কক্ষে আসিয়া দেখিলেন যে, মাধবী অস্পষ্টস্বরে কি বলিতেছে। স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য বিনোদ পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন, মাধবী তাহা শুনিলেন না, বা বুঝিলেন না। তখন বিনোদ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "মাধবি! মাধবি!" মাধবী উত্তর দিলেন না, ফিরিয়াও চাহিলেন না। তখন বিনোদ ভূমে জানু পাতিয়া মাধবীর শয্যায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মাধবীর কথা থামিল। বিনোদ মাথা তুলিয়া দেখেন, মাধবী নিদ্রা যাইতেছেন। বিনোদ তখন উঠিয়া পালঙ্কে বসিলেন, ধীরে ধীরে মাধবীর দক্ষিণ হস্তখানি আপনার হস্তমধ্যে যত্নে তুলিয়া লইয়া অতি ব্যগ্রদৃষ্টিতে মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিলেন। ক্রমে মাধবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, আর পূর্ব্বমত তাঁহার চক্ষের প্রখরতা নাই। প্রেমপূর্ণ নয়নে তিনি বিনোদের প্রতি চাহিলেন, একটু লজ্জা-মাখা হাসি মৃদু মৃদু হাসিলেন এবং ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতক্ষণ এখানে একা বসিয়া কষ্ট পাইতেছেন?" বিনোদ উত্তর দিলেন, "আমার কষ্ট নহে, তুমি যে কথা কহিলে, এই আমার সুখ। এখন তুমি বল যে, আমাদের বিবাহ হবে, আমায় তুমি ত্যাগ করিবে না।" মাধবী মাথায় অঞ্চল দিবেন বলিয়া বিনোদের হস্ত হইতে হস্ত টানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিনোদ হস্ত ছাড়িলেন না। মাধবী "ছি!" বলিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় হঠাৎ মাতঙ্গিনী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বিনোদ বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের বিবাহ হবে স্থির হইয়া গেল।"

"নিশ্চয়?" মাতঙ্গিনী এই কথা উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া একবার বিনোদের মুখপ্রতি চাহিতে লাগিল, আর তাহার হর্ষোৎফুল্ল লোচন হইতে অশ্রু-ধারা পড়িতে লাগিল। মাধবী হাসিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা।"

মাতঙ্গিনী। মিথ্যা হোক সত্য হোক, শম্ভুকে বলি গিয়া, তিনি আসিয়াছেন।

শম্ভু নাম শুনিবামাত্র বিনোদ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল মাধবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল, রাত্রি অধিক হইয়াছিল, তথাপি মাধবী সে অনুরোধ শুনিলেন না, নিদ্রা-উত্থিত পক্ষিণীর ন্যায় কতই গল্প করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মাধবী আরোগ্য লাভ করিলেন। তাঁহার বিবাহের দিনস্থির হইল। নানা উদ্‌যোগ-ঘটা পড়িয়া গেল। বিবাহ রাজধানীতে হইবে, এই কথা চারিদিকে প্রচার হইল। রাজা মহেশচন্দ্র যজ্ঞ করিয়া মাধবীকে পুত্রিকা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর মাধবী ও বিনোদের বিবাহ হইয়া গেল। কয়েক বৎসরমধ্যে তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি হইল। সন্তানেরা রাজধানী হইতে মধ্যে মধ্যে ঘাইট-পইঠায় আসিয়া রাজা মহেশচন্দ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া যাইত। রাজা রাজধানী ছাড়িয়া ঘাইট-পইঠায় বাস করিতেন। মাতঙ্গিনী রাজধানীতে মাধবীর গৃহে কর্ত্রীস্বরূপ থাকিতেন। তিনি গৃহকার্য্য ও বিষয়কার্য্য, সকলই দেখিতেন। কর্ম্মচারীরা সকলে মাতঙ্গিনীকে ভয় করিত, মাধবীকে সকলে ভালবাসিত।

সম্পূর্ণ।

জাল প্রতাপচাঁদ।

(বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত)

সঞ্জীবচন্দ্র-চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংরেজের কীর্ত্তিকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিস বলিয়া আমরা এখন গ্রহণ করিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখনও হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাসোপযোগী উপকরণের অভাব না হয়, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটী কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাই-তেছে। সেই জন্য আপাততঃ জালরাজাকে উপলক্ষ করা গিয়াছে।

যাহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার অনেক অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জাল প্রতাপচাঁদ।

বর্দ্ধমানরাজের গল্প।

১ পূর্ব্বকথা।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল, হুগলীতে জাল রাজার মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে প্রতাপচাঁদ নাই, সে পরাণ বাবু নাই, সে জজ নাই, সে মেজেষ্টর নাই, সে মহিবুল্লা দারগা নাই, সে আসাদ আলি নাজির নাই, সে মনসারাম সেরেস্তাদার নাই, সুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও কষ্ট হইবার সম্ভবনা নাই। দুই একজন সাক্ষী অদ্যাপি জীবিত থাকিলে থাকিতে পারেন, ভরসা করি, তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের এই বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জাল রাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজ-পত্র সেই সময় প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, লেখক নিজে সেই সময়ে হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প, কিন্তু এই মোকর্দ্দমা লইয়া ঘরে ঘরে যেরূপ গুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে।

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকমাত্রেই জাল রাজার পক্ষপাতিনী হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা ভুলিয়া কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কহিত। ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাইত, প্রতাপচাঁদের জয় হউক" বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত। ভিক্ষুকদের গীত বালকেরা শিখিয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইত। "পরাণ বাবু, হয়ে, কাবু, হাবু-ডুবু খেতেছে" এই গীত যখন তখন যেখানে সেখানে শুনা যাইত।

মূল কথা; এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। মোকর্দ্দমার সময় হুগলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ দুই তিন ক্রোশের ন্যূন্যন দশ হাজার লোক নিত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। জেলখানার দ্বার হইতে কাছারী পর্য্যন্ত পথে ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইত। যাহারা পথে স্থান পাইত না, তাহারা গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। যে দিকে চাও, সেই দিকেই লোক—লোকের উপর লোক—পথে, গাছে, ছাদে। এত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মধ্য দিয়া জাল রাজাকে পদব্রজে কাছারীতে পাঠাইতে জেলদারগার সাহস হইত না; সুতরাং পাল্কী করিয়া শত সিপাহী দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া পাঠান হইত। তাহাতে কেহ জাল রাজাকে দেখিতে পাইত না, পাল্কীর ছাদ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। লোকে তাহাতেই তৃপ্ত হইত; নিঃশব্দে অতি গম্ভীরভাবে তাহারা তাহাই দেখিত, আর এক এক দিন একবাক্যে আকাশ পূরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত —"জয় হউক"। দশ সহস্র কণ্ঠধ্বনি একত্রে—সে গম্ভীর শব্দে যেন দশদিক শিহরিয়া উঠিত। বাঙ্গালী তখনও সজীব, তখনও দশ হাজার লোক একজনের নিমিত্ত একত্র চীৎকার করিতে পারিত। পেনাল্ কোডের ভয়ে হউক, অথবা অন্য কারণে হউক, এখন দশজন লোকের কণ্ঠ একত্র স্ফূর্ত্তি পায় না। মানুষের নিমিত্ত একত্র চীৎকার আর শুনা যায় না, যাহা এখন শুনা যায়, তাহা শব বাহকের চীৎকার—পথ হইতে লোক তাড়াইবার চীৎ-

কার এখন সে সকল কথা অনর্থক। যাহারা জাল রাজাকে দেখিবে বলিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহারা জাল রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদালতে গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইত; কে কে সাক্ষ্য দেয়, কে কি বলে, শুনিয়া যাইত। যে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপ-চাঁদের পক্ষে কথা বলিত, সে দিবস আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; সে দিন গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকা ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার ঝুঁকিত। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের সিন্নি হইত। আর যে দিবস সাক্ষীরা বিপক্ষতা করিত,সে দিবস লোকে এক প্রকার ক্ষিপ্ত-প্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিত। একদিন একজন "মেচুনি" কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর শিরে আঁইশ-চুবড়ি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের পূর্ব্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব-রটনা অনুরোধেই হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই জাল রাজার পক্ষ হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, তিনি কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহা-পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন —মরেন নাই। প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করিলে যদি অজ্ঞাতবাস সিদ্ধ না হয়, তাই তিনি কাল্‌নার ঘাটে শব সাজিয়াছিলেন। এ রটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। বিশ্বাসের তাৎপর্য্যও ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবার রাজপুত্র, ঐশ্বর্য্যাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলেন। এরূপ যাওয়াই বীরত্ব। এ বীরত্বের কথা শুনিয়া বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে কেমন একপ্রকার পবিত্র সুখের উদয় হইল। সে পবিত্র সুখ লোকে ত্যাগ করিতে পারিল না। সুতরাং সকলে এ রটনা বিশ্বাস করিল, প্রতাপচাঁদের উপর লোকের ভালবাসা বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। "আহা! ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আসুন," এ কামনা স্ত্রীলোকমাত্রেই করিল।

পনর বৎসর পরে একজন আসিয়া বলিল,"আমি প্রতাপচাঁদ।" তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তঃকরণ একেবারে উথলিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল, তাঁহার আসিবার কথাই ছিল। কিন্তু যখন লোকে শুনিল, প্রতাপচাঁদকে বৰ্দ্ধমান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, মেজেষ্টর তাঁহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন লোকের আর সহ্য হইল না; তাই এতটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল

পিতা মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেন না,পরে যাহা ঘটিয়াছে, অনেকটা সেই প্রকৃতির ফল। দুই একটী ঘটনা বলিলে তাঁহার প্রকৃতি সহজেই অনুভূত হইতে পারিবে।

২ — তেজচাঁদ বাহাদুর।

(বৰ্দ্ধমানের বুড়া রাজা)

প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন; তিনি যথা-সময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন। পিঞ্জরে কতকগুলি "লাল" নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত, মহারাজও হাসিমুখে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জরহস্তে অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয় যোড়করে নিবেদন করিল, "মহারাজ, হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।" তেজচাঁদ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "চুপ! হামরা লাল ঘবরাওয়েগা!" এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না. কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে, এইজন্য তাঁহার কষ্ট হইল। এই মনে করিয়া কর্ম্মচারী বড় রাগ করিলেন পাপিষ্ঠ মোক্তা-রকে সমস্ত টাকা উদ্গীরণ করাইব, নতুবা কর্ম্ম ত্যাগ করিব, এই সঙ্কল্প করিলেন। মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছু কাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটীতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দেউল দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রাজসরকার হইতে সিপাই ও হাওলদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজচাঁদ প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই; কিছুদিন পরে শুনিয়াছিলেন

মোক্তার ধৃত হইয়া রাজবাটীতে আনীত হইলে, তেজচাঁদ বাহাদুর মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ ?"

মোক্তার। না মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা বাটীতে লইয়া গিয়াছি।

তেজচন্দ্র। কেন লইয়া গেলে ?

মোক্তার। মহারাজের কার্য্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটীও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপদানের ফল পাইত না, যুবতীরা শিবপূজা করিতে পাইত না, এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর, একটী অতিথিশালা করিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাইতেছে।

তেজচন্দ্র। তুমি কি সমুদয় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ ?

মোক্তার। আজ্ঞা না মহারাজ ! আমাদের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল ; গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না। আমি মহারাজের টাকায় একটী বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিষ্কার ও সুস্বাদ হইয়াছে, তাহা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তেজচন্দ্র। পুষ্করিণীটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছ ?

মোক্তার। আজ্ঞা না। টাকায় কুলায় নাই।

তেজচন্দ্র। এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা হয় ?

মোক্তার। ন্যূন কল্পে আর দুই হাজার চাই।

তেজচন্দ্র। কিন্তু দেখ !—খবরদার !—দুই হাজার টাকার এক পয়সা বেশী না লাগে, তাহা হইলে আর আমি দিব না।

তাহার পর পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, "আমি ত মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম ?" কর্ম্মচারী নিরুত্তর হইল।

মহারাজ তেজচন্দ্রের মধ্যবয়সের একটা কথা বলি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের আর একদিক স্পষ্ট হইবে। তিনি একদিন দরিদ্র একটী বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরম সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল, "পিতার নাম কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়।" মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে অর্থলাভ দেখাইয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিলেন। তিনিই মহারাণী কমলকুমারী।

সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ট ফিরিল, পুত্র লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন পুত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ,—ইনিই আমাদের এই গল্পের পরাণ বাবু।

যেরূপ এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠী বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন না, পূর্ব্বরাজারা সেরূপ "এক ঘরের" মত থাকিতেন না ; আপনাদের বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এদেশীয় প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখিতেন তেজচাঁদ বাহাদুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন, এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, অনেকের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইতেন ; সালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া "প্রমারা" খেলিতেন। একদিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে "মাছ" জুটিল, তখন রাধামোহন বাবুর হাতে "কাতুর" ছিল ; দুই প্রধান "দান", সুতরাং দুইজনেই "ডাকাডাকি" চলিল ক্রমে দেড় লক্ষ পর্য্যন্ত "ডাক" রাধামোহন বাবু দেড় লক্ষ টাকা সহিলেন। শেষ মহারাজ "মাছ" দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড় লক্ষ টাকার নোট লইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলার অতিশয় চলন ছিল। সকলেই প্রমারা খেলিত ; পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল ; বালকেরা পর্য্যন্ত খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রে নারিকেল-জল খাওয়া যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, সেইরূপ ঐ রাত্রে—কোথাও বা শ্যামাপূজার রাত্রে,—প্রমারা খেলাও অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এমন কি, কলিকাতার সুবর্ণবণিকদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রথা আছে যে, দেওয়ালি পর্ব্ব উপলক্ষে প্রমারা খেলিবার টাকা তাঁহারা জামাতাদের পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কেহ আর প্রমারা খেলে না, তথাপি প্রমারা খেলার টাকা তাঁহারা অদ্যাপি দিয়া থাকেন। রাসযাত্রায় বা কোন যাত্রার পূর্ব্বে যেখানে লোক-সমারোহ হইত, সেইখানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় বড় বাটী ভাড়া করিয়া আড্ডাধারীরা পরিষ্কার দোসুতি বিছাইয়া তাহার উপর প্রমারার নূতন তাস

সাজাইয়া বসিত। ক্রমে ক্রমে সেই আড্ডায় খেলওয়াড় জমিতে আরম্ভ হইত, শেষ বাটীর উপর-তলায়, নীচ-তালায়, দালানে, বারাণ্ডায়, উঠানে—কোথাও আর স্থান থাকিত না, সর্ব্বত্র প্রমারা চলিত সে সময় দেখিতে চমৎকার। খেলওয়াড়েরা চক্ষু, নাসা উভয় কুঞ্চিত করিয়া একাগ্রচিত্তে তাস পিটিতেছেন, একেবারে খুলিয়া দেখিতে সাহস হয় না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেন, ভয় আছে, পাছে "ফিগরু" সরিয়া থাকে! পাছে বাজে রং সরিয়া থাকে! তাহা হইলেই সর্ব্বস্ব যাবে। আবার যদি যাহা ধরিয়াছি, তাহাই আসিয়া থাকে, যদি তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশা। এই আশা,—এই ভয়। আবার এই ভয়, এই আশা। অল্প সময়ের এক মুখের চাঞ্চল্য সে সময়ের এক দণ্ডে উপস্থিত হয়। প্রমারা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু খেলাটী Dramatic। যে খেলা এ সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছি, সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা। তবে প্রভেদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দশ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে মন্দগতিতে, কখন আইসে, কখন আইসে না; সেই আশা, সেই বেগ, সেই চাঞ্চল্য, এক দিনে, এক দণ্ডে, এক মুহূর্ত্তে, দুর্দ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই এ খেলার সুখ! আবার তাহার উপর অদৃষ্টের কুহক। প্রমারার অদৃষ্টের নাম "পড়্তা।" এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিলে "ধূলামুটা ধরিলে সোণামুটা হয়"; প্রমারার পড়্তা লাগিলে যে কাগজ ধর, সেই কাগজেই তুমি জিতিবে। এক রঙ্গা ফিগ্রু পর, তুমি ফুরুস মারিবে; ফুরুস পাচার কর, ন্যনকল্পে তোমার কোরেস্তা দান জুটিবে। পড়্তা সম্বন্ধে স্পেনসার (Spencer) বলেন, যে তাস যেরূপ ভাল মন্দ পরম্পরাক্রমে সাজান থাকে, সেইরূপ একজন ভাল একজন মন্দ পায়। মিথ্যাকথা! তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া কাগজ সাজাইয়া দেও, ভাঁজিয়া দেও, পড়্তা ঠিক থাকিবে; যে তাস লইয়া খেলিতেছিলে, সে তাস ফেলিয়া অন্য তাস দেও, পড়্তা সেইরূপ থাকিবে।

আমি প্রমারা খেলার পক্ষপাতী বলিয়া এই খেলার পরিচয় দিতে বা প্রশংসা করিতে বসিয়াছি, এমত নহে। তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়া উঠে, তাহাই বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম প্রমারাখেলার উন্মাদ করে, দিন-রাত্রি কখন্ আসে কখন্ যায়, তাহা খেলওয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রমারা খেলা নাই, তাই এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদে যে অভাব পূর্ণ হয়, সেকালে প্রমারায় সেই অভাব পূর্ণ হইত। এ উভয়ের মধ্যে কোনটী ভাল, আমি বলিব না। মোট কথা, পূর্ব্বে রাজাধিরাজ হইতে জেলেমালা পর্য্যন্ত প্রমারা খেলিত, আর কবি শুনিত।

কবির কথা এখন আর তুলিব না। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, কবি সে সময়ের Esthetic culture প্রধান সহায় ছিল। তদ্দ্বারা তখনকার লোক কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিত্ব লইয়া মাতিয়াছিল। সেরূপ জিনিস এখন কিছুই নাই। একালের পুঁজি কেবল নাটক! তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়; তাহা যে কিছুই নহে, এ কথা কেহ এখন বুঝিবে না, কাহারও বুঝাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপযোগী। মূল কথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উত্তর-প্রত্যুত্তর নহে, উপন্যাস নহে। যাহা লইয়া নাটক, তাহা বাঙ্গালীর অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজ্জা কার্য্যকারিতা, সে কার্য্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, তাহা জাতিগত ও সমাজগত। সে কার্য্যকারিতাশক্তি আমাদের কই? স্পেন দেশ যখন কার্য্যকারিতায় অতুল, তখন তথায় সরবাণ্টিস নাটক লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতাশক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, তখন ইংরেজি ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয়দেশের এই শক্তি কমিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নাটকপ্রসবিনী শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে এখন যে সকল নাটক তথায় লিখিত হয়, তাহা প্রায়ই বাঙ্গালা নাটকের মত কেবল বকাবকি আর চাকাইাকি।

সে সকল কথা এখন যাক্। তেজচাঁদ বাহাদুরের কথা হইতেছিল, তিনি শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটী করিয়া ক্রমে সাতটী বিবাহ করেন। শেষ বিবাহটী অতি বৃদ্ধবয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বিষয়কার্য্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধ রাজা অপটু বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

৩। কুমার বাহাদুর।

কুমার প্রতাপচাঁদের বালককালের কথা সবিশেষ ড় প্রকাশ নাই, তবে এই মাত্র শুনা যায় যে, তিনি ড় দুরন্ত ছিলেন। ঘুড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার শেষ বলবৎ ছিল; একবার ঘুড়ির লক পড়িয়া াহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। একবার কটা ঘোড়া তাঁহার পীঠে কামড়াইয়া মাংস লিয়া লইয়াছিল। সে চিহ্ন তাঁহার যাবজ্জীবন হল। গোলোকচাঁদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি াহাকে ইংরেজি পড়াইতেন। এদেশে রাজ মারদের যেরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে, প্রতাপচাঁদের াহাই হইয়াছিল।

অল্প বয়সেই তাঁহার গর্ভধারিণী নানকী রাণীর াল হয়, সেই অবধি তাঁহার পিতামহী বিষণকুমারী াহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিষণকুমারীর াদরে প্রতাপচাঁদের কোন শিক্ষা হইতে পারে নাই।

প্রতাপচাঁদ কোন অকার্য্য করিলে, রাণী বিষণ-মারীর ভয়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা কহিতে রিত না। অন্যের কথা দূরে থাকু, স্বয়ং রাজা চন্দ কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। সুতরাং ার বাহাদুর আলালের ঘরের দুলাল হইয়া দাঁড়াই-ন, কাহাকেও ভয় করিতেন না, কাহাকেও গ্রাহ্য তেন না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। এই অর্থাৎ এই দুর্দ্দম ইচ্ছা, তাঁহার কালস্বরূপ াছিল। ইচ্ছা দমন করিতে তিনি শিখেন নাই।

তাঁহার বিমাতা কমলকুমারী তাঁহার প্রতি বড় ছিলেন না। বিমাতা সর্ব্বত্র কুমাতা, বিশেষ বাটীতে। একা বিমাতা নহে, বিমাতার সহো-পরাণবাবু প্রতাপচাঁদকে একেবারে দেখিতে তেন না। প্রতাপ তাহা জানিতেন এবং তাহার শোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে একদিন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।

সর্ব্বদাই প্রতাপচাঁদ আমোদ-আহ্লাদে কাটাই-ন। তিনি হাসিতে বড়পটু ছিলেন; হাসিতে গেলে াহার গালে টোল পড়িত। সর্ব্বদাই তাঁহার ঘর্ম্ম ত, পৌষমাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন। এই ভাব তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।

৪। ছোট রাজা।

কুমার বাহাদুরের বয়ঃক্রম হইলে, লোকে তাঁহাকে ছোট রাজা বলিত। তিনি বাল্যকালে দুরন্ত ছিলেন, যৌবনকালে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাহস ও শক্তি অসাধারণ ছিল। সেই সঙ্গে আপনাকে রাজা বলিয়া তাঁহার মনে একটা দাম্ভি-কতা সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত।

মোগলেরা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ বলিয়া প্রতাপচাঁদ তাহাদিগকে ভালবাসিতেন, কয়েকজনকে তাঁহার বডিগার্ডস্বরূপ রাজবাটীতে রাখিয়াছিলেন, সেই কয়েকজনের জমাদ্দার—আগা আব্বাছ আলি,—সর্ব্বদা ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত; সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তিনি অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেন। অপঘাত মৃত্যু যে কখন হইতে পারে, এ কথা তাঁহার বুদ্ধির অতীত ছিল।

তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ, একহারা অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন; কুস্তি করা তখনকার প্রথাই ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লবিদ্যা না জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ানদিগের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশ হইতে "কুস্তিগীর পালওয়ান" আসিয়া বল ও কৌশল দেখাইত। তদুপলক্ষে বিস্তর ধনবান একত্র হইতেন। তাঁহারা পালওয়ানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজগণ কুস্তিগীরকে কোলে লেন, ইংরেজ ডাকিয়া তাহাদের তসবির লন, এবং আপনারা স্বয়ং কুস্তি করিয়া সাধারণ সমক্ষে বলবন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভরত নামে একজন প্রসিদ্ধ পালওয়ান এ অঞ্চলে ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালীর মধ্যে মনোহর চক্র-বর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, তাঁহার বলমাংস এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিম্নভাগে রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগে পা তুলিয়া কেবল দুই হস্ত দ্বারা অনায়াসে নারিকেল-গাছে উঠিতেন।

যাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইংরেজ-প্রাদুর্ভাবে ইদানীং বাঙ্গালায় কুস্তি (Gymnastic) আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের ভুল। ইংরেজি শিক্ষায় ও শাসনে বরং আমাদের কুস্তি উঠিয়া গিয়াছে। প্রাতে বালকেরা

স্কুলের পাঠাভ্যাস করে, কুস্তির অবকাশ থাকে না; ইতরলোকেরা কুস্তি করিলে তাহাদের প্রতি পুলিসের দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং কুস্তি করা রহিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইতরলোকদিগের কোন কার্য্যের ভার দিলে, তাহারা তাল ঠুকিয়া সম্মতি জানাইত। এখন আর সে তাল ঠোকা নাই, কারণ, সাধারণ লোকের মধ্যে আর সে কুস্তি নাই, সে বল নাই। অনেকের বিশ্বাস, আমরা চিরকালই এইরূপ দুর্ব্বল। যাঁহারা ইংরেজি গ্রন্থ পড়িয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস শিখিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা আকবর প্রভৃতির রুবকারী ইত্যাদি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মুসলমান আমলে বিস্তর বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। বাঙ্গালার ফৌজ বাঙ্গালীরাই হইত, নবাবের পক্ষের যুদ্ধ বাঙ্গালীরাই করিত। পঞ্চহাজারি, দশহাজারি যে সকল সেনাপতি ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন প্রজা লইয়া যুদ্ধে যাইতেন, সে প্রজা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহই নহে। সে দিন পলাসীর যুদ্ধে বাঙ্গালী জেনেরেল আর বাঙ্গালী সেনা যুদ্ধ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনা ও ইংরেজ জেনেরেলের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা একজন ইংরেজ সাহস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যদি সে দিন মিরজাফর ইংরেজদের স্বপক্ষ হইয়া হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিত না করাইতেন, তাহা হইলে বাহাদুরির স্রোত আজ আর একদিকে বহিত।

এখন বাঙ্গালীর আর বলবীর্য্য নাই সত্য, কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর দোষে নহে, রাজশাসনের দোষে। সে সকল কথা এখন অনর্থক।

প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে বড় পরিপক্ক ছিলেন। লোকে বলে, তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ ছিলেন। গল্প আছে, তিনি না কি কোন একজন ইংরেজকে বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সার্বেণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ধোপা-নাপিতের ছেলেরাই সিবিল সার্বেণ্ট হইয়া এদেশে আসে, এবং সেইজন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টর সাহেব সেই সময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি এইরূপ একটা সামান্য ত্রুটি করিয়াছিলেন, প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা "বেয়াদবি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টরকে নামাইয়া আপাগোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে, তাঁহার নামে সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেণ্টদের উপর ছিল; তাহাদিগকেই তিনি "বেয়াদব" বলিতেন। অন্য ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, পলটনের একজন ডাক্তার স্কট সাহেবকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। আরও অন্যান্য ইংরেজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই আসিতেন, আমোদ-আহ্লাদ করিতেন আর মদ খাইতেন। প্রতাপচাঁদ তাঁহাদের সঙ্গে মদ ধরিলেন। মেদেরা মদ তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাসে প্রতাপচাঁদ তাঁহাদের সহিত অনর্গল ইংরেজিতে কথা কহিতেন। তিনি কখন ইংরেজি অধ্যয়ন করেন নাই বলিলেই হয়, তাঁহার শিক্ষক গোলোকচাঁদ ঘোষ নিজে ইংরেজি জানিতেন না। "থামস্ ডিগ" পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যা ছিল।

তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন। এ অঞ্চলে আসিলে একবার সালিখায় যাইতেন; একবার তেলিনীপাড়ার রামধন বাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। চুঁচড়ায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়া দিনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি অনেক অনেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। সিঙ্গুরের নবাব বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত আছে, নবাব বাবু দোল উপলক্ষে তাঁহার সহিত ফাগ খেলিবার জন্য প্রতি বৎসর বর্দ্ধমান যাইতেন, একবার এত ফাগ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন যে, পনর দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষ প্রত্যাগমনকালে বস্তা বস্তা ফাগ বাঁকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। সেই নবাব বাবুর স্ত্রী ইদানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন।

প্রতাপচাঁদ অল্প বয়সেই বিষয়কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকে বলে, পরাণবাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপচাঁদ সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট

দলে ... দানপত্র লিখাইয়া হইল। ... স্বসম্পর্কীয় ... করিবার জন্য ব্যস্ত নহে, তাঁহার ... পারিলেন না। কিছু নাই। বোধ হয়, ... লিলেন। তাঁহার এক থাকিবে। কালনায় ... ছিল। তিনি অনেক ... তথাকার রাজবাটী ... বৃদ্ধ রাজা তেজচাঁদকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারাণী বসন্তকুমারী বলিয়া পরিচিতা।

লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহে সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল। মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর পরাণ বাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন। লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি। প্রতাপচাঁদ ভাবিলেন, "পরাণ মামা দড়ি পাকাচ্ছেন।"

পরাণ বাবুর যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, অষ্টমগর্ভের পুত্র যদি বাঁচে, তবে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুনা যায়, এই কথায় প্রতাপচাঁদ বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, "অষ্টমগর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হইবে; যদি পরাণ ততদিন জীবিত থাকে, আমার গদিতে পরাণের পুত্র আসিবে; বরং তোমরা এ কথা লিখিয়া রাখ।" এ কথা ... হইয়া পড়িল, এবং পরাণ বাবুর ভবিষ্যৎ ...ভাগ্যপ্রণালীর বীজ সেই অবধি রোপিত হইল।

পরাণ বাবুর সহিত প্রতাপচাঁদের মনোকৌশল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া উঠিল। সে সকল পরিচয় এখন অপ্রয়োজন।

কথিত আছে, ১৮১৯ সালের ৮ আইন, যাহাকে সাধারণতঃ "পত্তনী" আইন বলে, তাহা প্রতাপচাঁদ নিজে উদ্ভাবন করেন। ... সন্দেহ আছে; ... হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় না যে, তিনি বিষয়রক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় চিন্তা করিবার ... পাইতেন। কিন্তু লোকে বলে যে, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। ... ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে নিয়মিত ... সূর্য্যাস্তের মধ্যে সরকারি রাজস্ব সমুদয় দিতে না পারিলে জমিদারী নীলাম হইয়া যায়। এই নিয়মচক্রে, বড় বড় জমিদারদিগের জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান রাজার জমিদারী ... তাহার খাজনা নিয়মিত মুহূর্ত্তমধ্যে দেওয়া ... ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপচাঁদ স্থির ... গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে ... করেন নাই, মধ্যবর্ত্তী জমিদারের স্কন্ধে তাহা ফেলিয়া খাজনা তহসিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী পত্তনীদার রাখিব। জমিদার নিয়মিত মুহূর্ত্তমধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারী নীলাম করিয়া লন, আমিও সেইমত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নীলাম করিয়া সেই নীলামের টাকা হইতে গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিব। এই বিষয় দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন দ্বারা পত্তনী নীলামের বিধি করিয়া দিলেন।

এই কৌশলে প্রতাপচাঁদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করিয়া লইলেন, এবং সেই সঙ্গে অন্য জমিদারের জমিদারী রক্ষা পাইল। নতুবা পূর্ব্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) ... চিরস্থায়ী বলা হই... চিরস্থায়ী ... জমিদারী ক্রমাগত ... হইতে না। এ অস্থায়িত্ব ... ডাইরেক্টারেরা অনেক ... লেখালেখি করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কিছুই করিতে পারেন নাই।

প্রতাপচাঁদের যতই প্রশংসা থাক, তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছিলেন। ... ইদানীং তাঁহাকে এই জন্য দেখিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্য কারণ ছিল। তাহা যাহাই হউক, শেষ অবস্থায় কিছু দিন তেজচাঁদ বাহাদুর পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা কুমার কৃষ্ণনাথকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় প্রতাপচাঁদের সহিত তাঁহার কতক সাদৃশ্য ... থাকিবেন। আমরা বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই জনের প্রকৃতি একই রূপ ছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় এইরূপ ব্যক্তি আরও দুই এক জন জন্মিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সময়োপযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না। চারিপার্শ্বস্থ আর সকল যেরূপ, সেইরূপ হইলেই মানুষ বল, পশু বল, যাহা বল, তাহাই টিকে, নতুবা লোপ পায়। এই নিয়ম যেখানে সমাজের

মূলের প্রকৃতি নীচ, সেখানে নীচব্যক্তিই টিকিবে, ইতরেরই উন্নতি হইবে; উচ্চ-প্রকৃতির লোক, সেখানে প্রধানত্ব পাওয়া দূরে থাকু, একেবারে লোপ পাইবে। যেখানে সমাজ পবিত্র, সেখানে পবিত্র লোকই টিকিবে। সেখানে নীচ ও শঠ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে এবং পরিশেষে লোপ পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন, "যথা ধর্ম্মস্তথা জয়ঃ।" কিন্তু বাস্তবিক এ কথা সকল সময়ে সত্য নহে। তাই বলিতে হইয়াছে, "কলিতে অধর্ম্মেরই জয়, যে প্রবঞ্চনা করে, যে শঠতা করে, তাহারই উন্নতি।" মূল কথা, অধিকাংশ লোক যেরূপ, ফলও সেইরূপ হয়। যেখানে কিয়দংশ লোক ধর্ম্মিষ্ঠ সেইখানেই ধর্ম্মের জয়, আর পাপের পরাজয়; যেখানে অধিকাংশ লোক পাপিষ্ঠ, সেইখানেই পাপের জয়, ধর্ম্মের পরাজয়। কৃষ্ণনাথ প্রতাপচাঁদ উভয়ে লোপ পাইয়াছিলেন। উভয়েই চক্ষুষ্পাঁর্শস্থ লোকের মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন; ভাল ছিলেন, কি মন্দ ছিলেন, তাহা বলিতেছি না।

৫। [illegible]চাঁদের মৃত্যু।

প্রতাপচাঁদ [illegible] পর্য্যন্ত এইরূপে আমোদ-আহ্লাদে [illegible]। তাহার পর, তাঁহার মানসিক অবস্থা হ[illegible] হইয়া গেল। যিনি হাসিলে ঘর ভরিয়া [illegible] তাঁহার সে হাসি আর বড় শুনা যাইত না। [illegible] অপরাহ্নে বারদ্বারীর ছাদে উঠিয়া তিনি নীলপু[illegible] দিকে দূরবীণ কসিতেন, তথাকার একটী গেট হইতে কখন একখানি বগি ছুটিয়া বাহির হয়, দেখিতেন। তিনি আর সে ছাদে যান না, দূরবীণ স্পর্শ করেন না। রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে বহুব্যয়ে এক অপূর্ব্ব স্নানাগার প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তাহা প্রস্তুত হইল, কর্ম্মচারী আসিয়া সে সংবাদ দিল, একবার তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাহেবদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন না। শ্যামচাঁদ বাবু নামে একজন পারিষদ ছিলেন, কেবল তাঁহারই সঙ্গে দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিতেন, আর চিনারি নামে একজন ইউরোপীয় চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, সে ব্যক্তি তখন প্রতাপচাঁদের একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে নিযুক্ত ছিল।

কিছুদিন পরে ছোট মহারাজকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কেহ তাঁহার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ রাজা বড় কাতর হইয়া পড়ি[illegible] তিনি পুত্রকে অনাদর করিয়া আসিয়াছেন [illegible] তাঁহার আরও বিশেষ কষ্ট হইল। মনে [illegible]। লোকে সেইজন্যই হয় ত তাঁহার প্রতাপচাঁদ [illegible]র্ণমেণ্ট হইতে করিয়া গিয়াছে। যে জন্য [illegible]বাহিল। হইয়াছেন, তাহা দুই একজ[illegible] সিভিল সারবেণ্টদের কেহ প্রকাশ করিতেন না। [illegible] তান "বেয়াদব" বলিতেন। [illegible]তাহার বিলক্ষণ [illegible] মুসলমান আমলা মহারাজ [illegible] গোপনে ছোট মহারাজের সন্ধান বলিয়া দিলেন। তেজশ্চাঁদ বাহাদুর সেই সন্ধান পাইয়া প্রতাপচাঁদকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনিলেন।

কিন্তু প্রতাপচাঁদ পূর্ব্বমত বিমর্ষ থাকিতেন, পিতা কত আদর করিতেন, কত বুঝাইতেন, কিছুতেই কর্ণপাত করিতেন না।

একদিন প্রাতে প্রতাপচাঁদ শয্যা হইতে উঠিয়া খানসামাদিগকে বলিলেন যে, "আজ নূতন মহলে স্নান করিব।" খানসামারা পয়ঃপ্রণালীতে জল পূরিয়া সমুদয় ফোয়ারা খুলিয়া দিল, বাটীর বাহির হইতে জলের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। প্রতাপচাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে, সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে।

সেই দিন অপরাহ্নে রাষ্ট্র হইল, প্রতাপচাঁদের পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসকেরা যাতায়াত করিতে [illegible] একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপচাঁদের [illegible]ছিল, তাহার নাম আসগর আলি। [illegible] তাহারই ব্যবস্থা চলিতে [illegible] সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার [illegible]। রাষ্ট্র যে, ডাক্তার সাহেব [illegible] করিতে [illegible]; কিন্তু, বাস্তবিক তাহা নহে। [illegible] প্রতাপচাঁদের কপোলদেশে দশ বারটী জোঁক বসাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ রাজা ও প্রতাপচাঁ[illegible] আপত্তি হওয়ায়, ডাক্তার সাহেব [illegible] যান। তখনকার ডাক্তারদের সং[illegible]মোক্ষণ সকল রোগে নিতান্ত আবশ্যক। [illegible] প্রধান সহায় ছিল, তাই ইংলণ্ডে ডাক্তারদে[illegible] (Leech) অর্থাৎ জোঁক।

সেই দিবস কি পরদিবস হইবে, প্রত[illegible] বলিলেন, "আমায় গঙ্গাযাত্রা কর।" পীড়া তখন সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না। পরে রাজবল্লভ কবিরাজ আসিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা

দেন। সুতরাং তাঁহাকে কাল্‌নায় লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজ স্বয়ং গেলেন। স্বসম্পর্কীয় অন্য কেহই গেলেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই বহে, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা কেহই যান নাই। বোধ হয়, তাঁহাদের যাইতে নিষেধ করা হইয়া থাকিবে। কাল্‌নায় পৌঁছিয়া প্রতাপচাঁদ কয়েক দিন তথাকার রাজবাটীতে থাকিলেন, কিন্তু ক্রমেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরে, একদিন রাত্রি দেড়প্রহরের সময় তাঁহাকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল, এবং কানাত দ্বারা ঘাট ঘেরিয়া তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হইল। সে সময় বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা সকলে কানাতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। রাত্রি বড় অন্ধকার, আট দশটা মাত্র মশাল সেখানে জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলোক ভাল হয় নাই। জলের ধারে একটা তাঁবু খাটান হইয়াছিল; পৌষ মাস, বড় শীত, আত্মীয়-স্বজনেরা তথায় বসিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর শবদাহ হয়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

মৃত্যুর দুই চারিদিন পরেই রাষ্ট্র হইল, প্রতাপচাঁদ পলাইয়াছেন। রাজা তেজচাঁদ তাহা শুনিলেন, কিন্তু হাঁ—না কিছুই বলিলেন না। যে কারণেই হউক, প্রতাপচাঁদের সমাজমন্দির কাল্‌নায় তখন প্রস্তুত হইল না। রাজবাটীর রীতি আছে, কেহ মরিলে একটা নূতন মন্দিরে তাঁহার ভস্ম রক্ষিত হয়। প্রতাপচাঁদের সমাজ-মন্দির, শুনা যায়, তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর জমিদারী লইয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত প্রতাপচাঁদের দুই রাণীর মোকর্দ্দমা বাধিয়া গেল। প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাণীরা বিষয়াধিকারিণী; এবং সেইজন্য তাঁহারা দাবি করিলেন; এবং তদনুসারে জজ-আদালতে তাঁহারা ডিক্রি পাইলেন। কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, শেষ তেজচাঁদের হাতেই বিষয় থাকে; রাণীরা মাসিক বৃত্তি পাইয়া নিরস্ত হন।

কিছুদিন গেলে, পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল; তেজচাঁদ পোষ্যপুত্র লইতে অসম্মত হইলেন। কেন অসম্মত, তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন না। আবার কিছুদিন পরে, পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল, আবার তিনি অস্বীকৃত হইলেন। এবার বলিলেন যে, আমার প্রতাপ আসিবে—সে অবশ্য আসিবে। তাঁহার আত্মীয়েরা বুঝাইলেন যে, তাঁহাকে পুত্রশোক হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অজ্ঞাতবাস কল্পনা করিয়াছে। এ সুখের ভ্রম নষ্ট করা উচিত নহে। কিন্তু যদি প্রতাপচাঁদ ফিরে না আসেন, বা তাঁহার আসিতে বিলম্ব হয়, আর ইহার মধ্যে যদি মহারাজের দেহনাশ হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় কোম্পানী বাহাদুর লইবেন। যাহাতে না লইতে পারেন, তাহার একটা উপায় করিয়া রাখা আবশ্যক।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, তেজচাঁদ বাহাদুর পোষ্যপুত্র লইতে সম্মত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, পরাণ বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—বেটী অষ্টম গর্ভের—সেইটী গৃহীত হইল। তাঁহার নাম কুঞ্জবিহারী কি নারায়ণবিহারী এমনি একটী ছিল—রাজপুত্র হইলে সে নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মহাতাপচাঁদ রাখা হইল।

। আলোক শা।

পঞ্চদশ বৎসর পরে, ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিল। তখন বর্দ্ধমান আর পূর্ব্বমত নাই, স্থানে স্থানে ইংরেজ-পছন্দ নতন রাস্তা হইয়াছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের বন গজাইতেছে। কৃষ্ণসায়রের পাড় ঝর্ ঝর্ করিতেছে, সেখানে আর জঙ্গল নাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মনোহর রাখা হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্ভাগ পূর্ব্বমত অপরিষ্কার রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অনেক নূতন মহল প্রস্তুত হইয়াছে। পায়রার পাল বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিড়িয়াখানা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গা, কুমুরী প্রভৃতি সাহেবদল সমুদয় মরিয়া গিয়াছে, এখন বিলাতী পক্ষীই অধিক।

সন্ন্যাসী রাজবাটীতে প্রবেশ করিল, চারিদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না, সন্ন্যাসী কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শেষ সন্ন্যাসী বারদ্বারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বারদ্বারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই একটী দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানের চুণকাম খসিয়া গিয়াছে. সন্ন্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল; কিন্তু রাজবাটীর জনকতক

লোক কি সন্দেহ করিয়া, সন্ন্যাসীকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

তাহার কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী গোলাপবাগে গিয়া উপস্থিত হইল ; ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গেটের নিকট বসিয়া থাকিল। সেই গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা পরামাণিক নামক একজন বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছোট মহারাজ।" সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিল, গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল এদিকে বিস্তর লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘেরিল। ছোট মহারাজ আসিয়াছেন,এ কথা সহরের সর্ব্বত্র বিদ্যুদ্‌-বেগে রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিল। ছোট মহারাজের রাণীরা,বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য একজন পুরাতন দাসীকে পাঠাইলেন। দাসী ফিরিয়া গিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "আর সে বর্ণ নাই, সে মূর্ত্তি নাই, কিন্তু গাল ভরা সে হাসি রহিয়াছে। আহা! ছিলেন মহারাজাধিরাজ, আজ কি না সন্ন্যাসী! একেই বলে—যে রাজ্যে রাজা ছিলেন, সেই রাজ্যে মেগে খেলেন।" রাণীরা চক্ষের জল মুছিলেন।

রাজবাটীর অনেক পুরাতন আমলা দেখিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন মুহুরী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গিয়া পরাণ বাবুর মধ্যম পুত্র তারাচাঁদকে বলিল, "বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই।"* তারাচাঁদ সে কথা পরাণ বাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ পরাণ বাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। তাহাদের উত্তেজনায় সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিয়া কাঞ্চননগরে গিয়া থাকিলেন ; তথায় তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। পরাণ বাবু আবার তথায় লাঠিয়াল পাঠাইলেন,এবার লাঠিয়ালেরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে সেই সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। তিনি সন্ন্যাসীকে মহারাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া হঠাৎ চিনিলেন,এবং বহুযত্ন করিয়া তাঁহাকে আপন বাটীতে রাখিলেন। দুই তিন মাস পরে রাজা ক্ষেত্রমোহন পরামর্শ দিলেন যে, সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান,মেজেষ্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা তাঁহাকে বলুন। মেজেষ্টর সাহেব অভয় দিলে পুলিসের সাহায্য লইয়া বর্দ্ধমানে যাইবেন, তখন পরাণ বাবুর লাঠিয়াল আর কিছুই করিতে পারিবে না। পরাণ বাবু বিষয় না দেন, তখন আদালত আছে।

এই পরামর্শ অনুসারে সন্ন্যাসী বাঁকুড়া যাত্রা করিলেন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন না, সঙ্গে কোন লোক লইলেন না।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম জেলার জঙ্গলি লোকেরা একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল যে, তাহাদের নিরস্ত করিবার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌজ পাঠাইতে হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে ; তথাপি ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন নামে একজন সাহেব পোলিটিকেল এজেণ্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাঁহার অধীন আর একজন আসিষ্টাণ্ট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন হানিংটন। তাঁহারা উভয়ে বড় সতর্ক, মানভূমে বসিয়া চিলের ন্যায় চারিদিক দেখিতেছেন ; কোথায় দশজন পাঁচজন লোক একত্র হইতেছে, তাঁহরা তাহা দেখিতেছেন, আর নোট করিতেছেন।

পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হওয়ায় বাঁকুড়া ও মানভূমের মেজেষ্টরেরা একটু সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকিবেন যে, "আর ঠকিব না, এবার বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব।"

এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলে কোথাও বাস না করিয়া সরকারী সরকিট হাউসের নিকট একটী তেঁতুলতলায় গিয়া থাকিলেন, মেজেষ্টর সাহেবের বাটীতে দেখা করা, বোধ হয়, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, সন্ন্যাসীবেশে তথায় দেখা হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। যে কারণেই হউক্, সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মনে করিয়া থাকিবেন, মেজেষ্টর সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে।

প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিতেছেন, এ বার্ত্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্রসিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন, এ কথাও লোকে শুনিয়াছিল ; সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

মেজেষ্টর এলিয়ট সাহেব দেখিলেন, এইএক

*কুঞ্জবিহারী এই অপরাধের নিমিত্ত পদচ্যুত ও রাজবাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

সময়। এবার আর ঠকা হইবে না। অতএব তৎক্ষণাৎ দারগা, জমাদার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা অনেকেই পলাইল, তথাপি প্রায় এক শত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেলখানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট গেল যে, একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন।

যাঁহারা প্রতাপচাঁদের প্রত্যাগমনবার্ত্তা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কলিকাতা হইতে একজন ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীলসাহেব গিয়া মেজেষ্টর সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টের নকল চাহিলেন। মেজেষ্টর সাহেব বলিলেন,"কোন ওয়ারেণ্ট হয় নাই, আমার হুকুমই ওয়ারেণ্ট।" উকীল সাহেব তখন আপনার মক্কেলের অপরাধ কি, জানিতে চাহিলেন এবং দরখাস্ত দিয়া বলিলেন, চার্জের নকল দেওয়া হউক। মেজেষ্টর সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমরা মফঃস্বলে চার্জ লিখি না। তোমার মক্কেলের অপরাধ অবশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা রীতি নহে।" সুতরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় আট মাস পরে, সন্ন্যাসী হুগলীতে প্রেরিত হইলেন। কেন, তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই। হুগলীর দায়রায় তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। কৌন্সিলি টার্টন সাহেব তাঁহার পক্ষ হইয়া হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে কোন কথা কহিতে দিলেন না। তাহাতে টার্টন সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া নিজামতে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজামত আদালতে জজ সাহেবের হুকুম বাহাল থাকিল। সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকীল, কি কৌন্সিলি, কি মোক্তার কেহই থাকিতে পাইল না। জজ সাহেব একতরফা বিচার করিয়া সন্ন্যাসীকে ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন; এবং খালাসের পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিতে হুকুম দিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচারপতি! আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, কি অপরাধের নিমিত্ত আমি দণ্ড পাইলাম।"

বিচারপতি বলিলেন,"তোমার নাম আলোক শা! তুমি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছ, রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ।" সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী যথারীতি ছয়মাস কারাবাস করিয়া চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিয়া, ১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যে দিবসে খালাস হইলেন,সে দিবস হুগলীতে মহাসমারোহ হইল। কলিকাতা হইতে কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। পর দিবস অর্দ্ধোদয় যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার বিস্তর লোক হুগলী ও ত্রিবেণীতে আসিয়াছিল; তাহারাও ঐ সমারোহে যোগ দিল। পঞ্চকোটের রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজা উভয়েই যোগ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, উভয়েই জেলখানার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ অঞ্চলের ধনবানেরা দেশী বাদ্য, ইংরেজি বাদ্য, হাতী, ঘোড়া, রেসালা লইয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন জেলখানা হইতে জালরাজা বহির্গত হইলেন, অমনি হাতীর উপর হইতে নহবত বাজিয়া উঠিল, দূরে কাড়ানাগরা বাজিতে লাগিল, চারিদিকে হরিবোল পড়িয়া গেল, তিনি চারি দল ইংরেজি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে জালরাজাকে মহাসম্ভ্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা সুখাসন স্কন্ধে তুলিল, চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শত শত পতাকা দুলিতে দুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন এবং বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাটীতে প্রথমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

৭। কাপ্তেন লিটিলের লড়াই।

কয়েক মাস পরে, আত্মীয়-সকলের পরামর্শ অনুসারে আপাততঃ কলিকাতার সম্পত্তির নিমিত্ত সুপ্রিমকোর্টে নালিশ-মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত মাহাতাবচাঁদ তখন নাবালক। তাঁহার পূর্ব্ব-পিতা পরাণবাবু, রাণী কমলকুমারীর পক্ষ হইয়া তাঁহার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত তিনি মদনমোহন কর্পূরকে পাঠাইয়া দিলেন।

জালরাজা প্রকৃত পক্ষে প্রতাপচাঁদ কি না, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক প্রধান ব্যক্তির জবানবন্দী হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, বাদী সত্যই রাজা প্রতাপচাঁদ। তার পর, বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাক্ষ্য আবশ্যক হইল, সুতরাং উকীলেরা পরামর্শ দিলেন যে, একবার প্রতাপচাঁদ স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা প্রমাণিত হইবে।

জাল-রাজা বর্দ্ধমানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কলিকাতানিবাসী যাঁহারা তাঁহার জামিন ছিলেন, তাঁহারা এক বৎসর পূর্ণ না হইলে যাইতে নিষেধ করিলেন; জাল-রাজা সুতরাং এক বৎসর অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর বর্দ্ধমান যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় উকীলদের পরামর্শমতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডেপুটি গবর্ণর এলেকজাণ্ডর রশ সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত করা হইল*। কিন্তু হালিডে সাহেব তখন সেক্রেটারি, তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। †

দরখাস্ত অসঙ্গত হয় নাই, বর্দ্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা অত্যাচার করে, এই ভয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছিল; সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জাল-রাজা সে সকল কথা কিছু মনে না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। ‡ কালনা দিয়া গেলে সুবিধা হয় বোধ করিয়া তিনি সেই পথেই গেলেন। এ অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সিমুরের শ্রীনাথ বাবু যাঁহাকে লোকে সচরাচর নবাব বাবু বলিত, তিনি গ্রাণ্ড টঙ্ক রোড হইয়া বর্দ্ধমান গেলেন।

জাল-রাজা সঙ্গে অধিক লোক লইলেন না; যে সকল ভৃত্যগণ ও প্রহরীরা তাঁহার পরিচর্য্যার্থ কলিকাতায় নিযুক্ত ছিল, কেবল তাহাদিগকেই লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত কয়েকখানি বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পান্‌সী, তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, চিড়িয়াখানার নৌকা, গায়কদের নৌকা, তাঞ্জামের নৌকা, এইরূপে ৪০ কি ৫০ খানা নৌকা একত্র বাহিত হইল।

রাজা প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমান যাইতেছেন, এ কথা পরদিন গঙ্গার উভয় কূলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কুলবধূ অবধি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। মাস্তরে মাস্তরে রক্তপতাকা উড়িতেছে, নৌকার ছাদে তখমাওয়ালা প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। কতই লোক নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া কূল দেখিতেছে। কতই লোক কূল হইতে নৌকা দেখিতেছে। রাজা পিনেসের ভিতর আছেন, তাহার খড়খড়ি খোলা রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধারা বলিতে লাগিল, "যাও বাছা! আপনার ঘরে যাও। কতদিন পথে পথে বেড়ালে, এখন ঘরে যাও।"

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তাঁহার কৌন্সিলি ও উকীল কেহই সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অপেক্ষায় তিনি এখানে সেখানে নৌকা রাখিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। চুঁচুড়ার অপর পারে জালরাজা প্রায় অষ্টাহ ছিলেন। নিকটবর্ত্তী মোগল, ফরাসিস ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই স্থানেই কালনার পুলিস আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ লয়। কে কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, কালনার জমাদার তাহার এত্তেলা পাঠাইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মেজেষ্টরকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, জাল-রাজা কালনা হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছেন; সেই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে কি একখানা গোপন মিনিটও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।*

* Extract from petition dated 15th. February 1838.

"Your memorialist prays therefore, that your Honor will be graciously pleased to grant to him (through the proper channel such means of safeguard to protect his person and life, from any eventual insult or danger during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

† Reply,

"The prayer of this petition cannot be complied with."

Fort William. March 5. 1838. } (Signed) Fred. Jas. Halliday. Offg secy. to the Govt. of Bengl.

‡ ইংরাজি সন ১৮৩৮ সালের মার্চ্চ মাস।

* এই মিনিটের কথা সুপ্রিমকোর্টে জবানবন্দীতে প্রকাশ পায়।

মেজেষ্টর সাহেব—ওাঁ লিপি—তাহা পাঠ করিয়াই কংকর্ত্তব্য স্থির করি॥ রাখিয়াছিলেন ও দারগার পর পরওয়ানা পাঠাই॥ছিলেন।

শেষ ২রা বৈশাখ * তারিখে জালরাজা কাল্নায় পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই দুই জন মোক্তারকে র্দ্ধমান পাঠাইলেন। তাঁহারা মেজেষ্টর সাহেবের নকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিবে যে, "প্রতাপচাঁদ কাল্নায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বর্দ্ধমান আই-সেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে আসিতে সাহস করেন না।"

একদিন মেজেষ্টর সাহেব ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে আহারান্তে কুঠী হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমত সময়ে গেটের নিকট দেখিলেন, কাল্না হইতে জাল-রাজার দুইজন মোক্তার দরখাস্ত লইয়া আসিয়াছে কি দরখাস্ত, তাহা তিনি অনুসন্ধান না করিয়া একবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মোক্তারেরর নাম রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল। মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়া মেজেষ্টর সাহেব কাল্নার দারগাকে হুকুম দিলেন তথায় জমিয়তবস্ত হইতে দিবে না, যদি জাল-হুকুম মাত্রেই আপনার সঙ্গিদের বরখাস্ত না তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

ইতিপূর্ব্বে পরাণ বাবু জাল-রাজার আগমনবার্ত্তা পিয়ারালাল নামে একজন ক্ষত্রিয়কে কাল্নায় ইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বন্দো-করিয়া রাখিয়াছিল যে, বাজারের কেহ কোন জাল-রাজাকে বিক্রয় করিতে সাহস করিত না। অধিক মূল্যে যে যাহা বিক্রয় করিত, তাহা ত গোপনে।

কাল্নায় একজন পাদরী থাকিতেন, তাঁহার নাম [illegible]আওার। তাঁহাকে মেজেষ্টর সাহেব এক-খানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়াছিলেন যে, জাল-রাজা কাল্-নায় পৌঁছিয়া কিরূপ ব্যবহার করেন ও তাঁহার সঙ্গে কত লোক, তাহা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানাই-বেন। এ পত্রের সন্ধান পিয়ারালাল বাবু জানিতেন, গত[illegible] পাদরী সাহেবের চক্ষে ধুলা দিবার জন্য তিনি একজন খৃষ্টানকে হস্তগত করিলেন। সেই খৃষ্টান যাহা বলিত, তাহাই পাদরী সাহেব মেজেষ্ট-রকে লিখিতেন, স্বয়ং কোন বিষয় তদন্ত করিতেন না। এ কথা তিনি পরে জবানবন্দীতে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

কাল্নার দারগা রাজবাটীর অনুগত, তাঁহার নিমিত্ত পিয়ারালাল বাবুকে কোন কষ্ট করিতে হইল না। দারগা পুনঃ পুনঃ পিয়ারালালকে জানাইলেন যে,"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,এ অধীন জীবিত থাকিতে জাল-রাজা কখন কাল্নায় পদার্পণ করিতে পারিবে না।"

দারগার নাম মহিবুল্লা। লেখা-পড়া তিনি একবারে জানিতেন না। দারোগাগিরি কর্ম্মে লেখাপড়া জানা অনাবশ্যক বলিয়া তখনকার মেজেষ্টর সাহেব প্রায়ই মূর্খদিগকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। দারগারা একজন করিয়া মুহুরি রাখিতেন, তাহারাই রিপোর্ট লিখিয়া দিত। দারগারা কেবল তাহাতে মোহর ছেব্দ করিতেন। পিয়ারালাল বাবু মহিবুল্লার মুহুরিকে হস্তগত করিলেন।

জালরাজার মোক্তারেরা বর্দ্ধমানে পৌঁছিবামাত্র যে জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছে, এ সংবাদ জাল-রাজা কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। সুতরাং "বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেন। কিন্তু কতদিন আর চুপ করিয়া নৌকায় বসিয়া থাকি-বেন? একবার কালনায় নামিতে ইচ্ছা করিলেন।

৯ই বৈশাখ তারিখের প্রাতে বেলা ৮ টার সময় নৌকা হইতে নামিবার উদ্যোগ হইল। তাঁহার সঙ্গে তাঞ্জাম ও বাহক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাথরিয়া-মহল ঘাটে গিয়া নৌকা ভিড়াইল। নগরে রাষ্ট্র হইল যে,রাজা আসিতেছেন। আবালবৃদ্ধ সকলে পাথরিয়া-মহল ঘাটের দিকে ছুটিল। পিয়ারালাল থানার দিকে ছুটিলেন। দারগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া পোষাক পরিতেছিলেন, পিয়ারালাল গিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন।" দারগা পাগড়া জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "ভয় কি, এই আমি চলিলাম, কাহার সাধ্য এখানে ভিড়ায়?" মহিবুল্লা দারগা বাহির হইলেন,সঙ্গে জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদার প্রভৃতি অনেক চলিল। তাঁহার ইচ্ছা—সদর্পে চলেন, কিন্তু তিনি অতি স্থূলকায়; * একটী প্রকাণ্ড মহিষা-কার বলিলেই হয়! সদর্পে বা শীঘ্র চলা তাঁহার পক্ষে

* ২রা বৈশাখ ১২৪৫, ইংরেজি ১৩ই এপ্রেল

* "Mahiboollah, the wo thy Dar gah of Culna, the constituted authority, who can neither read not write nor walk not run," Petition to the Nizamut Audalut.

আবশ্যক। সুতরাং মহিবুল্লা যথাকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন জাল-রাজার নৌকা ঘাটে ভিড়িতেছে। মহিবুল্লা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি নতশিরে জাল-রাজাকে সেলাম করিয়া যোড়করে দাঁড়াইলেন। রাজা নৌকা হইতে তাঞ্জামে উঠিলেন, একজন ভৃত্য আসিয়া রাজার দক্ষিণদিকে একখানি তরবারি রাখিয়া গেল। * আর একজন ছাতা ধরিল, তৃতীয় একজন আড়ানি ধরিল, অপর দুই জন চামর করিতে লাগিল, পাঁচ ছয় জন আশা-সোটা ধরিল। সম্মুখে নকিব ফুকারিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া উঠিলেন—"তফাৎ, তফাৎ"—আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন। তাঞ্জামের দুই পার্শ্বে দুই জন আরদালি তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল, মহিবুল্লা একজনকে সরাইয়া আপনি আরদালি হইয়া তাঞ্জাম ধরিয়া চলিলেন। জাল-রাজাকে দেখিয়া গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনেরা চিনিল, তাহারা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল, দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা উলু দিতে লাগিল, আনন্দের আর সীমা রহিল না। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা নৌকারোহণ করিলেন; সেই সময়ে কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া আপন আপন পরিচয় দিতে লাগিল। রাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক পূর্ব্বকথা কহিলেন। বৃদ্ধেরা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল।

এই ব্যাপারের কথা পাদরী এলেক্‌জাণ্ডার সাহেব আপনার খৃষ্টানের নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টরকে লিখিলেন যে, একশত তরবারধারী আর দুই-শত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপচাঁদ কালনা প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল, কেবল সুদক্ষ দারগার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপচাঁদকে শীঘ্র দমন করা না হয়, তবে বোধ হয়, একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে। †

পত্র পাইয়া মেজেষ্টর সাহেব, প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারি জন্য তাঁহার চতুর নাজির আসাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। পরাণ বাবুও এই সুযোগ পাইয়া রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

পূর্ব্বে সমুদয় বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একজন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মেজেষ্টরেরা তাঁহারই আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময় স্মিথ্ সাহেব এই পদে ছিলেন। কিন্তু তিনি জালরাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ কি হুকুম দেন নাই, তিনি কেবল লিখিয়াছিলেন যে, যদি জাল-রাজা আপনার লোক বিদায় না করে, তবে তাহার নিকট হইতে ফেল জামিন লইতে পার। * মেজেষ্টর

---

* বর্দ্ধমানের রাজারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। জাতীয় ধর্ম্ম সুযোগে হউক অথবা রাজা বলিয়াই হউক, তরবারি তাঁহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু জাল-রাজার তাঞ্জামে তরওয়ার থাকায় "drawn sword" বলিয়া পাদরী সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন ও মেজেষ্টর সাহেব ভয় পাইয়াছিলেন।

† My dear sir,—Protap Chund has just gone on board his boat, after para ing the whole length of Kalna in a Tonjohn with a drawn sword in his own hand, attended by upwards of a hundred swordsmen and double that number of stickmen. The concourse was altogether 6 to 8,000. He appeared to be intent on the Rajbarry. But your active Dorogah prevented him. The aspect of things, I think, threatens an affray, if he is not checked soon.

I am &c. A. ALEXANDER.

* Extract from Superintendent's letter, No. 400, dated 28th. April, 1838.

"4th. The conduct of the claimant of the Burdwan Raj, appears to me to be of such a dangerous nature, so insulting to the family in possession, that I think ther is every reason to apprehend a serious affray. * *

"5th. Considering the tendency of his acts to tumult and riot, I am of opinion, that you will be fully justified in requiring to disband his array, and to behave himself like a good and quiet subject, and on his refusal to obey or evasion of your orders, I think you will be fully justified in calling on him to furnish good security to keep the peace.

"6th. It will be necessary previous to the adoption of such a measure to take evidence of his having assembled such a body of men, and of the tendency of their conduct to break the peace."

সাহেব এই পরামর্শ অনুসারে পূর্ব্বে পরওয়ানা জারি করিয়াছিলেন। জাল-রাজাও তদনুসারে লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন; কেবল এই মাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ লোক বিদায় করিবেন, তাহা তাঁহাকে বলিয়া বা দেখাইয়া দিতে হইবে কিন্তু মেজেষ্টর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একেবারে তাঁহাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজিরকে পাঠাইলেন। নাজিরকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল যে, পূর্ব্বদিন একটী পল্টন * বর্দ্ধমান দিয়া বারাকপুর গিয়াছে। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া পত্র দ্বারা তাহার কাপ্তেনকে পথে আটক করিলেন। জজ সাহেব এই বার্ত্তা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং মেজেষ্টর সাহেবের সঙ্গে ডাক্তার চিকসাহেব কালনায় যাইতেছেন শুনিয়া আপনার দুইটী পিস্তলে স্বহস্তে গুলী পূরিয়া উভয়কে সাদরে দিলেন।

কাপ্তেন সাহেব পত্র পাইয়া সিপাহীসমভিব্যাহারে বৈঁচিতে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং আর ডাক্তার সাহেব একসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। জাল-[illegible]র সংবাদের নিমিত্ত মেজেষ্টারের আদেশমত [illegible]ক্তার সাহেব তথা হইতে কালনার পাদরীকে এক [illegible] লিখিলেন। উত্তরে পাদরী ভয় দেখাইলেন। [illegible]রাং মেজেষ্টর সাহেব ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ [illegible]লনা যাত্রা করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পলটন [illegible]য় পৌঁছিল। কাপ্তেনের নাম লিটিল। তিনি [illegible]জেষ্টার সাহেবের পরামর্শমতে প্রথমে সিপাহী [illegible]ইয়া পাদরী সাহেবের কুঠীতে গেলেন, তথায় স্থির [illegible]ইল যে, মেজেষ্টর একবার নদীর কূলে গিয়া [illegible]সংবাদ লইয়া আসিবেন; তাহার পর ইতিকর্ত্তব্য [illegible] হইবে। ওগলবি সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়া দারোগা ও নাজিরের সঙ্গে ঘাটে গেলেন। তথা কাপ্তেন লিটিলকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যুদ্ধে জাল প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন। আপনি সসৈন্য সত্বর আসুন।" পত্র পাইয়া সাহেব হুকুম দিলেন, অমনি সিপাহীরা গুলী পাড়িল, তাহার পর গম্ভীর পদচারণে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখে জল কল কল করিয়া ছুটিতেছে। এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থলে একখানি পিনাস নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে; তৎপশ্চাৎ চারি পাঁচখানি বজরা, তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি পান্সী ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাজিরা নৌকার ছাদে, ভদ্রলোকেরা নৌকার ভিতরে নিদ্রা যাইতেছে। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। নৌকার আলোক নিবিয়া গিয়াছে—সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও যেন ঘুমাইতেছে। এমন সময়ে কাপ্তেন সাহেব মেজেষ্টরের সহিত কি পরামর্শ করিয়া ফায়ারের হুকুম দিলেন। ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া "মার, মার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুড়িলেন। অমনি গুড় গুড় করিয়া পলটনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। নৌকার ছাদে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না। অপরমধ্যে কাহার হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উলটিয়া জলে পড়িল। জাল-রাজা হঠাৎ উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। পশ্চাতের বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন, তাঁহার নাম রাজা নরহরি চন্দ্র—নিবাস হরধাম। উভয়ে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরের উত্তরে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলেন।

এ দিকে যুদ্ধ ফুরাইল, যুদ্ধের পর লুঠ। সুতরাং লুঠ আরম্ভ হইল। সিপাহীরা ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া পিনাসে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আসাদ আলি নাজির ও মহিবুল্লা দারগা আপন আপন দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। জালরাজা, রাজা-সাজিয়াছেন, কর্জ্জ করিয়া রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, সোণার আসা, সোণার সোটা, সোণার ছাতি, সোণার আড়ানি, লুঠের মুখে তৎসমুদয় অন্তর্হিত হইল।

লুঠ শেষ হইলে পর গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল। মাঝিমাল্লা, খানসামা, পেজমৎগার, যাহারা গুলীবৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধরা পড়িল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজিরের মন উঠিল না। দারগা, নাজির উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০০ কি ৮০০ লোক। রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ৩৫২জন লোক। এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার অসম্পন্ন হয়

* A detachment of 3rd Regiment N. I. under the command of Captain Little.

সুতরাং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর কিছু বাড়াইতে হইল। নিকটে দুই একখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা ছিল, নাজির সে সকল নৌকা হইতে যাত্রীদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল। কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া ত্যাগ করায় আর সময় নাই, সুতরাং তাহারাও জালরাজার সঙ্গী বলিয়া গ্রেপ্তার হইল। ওগলবি সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) তারিখের রোবকারীতে সেই হতভাগা-দের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী বেওয়া, সূর্য্যি, গঙ্গামণি, অনু, চন্দ্রমণি, তুলসী, পদ্ম গোয়ালিনী, কশ, পদ্ম ঠাকুরাণী, গয়াঠাকুরাণী, দাসী-ঠাকুরাণী ইত্যাদি। বৃদ্ধারা বর্দ্ধমানে চালান গিয়া প্রায় নয় মাস তথায় আবদ্ধ থাকিল। যেরূপ তখন গবর্ণমেণ্ট ছিল, যেরূপ কর্ম্মচারী ছিল, যেরূপ সমাজ ছিল, তাহাতে বিপদ্‌গ্রস্তের নিকটে আসিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত। মন্দ সমাজের দোষ এই। যদি আমাদের সমাজ ভাল হইত, যদি আমরা নিজে ভাল হইতাম, আসাদ আলি ভাল হইতেন, মহিবুল্লা ভাল হইতেন, তাহা হইলে মেজে-ষ্টর সাহেব অত্যাচার করিতে সাহস পাইতেন না। যেরূপ সমাজ, সেইরূপ গবর্ণমেণ্ট হইয়া থাকে। সমাজের দোষে গবর্ণমেণ্ট মন্দ হয়, সমাজের গুণে গবর্ণমেণ্ট ভাল হয়।

কাল্‌নাগঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার জাল-রাজাকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল, তাহারাও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গী হইল। তথাকার কতকগুলি স্ত্রীলোকও সেই দশাপন্ন হইল। মেজেষ্টর সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত রোবকারিতে লিখিয়াছেন যে, "তারা আর গুণমণি জাল-রাজার লোককে বাটীতে অন্নপাক করিতে গিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাটীতে থাকে। গোবিন্দ সরকার আর নাথ পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপস্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তার-যোগ্য।"

এইরূপে ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হইয়া বর্দ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল। জালরাজা আর নরহরি চন্দ্র শান্তিপুরের নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্তু জাল-রাজাকে বর্দ্ধমানে না পাঠাইয়া হুগলীর জেলে পাঠান হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহাকে বর্দ্ধমানে চালান দেওয়া হয়। তিনি ত বর্দ্ধমানেই যাইতেছিলেন, রাজার মত যাইতেন—না হয় অপ-রাধীর মত গেলেন। যেরূপেই যান, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। সিপাহী-পরিবেষ্টিত হইয়া হুগলীতে বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। কিন্তু যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল, সে জেলায় তাঁহার বিচারের পক্ষে কি আপত্তি ছিল, তাহা কোন কাগজপত্রে প্রকাশ নাই। কেহ কেহ অনুভব করেন, পূর্ব্বেই পরামর্শ ছিল, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হুগলীর জেলখানায় পাঠাইতে হইবে। নরহরিচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলে বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

জাল-রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর, তাঁহার উকীল ডব্লিউ, ডি সা (W. D. Shaw) গ্রেপ্তার হইলেন। তিনি পূর্ব্বে জাল-রাজার সমভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই; লড়াইয়ের তিন চারি দিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। যে রাত্রে লড়াই হয়, সে রাত্রে সা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না—নিকটে পাইগাছি গ্রামে লায়েল সাহেবের নীলকুঠিতে গিয়া-ছিলেন, প্রাতে তথা হইতে আসিতেছিলেন, পথে ওগলবি সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। উকীল (British born subject) প্রভৃতি কত কথাই বলিলেন। মেজেষ্টর সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। গ্রেপ্তারের সময় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি অপরাধ? মেজেষ্টর সাহেব মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "রাজবিদ্রোহিতা (treason)"।

মেজেষ্টরের মুখে হঠাৎ যাহা আসিয়াছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়াছিলেন—এমত নহে। পরে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার ১৮৩৯ সালের ২৪ মে তারিখের ৫২৭ নং পত্রে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদের এই বলিয়া উল্লেখ করেন যে,

"Persons accused of being conspirators against the Government, and of resistance to the constituted authorities.

সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন—এই জনরব শুনিয়া পাইগাছির নীলকর সাহেব তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার একজন সরকারকে পাঠা-ইয়া দিলেন। আসামীর তত্ত্ব লইতে আসিয়াছেন বলিয়া সেই সরকারকে তৎক্ষণাৎ হাজতে যাইতে হইল এবং সে ব্যক্তি যে হাতী চড়িয়া

আসিয়াছিল, সে হস্তীটীও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল।

প্রতাপচাঁদের পরম বন্ধু নবাব বাবু সিমুর হইতে একাকী বর্দ্ধমানে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে সংবাদ মেজেষ্টর সাহেব কিরূপে পাইলেন। পাইয়া খানিয়মে তাঁহাকে জেলে পুরিলেন।

তাহার পর, আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুঁজিতে লাগিলেন। শেষ সন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির নবাব আনওয়ার আলি, জাল-রাজার স্বপক্ষ; অতএব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত হুগলীর মেজেষ্টরকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে জাহানাবাদের রামদীন সিংহ ও বল্লালদীঘির হাফেজ মতে আলিকে গ্রেপ্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। আরও জন কয়েককে গ্রেপ্তার করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে, কলিকাতার মুলুকচাঁদ বাবু, পানিহাটির জয়নারায়ণ বাবু প্রভৃতি কয়েক জন জাল-রাজার নৌকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা কাগজপত্রে প্রকাশ নাই

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তার হইল, কিন্তু একটা কাজ বাকি থাকিল। মেজেষ্টারিতে এত্তেলা দিয়াছিল যে, জালরাজার সঙ্গে পাঁচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে; কিন্তু তাহাদের সেই সব অস্ত্র কোথায় গেল? নৌকায় পনরখানি তরওয়ার, ৩টী কি ৪টী বন্দুক আর একটী পিস্তল ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। দারগা সাহেব বড়ই গোলে পড়িলেন। আসাদ আলি নির্ভীক পুরুষ—তৎক্ষণাৎ কালনার রাজবাটী হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬ খানি তরওয়ার সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মেজেষ্টর সাহেবকে জানাইলেন যে, "সিপাহীরা সমস্ত তরওয়ার লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে. আমি বহুযত্নে তাহাদের নিকট হইতে পঞ্চাশখান মাত্র উদ্ধার করিয়াছি। এখনও তাহাদের নিকট এত তরওয়ার আছে যে, গাড়ী বোঝাই হইতে পারে।" কাপ্তেন লিটিল এই সময় হুগলীতে পৌঁছাইয়াছেন অনুভব করিয়া ওগলবি সাহেব হুগলীর মেজেষ্টরকে লিখিলেন যে, সিপাহীদের নিকট হইতে তরওয়ারগুলি লইয়া পাঠাইয়া দিবেন; কেন না, সেই তরওয়ারগুলিই এই মোকদ্দমার প্রধান প্রমাণ। *

* Extract from a letter from the Acting Magistrate of Burdwan to the Magistrate of Hooghly, Dated the 6th May 1838.

"In my recent capture of Sri DISTANT Rajah of Burdwan, with his armed followers, some hundreds of swords were discovered in his boats. The Sepoys, however, of Captain Little's detachment considering them their fair plunder, appropriated to themselves as many as they could carry away. Their camp followers did the same and my Burkundazes and Chowkeedars caught the infection, so that here are only now 86 swords forthcoming: of which upwards of 50 were received from sepoys * * As Captain Laittle is today at Hooghly may I request you will join with him, if necessary in making the necessary search in his camp, and do your best to get possession for me the plundered swords. It is of the greatest importance to get them, as they form such strong evidence in the case.

৮। ওগলবি সাহেব আসামী।

কাপ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর, কলিকাতার ইংরাজি কাগজে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা প্রকাশ হইল। ৮ই মে তারিখের হরকরা লিখিলেন যে, সিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়জন লোক আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু "the arrangements and preceedings of this officer (captain Little) reflect equal credit on his judgment and humanity" শেষ কথাটী বড় ঠিক!

জালরাজা সম্বন্ধে তাঁহারা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রসিকতা করিলেন। কোরিয়ার (Courier) পত্রের সম্পাদক লিখিলেন, "there is a good chance of his closing his eventful career an exalted character হরকরা তাহার টীকা করিয়া বুঝাইলেন যে, "exalted situation অর্থে বুঝিতে হইবে,—উর্দ্ধে ফাঁসিকাটে ঝুলন লোকে ভাবিল, বিচার বটে। খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফাঁসি যাইবে জালরাজা।

এই সময় কে একজন সম্পাদককে ধমক দিয়া হরকরায় লিখিলেন যে, "আমি বিশেষ জানি, সে রাত্রে নৌকার মর্দ্দমা দিয়া রক্ত গড়াইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিল—সুমস্ত লোকের রক্ত। তোমরা তাহা ভুলিয়া কেবল কাপ্তেনের প্রশংসা করিতেছ, মেজেষ্টরের প্রশংসা করিতেছ। এই ঘটনা যদি আজ ইংলণ্ডে হইত, তাহা হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি বলিতেন?" এই পত্রের পর সম্পাদকের সুর যেন একটু ফিরিল, তদারকের নিমিত্ত তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ডেপুটী গবর্ণর রস সাহেবের আসন একটু টলিল, তিনি তদারকের হুকুম দিলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তখন মেজেষ্টরদিগের উপর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট ছিলেন, তাঁহার নাম স্মিথ সাহেব। তদারকের ভার সুতরাং তাঁহার উপরেই পড়িল। কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ ব্যক্তি। যখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি একাল পর্য্যন্ত মেজেষ্টরকে তাহার ভার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টর ওগলবি আপনার অপরাধের তদারক আপনি করিতে বসিলেন।

এদিকে উকীল সা সাহেবের কেরাণী জয়নারায়ণ চন্দ্র এফিডেবিড করিয়া সা সাহেবের খালাসের নিমিত্ত সুপ্রিমকোর্টের (Writ of Habeas Corpus) পরওয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু সে পরওয়ানা ওগলবি সাহেব বড় গ্রাহ্য করিলেন না।

যতক্ষণ কথা হইতেছিল, বাঙ্গালীর রক্ত নৌকার মর্দ্দমা দিয়া গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের ন্যায় মেজেষ্টরের নিমিত্ত কোন ইংরাজের ভয় হয় নাই, কিন্তু যাই প্রকাশ হইল যে, সুপ্রিম কোর্টের পরওয়ানা এই মেজেষ্টর অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আর অমনি হরকরা লিখিলেন যে, তবে আমাদের আর রক্ষা নাই। "The British inhabitants of Bengal will now look with intense anxiety to the course which Sir Edward Rayn may adopt on this occasion. On him will depend in a great measure the degree of protection for life and property and freedom, Europeans not in the service may expect. If it be once ruled that a company's servant can hold a writ of Habeas corpus at arm's length no man is safe."

কিছুদিন পরে মেজেষ্টর সাহেব জামিন লইয়া সা সাহেবকে খালাস দিলেন কলিকাতায় পৌঁছিয়াই সা সাহেব ওগলবির নামে বে-আইনি কয়েদ রাখার জন্য পুলিসে নালিশ করিলেন। এই মোকর্দ্দমার এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুপ্রিমকোর্টের এটর্ণি ও কৌন্সিলিদের মধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। মফঃস্বলের অরাজকতাসম্বন্ধে সকলে একবাক্য হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির নামে খুনের নালিস আনা উচিত। কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কি করেন, তাহা দেখিয়া পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করা যাইবে। পুলিসে যে জবানবন্দী হইয়াছিল, কৌন্সিলিরা তাহার নকল গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ না করায়, তাঁহারা ওগলবি সাহেবের নামে খুনের নালিশ উপস্থিত করাইলেন।

স্মিথ সাহেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, সুতরাং তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হইল। তথা হইতে তিনি কি রিপোর্ট করিলেন, আমরা তাহা দেখি নাই, কিন্তু সে রিপোর্ট পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কিছুদিনের নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে ছুটী দিলেন। এদিকে রাষ্ট্র হইল যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সসপেণ্ড করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুপ্রিম কোর্টে হাজির হইতে হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবকাশ দিয়াছিলেন, এবং যথানিয়মে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেতনও দিয়াছিলেন।

এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের মধ্যে শাক্ত আর বৈষ্ণবে যেরূপ দলাদলি ছিল, এদেশে ইংরেজদের মধ্যে কোম্পানীর চাকর আর অপর দলে প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সাহেবেরা কোম্পানীর চিহ্নিত চাকর (Covenanted servants) তাঁহাদের অহঙ্কার ছিল যে, আমরা এদেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা, আর কোন সাহেব আমাদের সমকক্ষ নহে। সুপ্রিমকোর্টের উকীল-কৌন্সিলিরা কোন মোকর্দ্দমায় মফস্বল আদালতে আসিলে এই হর্ত্তা-কর্ত্তাদের যথেচ্ছাচারিতায় কিছু ব্যাঘাত হইত, এবং বিদ্যাবুদ্ধিও ধরা পড়িত, সুতরাং তাঁহারা কৌন্সিলিদিগকে সুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোম্পানীর কোন কোন জজ, আপন আপন নির্ভীকতা অথবা যথেচ্ছক্ষমতা দর্শাইবার জন্য কৌন্সিলিকে কখন কখন তুচ্ছ করিতেন, তাঁহার মক্কেলের সর্ব্বনাশ করিতেন, আইনকানুন কিছু মানিতেন না,

শুনিতেন না; সুতরাং কৌন্সিলিরা চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু অশ্রদ্ধা করিতেন। অপর সাহেবেরাও বিশেষ সময় পাইতেন না বলিয়া চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন।

এই দলাদলির ফল কতকটা এই সময় ফলিয়াছিল। এ দলাদলি না থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত সা সাহেবকে কয়েদ করিতেন না। কিন্তু তাহা না করিলে, হয় ত কাল্‌নার হত্যাকাণ্ড কৌন্সিলিদের অন্তঃস্পর্শ করিত না। কাল্‌নার ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা কিছু তারক হইয়াছিল, তাহা কেবল কৌন্সিলিদের উদ্‌যোগে। ওগলবি সাহেব যে খুনের মিশ্রিত আসামী হইয়াছিলেন, তাহাও ইহাদের যত্নে। নতুবা এই হত্যাকাণ্ড হয় ত গবর্ণমেণ্ট শুনিতেও পাইতেন না।

ওগলবি সাহেবকে কলিকাতার মেজেষ্টর ওহনসন সাহেব জামিন লইয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। বিচার সুপ্রিম কোর্টের জজ, সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইল। জজ, কৌন্সিলি প্রভৃতি সকলেই "পরচুল (Periwing) পরিয়া স্ব স্ব স্থানে আসিয়া বসিলেন। তখনও সাহেবদের মধ্যে পেরিউইগ পরার প্রথা ছিল। পিটার কোং (Pittar & Co.) তখন কলিকাতার মধ্যে প্রধান পেরি-উইগওয়ালা। জুরি সকলেই ইংরেজ, তাহাদের মধ্যে প্রথমে একজন বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু আসামীর কৌন্সলি আপত্তি করায় তাঁহার পরিবর্ত্তে আর একজন ইংরেজ মনোনীত হইলেন।

আসামী ওগলবি হাজির হইলেন। আর তাঁহার সে তেজ, সে দাম্ভিকতা নাই. মুখখানি শুকাইয়াছে, শরীর দুর্ব্বল। পীড়া হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে বসিতে একখানি কেদারা দেওয়া হইল। তাঁহার মুখ দেখিয়া ইংরেজে পীড়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইলে লোকে বলিত, ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। আসল কথা, যাহারা অত্যাচারী, তাহারা বড় ভীরু। যাহারা সুবিধা পাইলেই অত্যাচার করে, তাহারা ধরা পড়িলেই পায়ে ধরে। ওগলবি বড় ভীরু ছিলেন, তাই তিনি এত অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং ধরা পড়িয়া তাই তাঁহার মুখ এত শুকাইয়াছে।

তাঁহার পক্ষে কৌন্সিলি প্রিন্সেপ। ফরিয়াদীর পক্ষে কৌন্সিলি লঙ্গবিলকার্ক। ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

একজন সাক্ষী জালরাজা। তাঁহাকে দুইজন সার্জ্জন আর মেজেষ্টর সাহেব স্বয়ং সঙ্গে করিয়া হুগ্‌লী হইতে আলিপুরের জেলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে তাঁহাকে সার্জ্জনের পাহারায় আদালতে আনা হইল, এবং যখন তিনি জবানবন্দী দিবার জন্য দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন সার্জ্জন তাঁহাকে ঠেসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া অনেকে হাসিতে লাগিল, সকলেই বুঝিল যে, হাকিমদের ভয়, পাছে জালরাজা তথা হইতে অন্তর্ধান হন, তাই তাঁহাকে সার্জ্জনেরা ঠেসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জালরাজা জবানবন্দীতে বলিলেন, "কালনায় একদিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমায় গুলী লাগিয়াছে।' এই কথা শুনিয়াই আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। আমি পলাইতেছি জানিতে পারিয়া সিপাহীরা জলে গুলী মারিতে লাগিল। বন্দুকের আলোক দপ করিয়া উঠে, আর আমি ডুব মারি। গুলী আমার চারিদিকে পড়িতে লাগিল। নৌকায় আমার সঙ্গে ১০ কি ১৫ খানা তরওয়ার, তিনটী কি চারিটী বন্দুক, একটী পিস্তল, দুইটী কি তিনটী বর্শা ছিল। আমার স্বসম্পর্কীয়দের সঙ্গে অসদ্ভাব হইয়াছিল বলিয়া আমি পলাইয়াছিলাম, কিন্তু মরি নাই, মৃত্যুর ভাণ করিয়াছিলাম। সে সকল অনেক কথা।"

জয়নারায়ণ চন্দ্র জবানবন্দীতে বলিলেন, "আমি সা সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাহীরা গুলী করে, আমি তখন নৌকায় নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে কলিকাতায় পলাইয়া আসি। (বম্বেটিয়ার ভয়ে) নৌকাযাত্রীদের সঙ্গে তরওয়ার রাখিতে হয়।"

ভিকা সিংহ বলিলেন, "আমি ৩নং পল্টনের সুবাদার। গুলী করিবার পূর্ব্বে 'মারো মারো', হুকুম শুনিয়াছি। সে হুকুম কে দিয়াছিলেন. বলিতে পারি না। কিন্তু সাহেবেরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতে এ হুকুম দেওয়া হয়।"

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, "আমি ঐ পল্টনের এন্সাইন্। কাপ্তেন লিটিল সাহেব মেজেষ্টরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে. প্রতাপকে যেরূপে পারি, জীবিত হউক বা মৃত হউক, গেপ্তার করিব কি না? ওগলবি তাহাতে বলেন, হাঁ, যেমন করিয়া পার, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

বাবু তিওয়ারী বলিলেন, "গুলী করিবার পূর্ব্বে

মেজেষ্টর সাহেব 'মারো মারো' বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন। একবার গুলী করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝা গেল, রাজা সাঁতার দিয়া পলাইতেছেন, তখন মেজেষ্টর বলিলেন, 'উস্কো গুলীসে মারো।' আবার গুলী আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল। পাদরী সাহেবও গুলী করিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়াছি। মেজেষ্টর সাহেব প্রথমে গুলী করেন।"

খোদাবক্স হাবিলদার বলিল, "গুলী করিতে আমি পাদরীকে দেখি নাই। হয় ত তিনি গুলী করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মেজেষ্টর যে, 'মারো মারো' হুকুম দিয়াছেন, তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

কাপ্তেন লিটিল বলিলেন, "গুলী করিতে কেহ হুকুম দেয় নাই। সিপাহীরা ভুলে গুলী করিয়াছে। ওগলবী সাহেব গুলী করিতে হুকুম দিয়াছেন, এমত আমি শুনি নাই। তিনি, কি ডাক্তার সাহেব, কি পাদরী সাহেব কেহ গুলী করেন নাই। প্রতাপের সঙ্গে তিন শত যোদ্ধা লোক (fighting men) ছিল। প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাঁবুতে রাখিলে পর, দুই প্রহর হইতে অস্ত পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমিয়াছিল। তাহারা রাজাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে নাই, তবে একটু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল।"

ডাক্তার চিক বলিলেন, "বর্দ্ধমানের জজ আমাকে ও ওগলবিকে এক একটা করিয়া পিস্তল নিজ হস্তে গুলী পুরিয়া দিয়াছিলেন। গুলী করিবার সময় মেজেষ্টর আমার নিকট হইতে দূরে ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই। পাদরী এলেকজাণ্ডার পূর্ব্বে পল্টনের গোরা ছিলেন।"

এইরূপে অনেকে সাক্ষ্য দিলেন, সে সকল লিখিবার প্রয়োজন নাই। বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেলে আসামী ওগলবির জবাব আরম্ভ হইবে, কিন্তু তিনি নিজে মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না। একখানি বর্ণনাপত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন না। হুগলীর মেজেষ্টর সামুয়েল সাহেব সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, তিনিই আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন।

এই জবাবে আসামী ওগলবি জানাইলেন যে, "আমি নির্দ্দোষী। কাল্নায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল সিপাহীদের দোষে। আমি পল্টন লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত। সকলেই জানেন, মেজেষ্টরের কার্য্য কি গুরুতর। সকলেই জানেন, পরাণ বাবুর কার্য্যদোষে লোকে রাজপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত। এ সময় লোকে জালরাজার পক্ষ হওয়াতে একটা গোলমাল বাধিবার সম্ভাবনা। জালরাজা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে হুকুম আমি পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, তাহা দাখিল করা হইয়াছে। ও পক্ষে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি স্বয়ং গুলী করিয়াছি এবং 'মারো মারো' বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার চিক সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের জবানবন্দীর পর আমার আর কিছু বলা বাহুল্য। যাহাই হউক, যদি কেহ আমাকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি নিদ্রিত লোকদিগকে সিপাহী দ্বারা হত্যা করাইতে পারি, তাহা হইলে যে দণ্ডবিধান হইবে, আমি তাহ শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" *

তাহার পর আসামীর পক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল। আসাদ আলি নাজির, আর মহিবুল্লা দারগা ভিন্ন আর যাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন, তাঁহারা কেহই কাল্নায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে পর সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব জুরিদিগকে চার্জ্জ দিলেন।

জুরিরা বলিলেন, "ওগলবি সাহেব নির্দ্দোষী।"

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস দিলেন, খালাস দিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন যে,—

"You now stand quite free from all charges and imputations, and if there have been a little error of judgment, you are still most clearly proved to have had no participation whatever in the act itself, which resulted so fatally, and to have been acted throughout by no feeling or motive, other than becomes a gentleman."

সংবাদপত্রের সম্পাদকের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, কাপ্তেন লিটিলকে আসামী না করা ভুল হইয়াছিল।

---

* উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা জবাবের অনুবাদ নহে, কেবল স্থূল মর্ম্ম মাত্র।

৯। সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জালরাজা গ্রেপ্তার হইয়া হুগলী প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার কি দুরবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছা নাই। তবে এইমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, জালরাজা আর তাঁহার সঙ্গী রাজা নরহরিচন্দ্রকে দুই খানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া পুলিস দ্বারা দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করাণ হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহা দেখিবে? গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিণীরা পর্য্যন্ত কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। যাহারা ছিল, তাহারা কেবল পরাণ বাবুর দলস্থ।

সিপাহী সঙ্গে দিয়া, সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জালরাজাকে পদব্রজে হুগলী পাঠান হইল। কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার করিবেন, বোধ হয়, ভুলক্রমে তাহার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল। যেখানে সিপাহীরা অন্ন পাক করিত, জালরাজা সেইখানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটী সিপাহীর দয়া হইল; সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটী চা'ল আনিয়া দিল। জালরাজা সে দিন অতি গুরুতর আহার করিলেন।

জালরাজা ন-সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলে বিস্তর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। হরকরার সম্পাদক বলেন, আট দশ হাজার লোকের ন্যূন নহে। আমরা শুনিয়াছি, তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল, দরিদ্রেরা পয়সা আনিয়াছিল, ভিখারিণীরা চা'ল আনিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালা দয়ায় পূর্ণ। আমাদের বহুকালের শিক্ষার ফল এই দয়া। সহস্র পুরুষ ধরিয়া ভক্তি আর দয়া বাঙ্গালায় অভ্যাস হইয়াছিল। মুসলমানের সংস্পর্শে এই সহস্র পুরুষা-রক্ত লোপ পায় নাই; বরং সংসর্গপ্রাবল্যে দয়া মজ্জাগত হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু -সংস্পর্শে আমরা অনেক মূলধন হারাইয়াছি। এখন বলিতে অভ্যাস করিয়াছি,—দয়া akness—ভক্তি a weakness—স্নেহ a weakness। সুতরাং যাহা দয়ার বিপরীত, যাহা স্নেহের বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত, তাহাই strength of mind। আবার যদি কখনও আরও অদৃষ্ট পোড়ে, যদি এই [illegible] পাল আবার হস্তান্তর হয়, তখন হয় ত বলিতে অভ্যাস করিব,—সত্যবাদ "বেওকুফি"; মিথ্যাবাদ "সিয়ানামি"; পরদ্রব্যহরণ "কর্ত্তব্য কার্য্য"; কেননা, তাহাতে কখন কখন লাভ আছে।

সে সকল দুঃখের কথা থাক। যাহারা প্রতাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়সা আনিয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতাপকে তাহা দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাঁহার নিকট আসিতেও পারিল না।

৫ই মে তারিখে জালরাজা হুগলীতে পৌঁছিলেন। তথাকার জেলখানায় একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন। একখানি কম্বল পাইলেন, সেখানি নূতন কি পুরাতন, কি অন্য কয়েদীর ব্যবহৃত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে সংবাদপত্রে কে একজন লিখিয়াছেন যে, সেখানা নিশ্চয়ই নূতন।

এই সময় হুগলীতে সামুয়েল সাহেব মেজেষ্টর। তিনি ইহার কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে মেজেষ্টরি করিয়াছিলেন। যখন জালরাজা সন্ন্যাসীবেশে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন, তখন তিনি সেখানে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাল প্রতাপচাঁদ-সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পরাণ বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, জালরাজা একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে হুগলীতে তাঁহাকে আপন হাতে পাইয়া আপ্যায়িত হইলেন। কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই জন্য এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তিনি এই নিমিত্ত পরাণবাবুকে একপত্র লেখেন। সে পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবের নিকট জালরাজা দরখাস্ত করেন। নকল প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সামুয়েল সাহেব তাহা দিতে দেন নাই। তিনি দিন কতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত ছিলেন। লেষ্টার সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেন।

সামুয়েল সাহেব শুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল বলিয়া একজন পাকা জুয়াচোর ছিল। চার পাঁচ বৎসর অবধি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এক্ষণে সেই ব্যক্তিই এই জালরাজা সাজিয়াছে। অতএব তাহার সোনাক্তের জন্য তিনি নদীয়ার মেজেষ্টর হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। হালকেট সাহেব কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কতকগুলি প্রতিবাসী পাঠাইয়া দিলেন। সামুয়েল সাহেব তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জেলখানায় গেলেন। তাহারা জাল-রাজাকে দেখিয়া ভাল সোনাক্ত করিতে

পারিল না। সুতরাং সামুয়েল সাহেব বড় চটিয়া গেলেন। জবানবন্দী না লইয়া তাহাদিগকে ফেরং পাঠাইলেন। আবার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। এবার হালকেট সাহেব আপনার নাজীর, পেস্কার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি বিস্তর আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও একদিন নিজে আসিয়াছিলেন।

সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লেখেন। তাঁহার কতদূর চেষ্টা ছিল, তাহা বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম। রাজা বৈদ্যনাথের জবানবন্দী হইয়া গেলে পর, এই পত্রখানি তাঁহাকে লেখা হয়

"Hooghly. Sept. 4. 1838.

My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Boranagore, who know him as Kristolall. I dare say you could do this through Kali Nath Roy Chowdhery, Mothooranath Mookerji or any of your own servant Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If I had known his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Boranagore within a week or so. Persuade Mothooranath also to come. His hoormut and izzut shall be hureck soorut se bahal.

Yours truly
F. A. SAMUELLS."

সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন। তাহাদের জবানবন্দী হইত, কিন্তু তিনি তাহা পড়িয়া সাক্ষীদিগকে শুনাইতেন না। তখন সে প্রথা ছিল না জালরাজার উকীলেরা বলিতেন যে, "সাক্ষীরা যাহা বলিত, তাহা অবিকল লেখা হইত না।" তাঁহারা আরও বলিতেন, "কোন কোন সাক্ষীর জবানবন্দী জালরাজার অসাক্ষাতেও লওয়া হইত।"

হরকরা-সম্পাদক হুগলীতে একজন রিপোর্টার পাঠাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সামুয়েল সাহেব সেই ব্যক্তির নিমিত্ত রিপোর্ট সংশোধন করিয়া হুগলী কালেজের অধ্যাপক সদরলাণ্ড সাহেবের দ্বারা হরকরায় পাঠাইতেন। জালরাজার উকীলেরা বলিতেন, "হরকরায় যে জবানবন্দী প্রকাশ হয়, তাহা প্রকৃত নহে, তাহা কেবল মেজেষ্টর সাহেবের মনগড়া।" ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে দরখাস্তও হইয়াছিল। সামুয়েল সাহেব বলেন, সদরলাণ্ড সাহেবকে তিনি তাঁহার ইয়াদদাস্ত দিতেন মাত্র, আর কিছু নহে।*

*এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাহেব সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে,—

"A silly reporter was deputed by the publisher of that paper (Hurkura) to Hooghly, for the purpose of reporting the proceedings in my Court. The reports which he furnished however, were so exceeedingly incorrect that, Mr. Sutheland now principal of the Hooghly College, who resides with me, and who had formerly been connected with the Hurkura press, requested me to furnish him with my note in order that he might correct these reports before they were forwarded. To this, of course I could have no objection, and the reports which appeared from that time, forwarded in the Hurkura, were the only reports which give a tolerable idea of the evidence, which was given in court. That there were many inacuracies even in-tthese, is very probable as Mr. Suther land's leisure was not such as to enable him in most instances to give more than a general correction.

কিন্তু জালরাজার উকীলেরা বলেন যে, সদরলণ্ড সাহেব যে রিপোর্ট পাঠাইতেন, তাহা হরকরা আপিসে গিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন। সে রিপোর্টে যত কাটকুট বা নূতন লেখা থাকিত, তাহা সমুদয় [illegible] [illegible] হস্তের।"

জালরাজার বিরুদ্ধে যাহাদের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা, তাঁহারাই ফরিয়াদীর সাক্ষী। সুতরাং তাহাদের জবানবন্দী প্রথমে লওয়া হইতে লাগিল। তাঁহারা প্রায় অনেকেই বলেন, জালরাজা প্রতাপচাঁদ নহেন। হরকরা-সংবাদপত্রে এই সকল জবানবন্দী প্রথমেই ছাপা হইতে লাগিল। হরকরা হইতে তাহা সমাচার-দর্পণে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল। সামুয়েল সাহেব এই জবানবন্দী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি করিয়া সমাচার-দর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন, আবার থানার দারগারা তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দায়রায় জালরাজার স্বপক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল, তখন আর সমাচারদর্পণ সেইরূপ থানায় থানায় পাঠান হইল না। প্রথম জবানবন্দী পড়িয়া অনেকের ধারণা হইল যে, জালরাজা বাস্তবিকই জাল। সুতরাং এই বিষয়ে লোকে সামুয়েল সাহেবকে দোষী করিতে লাগিল। কিন্তু সামুয়েল সাহেব বলেন যে, লোকের মনে একটা অসঙ্গত ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন। ইহা তাঁহার কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে নহে।

১০। দায়রা সোপর্দ্দ।

সামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জালরাজার মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেন। সেই দিন তিনি এজলাসে বসিয়া জালরাজাকে বলিলেন, "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করিয়াছ, সেই জন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইলেন। হরি হরি! কালনার জলিয়ৎবস্তু তবে কোন কাজের কথা নহে! তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করাই তবে মূল অপরাধ। গুরুতর অপরাধের আবার জামিন নাই। খুনের মোকর্দ্দমায় ওগলবি সাহেবের জামিন লওয়া হইয়াছিল, প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জামিন লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের নিমিত্ত চারি মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল।

সামুয়েল সাহেব জালরাজের এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে, জালরাজার উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ফরিয়াদী?" মেজেষ্টর উত্তর করিলেন "গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী।" আবার সকলে অবাক্ হইল! প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিস করিল না, পরাণ বাবু নালিস করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, সুতরাং নানা লোক নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

চিনারি সাহেব দ্বারা প্রতাপচাঁদ নিজের যে প্রমাণ চিত্রপট আঁকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানি বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে আনীত হইয়া এজলাসের পার্শ্বে এক ঘরে রাখা হইল। চিনারি সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন। তিনি রাজা প্রতাপচাঁদের ছবি লিখিয়াছেন, এ কথা সাহেব মহলে সকলে শুনিয়াছিলেন। অনেকে সেই ছবি দেখিতে চিনারি সাহেবের বাটী যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদ চিনারি সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের দেহ যেমন লম্বা, পটের দেহ যেন ঠিক সেই পরিমাণে লম্বা হয়, দৈর্ঘ্যের যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে। পট ঝুলাইবার স্থানানুরোধে বা তাহার দূরতা অনুসারে চিত্রকরেরা দৈর্ঘ্যের যেমন কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে, প্রতাপ সেরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই চিত্রপট জালের মেজেষ্টরিতে আনীত হইলে, অনেকেই বুঝিলেন, ছবিখানি এ মোকর্দ্দমার প্রধান সাক্ষী—নিস্তব্ধ নিরপেক্ষ সাক্ষী—কথা কহে না, কাহারও মুখ চাহে না। পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা কহিয়া ছবি কি বলিল, জজ, মেজেষ্টর তাহা কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে লেখা যাইতেছে।*

* "Some curious evidence transpired concerning the "Portrait" that novel mute witness * * The prosecution certainly seem to have unwittingly subpœnaed, in this portrait a rather hostile witness * * Long odds in favour of the Rajah and no takers quite a dark horse. However; and may prove a winner,"—Hurkura 6th Saptember 1838.

গবর্ণমেণ্ট আপনার চাকরদিগকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ—একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ হাচিনসন—একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটাল—একজন সাক্ষী। ঐরাবত নামক জাহাজে করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষী-দিগকে মহাসমারোহে হুগলী পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আসিলেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না। তিন বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া হইল। প্রথমতঃ জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে; দ্বিতীয়তঃ প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে; তৃতীয় জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল কি না এই সম্বন্ধে। কেবল এই তিন বিষয়ের প্রমাণ লইয়া সামুয়েল সাহেব জালরাজাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। কিন্তু সোপর্দ্দের সময় একটী চার্জ বাড়াইয়া দিলেন—কাল্‌নায় জমিয়ৎবস্ত। এ বিষয়ে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহার চার্জ হইল।

সামুয়েল সাহেব বর্দ্ধমান হইতে প্রায় সকল আসামীকে আনাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেবল সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

প্রথম, জালরাজা। দ্বিতীয় মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল, (যিনি বর্দ্ধমানে ম্যেজেষ্টরের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন)। তৃতীয়, হাফেজ ফতে উল্লা। চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর। পঞ্চম, কালাপ্রসাদ সিংহ। ষষ্ঠ, জুমন খাঁ। সপ্তম, রাজা নরহরিচন্দ্র।

১১। দায়রার কার্য্য প্রণালী।

২০শে নবেম্বর মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য ছিল, এবং সাক্ষীদিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু কি গতিকে বলা যায় না, তাহার পূর্ব্বদিনে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা আইসে নাই, কিন্তু অপর কার্য্য হইল। জজ সাহেবর নাম কার্টিস।

গবর্ণমেণ্ট, প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে বিগনেল নামে একজনকে ৫০০৲ বেতনে ডিপুটী লিগ্যাল রিমে-ম্বেনসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিগনেল সাহেব বড় বুদ্ধিমান্, হ্যালিডে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত। তিনি এই মোকর্দ্দমায় দায়রায় গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, হ্যালিডে সাহেবই তাঁহাকে পাঠান। তিনি ১৯শে তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন। সুতরাং ১৯শে তারিখে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল, প্রার্থীদিগের নিমিত্ত অপেক্ষা করা হইল না।

কৌন্সিলি মর্টন সাহেব জালরাজার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সেই দিন পত্রের দ্বারা জজ সাহেবের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেব সে পত্র পাইয়া ফরিয়াদীর উকীল বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুমতি দেওয়া যাইবে কি?" বিগনেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করিয়াছেন। জজ সাহেব তখন মর্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন। উত্তর পাইয়া মর্টন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসামীর কৌন্সিলি জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, "আসামী শারীরিক অসুস্থ আছেন, অতএব তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়।" জজ সাহেব কেদারা দিতে হুকুম দিলেন। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

ফৌজদারি হইতে মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত যে রোব-কারী আসিয়াছিল, তাহা মনসারাম দেওয়ানজী ১১টারসময় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেড়টার সময় তাহা পড়া শেস হইল। তাহারপর সাক্ষীর জবানবন্দী যাহা মেজেষ্টর পাঠাইয়াছেন, তাহাও দেওয়ানজী মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। জজসাহেব বলি-লেন, 'এখানে জবানবন্দী লওয়া হইবে, সুতরাং সাবেক জবানবন্দী আর পড়া অনাবশ্যক।" বিগনেল সাহেবও জজ সাহেবের কথায় সম্মতি দিলেন। দেও য়ানজী শ্রীযুক্ত মনসারাম মহাশয় বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারির সমুদয় কাগজপত্র না পড়িলে আসামী-দের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে?" জজ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। দেওয়ানজীর যাহা ইচ্ছা, তাহা সমুদয় পড়িয়া শুনাইলেন।

তাহার পর চার্জ পড়া হইল। (১) আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে। (২) সেই নাম ব্যবহার করিয়া ট্রেজরির দেওয়ান রাধা-কৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া তাহার নিকট টাকা লই-য়াছে। (৩) বে-আইনিরূপে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়ৎবস্ত করিয়াছে।

আসামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দিল। সে দিন আর কোন কার্য্য হইল না। এই স্থানে বলিয়া রাখা

আবশ্যক যে, জালরাজা একখানি লিখিত জবাব দিয়াছিলেন। দুই দিন পরে (২১ শে নবেম্বর) সে সম্বন্ধে কথা উঠিলে জজ সাহেব বলিলেন, "আমার বোধ হয়,জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত, এই মোকর্দ্দমা দেওয়ানীর বিচার্য্য, ফৌজদারীর নহে। অন্ততঃ জুরি কিম্বা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই। সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য।"

আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্দ্ধমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেকবার প্রতাপচাদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন—একবার তাহার উরুস্তম্ভ অস্ত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর এক জন প্রধান সাক্ষী। বিশেষতঃ বোর্ডের মেম্বার টেয়ার সাহেব মেজেষ্টারিতে জবানবন্দী দিয়াছেন যে, সেই ডাক্তার হ্যালিডে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, "আসামী সত্যই প্রতাপচাদ।" অতএব তাঁহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইল। ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাঁহার আসিতে অনেক ব্যয় এবং বেতন-ক্ষতি, সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, 'আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি আসিতে প্রস্তুত আছি।' জালরাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাঁহাকে কর্জ্জ দেয় না। তিনি টাকা পাঠাইতে না পারিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, "ফৌজদারী আদালতের সাক্ষীকে অন্য মোকর্দ্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, যেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সাক্ষীদিগকে এ মোকর্দ্দমায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষ এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হউক।" ডাক্তার হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন। জজ সাহেব সে দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন. কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। নিজামতে দরখাস্ত করা হইল, সেখানকার জজেরাও তাহা শুনিলেন না। জালরাজা তখন নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা রাজকর্ম্মচারীরা কোম্পানীতে অবশ্য দাখিল করিয়া থাকিবেন। সেই সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নীলাম করিয়া হ্যালিডে সাহেবকে পাথেয় পাঠান হউক।" এ প্রার্থনাতেও কেহ উত্তর দিলেন না। শেষ কমিসন দ্বারা ডাক্তার সাহেবের জবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করা হইল; কিন্তু জজ সাহেব বলিলেন, "কমিসন বাঙ্গালী সাক্ষীর নিমিত্ত, ইংরাজের নিমিত্ত নহে।"

কোম্পানীর পক্ষ সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত, "যদি ধার্য্য দিনে কোন সাক্ষী উপস্থিত না হয়, তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে।" কিন্তু জালরাজার সাক্ষীদিগকে হাজির করিবার জন্য এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায় করা হইত না। যাহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইতেন, বরং জজ সাহেব তাঁহাদিগকে কটুক্তি করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আপনি আসিয়াছিলেন তাঁহাকে "গাধা" বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সাক্ষীর তালিকায় ছিল,তিনি নিত্য হুগলীতে পাড়ী করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন না। জালরাজার উকীল তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। আমি এই জেলায় বাস করি, আমার জমিদারি, বিষয় আশায় সমুদয় এই জেলায়, শেষ কি বিপদে পড়িব?" এইরূপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন,সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত হইলেন না।

২০শে নবেম্বর হইতে সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদীর পক্ষ যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী মেজেষ্টারিতে লওয়া হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিলাম। দায়রায় কেহ কিছু অতিরিক্ত বলিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিলাম। আসামীর সাক্ষী সম্বন্ধে যে জবানবন্দী নিম্নে দেওয়া হইল, তাহা দায়রায় লওয়া হইয়াছিল। মেজেষ্টারীতে বিচার হয় নাই, সুতরাং আসামীর পক্ষ কোন প্রমাণ তথায় লওয়া হয় নাই।

১২ সেনাক্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষী।

ট্রাওয়ার সাহেব (C. T. Trower) বলিলেন, "আমি ১৮০৮ সাল হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে। কিন্তু এই আসামীকে

দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হালিডে প্রতাপের চিকিৎসা করিতেন। একবার প্রতাপের উরুস্তম্ভ হয়, হালিডে তাহা অস্ত্র করেন। কিন্তু সেই হালিডে আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'এই আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।' হালিডে এখন কাশীতে আছেন।" দায়রায় বলিলেন যে, "আসামী কোন ক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।"

প্রিন্সেপ সাহেব (H. T. Prinsep, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি) বলিলেন, "আমি প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বৎসর কি ২০ বৎসর তাহাকে দেখি নাই, তাহার আকৃতি যেরূপ স্মরণ থাকে, প্রতাপের আকৃতিও আমার সেইরূপ স্মরণ আছে। আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া বোধ হয় না। (I should say that he was not Protap Chunder) প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা প্রতাপের। সে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই। প্রতাপের নাক-চোক কিরূপ ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই।" দায়রায় বলেন যে, "জেনেরেল অলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক দিন হইল, তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।"

প্যাটল সাহেব (James Pattle, বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, "১৮১৩ সালে আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে যাইতেন, কিন্তু কয়বার গিয়াছিলেন, স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছুমাত্র স্মরণ নাই। ঐ ছবির সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।"

হাচিন্সন্ সাহেব (Mr. Hutchinson) বলিলেন, "আমি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের এক্টীং জজ ছিলাম। আসামীকে আমি চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থূলকায়। ইহার সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। তবে বুক হইতে উপর দিকে কতক মেলে। প্রতাপের মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার বোলানিবের নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতাপের জ্বর হইয়াছিল।" দায়রায় এই সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, কারণ, তখন তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

বিচর সাহেব (John Beecher) বলিলেন, "আমি একজন হাউসওয়ালা। আমি প্রতাপকে চিনিতাম। তাঁহার আকৃতি আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই। ছবি দেখিয়াও তাঁহার আকৃতি আমার স্মরণ হইল না। তবে এই ছবির সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একই রূপ লম্বা।" দায়রায় এই সাক্ষীকে আর আহ্বান করা হয় নাই।

ওবারবেক সাহেব (D. A. Overbeck) বলিলেন, "আমি এক্ষণে চুঁচুড়ায় থাকি। দিনামারের আমলে আমি চুঁচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না।" তাহার পর অপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত ছোট রাজা। ছবির আকৃতি আর আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ।" দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, "পূর্ব্বে জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি, আমি তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জানিতাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষের বামভাগে মেহগনি রঙ্গের একটী ক্ষুদ্র দাগ ছিল, তিনি ঊর্দ্ধে চাহিলে সেটী দেখা যাইত, এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের ঘোর কমিয়াছে। এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আর কখন দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার গবর্ণর জেনারেলের এক জন এজেণ্ট গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা প্রতাপচাঁদ সেই রেসিডেন্সিতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় রাজা তেজচাঁদকে লেখায় তিনি উত্তর করেন, 'আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই।' এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না, তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।"

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল। তিনি ওয়াটালুর যুদ্ধের পর, একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কান্তবাবুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসে রোসনাই

দেখিতে যান, আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখন কলিকাতার তাঁতি কি বেণিয়ার বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন—রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না,এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকর্দ্দমায় যখন এই আসামী সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ সময় আমাকে এই ব্যক্তি চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই। ওয়াটাপুর লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। তাহার পূর্ব্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে পারে। মেজেষ্টর সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।" চিঠিসম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী, বিনা সওয়ালে বলিলেন। দায়রায় আসিয়া বলিলেন, "প্রতাপের যে ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।"

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, "প্রতাপের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—একবার গবর্ণর জেনারলের দরবারে,—আর একবার একটা বিবাহবাটীতে। সেখানে প্রতাপ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।" রাজা বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আসিলে লোকে তাঁহার গাত্রে ধূলা দিয়াছিল। এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, বরং তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার পরামর্শ হইয়াছিল

হারক্লটসসাহেব (Gregory Herclots) বলিলেন, "আমি হুগলীর সদর আমীন ছিলাম। দুই তিনবার প্রতাপকে দেখিয়াছি, এখন দেখিলে, বোধ হয়, তাঁহাকে চিনিতে পারি। এই আসামী প্রতাপ নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় তাহা বলিতে পরি না।" দায়রায় বলিলেন, "এই আসামীকে মৃত প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা এক ইঞ্চ লম্বা দেখায়।"

রাধাকৃষ্ণ বসাক বলিলেন, "আমি এই আসামীকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত, তাহা হিসাব নিকাস না করিলে বলিতে পারি না। ষোল হাজার হইবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আমি টাকা দিয়াছি। ইহাকে আমি নিজে চিনিতাম না; কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন, 'ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।' গোপীমোহন এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহন তাঁহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ। ডাক্তার হ্যালিডে আমার নিকট বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ। তদ্ভিন্ন জেনারেল এলার্ড* ঐরূপ বলিয়াছেন, তাঁহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার সঙ্গে লাহোরে এই আসামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি একা ইহাকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই, আরও অনেকে দিয়াছেন; দুই একজন ইংরেজও দিয়াছেন।" দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী বলিলেন, "পূর্ব্বে রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলীর জেলে একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তার হ্যালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ইনি যে নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

রাধামোহন সরকার (যাঁহার সঙ্গে পরাণ বাবু একদল লাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়াছিলেন) গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে এই আসামীর বিস্তর প্রভেদ। প্রতাপচাঁদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর এ লোকটা দেখিতে যে ভিকে হাড়ি। এ লোকটার হাত-পা বড় বড়, শরীর লম্বা, বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। আমি এখন রাজবাটীর দেবত্তর মহলের মোক্তার। আগা একাস নামে কোন মোগল কস্মিন্‌কালে প্রতাপচাঁদের চাকর ছিল না।"

বসন্তলাল বাবু বলিলেন, "আসামীকে আমি চিনি না। ইহাকে একবার বাঁকুড়ার মেজেষ্টরিতে দেখিয়াছিলাম, তখন ইহার দাড়ি ছিল। † এ ব্যক্তি

* জেনেরেল এলার্ড মহারাজ রঞ্জিত সিংহের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

† অনেকে বলেন যে, যখন জালরাজার দাড়ি ছিল, তখন তাহার সহিত চিত্রপটের সাদৃশ্য হঠাৎ অনুভব হইত না; তাই রাজবাটী হইতে চিত্রপট আনীত হইয়াছিল। পরে জালরাজা তখন

প্রতাপচাঁদ নহে। আমি এক্ষণে রাজবাটীর খাস দপ্তরে কর্ম্ম করি। পরাণ বাবুর পুত্র তারাচাঁদ আমার নাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।" দায়রায় বলিলেন, "আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা লম্বা, বয়স অল্প। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রতাপ জন্ম গ্রহণ করেন।"

মোহনলাল বাবু বলিলেন, "আমি রাজবাটীর হাতীশালার দারগা। এই আসামী প্রতাপচাঁদ নহে।" দায়রায় বলিলেন, "রাজা প্রতাপের সঙ্গে আসামীর বয়সে, বর্ণে দৈর্ঘ্যে, আকৃতিতে, গঠনে, কি কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই।"

ভৈরবনাথ বাবু বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, এ আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজবাটী হইতে তন্খা পাই।" দায়রায় বলিলেন, "আমি পরাণ বাবুর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছি, পরাণ বাবুও আমার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।"

নন্দলাল বাবু বলিলেন, "আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজসরকারে কর্ম্ম করি।" দায়রায় বলিলেন, "পরাণ বাবু আমার কুটুম্ব।"

এইরূপে আর কয়েকজন জবানবন্দী দিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর সাক্ষী—পরাণ বাবুর চাকর।

১৩। সেনাক্ত সম্বন্ধে আসামীর সাক্ষী।

ডাক্তার স্কট সাহেব [Robert Scott, 37th Madras Native Infantry] বলিলেন, "আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম। তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া আমি ইঁহার সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্নই মিলিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইঁহার গালের ভিতর একখানি ঘা হইয়া শোষ হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘার দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না।

শীতকালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামেন। আর প্রতাপের মত ইঁহার হাসি, কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রতাপের মত কণ্ঠ পরিষ্কার করা ইঁহার অভ্যাস। প্রতাপের মত ইঁহার বসিবার ভঙ্গী। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন, কিন্তু আসামী তেমন কহিতে পারিলেন না। দেখিয়া, আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 'আর অভ্যাস নাই'। তাহা হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম, কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল শুনিয়া কোন ভাষা শিখিলে এইরূপ হয়। পূর্ব্বের কথা আসামীকে দুই একটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখনকার জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আসামী আর কোন সাহেবের নাম করিতে পারিলেন না। আমি আপনকার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'আমি কি করিয়া বেড়াইতাম?' আসামী বলিলেন, 'একটি পিস্তল লইয়া পথে পথে কুকুর মারিয়া বেড়াইতে।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল?' আসামী উত্তর করিলেন, 'বুলার সাহেব রঘু বাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। রঘু বাবু তথায় বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ চিরিয়া বিষের কথা বলিয়াছিলে।' এ সকল কথাই সত্য। প্রতাপ মেদেরা মদ খাইতেন। আমি কথা জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলিলেন, 'আমি আর মদ খাইনা, তবে ব্রাণ্ডি এখনও ভালবাসি।' আমি যখন বৰ্দ্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে ট্রাওয়ার সাহেব থাকিতেন। আমি তাঁহার পুত্রদের চিকিৎসা করিতাম। সে দিন আমি আপিসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি সামান্য।"

রিডিলি [John Ridley] বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদের মত। আমি ইঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'আপনার নিকট কখন আমি কিছু বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না?' আসামী বলি-

সময় অপেক্ষা করিতেছিলেন। চিত্রপটখানি আদালতে আনীত হইলে পর, তিনি দাড়ি ফেলিলেন। তখন সকলেই দেখিল, চিত্রপটের সহিত তাঁহার মুখের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

লেন যে, 'একবার একটী সোণার ঘড়ি বিক্রয় করিয়াছিলে।' আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম 'রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিন্সাল সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল?' তাহাতে আসামী বলেন, 'রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ ভঞ্জন হয়।' এ সকল প্রকৃত কথা।"

বিবি হেরিয়াট বিটিং বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে বিশেষরূপে চিনিতাম। আসামী নিশ্চয়ই সেই প্রতাপচাঁদ। আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইঁহাকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি।"

বিবি সফিয়া ক্রেন বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম। এই আসামী নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।"

জন মার্শল বলিলেন, "আমি ৭১ নম্বর সিপাহী-পল্টনের ব্রিগেড মেজর। আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তাহা আমি জানি না। তবে ২০ বৎসর কি ততোধিক হইল, ইঁহার সঙ্গে ওবারবেক সাহেবের বাটীতে ও অন্যত্র আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ছিল। ইঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। ইঁহার অন্য কোন নাম যদি তখন শুনিয়া থাকি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইঁহাকে দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয়, ১৮২০ সালের পর, আর আমি ইঁহাকে দেখি নাই। তাহার পর ওগল্বির মোকর্দ্দমার সময় সুপ্রিম কোর্টে ইঁহাকে সাক্ষ্য দিতে দেখিয়াই আমার তখন স্মরণ হইল যে, এ ব্যক্তি আমার আলাপী, কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি। স্মরণ করিবার নিমিত্ত, ইঁহার মুখের ছবি আমার অনুশীলনে আঁকিয়া লইলাম। সেই ছবি ইংলিসম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি জুয়াচোর। ইহাকে আমি পশ্চিমে কোথায় দেখিয়া থাকিব। তাহার পর, গত [illegible] ওবারবেক সাহেবের বাটীতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয়। তিনি ছোট রাজার সংক্রান্ত দুই একটী ঘটনা বলিলেন। আমার তখন স্মরণ হইল—ছোট রাজাকে মনে পড়িল। আসামী বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, আমি তাহা জানিতাম। কিন্তু চুঁচুড়ায় যাঁহাকে ছোটরাজা বলিতাম, তিনিই যে বর্দ্ধমানের [illegible], তাহা আমি জানিতাম না।"

ফ্রান্সিস্কা সুলিমান (সাং চন্দননগর, জাতিতে ফরাসিস), বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে চিনি, আমি সর্ব্বদাই চুঁচুড়ায় যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাঁদকে দেখিয়াছি। একবার নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আট দশ বার যাতায়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী—সেই প্রতাপচাঁদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং নীলকুঠী বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।"

হাজি আবু তালেব, চুঁচুড়ার একজন মোগল, সওয়ালমতে বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন হাকিম তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীতে থাকিত। আমি তথায় গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়িতাম। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে বিলক্ষণ চিনিতাম। কিছুকাল পরে আমি লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিয়া শুনিলাম, প্রতাপচাঁদ মরিয়াছেন, কিন্তু আসগর আলি এবং অন্যান্য লোক আমায় বলেন যে, রাজা মরেন নাই, পলাইয়াছেন। এই আসামী সেই রাজা। আমি পূর্ব্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিতেছি।"

ডাক্তার জুলিয়ান নাইটাঙ্গ, সাং ফরাসডাঙ্গা, ফরাসি ভাষায় জাবানবন্দী দিলেন —"আমার বয়স ৭৯ বৎসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দ্ধমানের রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই, ইহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। আমি সেদিন জেলখানায় ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আসামী আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন।"

ফ্রেডারিক থিয়ার্শ বলিলেন, "আমি ফরাসডাঙ্গার মেজেষ্টর, আমি নিজে আসামীকে চিনি না। সেদিন আমি ডাক্তার নাইটার্ড সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়াছিলাম। ডাক্তারকে আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি জেনারেল এলার্ডকে চিনি, তিনি এখন লাহোরে আছেন। তিনি এক দিন জেলখানায় আসামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জেলখানা হইতে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার সহিত এই আসামী সংক্রান্ত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, এই আসামীকে তিনি লাহোরে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। জেনারেল এলার্ড বোধ হয়, ১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন

করেন। তাহার পর আমার সহিত কথা হয়। (এই জবানবন্দীর পর অথচ মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে জেনেরেল এলার্ডের মৃত্যু হয়)।

গোলোকচন্দ্র ঘোষ, সাং সালিখা, বলিলেন, "আমি কিছুদিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরেজি পড়াইয়াছিলাম। তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমি চিনি, এই আসামী সেই ছোট মহারাজ। ছোট রাজা মরিয়াছেন, এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। আবার তাহার একমাস পরে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, "আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স ৮৬ বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্দ্ধমানে প্রথম ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি ইঁহাকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ছোট মহারাজ মরেন নাই, মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন।"

রামধন বাগ্দী বলিল, "আমি পল্তার ঘাটমাজি এই আসামী মহারাজকে চিনি। ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের মাজি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন বাবুর একখানি বাগান ও বৈঠকখানা ছিল। সেখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন, এক রাত এক দিন সেখানে থাকিতেন, ইহা আমি দেখিয়াছি।"

আমীর উদ্দীন আমেদ বলিলেন, "আমার নিবাস চুঁচুড়া। আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি চুঁচুড়ার রাজবাটীতে মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। তাহার পর মৃত বুড়া রাজার ফরাসিস বিবি ইসাবেল আপন পুত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজবাটীতে রাখেন। প্রতাপচাঁদ চুঁচুড়ায় আসিলেই আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ।"

খোদা আব্বাস যে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপে সঙ্গে থাকিত সেই ব্যক্তি বলিল, "এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

ডেবিড হেয়ার সাহেব (David Hare) বলিলেন, "আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন ছয় সাত বার আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। পার্শের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। সেই ছবির পার্শে আসামীকে একবার এ দিকে একবার ওদিকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোক, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষতঃ ছবির বামদিকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে। আসামীর চিবুক ও নিম্ন ঠোটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে, তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম দেখিলাম, তখন তাহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, আমার ভ্রম হইয়াছিল। আসামী ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় আসামীর সহিত দুই এক বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি?' প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে যাই, তাহা প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না, তাহার পর স্মরণ হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটা দূরবীণ আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি।' এ সকল কথা প্রকৃত। দূরবীণ প্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একবার পানিহাটি গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেখানে আসামীকে দেখিয়াছিলাম। তখন ইহার মুখের উপরিভাগ দেখিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু ঐ সময় ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া আমি ভাল চিনিতে পারি নাই। তাহার পর ওগলবির মোকর্দ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষ্য দিতে দেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সিলি লিথ্ সাহেবকে বলি। আমি অনেক দিন জনরবে শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।"

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, "আমার পিতার নাম মহারাজ চৈতন্য সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম এবং এক একবার গিয়া দুই মাস করিয়া থাকিতাম। আসামী

নিশ্চয়ই তেজচাঁদ বাহাদুরের পুত্র প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি প্রতাপের পলায়নবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। তাহার পর সাত আট বৎসর হইল লাহোর-নিবাসী আমার একজন পাঠান দারবান্ স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি রঞ্জিতসিংহের পুত্র খড়ক সিংহের সহিত প্রতাপচাঁদকে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' আসামী প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল। আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তথায় তিন মাস রাখি। সেই জন্য বাঁকুড়ার মেজেষ্টর আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন আর বিস্তর অপমান করেন।"

জামকুড়িনিবাসী রাজা জয় সিংহ বলিলেন, আমি বিষ্ণুপুরের রাজ-গোষ্ঠীসম্ভূত। আমি আসামীকে চিনি, প্রতাপচাঁদ।"

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন, "আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি ইহাঁর চিকিৎসা করিয়াছি। আসগর আলি ইহাঁর বেতনভোগী হাকিম ছিলেন। তাঁহার মুখে বিশেষ করিয়া [illegible] যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, [illegible]ইয়াছেন।

কুঞ্জবিহারী ঘোষ বলিলেন, "আসামী আমার এক মুনিব প্রতাপচাঁদ। ইনি যখন প্রথম [illegible]পবাগে আসেন, আমি তখন ইহাঁকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম এবং পরাণ বাবুর পুত্র [illegible]চাঁদকে তাহা বলিয়াছিলাম।"

পিটর এমার সাহেব, ফ্রেজর সাহেব, নাজির [illegible] হোসেন, আগা ইস্পাহানী ও স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি আরও অনেকে আসামীর পক্ষে [illegible]প জবানবন্দী দিলেন। প্রতাপচাঁদের পিসী [illegible]কুমারী, আর তাঁহার দুই স্ত্রী সপিনা পাইয়া[illegible], কিন্তু তাঁহারা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন।

জবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে একদিন রাজা প্রতাপচাঁদের মাতুল হঠাৎ আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার একজন [illegible] ছিলেন। জালরাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ আমার মাতুল আসিয়াছেন। ইহাঁর জবানবন্দী লওয়া হউক।" কিন্তু তাঁহার উকীল তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "সোনাক্তসম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকদ্দমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিব না।" জালরাজা তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলে, উকীল সাহেব তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "উপস্থিত ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় দেওয়ানীর প্রমাণ অনাবশ্যক। যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী আপনাকে সোনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচাঁদ কি না, এ কথার বিচার দেওয়ানী আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না, এখানে সে বিচার হইলেও কোন ফল দর্শিবে না। এখনকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না। আপনাকে আবার দেওয়ানীতে নালিশ করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?"

সা সাহেব এখানে ভুলিলেন। তিনি জানিতেন যে, গুটীকতক প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী একত্র হইয়া পূর্ব্বাহ্নে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে,জালরাজাকে আসামী ভিন্ন কখন মোকর্দ্দমায় ফরিয়াদী হইতে দেওয়া হইবে না; এবং সেই পরামর্শ অনুসারে জাল-রাজাকে ফৌজদারীতে আসামী করা হইয়াছিল। এ কথা সা সাহেব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন; তথাপি তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অন্য লোকে দেওয়ানী আদালতে যেরূপ নালিশ করে, জালরাজাও সেইরূপ নালিস করিতে পারিবেন। তাঁহার এ প্রত্যাশা অসঙ্গত। জালরাজার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার অভাবনীয়—অচিন্তনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা যাইবে।

১৪। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কি না।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী রাধারমণ সরকার, বসন্তলাল বাবু, নন্দবাবু,ভৈরব বাবু প্রভৃতি দশের জন জবানবন্দী দিলেন। তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর বেতনভোগী এবং পরাণ বাবুর আত্মীয়-কুটুম্ব। তাঁহারা কে কি বলিলেন, আনুপূর্ব্বিক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক। মোট কথা, তাঁহারা সকলেই এইরূপ বলিলেন যে, ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ রাত্রি দেড় প্রহরের সময় কালনার রাজবাটী হইতে প্রতাপচাঁদকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়। তখন বড় অন্ধকার। পৌষমাসের রাত্রে বড় শীত। সেই শীতে প্রতাপচাঁদকে জলের নিকট রাখায় তাঁহার কম্প আসিল, কাজেই

তাঁহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া যাইতে হইল। তাঁবু সেই স্থানে জলের ধারেই পূর্ব্বেই খাটান হইয়াছিল তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। এ দিকে প্রতাপচাঁদ পালঙ্কে শুইয়া হাতী,ঘোড়া, ধন, ধান্য দান করিতে লাগিলেন। দান করা হইলে পর তাঁহার অন্তর্জ্জলী করা গেল। মোহন বাবু তাঁহার পা জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে খাদিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করেন। বাবলা ও চন্দন-কাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়। সেই সময় ঘাটে দশ বারটা মশাল জ্বালা ছিল।

সাক্ষীরা এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। কিন্তু তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু কোন্ তারিখে বা কোন্ সময়ে হয়, তাহা সাক্ষীরা অনেকেই বলিতে পারিলেন না, অথচ প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। কেহ বলিলেন, "তাহা স্মরণ নাই।" কেহ বলিলেন, "বনুরা দের মোকর্দ্দমায় এই সকল বিষয়ে আমি সাক্ষী দিয়াছিলাম, তাহাতেই প্রতাপচাঁদের মৃত্যুবৃত্তান্ত আমার স্মরণ আছে। তেজচাঁদের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই।" সাক্ষীরা এইরূপ নানা হেতু দর্শাইলেন।

কিন্তু এই সকল জবানবন্দীতে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তিনি আপনার রায়ে লিখিলেন :—

"The proof here is of the strongest description of the testimony of the fact; viz. the deposition of the witnesses (fifteen in number) named in the margin, who have sworn positively to the death and cremation, ann who are consistent in their narrative of the attendant particulars, their testimony would appear to be conclusive."

বিশ বৎসরের ঘটনা পনের জন সাক্ষীতে বর্ণন করিল, অথচ কেহ কাহার সহিত কোন অংশে অনৈক্য হইল না। কি কাষ্ঠ দ্বারা শবদাহ করা হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত সাক্ষীরা একইরূপ বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জবানবন্দীর প্রতি জজ সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল

জাল-রাজা জজকে বলিলেন, "পরাণের আত্মীয়-কুটম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও? প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটম্ব, পরাণের চাকর, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপের ত কুটম্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই, তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।" জজ সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

জালরাজা স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছামতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, "যে কোন পীড়া আমি অনুকরণ করিতে পারি, মৃত্যুও অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজেরা সে অনুকরণ ছন্দাংশে বুঝিতে পারিবে না।"

পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে জালরাজার কথা কতদূর গ্রাহ্য, তাহা বলা যায় না। তবে বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে দুই একজন বলেন যে, মৃত্যু অনুকরণ তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন যে, এক সময় কর্ণেল টাউনসেণ্ড বড় পীড়িত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে দুইবার করিয়া দেখিতে যাইতেন। একদিন কর্ণেল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "কতদিন হইতে আমার কেমন একটা হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না; আমায় তোমরা বুঝাইয়া দেও। আমি দেখিতেছি যে, মনে করিলে আমি মরিতে পারি, আবার চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারি।" সে স্থানে আর একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম বেনার্ড এবং আর একজন এপথিকারি ছিলেন, তাঁহার নাম স্কাইন। এই কয়েক জন কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কতকটা অবিশ্বাসও করিলেন। কিন্তু কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবেরা একে একে কর্ণেল সাহেবের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। নাড়ী বেশ পরিষ্কার, তবে একটু ক্ষীণ। তাহার পর বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও সহজমত টিপ্ টিপ্ করিতেছে। তাহার পর কর্ণেল সাহেব চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ডাক্তার চেনি সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন, ডাক্তার বেনার্ড বুকে হাত দিয়া থাকিলেন, আর স্কাইন সাহেব এক-

খানি পরিষ্কার দর্পণ নাসার নিকট ধরিয়া রহিলেন। ক্রমে নাড়ী যাইতে লাগিল—শেষ তাহা একেবারে পাওয়া গেল না। হৃৎ-চালনা স্থগিত হইল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও স্থির হইয়া গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধরা হইয়াছিল, তাহাতে আর নিশ্বাসের ঘাম লাগিল না। তাহার পর ডাক্তারেরা একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, সকলেই দর্পণ ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতের চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না। তখন তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কাতর্কি করিলেন, এ সময়ের মধ্যে কর্ণেল সাহেবের আর চৈতন্য হইল না। শেষ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কর্ণেল সাহেব নিশ্চয়ই মরিয়াছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। তাহার পর তাঁহারা চলিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় কর্ণেল সাহেবের শরীর একটু নড়িল। ডাক্তারেরা নাড়ী দেখিলেন—নাড়ী হইয়াছে; বুকে হাত দিলেন—হৃৎপিণ্ডের গতি আরম্ভ হইয়াছে; নাসায় হাত দিলেন—নিশ্বাস বহিতেছে। শেষ কর্ণেল সাহেব ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা অবাক্ হইয়া থাকিলেন, কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ থাকিল না। *

এরূপ আরও দুই চারিটী ঘটনার কথা শুনা যায়। ডাক্তার টানার সাহেব লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ, এ

ডাক্তার চেনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"Colonel Townsend told us, he had [illegible] for us to give him some account of [illegible] odd sensation, he had, for some time, [o]bserved and felt in hims lf: which was, [th]at composing himself, he could die or [ex]pire, when he pleased, and yet by an [eff]ort, or some how, he could come to life [ag]ain, which, it seems he had sometimes [trie]d before he had sent for us. We heard [this] with surprize, but as it was not to be [acco]unted for, from now common princi[ples], we could hardly believe the fact as [he r]elated it, much less give any account unless he should please to make [the e]xperiment before us, which we were [unwi]lling he should do, lest, in his weak [cond]ition, he might carry it too far. He [conti]nued to talk very distinctly and sen[sibly] above a quarter of an hour about this [to him]) surprizing sensation and insisted so much on our seeing the trial made, that we were at last forced to comply. We all three felt his pulse first: it was distinct, tho' small and thready: and his heart had its usual beating. He composed himself on his back, and lay in a still posture some time: while I held his right hand, Dr. Baynard laid his hand on his heart, and Mr. Skrine held a clean looking-glass to his mouth. I found his pulse sink gradually till at last I could not feel any by the most exact and nice touch. Dr. Baynard could not feel the least motion in his heart, nor Mr. Skrine the least soil of breath on the bright mirror he held to his mouth; then each of us by turns examined his arm, heart and breath, but could not by the nicest scrutiny discover the least symptom of life in him. We reasoned a long time about this odd appearance as well as we could, and all of us judging it inexplicable and unaccountable, and finding he still continued in that condition, we began to conclude that he had, indeed, carried the experiment too far, and at last were satisfied he was actually dead, and were just ready to leave him. This continued about half an hour. By nine O' clock in the morning in autumn as we were going away, we observed some motion about the boby, and upon examination found his pulse and the motion af his heart gradually returning; he began to breathe gently and speak softly: we were all astonished to the last degree at this unexpected change, and after some further conversation with him and among ourselves, went away fully satisfied as to all the particulars af this fact but confounded and puzzled and not able to form any rational scheme that might account for it."—Quoted by T. H. Tanner in his practice of Medicine 6th. Edition, Vol. I.

সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ আছে। যথা—সেল্‌সাস সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, একজন পাদরী যখনই ইচ্ছা করিতেন, তখনই আপনার সংজ্ঞাকে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন।*

শুনা যায় দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। অনেকে বলেন, যোগিদের মধ্যে সে পদ্ধতির চর্চ্চা অদ্যাপি বিলক্ষণ প্রচলিত। ভূকৈলাসের যোগী ও রণজিৎ সিংহের যোগী এ কথার প্রমাণস্থল। লোকে বলে, তাঁহারা উভয়েই এরূপ সংজ্ঞাহীন হইতে পারিতেন যে, ডাক্তারেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াও জীবনের লক্ষণ কিছুই পাইতেন না। ডাক্তার ম্যাগ্রেগর সাহেব নিজে রণজিতের যোগীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেই যোগীকে এক সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া চল্লিশ দিন রাখা হইয়াছিল; চল্লিশ দিনের পর মৃত্তিকা খনন করিয়া সিন্দুক বাহির করা হইলে দেখা গেল, তাহার ভিতর যোগী সমাধি অবস্থায় আছেন—তাঁহার সংজ্ঞা নাই। ডাক্তার (Mc Gregor) সাহেব নাড়ী দেখিলেন—নাড়ী নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহার চেতনা হইল। ডাক্তার-সাহেব "History of the Sikh war" গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"A Faqueer who arrived at Lahore, engaged to bury himself for any length of time, shut up in a box, and without either food or drink. Runjeet naturally disbelieved the man's assertions, and was determined to put them to the test. For this purpose the Faqueer was shut up in a wooden box, which was placed in a small apartment below the middle of the ground; there was a folding door to his box, which was secured by a lock and a key. Surrounding this apartment there was the garden-house, the door of which was likewise locked; and outside the whole a high wall, having its door-way built up with bricks and mud. In order to prevent any one from approaching the place, a line of sentries was placed, and relieved at regular intervals. The strictest watch was kept up for the space of forty days and forty nights, at the expiration of which period the Maharajh, attended by his grandson and several of his Sirdars, as well as General Ventura, captain Wade, and myself, proceeded to disinter the Faqueer. The bricks and mud were removed from the outer door-way: the door of the gardenhouse was next unlocked, and lastly that of the wooden box containing the Faqueer. The latter was found covered with a white sheet, on removing which, the figure of the man presented itself in a sitting posture. His hands and arms were pressed to his sides, and his legs and thighs crossed. The first step of the operation os resuscitaion consisted in pouring over his head a quantity of warm water. After this, a hot cake of atta was placed on the crown of his head; a plug of was next removed from one of his nostrils, and on this being

* "The influence of the will over even the involuntary muscles, is sometimes extraordinary as many remarkable cases attest. Thus Celsus speaks of a priest who could separate himself from his senses when he chose, and lie like a man void of life and sense. Carden used to boast of being able to do the same. But the most surprising example of this kind is the well known case of Colonel Townsend related by Dr George Cheyne." T. H. Tanner's Practice of Medicine 6th Ed. vol. I. page 500.

done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opend, and the tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forward, and both it and the lips anointed with ghee. During this part of the proceeding, I could ont feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard of health. The legs and arms being extended and the eyelids raised, the former were well rubbed and a little ghee applied to the latter. The eyelids presented a dimmed suffused appearance, like those of a corpse. The man now evinced signs of returning animation; the pulse became perceptible at the wrist, whilst the unnatnral temperature of the body rapidly diminished. He made several ineffectual efforts to speak and at length uttered a few words in a tone so low and feeble as to render them inaudible. When the Faqueer was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns and other demonstration of joy.

হঠযোগ অভ্যাস করিলে এ সকল ভেল্কী অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। জালরাজার তাহা অভ্যাস ছিল, এ কথা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; জজ, উকীল প্রভৃতি কেহ তাহা বুঝিলেন না, সুতরাং বিশ্বাসও করিলেন না। খেচরী মুদ্রা দ্বারা শ্বাস রোধ করিয়া মৃত্যু অনুকরণ করা যাইতে পারে, এ কথা ইংরেজি বুদ্ধির অতীত—আমাদের বুদ্ধিরও অতীত। আমরা ইংরেজি গ্রন্থে সে সকল কথা দেখি না, সুতরাং সে সকল কথা বিশ্বাস করি না।

জালরাজার পীড়ার ভাণ-সম্বন্ধে উকীল সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন যে, "প্রথমে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, এ প্রতাপচাঁদ সত্যই জাল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়। ক্রমে নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম যে, ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। কিন্তু মৃত্যুর ভাণ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিল। পরে একদিন সে সন্দেহের কথা হুগলীর জেলখানায় বসিয়া গল্প করিতে করিতে জালরাজাকে বলিলে, জালরাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, 'এ পরীক্ষা অতি সহজ। তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, আমি এখনই একটা পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকি।' তখন ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব হুগলীর সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় আসিলেন এবং জালরাজাকে দেখিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, 'জালরাজার বড় জ্বর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, বোধ হয়, তাঁহার গোদ হইবে। আপাততঃ তিনি কিছু দিন আদালতে যাইতে পারিবেন না'।" এ কথা প্রকৃত হইলে, পীড়ার ভাণ করিবার ক্ষমতা জালরাজার ছিল বলিয়া বোধ হইতে পারে।

সে কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ডাক্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়া সা সাহেব জজ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "জামিন লইয়া জালরাজাকে খালাস দেওয়া হয়, এবং আপাততঃ তাঁহাকে একখানি চারপাই আর একখানি গাত্রবস্ত্র দেওয়া হয়।" জজ সাহেব কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বিগনেল সাহেব বলিলেন যে, "জেলের আসামীর জন্য এ সকল সরঞ্জাম দিবার কোন বিধি আইনে নাই। তবে যদি একান্ত তাহা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ডাক্তার সাহেব আসামীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন।" জজ কার্টিস সাহেব বিগ্নেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহস করিতেন না, তথাপি তিনি বলিলেন যে, "এ বিষয়ের দরখাস্ত করিলে বিবেচনা করা যাইবে।" আর জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করিতে আদেশ করিলেন। সা সাহেব সেই-মত দুই আদালতে দুই দরখাস্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব চারপাই দিতে হুকুম দিলেন এবং কিছু দিন পরে নিজামত হুকুম দিলেন যে, "জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়ার আপত্তি নাই।" কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে হুকুম তামিল করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "এ অঞ্চলের লোকেরা জালরাজার জন্য যেরূপ মাতিয়া

উঠিয়াছিল, এখন আর ওত নাই। এ সময়ে তাহারা জালরাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং জালরাজাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তি-সিদ্ধ নহে।" নিজামত আদালত নিরুত্তর হইলেন।

রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে পর, জালরাজা তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল এইমাত্র দেখাইলেন যে, এই সময় রটনা হইয়াছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই—অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন। জালরাজার উকীলেরা জজ সাহেবকে বলিলেন, "যে স্থলে বড় বড় লোকে বলিতেছে, আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ, সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অন্যথা করিবার আর প্রয়োজন কি?" জজ সাহেব সে কথার বিপরীত বলিলেন যে, "যখন প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তখন কেহ তাঁহাকে সোনাক্ত করিলে আর কি হইবে?"

মৃত্যু রটনার হেতু জালরাজা এইরূপ বলেন:—

"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন। আমার বয়স যখন ষোল কি সতর, তখন তিনি আহারের সঙ্গে আমায় দুইবার বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইন্দুরকে খাইতে দিই; ইন্দুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলাল বাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষ তাঁহারা আমার পিতার মন এমন ভার করিয়া দিলেন যে, আমি তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না।

"আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস' এই সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, যেন সকলেই জানে তুমি—মরিয়াছ। এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সেবার আমার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীরউদ্দীন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন; আমাকেও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র, সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরিয়াছি—সকলে জানা আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভাণ করিয়া কালনায় গেলাম। কালনার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌঁছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন। আমি শয্যায় শুইয়া সেই সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষ অন্তর্জ্জলি করিল। অন্তর্জ্জলির পর যখন রাজবাটীর অধিকাংশ লোক শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল, কেবল দুই চারিজন মাত্র আমার নিকট থাকিল, সেই সময় আমি তাহাদিগকে শপথ করাইয়া জলে সরিয়া পড়ি; নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি; রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুরশিদাবাদ যাত্রা করি।"

এই সময় রটনাও হইয়াছিল—রাজবাটীর লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রতাপ পলাইয়াছেন—মরেন নাই।

১৪ জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কি না?

এই মোকর্দ্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, যশোর জেলানিবাসী শ্যামলাল তেওয়ারি নামে একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়িতে আসিয়া একখানি কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দিনযাপন হইতে থাকে। লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, মধ্যম রূপলাল, সর্ব্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইঁহাদের মধ্যে পৈতৃক ব্যবসায়ে কৃষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ ছিল না, তিনি চাকুরী করিবেন, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদারী করিয়া বেড়াইতেন। তথাকার পাদরী ডিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতি সদয়

ছিলেন, কৃষ্ণলাল তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলাম করিয়া আসিতেন। কিছু দিন পরে পাদরী সাহেব একখানি সুপারিস চিঠি তথাকার মেজেষ্টর ব্যাটি সাহেবকে দেন। সেই সময়ে শান্তিপুরের দারগাগিরী খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টর সাহেব কৃষ্ণলালকে সেই দারগাগিরী দিলেন কিন্তু একদিন পরে আবার পরওয়ানা ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পাদরী সাহেবকে লিখিলেন যে, "আমি শুনিলাম, কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি মন্দ; এবং তাহার একজন খুড়া ডাকাইত। সুতরাং উহাকে আমি চাকুরী দিতে পারিলাম না।" পাদরী সাহেব পত্র পাইয়া কৃষ্ণলালকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, "তুমি আর কখন আমার কুঠীতে আসিও না।" সেই অবধি কৃষ্ণলালের উমেদারী করা ফুরাইল।

সাক্ষীরা বলেন, "কৃষ্ণলাল তাহার পর ব্রহ্মচারী সাজিয়া এখানে ওখানে বুজরুকী দেখাইয়া দিনপাত করিতেন।"

পরাণ বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল এই জালরাজা সাজিয়াছে। যখন জালরাজা বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন, তখন পরাণ বাবু তাঁহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পাদরী ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে বড় গ্রাহ্য হয় নাই। সেবার জালরাজা আলক শা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এবার খোদ মেজেষ্টর সামুয়েল সাহেব এ বিষয়ে উদ্‌যোগী, সুতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল।

সেই সকল সাক্ষী দ্বারা প্রকাশ হয় যে, কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল, তাহার এক পায়ে ছয়টী আঙ্গুল ছিল আর বয়সে রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা কৃষ্ণলাল দশ বার বৎসরের ছোট ছিল।

এই মোকর্দ্দমার চা'র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল নিরুদ্দেশ হন। কেহ বলে, "তাঁহার মৃত্যু ", কেহ বলে, "তিনি আলিপুরের জেলে কয়েদ লেন।" তাঁহার দুই সহোদরের অগ্র পশ্চাৎ লোকান্তর হয়। এই সময় তাঁহার পিতা শ্যামলালেরও মৃত্যু হয়, সুতরাং শ্যামলালের ত্যক্ত পত্তি লাওয়ারিস বলিয়া আদালতে জব্দ কে।

গোয়াড়ির সাক্ষীরা জালরাজাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া কিরূপ সোনাক্ত করিল, তাহা সংক্ষেপে নিয়ে লেখা গেল।

(১) ফকিরচাঁদ তেওয়ারি—নিবাস যশোহর—বলিল, "আসামী আমার ভাগিনা কৃষ্ণলাল। আমি ইহাকে ৮ বৎসর দেখি নাই।"

(২) ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারি বলিল, "আসামী কৃষ্ণলাল আমার পিসীপুত্র। যখন ইহার ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই।"

(৩) গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, "এই আসামী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। ইহার বয়স এখন ৬৩ বৎসর হইবে। আমার ভগিনীপতি বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে চাকরী করিতেন, সম্প্রতি তিনি মরিয়াছেন। ইদানীং আমি কাল্‌নায় থাকি, রাজবাটীতে উমেদারী করি। কৃষ্ণলালের পায়ের আঙ্গুল পাঁচটা কি ছয়টা, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

(৪) রামচন্দ্র বিশ্বাস—আবকারীর একজন খুচরা দোকানদার বলিল "আমি আসামীকে চিনি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি।" (রাজা প্রতাপচাঁদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ ছিল, সেইরূপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা দাগ থাকায় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে কোন দাগ ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে, "হাঁ, বিলক্ষণ দাগ ছিল।" কিন্তু পৃষ্ঠের কোন্ অংশে সে দাগ ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্ততঃ করিতেছে, এমত সময়ে সেরেস্তাদার মনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। সাহেব মনসারামের দশ টাকা জরিমানা করিতে বাধ্য হইলেন)।

(৫) পাল খ্রীষ্টান বলিল, "এই আসামী কৃষ্ণলাল বটে, আমি ইহাকে গোয়াড়িতে ১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি। ইহার সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি। ইহার পিতার নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সোনাক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠান হয়; তখন আমি যদিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, কিন্তু তখন সোনাক্ত করি নাই। নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্ত আমি দশদিন সময় লইয়াছিলাম।" জেরায় বলিল, "গত রাত্রে মাণিক সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে সেরেস্তাদার মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, আমি তাঁহার

নিকট পথখরচা চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহেবের নিকট চাহিতে বলিয়াছিলেন।"

(৬) মহেশপণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান জবানবন্দীতে বলিলেন, "এই আসামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্দ্ধমানে দেখিয়াছি। ইহার নাম কৃষ্ণলাল।" জেরায় বলিলেন, "আমি যখন মেজেষ্টর ও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়া এই আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম বটে যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল কি না, তাহা আমি দশ দিন পরে বলিব। আমি বর্দ্ধমানে থাকি, আমার নিবাস ঐ জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রামে।"

(৭) গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি—এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। ইহাকে গত ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কেবল দুই তিন বার দেখিয়াছিলাম। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না, বলিতে পারি না।"

(৮) রামচাঁদ মিত্র বলিলেন, "আমি বর্দ্ধমানে কালেক্টরীর মুহুরি। এই আসামী কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি। এ ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাড়ুয়ের বাসায় গিয়া থাকিত। যখন ঐ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে 'আমি ছোট রাজা,' তখন আমি কাহাকেও ইহার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই, কেবল ইহাকে গোপনে তিরস্কার করিয়াছিলাম। কিন্তু সে তিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই।"

(৯) ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারীর পেস্কার। এই আসামীকে চিনি, ইনি কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী।

(১০) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খ্রীষ্টান) বলিলেন, "এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন। আমি ইহাঁর চেলা হইয়াছিলাম। ইহাঁর সঙ্গে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান, বরাহনগর প্রভৃতি নানাস্থানে বেড়াইয়াছি। আমি ইহাঁর পাদকজল পর্য্যন্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইহাঁকে দেবতা মনে করিতাম। যখন ইনি বর্দ্ধমানের রাজা হইবার কল্পনা করেন, তখন আমরা মশাগ্রামে ছিলাম। আপনাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া রাষ্ট্র করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তথা হইতে বর্দ্ধমানে গেলেন, আমি ও ইহাঁর ভ্রাতা গৌরলাল উভয়ে মশাগ্রামে থাকিতাম। আসামী বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া বিষ্ণুপুরে যান। আমরা সে সংবাদ পাইয়া তথায় যাই। তাহার পর, আমরা এক সঙ্গে বাঁকুড়ায় যাইতেছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের বলগমা খাঁটিতে গ্রেপ্তার করেন।* গৌরলাল পলাইয়াছিল, আমি ধরা পড়িয়াছিলাম। তিন মাস জেল খাটি। জেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসের অন্য উপায় না দেখিয়া মনে করিলাম, মেজেষ্টরের নিকট কৃষ্ণলালের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া দিলে তিনি আমায় খালাস দিবেন। এই প্রত্যাশায় আমি তাঁহার নিকট দরখস্ত করি। তিনি আমার এজেহার লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে খালাস দেন নাই। তখন আমার নাম কৃপানন্দ ছিল। আমি কৃষ্ণলালের চেলা হইয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ। আমি খালাস হইলে পর, পাদরী হিল সাহেব আমায় খ্রীষ্টান করিয়াছেন। আমি সেই অবধি আর মিথ্যা কথা বলি না। আমার পূর্ব্ব-চরিত্রের পরিচয় পাদরী সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছি। তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী অঙ্গুলি, তাহা বলিতে পারি না।" (অথচ এই সাক্ষী বলিয়াছেন, আমি জালরাজার পাদকজল খাইতাম)।

(১১) প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়াজেলার ফৌজদারী নাজির। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল; কেন না, ইনি রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল।" (এই সাক্ষীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা গল্প অদ্যাপি গোয়াড়িতে প্রচলিত আছে)।

(১২) নীলকমল ঘোষ বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী সেরেস্তাদার। এই আসামী

---

* এলিয়ট সাহেব কমিসনর হইয়া যখন বাঁকুড়ায় যান, তখন একদিন তথাকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এই তেঁতুলতলায় জালরাজাকে আমি গ্রেপ্তার করি।" যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন লেখক নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী যাহা বলিলেন, সুতরাং তাহার সহিত এলিয়ট সাহেবের কথা মিলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে, জালরাজা বাঁকুড়া জেলার বলগমা খাঁটিতে গ্রেপ্তার হন। এ জনরব কিরূপে জন্মিল, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, এই সাক্ষীর জবানবন্দী দ্বারা এই রটনা হইয়া থাকিবে।

দেখিতেছি কৃষ্ণলালের মত, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।"

(১৩) প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদার এই আসামীকে কৃষ্ণলাল বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কৃষ্ণলালের পিতা শ্যামলাল গত বৎসর মরিয়াছে; কেহ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি অদ্যাপি দাবি করে নাই। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

(১৪) হরচন্দ্র হাজরা বলিলেন, "আমি নদীয়া জজ আদালতের উকীল। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই।"

(১৫) ব্রজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "কৃষ্ণলালকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে আমার নিকটে অনেক দিন ধরিয়া উমেদার ছিল। এই আসামীর সহিত সে কৃষ্ণলালের বিস্তর প্রভেদ।"

(১৬) মুন্সী মকিম বলিলেন, "কৃষ্ণলালকে আমার ভাল স্মরণ নাই। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে। আমি শুনিয়াছি, কৃষ্ণলাল মরিয়াছে।"

(১৭) পাদরী ডিয়ার সাহেব (Rev. [illegible] W. F [illegible]eere) বলিলেন, "আমি এখন কৃষ্ণনগরে থাকি, [illegible]র্ব্বে কিছুদিন বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি কৃষ্ণলালকে [illegible]াল চিনি। তাহার পিতা শ্যামলাল কৃষ্ণলালের [illegible]করীর নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করে। কৃষ্ণলাল [illegible]ত্যহ আমার বাটীতে আসিত। ব্যাটি সাহেবকে [illegible]ষ্ণলালের নিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই। ব্যাটি [illegible]াহেব তাহাকে চাকরী দেন নাই। ১৮৩৬ সালে [illegible]অর্থাৎ বাঁকুড়ায় মোকর্দ্দমার সময়) বর্দ্ধমানের [illegible]রাণ বাবু আমার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়া-[illegible]লেন। তাহারা আমায় বলে, 'একবার হুগলী [illegible]য়া জালরাজাকে সোনাক্ত করিতে হইবে।' তাহারা [illegible]মায় পথখরচ বলিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছিল, তাহা লই নাই। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা কৃষ্ণলালের সন্ধান চাও, তাহা হইলে এখনই সন্ধান আনিয়া দিতে পারি।' এই [illegible] গোয়াড়িতে কৃষ্ণলালের নিকট একজন লোক [illegible] দিলাম। লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, [illegible]লাল ব্রহ্মচারী বলিলেন, কৃষ্ণলালকে টাকার [illegible]ত্ত শিষ্যবাটীতে পাঠাইয়াছেন, দশ বার দিনের [illegible] সে আসিবে, আসিলে তাহাকে পাঠাইয়া দিব।'

তাহার পর সে না আসায়, প্রায় পনর দিবস পরে, আবার শ্যামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম এবার শ্যামলাল বলিয়া পাঠাইলেন, কৃষ্ণলালকে যদি পাদরী সাহেবের এতই দরকার থাকে, তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লাস করিয়া লন। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে। আমি কৃষ্ণলালকে ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি যদি কৃষ্ণলাল হয়, তবে ছয় বৎসরে ইহার অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উর্দ্ধমুখ ছিল, আসামীর নাসাগ্র নিম্নমুখ। ১৮২১ সালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, রাজা প্রতাপচাঁদ এদেশে বিদ্রোহ উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত রণজিৎ সিংহের নিকট গিয়াছেন।"

(১৮) গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি কৃষ্ণলালকে বিলক্ষণ চিনিতাম। সে ব্যক্তি যখন উমেদারী করিত তখন ডিক্ সাহেবের কাছারীতে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাহার পিতা শ্যামলালকে চিনিতাম। কৃষ্ণলালের আকৃতি এই আসামীর মত ছিল না।"

(১৯) কৃষ্ণমোহন সরকার (এই সাক্ষী জবানবন্দী দিবার সময় জজ সাহেব বলিলেন, "আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি ভদ্র লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী") সওয়াল মতে বলিলেন, "আমি গোয়াড়িতে ওকালতী করি, কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, এই আসামীকে কৃষ্ণলালের মত বোধ হয় না।"

(২০) রামধন খৃষ্টান বলিলেন, "আমি এই আসামীকে চিনি না, ইহাকে কখন দেখি নাই। আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, তাহার সহিত ইহার কিছু আদল আইসে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি সে নহে। কৃষ্ণলাল ইহা অপেক্ষা লম্বা ও গৌরবর্ণ। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উন্নত ছিল, এ ব্যক্তির তাহা নহে, আর তাহার চক্ষু ছোট ছিল।"

(২১) কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি এখন উত্তরপাড়ায় থাকি। পূর্ব্বে টোল-দারগা ছিলাম। কৃষ্ণলাল আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, তাহার মুখ লম্বা ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল।"

গোয়াড়ির অন্য অন্য যে সকল লোক মেজেষ্টরীতে বলিয়াছিল যে, এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, দায়রায় তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই; সুতরাং আমরাও তাহাদের কথা অত্র উল্লেখ করিলাম না।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব

রায় দিলেন যে, "আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাণ-কৃষ্ণ দুর্গানের কথাও সেইরূপ। সে বলে যে, সে তিন চারি বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ সে জানে না যে, কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী অঙ্গুলি ছিল।"

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন যে,"জালরাজা যে কৃষ্ণলাল, এ কথা একপ্রকার প্রমাণ হইয়াছে।" আরও বলিলেন যে,"এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজনও নাই। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাঁহার শবদাহ যখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।" *

---

* "Combining all their testimonies, I cannot avoid the conclusion that the Prisoner's identity is sufficiently established by a preponderance of evidence above whatever has been adduced to impeach it. Evidence in such a matter cannot be expected to amount to absolute demonstration, Some dimness, and it may be doubt, will obscure the recital now of details which occured at a remote date. But circumstances considered I look upon the proofs as being on the whole satisfactory. It is true that on the main point the Law-Officer rejects the evidence on the grounds that there are several descrepancies, which I admit, in the averments made by the witnesses who swears to the prisoner's identity with Kristo Lal * * * For the reasons which I have stated above, it appears to me, the identity is established by tolerably good, or I may say sufficient evidence, although it may not be so satisfactory and decisive as the testimony to the Rajah's death. But I have a remark to make on this subject. After the prosecutor had proved the death and cremation of Rajah Protab Chunder, it was, I think, in no way incumbent on him to show who the prisoner really is. So long as the death, cremation, and non-identity remain, as I regard them firmly established, it would have been a matter of no moment to the case had he failed to prove that the prisoner is Kristo Lal," Extract from No. 3 of the Calender for Sept 1838.

১৫। কাল্‌নায় জমিয়ৎবস্ত হইয়াছিল কি না?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টারীতে লওয়া হয় নাই। দায়রায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন যে,কালনায় জমিয়ৎ-বস্ত অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি শেষে কয়েক-জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির আসাদ্ আলি আর দারগা মহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কালনার চৌকাদারেরা সামান্য চাকর, কি বলা আবশ্যক, কি বলা অনাবশ্যক, তাহা কিছুই বুঝিল না; সুতরাং তাহারা অনেকে অম্লানবদনে বলিল যে, কালনায় কোন জমিয়ৎবস্ত হয় নাই।

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন যে, কালনায় জমি-য়ৎবস্ত প্রমাণ হইয়াছে।—

"This charge, I view, is substantiated by the evidence of Mahaboollah Darogah and other Policeo fficers, and by that of Assadi Ali, the Burdwan Foujdary Nazir ; but there is, I conceive, no proof of an affray or actual breach of the peace. I should say the only facts proved are, first, that the prisoner No. I, the soi-dissant Rajah did not disperse his armed followers on receiving orders from the police officer to that effect, after the Darogah had explained to him the nature of the Purwanah or orders issued from the Burdwan Magistrate, requiring him to disperse his armed followers. Secondly, that the prisoner No. I, persisted in landing with a darwan sword in his hand, and visiting the shrine of Lalji Thakur at Culna : in the progress to which place, attended by a part of

his followers, ordered some of his people to disarm the two sepoys on guard at the burying ground of the Burdwan Rajah, but on the remonstrance of the Darogah, he at last, desisted from this foolish freak; after which, the soi-dissant Rajah and his people returned to the boats."

জজ সাহেব যাহাই বলুন, আপিলে এ কথা রক্ষা হয় নাই। সে পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে

১৬। জাল-রাজার নিজ কথা

আসামীর পক্ষে সকল সাক্ষী হাজির হইলেন না। প্রতাপচাঁদের রাণীরা জবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জালরাজাকে তাঁহারা সোনাক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র রটনা আছে; কিন্তু বাস্তবিক সে রটনা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জালরাজা তাঁহাদিগের সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। জজ সাহেব তাঁহাদের বলেন যে, তাঁহারা চূড়ার রাজবাটীতে আসিলে কমিসন্ দ্বারা তাঁহাদের জবানবন্দী লওয়া যাইবে। তাহাতে রাণীরা সম্মত হইলেন না। সুতরাং জালরাজা আর কোন চেষ্টা করিলেন না। তাহার কিছুদিন পরে, রাণীরা হঠাৎ দরখাস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি। এবার জালরাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন; বলিলেন, "আমি রাণীদের সাক্ষ্য চাহি না।" ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল না। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, 'এ সকল বুঝি কৃষ্ণ ঠাকুরের মানকেলি।' যখন জালরাজা উপযাচক হইয়াছিলেন, তখন রাণীরা মাথা নাড়িলেন; আবার যাই রাজা মান করিলেন, আর তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না, আপনারা সাধিয়া সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন। লোকে যে যাহা বলুক, আমরা শুনিয়াছি যে, রাণীরা সাক্ষা পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, "আসামীকে যদি বাস্তবিক ছোট মহারাজ বলিয়া আমরা চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না। আসামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াছে এবং হয় ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব ?" এই জন্য তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। তাহার পর যখন জালরাজা শুনিলেন যে, রাণীরা জবানবন্দী দিবার নিমিত্ত উপযাচক হইয়া দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি সা সাহেবকে বলিলেন, "কাহার দ্বারা এ দরখাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক।" সা সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, পরাণ বাবুর লোক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, এবং পরাণ বাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। জালরাজা উকীলকে বলিলেন, "এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। সে অনুরোধের অর্থ এই যে, তাঁহারা আমাকে সোনাক্ত না করেন, কিন্তু কি জানি, স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি ? তাঁহারা সুখে আছেন, সুখে থাকুন আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না।"

জালরাজার এই কথামতে রাণীদের এত্রা করা হইল। তাহাতে জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, "আসামী নিশ্চয়ই জাল, তাই সে ভয় পাইয়াছে। রাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।"

পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা মুসলমানের সরামতে হইত, সুতরাং সবার ব্যবস্থা দিবার নিমিত্ত একজন করিয়া কাজি বিচারাসনে বসিতেন। সেই কাজি, সমুদয় সাক্ষীদের জবানবন্দী হইয়া গেলে পর, জালরাজাকে বলিলেন, "তুমি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন আমি শুনিতে চাই যে, এই চতুর্দ্দশ বৎসর তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ছিলে, এবং কি করিতে ?" জালরাজা সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার উকীল তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, এবং বলিলেন, "পোষকতা ব্যতীত সে পরিচয় কোন মতে গ্রাহ্য হইবে না এবং প্রমাণেরও পোষকতার আর সময় নাই।" জালরাজা তাহা শুনিলেন না, তিনি জজ সাহেবকে

বলিলেন যে, "আগামী কল্য আমি এ বিষয়ের এক-খানি লিখিত ফৰ্দ্দ দিব।"

মোকর্দ্দমার শেষে তিনি একদিন সেই ফৰ্দ্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গালা দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দাখিল করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখর যাই; সেখান হইতে অদ্দিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় এক বৎসর থাকি। তাহার পর ভুবনেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বাণেশ্বনাথ মহাদেবের নিকট এক বৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাজ, জ্বালামুখী, প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করি। পঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্মীরে যাই। সেই খানে জেনারেল এলার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর আবার হিন্দুস্থানে আসি। দিল্লীতে বিবি বামজে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন। আমি ইতস্ততঃ যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল। যেখানে আমার কথা লইয়া আন্দোলন হইত, আমি সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতাম। যখন তাহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাঁহাদের সঙ্গ লইতাম। তাঁহারা এক স্থানে স্থায়ী হইতেন না, সুতরাং দীর্ঘকাল কাহারও সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। আমার একখানি ইয়াদদস্ত বহি ছিল; যে দিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই ইয়াদদস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি।* এলিয়ট সাহেব বাঁকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন, তখন সেই ইয়াদদস্তখানি হারায়। আমি সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টর সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না; মেজেষ্টর তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন হুকুমও দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই। তাহার পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ

"যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্ত পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়; কিন্তু আমার এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলাম, আমার বাক্‌রোধ হয় নাই। আমার গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেক দিন কালনায় ছিলাম; যদি সত্যই আমি মরিব, এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি এই সময়মধ্যে পোষ্যপুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? অথবা একখানা দানপত্র, কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল?

"আর এক কথা; আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আমা হইয়াছে। লোকে বয়সে কেহ স্থূল হয়, ক্রমে কেহ শুষ্ক হয়, কেহ কাল হয়; কিন্তু মাথায় কেহ ছোট হয় না, কেহ বড়ও হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মাপিয়া দেখা হইয়াছে, লম্বায় চুল পরিমাণে ছবির মূর্ত্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই। এখন বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর তাঁহার প্রতিনিধি আপনারা, অধিক বলা বাহুল্য।"

১০। দায়রার হুকুম।

অন্য সকল সাক্ষীদের জবানবন্দী হইয়া গেলে, উভয় পক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বক্তৃতা মুখে হইল না, লিখিত দাখিল হইল। তাহার পর কাজি সাহেব ফতওয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, "সোনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা

* রাজা প্রতাপচাঁদেরও এইরূপ ইয়াদদস্ত বহি রাখা অভ্যাস ছিল। তিনি যে সময়ে যাহা করিতেন, তাহা নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন যে, "তাঁহার সেই ইয়াদদস্ত বহি জালরাজা কোনরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন, সেইজন্য প্রতাপচাঁদের সমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা তিনি বলিতে পারিতেন।" কেহ বলে, "সে ইয়াদদস্ত বহি রাজবাটীতে ছিল, মোকর্দ্দমার সময় তাহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল।"

গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।" কিন্তু জজ সাহেব অন্য প্রকার বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, "আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং প্রতাপের নামধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।" এইরূপে উভয়ের মত-অনৈক্য হইল। সেই জন্য জজ সাহেব নিজামতকে জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন যে, "আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, একটী ব্যতীত তাহার সমুদয় প্রমাণ হইয়াছে। অতএব তাহাকে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হয়, ন্যূনকল্পে তিন বৎসর।" এ সম্বন্ধে নিজামত যে হুকুম দিলেন, তাহা পরে বলা যাইবে।

১৮। অন্য আসামীদের প্রতি দায়রার হুকুম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আসামীশ্রেণীতে কালনায় ১৯৪ জন গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলিকে তাহাদের সামিল করা হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবল ৩১০ জনকে হুগলীতে পাঠান হইয়াছিল। হুগলীর ম্যাজেষ্টর সামুয়েল সাহেব তাহাদের সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, অথচ তাহাদের খালাসও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষা গেল, তাহার পর শীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবস্ত্র নাই। তিন শত লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া সহজ নহে; সুতরাং সে দিকে আর কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। আসামীরা একে একে মরিতে আরম্ভ করিল। জালরাজা আপনার উকীলদিগকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন যে, "এই হতভাগাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর।" সা সাহেব মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, "এই তিন শত লোকের জন্য দরখাস্ত কে দিবে?" জালরাজা বলিলেন, "আমি আর দেখিতে পারি না। তোমরা না কর, আমি নিজে দরখাস্ত করিব।" শেষে সা সাহেব দরখাস্ত লিখিতে সম্মত হইলেন। জালরাজা লিখাইলেন, "হতভাগাদের এইমাত্র অপরাধ যে, তাহারা আমাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের যোগ্য তাহারা ঠকিয়াছে, তাহাদের অপরাধ নাই। তাহাদের খালাস দেওয়া হউক, অন্ততঃ গাত্রবস্ত্র দেওয়া হউক।" *

দরখাস্তের ফল কতক ফলিল। ১৪০ জন খালাস পাইল, কিন্তু সাত মাসের পর খালাস পাইল। তাহাদের বিপক্ষে এক জন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, অথচ তাহারা সাতমাস কারাবদ্ধ ছিল। তাহাদের খালাস দিবার সময় কেবল একখানি করিয়া মুচলকা দস্তখত করাইয়া লওয়া হইল। তাহাদের আর কোন বিচার হইল না। বাকি ১৬৩ জন জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক লোক সেইখানেই মরিয়া গেল।

বে-আইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব ওগলবি সাহেবের নামে যে নালিস উপস্থিত করেন, তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হয়। সেই মোকর্দ্দমায় হুগলীর মেজেষ্টর সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে এই সকল

---

* "Their whole crime consisted in believing me to be Rajah Pratap Chand. If I am an impostor, as alleged, I am guilty of having deceived them, and I may therefore be liable to punishment. Of these persons only six have been thought criminal enough to be sent for trial before you, and the others have been in custody for a period of nearly seven months without knowing the crime which they are alleged to have committed, without being confronted with any of the witnesses for the prosecution, and without having been brought to trial. Of the remainder, thirteen are dead,--two more, I understand, are at the point of death, and twentytwo are in the hospital. Extract from petition dated 30th November 1838."

আসামীদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয় মাসের পর, ১৪০ জনকে খালাস দিয়াছি; বাকি ১৫০ কি ১৬০ জন বিচারের নিমিত্ত জেলখানায় অদ্যাপি আবদ্ধ আছে। যে ১৪০ জনের কথা বলিলাম, আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ এগলবি সাহেব বর্দ্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন: আমি তাহাদিগকে ছয়মাস পরে ছাড়িয়া দিয়াছি, আদালতে তাহাদিগকে আনি নাই। আমার আদালতঘর বড় ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে না বলিয়া আদালতে তাহাদিগকে হাজির হইতে দিই নাই। সা সাহেব তাহাদের মোক্তার ছিলেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিত হইবার আবশ্যকও হয় নাই: সা সাহেব তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনামা দাখিল করেন নাই, আমিও দাখিল করিতে দিই নাই। সা সাহেব নিজে আসামী, সুতরাং তিনি মোক্তার হইবার অধিকারী নহেন।"

এ বিচারপদ্ধতি শুনিয়া সুপ্রিম কোর্টের অনেকে হাসিলেন। বোধ হয়, সামুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া ভাবিলেন "ইহারা তবে বিচার কাহাকে বলে?" তিনি এখন বলিলেন,—

"What do you mean by a trial? There certainly has been no regular trial of those prisoners whom I released, nor of those who, I have said are now awaiting their sentence: those whom I released I considered less criminal than the others, and I thought the punishment they had already undergone was sufficient;—they had been in prison six months—Yes! certainly without having any regular trial or sentence passed on them. By Regulation I cannot try after six months' imprisonment."

আরও হাসি পড়িয়া গেল। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ, সেই জন্ত মেজেষ্টর বাহাদুর তাহাদের বিচার না করিয়া জেলে রাখিয়াছিলেন। যাহাদের বিচার করিতে নিষেধ, তাহাদিগকে জেলে রাখিতে নিষেধ নাই! ছয় মাসের স্থলে নয় মাস তাহারা জেলে আছে, আরও থাকিবে, তাহাতে আইনের আপত্তি নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার করার সম্বন্ধে; ছয় মাসের পর, খবরদার যেন আর বিচার করা না হয়। ছয় মাসের পর যত দিন ইচ্ছা জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন।

যে সকল আসামীদের কথা বলা হইতেছিল, তাহারা কত দিন পরে খালাস পাইল, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, জালরাজার মোকর্দ্দমার পর মেজেষ্টর সাহেবের অবকাশ হইলে, তাহাদিগকে খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে। সামান্য লোকদিগকে জেলে রাখা তখন সামান্য ব্যাপার বলিয়া মেজেষ্টরদের বোধ ছিল। গরিব-দুঃখীরা কে খালাস পাইল কি না পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে কাহারও সাহস হইত না। "চাচা আপন বাঁচা" এই তখনকার প্রচলিত বুলি ছিল। তদ্ব্যতীত সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেজেষ্টরদের একেবারে ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেষ্টর ছিল না, সবডিবিজন ছিল না, সকল কার্য্যই মেজেষ্টরকে নিজে করিতে হইত। সুতরাং কোন কার্য্যই হইয়া উঠিত না, অনেকটা আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাই দেওয়ান মনসারাম মিত্রের অসম্ভব প্রভুত্ব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে, এই আসামীদিগকে খালাস দিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই।

দায়রায় সাত জন আসামী সোপর্দ্দ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জালরাজার পক্ষে জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অপর ছয় জন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, মেজেষ্টর সাহেবও কোন প্রমাণ নিজে লন নাই; দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই; সুতরাং জজ সাহেব তাহাদিগকে খালাস দিলেন। *

* এই ছয় জনের মধ্যে হরধামের রাজা রায় নরহরিচন্দ্র একজন আসামী ছিলেন। তিনি খালাস হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর সমাজে মুখ দেখা

এই ছয় জনকে কেন দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক বুঝা যায় না। ইহারা জাল-রাজার সঙ্গে ছিল সত্য, কিন্তু আরও অনেকে ত সেই সঙ্গে ছিল; তাহাদের সকলকে সোপর্দ্দ কেন করা হইল না, কেবল এই ছয় জনকে কেন সোপর্দ্দ করা হইল, তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন। জালরাজার উকীল সা সাহেব উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সাত সংখ্যা শুভপ্রদ, তাহাই সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল।"

---

১৯ ওগলবি সাহেব আবার আসামী।

একবার ওগলবি সাহেব খুনের মোকর্দ্দমায় আসামী হইয়াছিলেন, আবার তিনি আর এক মোকর্দ্দমায় আসামী হইলেন। এবার তাহাতে জালরাজার কিছু উপকার হইয়াছিল; এই জন্য সেই মোকর্দ্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালনার হত্যাকাণ্ডের পরদিবস জাল-রাজার উকীল সা সাহেব পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময় বর্দ্ধমানের মেজেষ্টর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই বে-আইনি কয়েদের বিচার, এত দিনের পর, ৯ই জানুয়ারী তারিখে আরম্ভ হইল। এবার চীফ্ জাষ্টিস্ সার্ এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব স্বয়ং বিচার করিতে বসিলেন। ওগলবি সাহেবের কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জুরিদের চার্জ দিলেন। জুরিরা ওগলবি সাহেবকে অপরাধী করিলেন। চিফ্ জষ্টিস তাঁহার দুই হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। সেই সময় জজ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"James Balfour Ogilvy—It is my painful duty to pass the sentence of this Court upon you. You have been found guilty of false imprisonment of the prosecutor Mr. Shaw. (The learned judge then recapitulated the facts of the case). The Darogah a most important witness as to the acts of Shaw and the necessity for his restraint, was not called by either party,—why, I cannot understand, as he certainly could have given the best evidence as to what took place, and whether Mr. Shaw was party to any disturbance or breach of the peace. But I must say that there is not a title of evidence to show that Mr. Shaw was guilty of sedition, or any other offence whatever. It is in evidence, that he knew only of one Purwanah being served on Protap * at Culna, and I must say, that his

---

হইতে পারিলেন না। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া তাঁহার বংশাভিমান কিছু অতিরিক্ত ছিল। এমন কি, তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা আপনাকে সম্ভ্রান্ত মনে করিতেন। রাজা গিরিশচন্দ্রও তাঁহার প্রতি কতকটা জ্ঞাতিবৈরিতা দর্শাইতেন। একবার কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে নরহরিচন্দ্রের দুর্দ্দশা অনুকরণ করিয়া একটা যাত্রায় "সং" দেওয়া হয়। তাহাতে গিরিশচন্দ্র বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপ কুরুচি ছিল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এ পরিচয় দিলাম। রাজা গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি অন্যের দুর্ভাগ্য লইয়া রহস্য করিতে পারিতেন, এবং দেখিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

* চীফ্ জষ্টিস সার এডওয়ার্ড রায়াণ সাহেব অম্লানবদনে "প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমা" "প্রতাপ-চাঁদের গ্রেপ্তার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর জজ-মেজেষ্টরগণ 'প্রতাপচাঁদ' নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। জবান-বন্দীতে হউক, রায়ে হউক, যেখানে প্রতাপ-চাঁদের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা "Soi dissant Rajah" প্রভৃতি শব্দ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল "জালরাজা" বলিয়া আসিতেছি।

conduct on that occasion appears to me to have been judicious, regular and proper. He made his client write a letter offering submission to the ordir of the authorities, and it was delivered to the Nazir that night. Mr, Shaw so far from committing any improper acts, gave the best advice as to how to get rid of the assembly, by 'telling the Nazir to point out who of the followers should be sent away. The treatment of Mr. Shaw after his arrest was certainly exceedingly harsh, and is without justification either in law or in fact, and he was made to undergo by you most unwarrantable and most unjustifiable imprisonment. The Court will not however cause you to suffer imprisonment; because, we must suppose, that you have been actuated by motives arising from erroneous information and a mistaken zeal, but ardent wish to preserve peace and good order in your district. (The letters from Mr, Alexander the missionary and Gaptain Harrigton were then read). It is probable that these letters excited considerable alarm in your mind, and after the importunate affray in the morning you may have imagined it necessary to arrest Mr. Shaw, but those letters should have led you to enquire into matters, before you proceeded to act as you have acted. It appears that there was no disturbance whatever when the affray took place nor had there been any for a considerable time before the event took place. But the Court believing, that you acted upon erroneous information, although rashly and unjustifiably, will give you in your sentence the benefit of that consideration, which they on that account extend towards you. Such conduct can not, however be lightly passed over. Liberty is dear to all: you have deprived the prosecutor of his with very unnecessary and very considerable harshness. It will also serve as a warning to others who may at any future time be placed in situations similar in nature of yours. The sentence of the Court therefore is that you pay a fine to the Queen of two thousand Rupees, upon payment of which, you be discharged."

জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে রায়ান সাহেব বলিলেন, "তোমায় কয়েদ দিলাম না, কারণ, তুমি ভ্রমে পড়িয়া মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করিয়া এই অকার্য্য করিয়াছ।"

কয়েদরে কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর মেজেষ্টর অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দিবার আছে, ইহা লোকে জানিত না। মহারাণীর আদালতে আর কোম্পানীর আদালতে যে কি প্রভেদ, তাহা লোকে এখন বুঝিতে পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। সে সকল পরিচয় দেওয়া এক্ষণে অপ্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে ওগলবি সাহেব দাগী হইলেন না। তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া মেজেষ্টারীর আসনে বসিবার অযোগ্য হইলেন না। একটীন্ মেজেষ্টর ছিলেন, শীঘ্র পাকা মেজেষ্টর হইলেন

জালরাজা সম্বন্ধে নিজামত আদালতের হুকুম।

এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জাল-রাজা সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ করিয়াছিলেন, তাহা নিজামত আদালতে পেষ হইল। জজেরা বড় গোলে পড়িলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "আসামীকে কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যায়? কালনার জমিয়ৎবস্ত হওয়ার অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এত দিন কয়েদ রাখা হইয়াছে, অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় নাই। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, 'কালনায় কোন গোলযোগ হয় নাই।' এ বিচারের পর কালনার জমিয়ৎবস্ত বলিয়া দণ্ড দেওয়া ভাল দেখায় না। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে গেলে রাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন অপরাধ নাই। অন্যের নাম গ্রহণ করাই বা কি এমন গুরুতর অপরাধ। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির নাম ধরায় কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। কেহ সে জন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য?" এই সময় নিজামতের কাজি সাহেব তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তিনি ফতওয়া দিলেন যে, আত্ম-উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজেরা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন যে, "মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলক সা, ওরফে প্রতাপচাঁদ, ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়; অনাদায়ে তাহার ছয়মাস কারাবাস। আর প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য চার্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল।"

অন্যান্য অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জালরাজা দরখাস্ত করিলেন যে, "নানা অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়া মেজেষ্টরেরা আমাকে এমনই গোলে ফেলিয়াছেন যে, তাহা অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহারা আমাকে জেলে পুরিয়া আমায় নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন। আমি কোথাও যাইতে পারি নাই, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। জেলে বদ্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে এত নির্দ্দোষের প্রমাণ সংগ্রহ করিব? এক্ষণে সে সকল অভিযোগ হইতে হুজুর আদালত আমায় মুক্তি দিয়াছেন। বাকি যে অপরাধটী আমার স্কন্ধে রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন, আমি নিরপরাধী, আমি অন্যের নাম ব্যবহার করি নাই। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, নিম্ন আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই; দিবার প্রয়োজন আছে, এমনও বিবেচনা করি নাই। আমি প্রতাপচাঁদ হইলেও হইতে পারি, এই সন্দেহ মাত্র ফৌজদারী হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিলেই অব্যাহতি পাইব, এই মনে করিয়া আমি প্রমাণ দিয়াছিলাম। ফৌজদারী হইতে অব্যাহতি পাওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, অন্য কেহ নহি, এই কথার প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে প্রয়োজন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ আমার উকীলেরা আমায় বুঝাইয়াছিলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা কোম্পানীর আইনানুসারে অথবা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কোন অপরাধই নহে। এই জন্য এই সম্বন্ধে এক প্রকার আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখন আমার ত্রুটি হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা মার্জ্জনা করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন। তাহার পর আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবে।"

কিন্তু নিজামত আদালত এই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। জজেরা বলিলেন যে, "দরখাস্তকারী যখন নিম্ন আদালতে আপনিই ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় নাই, তখন আর এখানে সে বিষয়ের কোন ওজর শুনা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর পুনর্ব্বিচারের কোন হেতু দেখা যায় না।"

এই হুকুমের পর জালরাজার পক্ষ হইতে আর এক দরখাস্ত দাখিল হইল। দরখাস্তখানি, বোধ হয়, বড় রাগ করিয়া লেখা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই—"দরখাস্তকারীর এক্ষণে জানিবার প্রার্থনা যে, কোন আইনমতে অপরাধী হওয়ায় তাহার ১০০০৲ জরিমানা হইয়াছে? কোন আইন বিধিমতে হুগলীর জজ এ মোকদ্দমা হুজুর আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন? হুজুর আদালতের কাজি যে ফতওয়া দিয়াছেন, আত্ম-উপকারার্থ মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা দণ্ডার্হ, তিনি তাহা

কোথায় এবং কোন মুসলমানী গ্রন্থে দেখিয়াছেন? দরখাস্তকারী এ অঞ্চলের বড় বড় মৌলবিদের দ্বারা বিশেষরূপে তদন্ত করাইয়াছে, কিন্তু সকলেই বলিয়াছেন যে, 'মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা' অপরাধ বলিয়া কোন গ্রন্থে তাঁহারা পান নাই।"

নিজামত আদালত তাহাতে হুকুম দিলেন যে, "মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যাইতে পারে না। দরখাস্তকারী ভবিষ্যতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে তাহা গৃহীত হইবে না। কেন না, বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে।" *

২১। জালরাজার সর্ব্বনাশ।

এই হুকুমটী শুনিতে সামান্য, কিন্তু পরিণামে অতি গুরুতর হইয়া পড়িল। ওগলবি, সামুয়েল যাহা করিতে না পারিয়াছিলেন, নিজামতের এই হুকুমটী তাহা করিয়াছিল। "বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, জালরাজা প্রতাপচাঁদ নহে, সুতরাং প্রতাপচাঁদ বলিয়া তিনি কোন দরখাস্ত করিলে আর তাহা গ্রহণ করা যাইবে না।" এই কথায় জালরাজার পক্ষে সকল দ্বার পাকতঃ রোধ হইল। তিনি দেওয়ানীতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া সম্পত্তি দাবি করিলে তাঁহার আর্জি আর দাখিল হইবে না, এবং প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আবার তিনি দণ্ড পাইবেন। সুতরাং আর কোন আদালতে তিনি বিচারপ্রার্থী হইতে পাইলেন না; আপীল পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপচাঁদ বলিয়া যে ব্যক্তি কোন আদালতে বিষয় দাবি করিতে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি আর্জিতে আলক সা বা কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দস্তখত করিতে পারে না; করিলে সেইখানেই তাহার দাবি শেষ হইবে। আবার প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে সে দরখাস্ত দাখিল হইবে না, দরখাস্তকারীকে হয় ত দণ্ড পাইতে হইবে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের ধারণা হইল যে, "জালরাজার পক্ষে দেওয়ানী আদালতের দ্বার রোধ করিবার জন্য জজেরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।" কেহ কেহ বলেন, "গবর্ণমেন্টের কোন চতুর সেক্রেটরী এই কৌশল তাঁহাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছেন।"

এই কৌশলের পর, জালরাজা কপাল ঠুকিয়া আর এক দরখাস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দরখাস্তে নাম দিলেন না, নামের পরিবর্ত্তে লিখিলেন, "The humble petition of one who hath been sued at the instance of Government by the name of Aluck Shap, alias Rajah Protap Chand, alias Kistolall Brohmocharee."

দরখাস্তখানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠাট্টাবিদ্রূপে পরিপূর্ণ। তাহার কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন কোন অংশের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল।—

১। "দরখাস্তকারীকে কখন আলক সা বলিয়া, কখন কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এখনও স্থির হয় নাই যে, আদালত হইতে ভবিষ্যতে তাহার কি নাম কায়েমি রাখা হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানী আদালত ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রে তাহার পূর্ব্বপরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বে-আদবির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্তু এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই যে, কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলে হুজুর আদালতের কি ক্ষতি হইবে।

২। "হুজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা— (is a crime unknown to the English Law, as well as to the Codes of Law of civilized Europe, and was, till the gloss put upon it by your Court and

---

* নিজামতের এই সকল হুকুম জজ (W. Bradden) ব্রডন সাহেব এবং (C. Tucker) টকর সাহেব একত্রে দিয়াছিলেন। টকর সাহেব একবার ফৌজদারী আদালতে নিজে আসামী হন। আমরা এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। এই জজদিগের শেষ হুকুমটী এইরূপ—

"The Court further remark that as they have judicially pronounced the petitioner not to be the Moharajah Protap Chand, they cannot, in future, receive any petitions or applications from him under that name and title.--Extract from order 19th July 1839.

its Mohammedan officer, unknown to Mohammedan Law, as it is still unknown to Regulation Law-wide and sweeping as it is) কি বিলাতে, কি এদেশে কেহ জানিত না। অন্তের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোলা হইয়াছে, কেন না, মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্ত মিথ্যা কথার দণ্ড এ পর্য্যন্ত কখন হয় নাই।

৩। "এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রতাপচাঁদ নাম উল্লেখ করিয়া বৰ্দ্ধমান কি অন্য কোন মফঃস্বল আদালতে নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।

৪। "এখন তাহার মানস যে, একবার ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপীল করে অতএব হুজুর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা।"

এই প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা কোন কাগজপত্রে পাইলাম না। বোধ হয়, দেওয়া হয় নাই। যে কারণেই হউক, বিলাতে আর আপীল হয় নাই।

এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ করা হয় নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জজেরা দিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যাহারা জালরাজাকে মোকর্দ্দমা চালাইতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই ভ্রম হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট যে কোন কৌশলে হউক, এ ব্যক্তিকে বৰ্দ্ধমানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন না।" সুতরাং তাহারা হাত গুটাইল—কেহ আর টাকা কর্জ্জ দিল না। জালরাজার আশা-ভরসা সকল ফুরাইল। তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন, সে সন্ন্যাসী রহিলেন।

২২। সাধারণের বিচার

জজ সাহেবেরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালীরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া জালরাজা সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। যে যাহা জানিত না, এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে তাহা সকলেই জানিয়াছিল। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিল যে, "জালরাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ; এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।" কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে, তবে পরাণ বাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য জুয়াচোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদয় ধন ব্যয় করিবেন কেন? *" কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি সত্যই

* যে সময় প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমা চলিতেছে, সে সময় পরাণ বাবু বৰ্দ্ধমানের রাজসংক্রান্ত অধিকাংশ জমিদারীর খাজনা নিয়মিত সময়মধ্যে দিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সকল জমীদারী বিক্রয় না করিয়া তাহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য দুইজন সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া বৰ্দ্ধমানে পাঠান। লোকে সন্দেহ করিল যে, "পরাণ বাবু এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে রাজবাটীর সমুদয় আয় ও সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি জমিদারীর খাজনা দিতে পারেন নাই।" বোধ হয়, সেই অন্য বিস্তর ঘুষের কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল: এমন কি, ওগকাবি সাহেব খুনি মোকর্দ্দমার সময় বঙ্গে নগরে আপনার সহোদরকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, 'লোকে বলে, আমি তিন লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়াছি।' পরবর্ধমান বঙ্গের সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত কেবল তাহার কতকাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

"The lawyers of Calcutta are the natural and inveterate enemies of our service. The whole of the profession was up in arms against me. They knew not of course the rights of the story, for that was an official secret. (এই কথাটী বাঙ্গালীরা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন) * * * Besides this, all those Zemindars who were to join the pretender, and all who have lent him money (and he had contrived to realise enormous) have also deeply vowed to be revenged upon me, for all their schemes and hopes of all plunder have been defeated and these are the party who pay the expense of the proceedings against me, while the lawyers conduct them, some of them positively acting without a fee contrary to all professional rule and precedent, the only

জাল হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যয়ে পরাণ বাবুর মোকর্দ্দমা চালাইবেন কেন? মেজেষ্টরদের গোপনে পত্র লিখিবেন কেন? এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্যায় কৌশল করিবেন কেন? অবশ্য এ ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে জানিতেন যে, "প্রতাপচাঁদ মরেন নাই রণজিৎ সিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন।" রণজিতের স্বপক্ষ ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধনসম্পত্তি অধিকার করিলে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাই গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার চাতুর্য্য করিয়া প্রতাপচাঁদকে বঞ্চিত করিলেন।" এ সকল সন্দেহ যে অমূলক, তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপে যে ব্যক্তি যে কারণেই জালরাজাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্থির করুন, তাঁহারা এই ঘটনা আপন আপন ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত মিলাইয়া এক প্রকার তৃপ্তিলাভ করিলেন। যাহারা ধর্ম্মভীত,তাঁহারা ভাবিলেন, "ধর্ম্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম্ম মিথ্যা।" আর এক দল ভাবিলেন, "ধর্ম্ম মিথ্যা; কেন না, যথাশাস্ত্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম্ম মিথ্যা।"

কেহ বলিল, "অদৃষ্টই মূল। সকলই অদৃষ্ট-দোষে ঘটে। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না, তাহাও অদৃষ্ট-দোষে। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? যদি কোম্পানী বাহাদুর মনে করিতেন, তবুও প্রতাপচাঁদকে রাজ্য দেওয়াইতে পারিতেন না। প্রতাপের অদৃষ্টে না থাকিলে কোম্পানীর মনে এ কথা আসিবেই বা কেন?"

যাহারা কর্ম্মফলবাদী, অর্থাৎ যাহারা খাঁটি হিন্দু, তাঁহারা ভাবিলেন, "যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল। ইহজন্মে হউক, পূর্ব্বজন্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন, তাই আপনি বঞ্চিত হইলেন।"

এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাহারা ধর্ম্মকর্ম্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বুঝিলেন, "কেনা সাহেবেরা পরাণবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন।" তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, "ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়,প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কেহ কোন নতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইনি কাহার সাহেব?"

reward they seek is to crush me if possible. It was by no means sufficient with them to vilify me in the papers as man was never before abused, but they would hang me if they could; and accordingly are trying to prove me guilty of murder. * * The public have been taught to believe that I fired upon unresisting sleeping innocents. * * The papers have it that I am suspended but that is not the case, I am required to attend in Calcutta pending this business, but I continue to draw my salary, and the Deputy Governor tells me that Govt. express no opinion one way or the other. I understand that but for a blunder the case would have been dropped long ago. To show you the spirit that is working against me I must tell you that I had notices of actions for damages in fourteen civil actions with which I was threatened; one case of false imprisonment, one of contempt of Court, and one of murder. They tried also to get up a case of bribery and corruption, swearing I had taken a consideration of three lacs of Rupees; and I was also accused of subornation of perjury. Finding they could make out no case they have given up all but two—contempt of the Supreme Court, and murder and these they only persevere in to keep up the odium against me and the agitation while the trial of Mr. Shaw and the pretender is pending. My being in difficulty gives great weight to them as it awes all the witnesses who have to give evidence for the prosecution."

এই শেষ কথা ওগলবি মেজেষ্টর হইয়া আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন। জালরাজার সম্বন্ধে এ কথা আরও কত বলবৎ।

অর্থাৎ কাহার । যাঁহার "কেনা সাহেব" থাকিত, তাঁহার বঙ্গসমাজে অতুল হইত। তিনি মনে করিলে র প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারিতেন। "কেনা সাহেব" তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এইমাত্র একটু বিশেষ ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না, যে সাহেবেরা বিক্রীত হইবেন, তাঁহারা আপনারাই বাটীতে আসিয়া শৃঙ্খল গলায় পরিয়া যাইতেন। তখন সাহেবের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাঁহাদের বিলাতী দ্রব্যাদি এদেশে অতি দুর্মূল্য ছিল, তাহাতে আবার তাঁহারা এক একটী ক্ষুদ্র নবাবের মত ধূমধামে থাকিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর নিকট যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সকল দিক কুলাইতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহারা কেহ কেহ বাটী হইতে টাকা আনাইতেন, কেহ কেহ বা এদেশে কর্জ্জ করিতেন, কিন্তু কর্জ্জ দুই চারি শত পরিমাণে নহে, একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, লক্ষ, এইরূপ পরিমাণে লওয়া হইত। যাঁহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, তাঁহার কর্জ্জ পরিশোধ করা অসাধ্য। এ কথা খাতক মহাজন উভয়েই জানিতেন, অথচ কর্জ্জ আদান-প্রদান হইত। যিনি কর্জ্জ লইতেন, তিনি জানিতেন, "উপকার করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব।" যিনি কর্জ্জ দিতেন, তিনি জানিতেন, "আমি সময়ে সময়ে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব।" তখন পদে পদে লোকের বিপদ ঘটিত। বাঙ্গালীর মধ্যে আত্মীয়তা শত্রুতা উভয়ই তখন গুরুতর ছিল। এখন আর সে আত্মীয়তা নাই, সে শত্রুতাও নাই। বাঙ্গালী সমাজের স্রোত কিছু মন্দ পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে একজন "কেনা সাহেব" সহায় থাকিলে বড় উপকার হইত। তাই ধনবানেরা বহু অর্থ কর্জ্জ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়া সাহেব ক্রয় করিতেন। অন্য উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ ব্যক্তি কেনা সাহেব দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে। এক্ষণকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল। তাঁহারা স্বপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহা মনে করিতেন, তখনই তাহা করিতে পারিতেন। তাহা আইনি হউক, বে-আইনি হউক, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, তাঁহারা অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতেন। এখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে তাহা আর বড় পারেন না। এখন ধরাধরির ভয়, প্রকাশের ভয়, নালিশের ভয়, কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি, দেশী সংবাদপত্র ইহার মূল হেতু।

"কেনা সাহেবের" কৌশলে জালরাজার দণ্ড হইয়াছে, এ কথা যাঁহারা না বলিলেন, তাঁহারা সকল দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে সমর্পণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যে চাতুরী করিয়াছেন, অকার্য্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, যিনি যে বাদী হউন, সকলে এই বিষয়ে একবাক্যে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিলেন। প্রতাপচাঁদ পাপী, প্রতাপচাঁদের অদৃষ্টের দোষ, এ কথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে এই অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। সুতরাং কোম্পানীর প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিল; পাদরীদের প্রতি লোকের ভক্তি না হউক, একরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতেছিল তাঁহারা সত্যবাদী, এ কথা সকলেই বলিত, সে শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল না। কাল্লনায় যে পাদরী ছিলেন, যিনি এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বে লোকে যে সংখ্যায় খ্রীষ্টান হইতেছিল, সে সংখ্যার যেন হ্রাস হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইবার একটু সূচনা দেখা দিল। অন্যের মোকর্দ্দমা কুরাণ করিয়া লওয়ার রীতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও একটু হ্রাস পাইল। সম্প্রতি মেকলে সাহেব পিনাল কোডের খসড়া করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর দুই একটী ধারা সন্নিবেশিত হইল, এবং সেই সঙ্গে কার্য্যবিধি আইনের সূত্রপাত হইল।

২৩। জালরাজা ধর্ম্মপ্রণেতা।

মোকর্দ্দমা ফুরাইল। জালরাজা দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সঙ্গতি নাই, দ্বিতীয়তঃ তথায় প্রতাপচাঁদ বলিয়া নালিশ করিলে আবার জেলে যাইতে হইবে। সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকিলেন। পূর্ব্বে যাহারা বিশেষ স্বপক্ষতা করিয়াছিলেন,

তাঁহারা কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "কি জানি, গবর্ণমেণ্টের যে গতিক দেখিতেছি, আর সাহস হয় না।" কেহ বা সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যে জালরাজার সহিত আত্মীয়তা রাখিলেন। জালরাজা তাঁহাদের নিষেধ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিতেন না। তাঁহাদের যত্নে জালরাজার অন্নকষ্ট—কোন কষ্টই ছিল না, ধনবানের ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে তিনি দিনযাপন করিতেন।

প্রথমে তিনি কিছু দিন কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিলেন। তাহার পর কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে দুই তিন মাস থাকেন। তাঁহার নিমিত্ত সে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করে। তাহার একান্ত ধারণা ছিল যে, জালরাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ।

কলুটোলা হইতে জালরাজা শ্যামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। কিছু দিন পরে, লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই সময় জালরাজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়িল। গতিক বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্য হইতে পলাইয়া প্রথমে চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসিস আশ্রয়ে কয়েক বৎসর থাকিলেন। তাহার পর শ্রীরামপুরে যান। শ্রীরামপুর তখন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। সেখানে প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শ্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল। শুনিতাম, তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা আসিয়া এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাঁহাকে আরতি করিত, তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে বলে, "সে সময় বড় সমারোহ হইত।"

এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিত যে, জালরাজার বুদ্ধির একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি সত্যই প্রতাপচাঁদ হইলে এই দুর্ঘটনার পর তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু যাহারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, কথাবার্ত্তায় কখন তাঁহার ভ্রান্তি বুঝা যায় নাই; বরং তখন তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বোধ হইত। তিনি তৎসাময়িক কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা—সমুদয় সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিতেন। যাহারা সে সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাহাদিগকে ফরাসিস Politics, বঙ্গদেশীয় রাজনীতি পারম্পর্য্যরূপে বুঝাইয়া দিতেন। কেহ কেহ বলেন, বিলাতী রাজনীতিতে (European Politics) তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আরও শুনা যায়, তিনি রুশীয় রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতীও ছিলেন। এদিকে, বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকিবার সময় দুই একজন অধ্যাপক তাঁহার নিকট বেদান্তের কথা শুনিতে যাইতেন; সুতরাং এ অবস্থায় বলা যায় না যে, তাঁহার কোন প্রকার চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছিল। অথচ, আবার দেখা যায়, তিনি শালগ্রামশিলার ন্যায় সর্ব্বদা ঝারায় বসিয়া থাকিতেন, লোকের সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইতেন, পূজা গ্রহণ করিতেন, বৈকালি খাইতেন। তখন তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই।

যাহারা তাঁহার পূজা করিতে আসিত, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, পুরুষের দলও নিতান্ত অল্প নহে। অনেকগুলি বাবাজী তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। বোধ হয়, তাহাদের দ্বারাই জালরাজার অমানুষিক শক্তি দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইত। স্ত্রীলোকদের ধারণা হইয়াছিল যে, 'এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেবতা।' অনেকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব মনে করিত।

তিনি অনেক লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন; এমন কি, পঞ্জাবী ও অপর হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য চেলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, স্ত্রীলোক শিষ্যার ত কথাই নাই। বারগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেন। দূরস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া অতি গোপনে স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র দিতেন, তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী, অর্চ্চনাপদ্ধতি নূতন প্রকার। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে তাঁহাদের ঘোষপাড়ার দল বলিয়া জানে।

এই নূতন ধর্ম্মটী ক্রমে বিস্তার হইতেছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা জালরাজার শিষ্যের সংখ্যা বোধ হয়, এখন বহু গুণে অধিক।

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু কেহই জানেন না যে, জালরাজার প্রণীত ধর্ম্মে তাঁহারা উপদিষ্ট হইতেছেন। শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার স্বতন্ত্র নাম সত্যনাথ।

২৪। জালরাজার মৃত্যু।

জালরাজার মূর্ত্তি বড় প্রশান্ত ছিল। যে দেখিয়াছে, সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সেই মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচোরের নহে। গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লীগ্রামে শিষ্যদের দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের বাটীতে গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বাটীতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যেরা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, একজন বদ্‌মায়েস মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূন্য স্ত্রীলোকদের লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়, সেই জন্য তাহারা সংকল্প করিয়াছিল যে, সে বদ্‌মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিব। এখন সে সময় উপস্থিত হইল। বদ্‌মায়েসের সন্ধান পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে আট দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্যা-পরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর যখন তাহারা অভীষ্টস্থানে তাঁহাকে লইয়া ফেলিল, তখন তাঁহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা হইল।

ইদানীং তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। মোকর্দ্দমার সময় তাঁহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু পরে সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত; অথচ সে চক্ষুতে প্রখরতা মাত্র ছিল না।

তিনি সকলকেই মিষ্ট কথা বলিতেন, মিষ্ট কথাই তাঁহার বশীকরণমন্ত্র ছিল।

মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার উত্তর বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না, অর্থেরও কিছু অনটন হইয়া থাকিবে, কেন না, বাটীর ভাড়া একেবারে দিতে পারেন নাই। এই সময়ে বোধ হয়, তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন; তাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, একা থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিতেন, কেহ তাঁহার নিকটে আসিতেন, কেহ বা আসিতেন না। যাঁহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন, "আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।"

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১২৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়নাডাঙ্গা পল্লীতে একটী সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটী লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে, তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এই জন্য আরও কষ্ট হয়।

তাঁহাকে জালরাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।

সম্পূর্ণ।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামেশ্বর শর্ম্মার পঁচিশ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইল। তিনি পিতাকে বড় ভালবাসিতেন। রামেশ্বরের পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় রামেশ্বর শ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন। পিতার স্বর্গার্থে যে যাহা পরামর্শ দিল, তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। আত্মীয়-কুটুম্বগণ স্ব স্ব গৃহে গেল। রামেশ্বর তখন জানিলেন যে, তাঁহার আর কিছুই নাই। পরিবারের ভরণপোষণ করা ক...ন হইল। ...হার ঘরে যুবতী ভার্য্যা পার্ব্বতী; এবং তিন ...সরের পুত্র আনন্দদুলাল। এক দিবস সকলেই ...পবাসী রহিল. শিশু আহারের নিমিত্ত ক্রন্দন ...রতে লাগিল; সন্তানের ক্রন্দন দেখিয়া পার্ব্বতী ...দিতে লাগিলেন। রামেশ্বর কিছু খাদ্য সংগ্রহের ... গিয়াছিলেন, নিষ্ফল হইয়া রিক্তহস্তে আসিয়া ...খিলেন, উভয়ে তাঁহার প্রতীক্ষায় দ্বারে বসিয়া ...ছ। দ্বারের কিঞ্চিদ্দূরে ব্রাহ্মণভোজনের উচ্ছি... ...ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতির স্তূপমধ্যে গ্রাম্য কুকুরেরা ...হার অন্বেষণ করিতেছে, শিশু একাগ্রচিত্তে ...হাই দেখিতেছে। রামেশ্বরকে দেখিয়া শিশু ...ড়িয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! আমার ... কি এনেছ?" রামেশ্বরের চক্ষু ছল ছল করিতে ...ল; দেখিয়া পার্ব্বতীর চক্ষু জলে পূরিল; ...র মুখপানে চাহিতে সে জল উছলিয়া পড়িল; ...ই আবার মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিতে ...ই কাঁদিয়া উঠিলেন; বালক উভয়ের মুখপ্রতি ...ই একবার চাহিয়া শেষ কাঁদিয়া উঠিল। তিন ...নে একত্রে অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ...শু নিদ্রা গেল। এই সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে; ...মেশ্বর উঠিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিলেন। এক...ন দেখিলেন, বালজ্যোৎস্নার আলোকে এক ...রিণীতীরে কতকগুলি অল্পবয়স্ক বাবু, ক্ষেড়িকাটা, কোট গায়ে, কৌমুদীদীপ্ত স্বচ্ছবারির উপর পয়সা নিক্ষেপ করিয়া "ছিনিমিনি" খেলাইতেছেন। রামেশ্বর তাঁহাদের নিকট গিয়া যোড়হাত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে চারিটী পয়সা যাচ্ঞা করিলেন। বাবুরা উচ্চ হাস্য করিলেন, একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা, আমাদের পয়সা তোরে দিতে গেলাম কেন?" রামেশ্বর কাতর হইয়া বলিলেন, "আমি অন্নাভাবে সপরিবারে মারা যাই, আপনারা পয়সা জলে ফেলিয়া দিতেছেন" বাবুরা বলিলেন, "আমাদের পয়সা আমরা জলে ফেলিব, তোর কি রে শ্যালা?" এই বলিয়া ঘুষা তুলিয়া, একজন রামেশ্বরকে মারিতে গেলেন। রামেশ্বর শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিয়দ্দূরে গিয়া মনে ভাবিলেন, "এই বানরগুলাকে এক একটা চড় মারিয়া পয়সা কাড়িয়া লইতে পারিতাম—কেন লইলাম না?" ক্ষুধার জ্বালায় রামেশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ লুপ্ত হইতেছিল।

রামেশ্বর গ্রামান্তরে গেলেন; তথায় এক বাটীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। গৃহমধ্যে সকলে নিদ্রিত বোধ হইল; আনন্দদুলালের সেই ক্ষুধাপীড়িত, কাতর, শৈশবসুকুমার মুখ মনে পড়িল; পার্ব্বতীর রোদন মনে পড়িল; ক্রীড়াশীল বাবুদিগের নির্দ্দয় ব্যবহার মনে পড়িল। ভাবিলেন, আমি একা ধর্ম্মপথে যাইব কেন? তখন রামেশ্বর এক গৃহস্থের গৃহপ্রবেশ করিয়া পেটরা হইতে পয়সা চুরি করিলেন। পেটরায় তিনটী টাকা আর আট আনা পয়সা ছিল; রামেশ্বর কেবল সেই আট আনা পয়সা লইয়া আসিলেন। গৃহস্থেরা তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

রামেশ্বর আসিতে আসিতে ভাবিলেন, পয়সা হইল, চাউল লবণ কোথায় পাইব? অতএব তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আর এক গ্রামে গেলেন। নিকটস্থ পাঁচ সাত গ্রামের মধ্যে কেবল সেই গ্রামে একখানি দোকান ছিল। রামেশ্বর তথায় উপস্থিত

হইয়া দোকানীকে পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন; দোকানী স্বাপ্ন স্বরে ছিল, অতএব কোন উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তিনি দোকানের দ্বার মোচন করিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রাত্রোপযোগী চাউল, লবণ,ডাল সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রাগ্রে তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিলেন, তাহার উচিত মূল্য সেই স্থানে রাখিয়া বহির্গত হইলেন। পথে অত্যন্ত জল হইতে লাগিল, কিন্তু কোন বিঘ্ন ঘটিল না; বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। পার্ব্বতী পাক করিল, রামেশ্বর ও শিশু খাইল; পার্ব্বতী খাইল না। অল্প সামগ্রী আসিয়াছে—পার্ব্বতী খাইলে পরদিনের জন্য কিছু থাকে না। পার্ব্বতী উপবাস করিয়া গোপনে নিজাংশ স্বামী-পুত্রের জন্য হাঁড়িতে তুলিয়া রাখিল। রামেশ্বর তাহা জানিতে পারিলেন না।

পরদিবস রামেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, ভাতিপুর গ্রামে সপরিবারে গেলেন। এই গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি হইতে দুই দিবসের পথ দূর। এখানে তাঁহাকে কেহই জানিবার সম্ভবনা ছিল না, অতএব ভাবিলেন, এখানে উগ্রক্ষত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া অনায়াসে ইতর লোকের ন্যায় শারীরিক শ্রমদ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবেন। পার্ব্বতীও বলিলেন, তিনি কোন ভদ্র-সংসারে দাসীবৃত্তি করিবেন। এই পরামর্শ করিয়া তথায় ভদ্রাসন-বিক্রয়লব্ধ অর্থে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন; কিন্তু অপরিচিত বলিয়া রামেশ্বরের অদৃষ্টে দাসত্বও ঘটিল না। যেখানেই যান, সেইখানেই জামিনের প্রস্তাব হয়। অপরিচিতের জামিন কে হইবে? নিজগৃহবিক্রয়ে যে কয়েকটী টাকা আনিয়াছিলেন, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই অবস্থায় রামেশ্বর একদিন গ্রামের নায়েবের নিকট আপন দৈন্য জানাইয়া একটী পিয়াদাগিরী কর্ম্মের প্রার্থনা করিলেন। নায়েব বলিলেন, "সে কর্ম্ম এক্ষণে খালি নাই, কিন্তু আপাততঃ উপার্জ্জনের এক উপায় আছে। তোমার স্ত্রী আমার অন্দরে গত কল্য আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সে কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু সে তাহা শুনিয়া বড় রাগিয়া উঠিল। তুমিও রাজি হইবে বোধ হয় না। সে সব কাজ তোমা হইতে হইবে না। অতএব আর তাহা তোমাকে বলা বৃথা।"

রামেশ্বর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "পেটের জ্বালায় আমার অসাধ্য কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের মতামত সকল বিষয়েই অগ্রাহ্য; অতএব আমাকে বলুন, আমি তাহা বিবেচনা করিব।"

নায়েব বলিলেন, "তুমি শুনিয়া থাকিবে, প্রায় দুইমাস হইল,এই গ্রামে একটী স্ত্রীহত্যা হইয়াছিল, কিন্তু কে হত্যা করিয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। দারগা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, আমিও বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। হত্যাকারীর স্থির না হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব রুষ্ট হইয়া আমাদিগের অমনোযোগ অনুভব করিয়া জমীদারের দণ্ড করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই গ্রামে আবার একটী চুরি হইয়া গিয়াছে; তাহারও এ পর্য্যন্ত কোন উপায় হয় নাই। দারগা একটী লোককে সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু সে পলাইয়াছে। তাহার উদ্দেশ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, শীঘ্র যে পাওয়া যাইবে, এমত সম্ভাবনা নাই। শীঘ্র একজন অপরাধী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট না পাঠাইলে আবার জমীদারের দণ্ড হইবে, অথবা হয় ত তাঁহার জমিদারী যাইবে, অতএব আসামী সাজাইয়া একজনকে পাঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে আসামী সাজিবে, তাহার বিশেষ ভয় নাই। সামান্য পানপাত্র চুরি হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত উর্দ্ধসীমা একমাস কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে, অধিক নহে। কর্ম্মান্তরে বিদেশে গেলে কখন কখন একমাসেরও অধিক কাল পরিবার ছাড়িয়া থাকিতে হয়। ইহাও সেইরূপ; অধিকন্তু বিদেশে গিয়া এক মাসে যে উপার্জ্জন সম্ভব, তাহার দশ গুণ অধিক উপার্জ্জন হইবে। জমীদার বলিয়াছেন যে, যে আসামী হইয়া যাইবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা নগদ দিবেন। অতএব এই এক লাভের পন্থা আছে। আবার তুমি জেল হইতে অব্যাহতি পাইলেই তোমাকে এই সরকারে উপযুক্ত কর্ম্ম দিব।"

নায়েবের এই প্রস্তাব শুনিয়া রামেশ্বর নিজকৃত পূর্ব্ব চুরি মনে করিয়া শিহরিলেন। ভাবিলেন, বুঝি, বিধাতা নিশ্চিতই কারাগারই আমার কপালে লিখিয়াছেন, নহিলে সেদিন আমি পয়সা চুরি করিতাম না। সে পাপের ফল এক দিন আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে—তবে দুদিন অগ্র পশ্চাতে কি আসিয়া যায়? কেনই আপন ইচ্ছায় জেল খাটিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিব? আপন ইচ্ছায় এ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন না? যাহাই হউক,উপস্থিত অন্নাভাব-নিবারণের উপায় ইহা অপেক্ষা আর কি হইবে?

রামেশ্বর উঠিয়া বলিলেন, "আমি সম্মত, আমায় পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দাও।" নায়েব তৎক্ষণাৎ টাকা

দিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা আছে। জেলায় যাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই চুরি স্বীকার করিতে হইবে; একরার না করিলে আবার আমাকে মিথ্যা প্রমাণ যোজনা করিয়া পাঠাইতে হইবে।"

রামেশ্বর উঠান হইতে মাথা নাড়িয়া নায়েবের কথার উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বাটী পৌঁছিয়া পঞ্চাশ টাকা গণিয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন। পার্ব্বতী টাকা হস্তে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পেলে?" রামেশ্বর সবিস্তারে সকল বলিলেন।

পার্ব্বতী উহা শুনিবামাত্র টাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর পাদমূলে আসিয়া পদদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধমুখে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "এমন কর্ম্ম কখন করিও না, ছার টাকার জন্য সাধ করিয়া কয়েদী হইও না, আমি ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব; তুমি এমন কর্ম্ম করিও না, এই বিদেশে আমায় রাখিয়া তুমি যাইও না, আমার নিমিত্ত না ভাব, ছেলের মুখপানে চাও, ছেলের আর কে আছে, ছেলের রোগ হলে আমি কোথা যাব, কাহার দ্বারে দাঁড়াইব?" এই বলিতে বলিতে পতি-পদে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিলেন। এই সময়ে শিশু দ্বারের নিকট কর্দ্দম লইয়া খেলা করিতেছিল, মার ক্রন্দনশব্দ তাহার কর্ণে গেল, ব্যস্ত হইয়া কর্দ্দম আপনার অঙ্গে মুছিতে মুছিতে উভয়ের প্রতি চাহিতে লাগিল; শেষে "বাবা তুই মাকে মাল্লি?" এই বলিয়া মার অঙ্গের উপর ঝাঁপ দিয়া শত শত মুখচুম্বন করিল, আর বলিতে লাগিল, "মা, টুমি কেঁডো না, বাবাকে খুব মালব অকুন।" অমনি পার্ব্বতী সকল ভুলিয়া গেলেন, পুত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন, 'কৈ, ওঁরে মার আগে।" শিশু কোল হইতে উঠিয়া "এই মেলেসি" বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে বাপের পিঠে মারিল, আবার তখনই গলা ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। পার্ব্বতী শিখাইয়া দিতে লাগিল, "আবার মার।" শিশু তৎক্ষণাৎ "আবার মেলেসি" বলিয়া আবার সেই কোমল অমৃতমাখা কর পিতার পৃষ্ঠে দিল। এইরূপ পবিত্র সুখে কিয়ৎকাল অতি-বাহিত হইলে রামেশ্বর উঠিয়া টাকাগুলি একত্রিত করিয়া শয্যার উপর রাখিয়া চলিয়া গেলেন; পার্ব্বতী সন্তান লইয়া অন্যমনে রহিলেন।

রামেশ্বর নায়েবের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহা-শয় আমায় চালান দিতে আর বড় বিলম্ব করিবেন না, বিলম্ব হইলে বুঝি আমার খাওয়ার ব্যাঘাত হইবে। স্ত্রীর কাতরতা আর একবার দেখিতে গেলে আমার বোধাবোধ থাকিবে না, অতএব যাহা হয় করুন, আমি এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছি।" নায়েব ব্যস্ত হইয়া দারগাকে সংবাদ পাঠাইলেন। দণ্ডেক কালের মধ্যেই পদাতিকগণ রামেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া জেলায় লইয়া চলিল। তিনি আর স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়া আসিলেন না।

তখন প্রথম রামেশ্বরের স্মরণ হইল, এ যে জেলে যাইতেছি! জেল! যেখানে ব্রহ্মঘ্ন, নারীঘ্ন, পাপাত্মারা থাকে—যেখানে ডাকাত, রাহাজান, ঠগ, পরস্পরে বন্ধু—সেই জেলে! যেখানে মানুষকে গরু করিয়া ঘানিগাছে যোড়ে, সেই জেলে! যেখানে জাতি নাই, ব্রাহ্মণ মুসলমান এক পংক্তিতে খায়, হাড়ী-ডোমের সঙ্গে এক শয্যায় শুইতে হয়, সেই জেলে! যেখানে বিচার নাই, তৎপরিবর্ত্তে কেবল বেত্রাঘাত আছে, সেই জেলে! কি অপরাধে? অপরাধ, খাইতে পাই না—অপরাধ স্ত্রী-পুত্রের অন্নাভাবে মৃত্যু দেখিতে পারি না—এই অপরাধ।

এমন সময়ে শূন্যমার্গ বিদীর্ণ করিয়া, পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষ, লতা, শাখা, পত্র, গ্রাম্য প্রদেশ কম্পিত করিয়া তীব্র করুণ মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি রামেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে, পার্ব্বতী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে; কাঁদিয়া বলিতেছে, "একবার দাঁড়াও! তোমায় দেখি।" রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দৌড়িয়া ব্রাহ্মণীর নিকট আসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পদাতিকেরা আসিতে দিল না, ধাক্কা মারিয়া লইয়া চলিল। রামেশ্বর আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কয়েকটি গ্রামবাসী আসিয়া পার্ব্বতীকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পার্ব্বতী ধূলায় পড়িয়া চীৎকার করিতেছে আর কেশরাশি ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। রামেশ্বর আর দেখিতে পাইলেন না; ক্রমে দূরতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বায়ুসঙ্গে পত্নীর ক্রন্দনধ্বনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন সাগর উছলিতেছে, জগৎ কাঁদিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুলিসের পদাতিকগণ রামেশ্বরকে লইয়া গেলে পর রাত্রে দারগা আর নায়েব উভয়ে আহারান্তে একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; এমত সময় একজন দাসী সংবাদ দিল যে, রামেশ্বরের স্ত্রী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। এক্ষণে যন্ত্রণা যে সহ্য করিতে পারিবে, এমন বোধ হইতেছে; সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া আপনিও শুইয়াছে, কিন্তু এখনও ধীরে ধীরে কাঁদিতেছে

নায়েব বলিলেন, "তাহার নিকট অন্য যাহার থাকিবার কথা ছিল, সে স্ত্রীলোকটী এখনও যায় নাই?" দাসী উত্তর করিল, "সে সেখানে আছে; আমিও এ পর্য্যন্ত ছিলাম, এই মাত্র আসিতেছি।"

দাসী এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে দারগা বলিলেন, "যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, আসামী পলাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকিবে। একান্ত না পলাইতে পারে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আর একরার করিবার সম্ভাবনা নাই।" নায়েব জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে এক্ষণে উপায়?" দারগা বলিলেন যে, "আসামী একান্ত স্বীকার না করে, তবে অন্য প্রমাণ দিতে হইবে। আসামীর ঘর হইতে চুরির মাল বাহির করিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বাহ্নে তাহা খুঁজিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। একটী জলপাত্র এই সময়ে আপনি স্বয়ং যাইয়া উহার স্ত্রীকে সম্মত করিয়া রাখিয়া আসুন।" নায়েব বলিলেন "অদ্য রাত্রি হইয়াছে; কল্য প্রাতে তাহা করা যাইবে।" দারগা বলিলেন, "তাহা কদাচ হইবে না, প্রাতে অন্য লোক দেখিলে সকল কথা ব্যক্ত হইয়া যাইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে যাও।" নায়েব অগত্যা যাইতে স্বীকার করিলেন।

রামেশ্বরের অদৃষ্টশৃঙ্খল চারিদিক্ হইতে রামেশ্বরকে আঁটিয়া ধরিতেছিল। গভীর রাত্রে রামেশ্বর পদাতিকদিগের নিকট হইতে পলাইলেন। পাছে কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে সঙ্গোপনে আসিয়া গৃহের নিকট এক বৃক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বদিক্ হইতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া রামেশ্বর লুকাইয়া থাকিয়া, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, চিনিলেন যে, সে ব্যক্তি নায়েব; অতএব ভাবিলেন, এই সময় নায়েবের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া টাকা ফিরাইয়া দিই। স্ত্রীর সুখসাধন নিমিত্ত এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি তাহারই কষ্ট হইল, তবে আর টাকায় প্রয়োজন কি? এই ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, নায়েব তাঁহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। তখনও পার্ব্বতী অতি মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। প্রতিবাসিগণ বলিল, "ওগো, একটু নিদ্রা যাও, নতুবা পীড়া হইবে।" এই বলিবামাত্র পার্ব্বতী আরও অধিক কাঁদিয়া উঠিল। নায়েব দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া বলিলেন, "মা, একবার দ্বার খুলিয়া দাও, আমি তোমার স্বামীর কোন সংবাদ আনিয়াছি।" যেখানে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া রামেশ্বর দেখিতেছিলেন, সেখান হইতে এ সকল কথাবার্ত্তা কিছুই শুনা যাইতেছিল না;—পার্ব্বতীর অনুচ্চ রোদনশব্দও শুনা যাইতেছিল না। পার্ব্বতী নায়েবের কথা শুনিবামাত্র দ্রুতবেগে দ্বার খুলিয়া দিলেন, ভালমন্দ কিছুই ভাবিলেন না। নায়েব গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "অনেক কথা আছে। প্রথমে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, নতুবা কে শুনিতে পাইবে।" রামেশ্বর দূর হইতে দেখিলেন যে, নায়েব দ্বারে আসিয়া দ্বার নাড়িতে লাগিল, অস্ফুটস্বরে পার্ব্বতীকে ডাকিয়া কি দুই একটী কথা বলিল; তাঁহার নিশ্বাস খরতর বহিতে লাগিল। আবার দেখিলেন, অবিলম্বে পার্ব্বতী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। নায়েব গৃহে প্রবেশ করিলে আবার দ্বার রুদ্ধ হইল। রামেশ্বর মনে করিলেন, তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। ভাবিলেন, এই নিমিত্ত নায়েব আমাকে কৌশল করিয়া দারগার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; অতএব ইহার প্রতিফল দিব। এই বলিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলেন একবার ভাবিলেন, কি কথা হইতেছে শুনি; অমনি আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারে পদাঘাত করিলেন। গৃহাভ্যন্তর নিস্তব্ধ হইল। তখন মর্ম্মযন্ত্রণায় একপ্রকার রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমি আসিয়াছি, তুমি যাহার জন্য কাঁদিতেছিলে, সেই আমি আসিয়াছি—তোমার উপপতি তোমার ঘরে আছে, এখন আমি চলিলাম।" পার্ব্বতী এই স্বর শুনিল, আহ্লাদে কথা বুঝিতে পারিল না, উন্মত্তা হইয়া বহির্গত হইল; বহির্গত হইয়া প্রেমপুরিতস্বরে ডাকিতে লাগিল। রামেশ্বর বিস্মিত হইলেন; আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী দ্বার খুলিয়া স্বামীকে না দেখিয়া ডাকিতে

ডাকিতে উত্তর না পাইয়া, শেষে কাঁদিতে লাগিল।

রামেশ্বর আর কোন উত্তর না দিয়া ভাবিলেন, অন্তকে আর কষ্ট দিব না, আপনি আর কষ্ট পাইব না, এই ঘৃণিত পৃথিবী ত্যাগ করিব। এই সিদ্ধান্ত করিয়া চলিলেন। অপরাহ্নে যে ক্রন্দনধ্বনি মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই শব্দ পৈশাচিক বোধ হইতে লাগিল।

রামেশ্বর কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলেন, পদাতিকগণ ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, "আমাকে বন্ধন কর; আমি আসিয়াছি।" রামেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইল, বন্ধন করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তিনি বলিলেন, "পরিবার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাই গিয়াছিলাম। এখন চল, তোমাদের ভয় নাই। আমি নিজে আসিয়া ধরা দিয়াছি, তাহাই তোমাদের দারগা আমাকে চালান দিতে পারিয়াছেন, নতুবা তাঁহার সাধ্য হইত না। সে দিবস খুন করিয়াছিলাম, আমি ধরা দিই নাই বলিয়াই কেহ সন্ধানও পায় নাই।"

ইহা শুনিয়া জমাদ্দার অতি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "সে খুন কি তুমি করিয়াছিলে?" রামেশ্বর উত্তর করিলেন, "হাঁ! আমিই সে খুন করিয়াছি।" জমাদ্দার আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আদালতে স্বীকার করিতে পারিবে?" রামেশ্বর বলিলেন, "অবশ্য স্বীকার করিব; কাহারে ভয়?"

আর কেহ কোন কথা বলিল না, সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পরদিবস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনীত হইয়া রামেশ্বর দাঁড়াইলেন। মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাঁহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি সেই খুনী মামলার একরারী আসামী?" রামেশ্বর "হাঁ" বলিয়া সেলাম করিলেন। তখন তাঁহার আন্তরিক যন্ত্রণা বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়া-[illegible], 'কোনরূপে এ দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই [illegible] এই বিবেচনায় হত্যাকারী বলিয়া আত্মপরিচয় [illegible]। জমাদ্দার আনুষঙ্গিক প্রমাণ যোগাড় করিয়া [illegible]ন। রামেশ্বর দায়রা-সোপর্দ্দ হইলেন। দায়রা-বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম [illegible]। কিছুদিন পরে নিজামত আদালত দণ্ড ক[illegible]হিয়া দিলেন। তখন পিনল কোড ছিল না; বিশ বৎসরের নিমিত্ত রামেশ্বর দ্বীপান্তরে গেলেন।

এদিকে পার্ব্বতী এক্ষণে স্বামীর কথার শব্দ শুনিয়া আর উত্তর না পাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার সন্ধানে বনে বনে ছুটিতে লাগিল। কোথাও স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল না; কত ডাকিল—কোন উত্তর পাইল না; কত কাঁদিল—কেহ তাহাকে শান্ত করিল না। শেষে পদ্মানদীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল; তখন হঠাৎ মনে পড়িল যে, রামেশ্বর যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার কথায় কি একটী শব্দ ছিল—অতি নিষ্ঠুর, অতি ভয়ঙ্কর, একটী কথা ছিল—পার্ব্বতী তখন আহ্লাদে তাহাতে কাণ দেয় নাই—তখন রামেশ্বরের কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই; এখন সেই কথাটী মনে পড়িল—এখন তাহার অর্থ বুঝিল—এখন বুঝিল, রামেশ্বর কেন পলাইয়াছেন। বুঝিল—তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; বুঝিল—এ সংসারে আর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তখন তাহার চক্ষে আকাশ, নক্ষত্র, জল সকলই আঁধার হইয়া আসিল। নদীজলের একটী শব্দ হইল, জলে তরঙ্গ উঠিল, ক্রমে মিলাইয়া গেল, শেষে সকল স্তব্ধ হইল। পার্ব্বতী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে আর নাই—পার্ব্বতী জলমগ্না হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ঘোরনাদী সমুদ্রের বজ্রগম্ভীর কল্লোল শুনিতে শুনিতে বিশ বৎসর; এই বালুকাময় উপকূলারূঢ় নারিকেলবৃক্ষের সঙ্কীর্ণ ছায়ায়, কোদালী হাতে, বিশ্রাম করিতে করিতে বিশ বৎসর! এই সাগরপ্রান্তব্যাপী ফেণবিকীর্ণ ধূমমধ্যে আনন্দদুলালের হাসিভরা মুখের অন্বেষণ করিতে করিতে বিশ বৎসর! স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, 'মরিব'—মরিতে পারিল না—বিশ বৎসরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিল। আমরা মনে করি, 'এই করিব,' আর একজন মনে করেন আর। আমাদিগের কার্য্য দৃষ্ট; তাঁহার কার্য্য অদৃষ্ট!

যখন বিশ্বাসঘাতিনীর কথা মনে করিয়া, রামেশ্বর মরিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ত আনন্দদুলালকে মনে পড়ে নাই। এখন দিবারাত্রি এই নির্ব্বাসিতের বাসদ্বীপে আনন্দদুলালের অকৃত্রিম, সরল

হাসি-ভরা মুখ, তাহার আধ কথা, তাহার খেলা মনে পড়িতে লাগিল। যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকে, রামেশ্বর ভাবেন, আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে। যখন দূরে অস্পষ্টলক্ষ্য একটী তরঙ্গ উচু হইয়া নাচে, রামেশ্বর মনে করেন যে, আনন্দদুলাল নাচিতেছে। রামেশ্বর মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ বৎসর বাঁচিবেন না—কিন্তু বিশ বৎসর বাঁচিলেন। কাল পূর্ণ হইলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। জ্ঞাতিপুরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সে কুটীর নাই—তাঁহার সে পত্নী নাই, কই, আনন্দদুলালী ত নাই! কেহ তাহাদের কথা কিছুই বলিতে পারিল না। রামেশ্বর! রামেশ্বর কে? রামেশ্বরকে কেহ চেনে না।

কয়েকদিন রামেশ্বর সন্তানের নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমিলেন। একদা তিনি হাট যাইবার পথে বসিয়া থাকিলেন; ভাবিলেন, হয় ত তাঁহার সন্তান জন্য হাট করিতে আসিবে রামেশ্বর যুবা পথিক মাত্রই সকলকে অতৃপ্ত-লোচনে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া রামেশ্বর শিহরিলেন; স্ত্রীলোককে দেখিয়া বোধ হইল, সে বেশ্যা; আকার দেখিয়া, রামেশ্বরের বোধ হইল, সে পার্ব্বতী। রামেশ্বর যখন দ্বীপান্তরে যান, তখন পার্ব্বতীর বয়স বিশ বৎসর, এক্ষণে তাহার বয়স চল্লিশ হওয়ার কথা; ইহার সেই বয়স। যাহাকে বিশ বৎসর বয়সের পর আর দেখি নাই, তাহাকে চল্লিশ বৎসর বয়সে সহজে চেনা যায় না। যে পার্ব্বতীকে রামেশ্বর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এ সে পার্ব্বতী নহে বটে, কিন্তু রামেশ্বর মনে বুঝিলেন যে, যে বৈসদৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহা বয়োপরিবর্ত্তনে ঘটিয়াছে। বেশ্যা রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধা শুষ্ক বনফুলের মালা গলায় দিয়া তামাক খাইতে খাইতে একজন মুসলমানের সহিত কথা কহিতেছে; দেখিবামাত্র রামেশ্বর তাহার নিকট গিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র কোথায়?" বেশ্যা আকাশমুখী হইয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "কে তোর ছেলে?" রামেশ্বর বলিলেন, "আনন্দদুলাল।" নটী বলিল, "মরণ আর কি! তোমার দড়া কলসী যোটে না?" রামেশ্বর বলিলেন, "শীঘ্র যুটিবে; এক্ষণে বল্ আনন্দদুলালকে কোথায় পাঠাইয়াছিস্?" বেশ্যা উত্তর করিল, "চুলায় পাঠাইয়াছি—নদীর ঘাটে তারে পুঁতিয়া আসিয়াছি—তাহার ওলাউঠা হইয়াছিল—সে গিয়াছে, এক্ষণে তুমিও যাও।" রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না; জোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া গেলেন।

গেলেন কোথায়? কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। দ্বীপান্তরে বসিয়া এই পুত্রের মুখ ভাবিতেন। কবে আবার তারে দেখিবেন, বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেন। এই আশা এ পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থি ছিল। এক্ষণে সে গ্রন্থি ছিন্ন হইল। এক্ষণে আর কোথায় যাইবেন অথচ গেলেন।

পথে দেখিলেন, আর একজন স্ত্রীলোক একটী ছেলে কোলে করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামেশ্বর হঠাৎ তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া তাহার ক্রোড় হইতে ছেলে কাড়িয়া নামাইয়া দিলেন। স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। রামেশ্বর বলিলেন, "তোরা রাক্ষসীর জাত! ছেলে মারিয়া ফেলিবি—ছেলে ছেড়ে দে।"

রামেশ্বর সমস্ত দিন পথে পথে বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইলেন। রাত্রে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সম্মুখে এক দোকান দেখিলেন; দোকানী ঝাঁপ ফেলিয়া শুইয়া আছে। রামেশ্বর ঝাঁপ ভাঙ্গিয়া, প্রবেশ পূর্ব্বক সম্মুখে যাহা পাইলেন, খাইতে আরম্ভ করিলেন দোকানী উঠিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। রামেশ্বর দোকানীর গলদেশে হস্ত দিয়া দোকানের বাহির করিয়া দিলেন।

দোকানী ফাঁড়ি হইতে বরকন্দাজ ডাকিয়া আনিল; রামেশ্বর বরকন্দাজের লাঠি কাড়িয়া তাহার মাথায় মারিল। বরকন্দাজের মাথা ফাটিয়া গেল।

শীঘ্র রটিল, একজন প্রসিদ্ধ দায়মালী, পিলোবিনাং হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশ লুট করিতেছে, যাকে পাইতেছে, তাকে মারিতেছে। পুলিস শশব্যস্ত হইল; মাজিষ্ট্রেট রামেশ্বরের গ্রেপ্তারীর জন্য দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। রামেশ্বর দিনকত লুঠিয়া খাইয়া মানুষ ঠেঙ্গাইয়া লুকাইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সকলে বন্য পশুর ন্যায় তাঁহাকে তাড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যত বদমাস, ডাকাইত, তাঁহার প্রতাপ শুনিয়া তাঁহার চারিপাশে জমিল। তখন রামেশ্বর ডাকাতের সর্দ্দার হইয়া, মনুষ্য-জাতির উপর ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারিল না; কিন্তু একবার প্রায় ধরা পড়িয়াছিলেন। তিনি সদলে, বহু দূরে, এক ডাকাতী করিতে গিয়াছিলেন

গৃহরক্ষকেরা সতর্ক হন, বলবান; রামেশ্বর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে বহিয়া আনিয়া গ্রামান্তরে এক জঙ্গলে ফেলিয়া গেল।

সেই গ্রামের লোক পরদিন প্রাতে সভয়ে দেখিল যে, একজন মৃতপ্রায়, আহত ব্যক্তি বনে পড়িয়া আছে। তাহারা পুলিসে সংবাদ দিতে যাইতেছিল। এমত সময়ে সেই দিন একজন ডাক্তার কোন ধনী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ নগর হইতে সেই গ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "এ মুমূর্ষু। আমি আগে ইহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাই; এক্ষণে ইহাকে পুলিসে লইয়া গেলে ইহার মৃত্যু হইবে। তোমরা পশ্চাৎ পুলিসে সংবাদ দিও।" লোকে ডাক্তারের কথা শুনিল, পুলিসে তখন সংবাদ দিল না। ডাক্তার তৎক্ষণাই চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া তাহার জীবন দান করিলেন। রামেশ্বরের উত্থানশক্তি হইবামাত্র তিনি ডাক্তারের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া পুলিসের হাত এড়াইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামু সর্দারের ভয়ে দেশ কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু নন্দদুলালের শোক রামু ভুলিল না। শেষোক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে একদিন রাম বা রামেশ্বর দলের সঙ্গে এক ডাকাইতীতে যাইতেছিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। প্রান্তরের বৃক্ষাগ্রে, নদীজলে, চন্দ্রকিরণ কাঁপিতেছে। একখানি পাল্কী ধীরে ধীরে নদীর ধার দিয়া যাইতেছে। পাল্কীর মধ্যে বাবু শয়ন করিয়া আছেন। পাল্কীতে শয়ন করিয়া বাবু অন্তরে নানা বিষয় ভাবিতেছিলেন। গৃহিণী, কন্যা, খোকা, পাজা, নূতন বাগান, নূতন বাগানের কেবলা মালীর দোরঙ্গা দাড়ী, তাহার মালীর খাঁদা নাক, সবই চিন্তার ভাগী হইল। বাবু এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময় হঠাৎ পাল্কী তুলিয়া উঠিল— দুই এক পদ হাটিল, শেষ ভূমিতে নামিল। বাবু পাল্কী হইতে মুখ বাহির করিলেন; শিহরিয়া উঠিলেন, দেখিলেন,প্রায় পঁচিশ ত্রিশটী তরবারিফলকে চন্দ্রকিরণ জ্বলিতেছে এবং যাহাদের হস্তে সেই তরবারি ছিল, তাহারা গম্ভীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। বাবু তখন সকল বুঝিলেন। দস্যুরা পাল্কীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে একজন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক চুল ধরিয়া বাবুকে বাহির করিল। আর একজন আকর্ণ হস্ত তুলিয়া সড়কী সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতেছিল, এমত সময় রামেশ্বর সেই সড়কীর ফলক ধরিয়া বাবুর প্রাণরক্ষা করিল এবং সকলকে বলিল,'তোমরা একটু অপেক্ষা কর,আমি একবার বিশেষ করিয়া দেখি, এই ব্যক্তিকে বুঝি কোথায় দেখিয়াছি।" যে সড়কী নিক্ষেপ করিতেছিল, সে ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিল, "তুমি সকলকে, দেখিয়াছ! সকলেই তোমার আত্মীয়-কুটুম্ব, তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমরা বাবুর পরিচয় লই।" রামেশ্বর তখন দর্পে তরবারি ঘুরাইয়া বলিলেন, "সকল তফাৎ যা, নহিলে কে পারিস্ হাতিয়ার লইয়া এগো।" এই কথা শুনিয়া সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু আপনি কি ডাক্তার?" বাবু বলিয়া উঠিলেন 'আমি ডাক্তার আমায় বাঁচাও, আমি চিরকাল তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।"

রামেশ্বর বলিল, "কোন ভয় নাই, আমিই আপনার ক্রীতদাস।" এই বলিয়া অন্য দস্যুদিগকে ডাকিয়া কি বলিল; তাহারা অমত দেখিয়া শেষ যে উদ্দেশে তাহারা যেখানে যাইতেছিল,সেই দিকে চলিয়া গেল। তখন ডাক্তার বাবু দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে তুমি আমাকে চিনিলে, আর কেনই বা আমাকে রক্ষা করিলে, ইহার সবিশেষ জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

দস্যু বলিল, 'কয়েক বৎসর হইল, আমি জখম হইয়া এক জঙ্গলে পড়িয়াছিলাম—আপনি আমাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া প্রাণদান করিয়াছিলেন। গ্রাম্য লোকের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, পুলিসে দেন নাই। আমি আপনার নিকট চিরকাল বিকাইয়া আছি। চলুন, আমি আপনাকে ঘাঁটি পার করিয়া রাখিয়া আসি।"

ডাক্তার বাবু দস্যুর এরূপ কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি স্বভাবতঃ মহাত্মা—কেন এ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ?"

রামেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন দেখিয়া, ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, এ ব্যক্তি গুরুতর মনোদুঃখ পাইয়া দস্যু হইয়াছে—চেষ্টা করিলে ইহাকে কুপথ পরিত্যাগ করান যায়। মনে ভাবিলেন, এ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—ইহার

উদ্ধারের উপায় করা আমার কর্ত্তব্য। যখন ডাক্তার বাবু রামেশ্বরকে বলিলেন, "তুমি কে? কেন তোমার এ দস্যুবৃত্তি ঘটিয়াছে? তোমার বৃত্তান্ত জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমাকে পরিচয় দিয়া পরিতৃপ্ত কর। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।" দস্যু বলিল, "আপনিও একবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, অতএব আপনার দ্বারা যদি এক্ষণে সেই জীবনের কোন বিঘ্ন হয়, তাহাতেও আমার আক্ষেপ নাই।" এই বলিয়া আপনার পূর্ব্বপরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। শেষ চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি আমার সন্তান জীবিত থাকিত! যদি তাহাকে আর দেখিতে পাইতাম!" এই বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। আবার তাহার চক্ষু দিয়া অজস্র জলধারা পড়িতে লাগিল। ডাক্তারও তাহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষের জল মুছিয়া ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি সেই ভাতিগ্রাম চিনি। সেখানে আমি চিকিৎসা করিতে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সবিশেষ আমি সেখানকার নায়েব ও অন্যান্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। আপনার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! সেইজন্য আপনি ভয়ঙ্কর ভ্রমে পতিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া দ্বীপান্তরে গিয়াছিলেন।"

রামেশ্বর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?" ডাক্তার বলিলেন, "আপনি হাটের পথে যে বেশ্যাকে পার্ব্বতী মনে করিয়াছিলেন, সে পার্ব্বতী নহে।"

রামেশ্বর বলিল, "না হউক—সমান কথা। সে পাপিষ্ঠাও কোথায় বেশ্যাবেশে কাল কাটাইতেছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, আজ্ঞে না। তিনি আপনার শোকে পদ্মার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।"

রামেশ্বর এ কথায় অশ্রদ্ধা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যে প্রকারে হউক, ডাক্তার বাবু প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। নায়েব ও দারগার পরামর্শ হইতে পার্ব্বতীর পদ্মায় নিমজ্জন পর্য্যন্ত প্রকৃত কথা রামেশ্বরের নিকট সবিস্তারে বলিলেন। শুনিয়া, রামেশ্বর আপন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া ডাক্তার বাবুর হাতে জড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আমাকে প্রতারণা করিও না—শপথ করিয়া বল, এ কথা কি সত্য? মিথ্যা বল, তবে ব্রহ্মহত্যার পাপী হইবে,—এ সকল কথা কি সত্য?"

ডাক্তার বলিল, "এ সকল কথা সত্য।"

যখন রামেশ্বর ধীরে ধীরে সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল কোমল পুষ্পশোভিত তীরভূমিতে উপবেশন করিলেন; দুই করে মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। ক্রমে তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষণকাল পরে রামেশ্বর, ভূমিতে লুটাইয়া "পার্ব্বতী পার্ব্বতী! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়াই ডাক্তার বাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, হাত ধরিয়া উঠাইলেন; বলিলেন, আপনি কাঁদিবেন না। এই দুঃখের সময়ে আপনাকে আমি একটী সুসংবাদ দিব। আপনার পুত্র মরে নাই।"

রামেশ্বর বিদ্যুদ্বৎ বেগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দুলাল জীবিত আছে? শীঘ্র বল, সে আমার কোথায়?"

"আপনার পুত্র আপনার পাদমূলে।" এই বলিয়া ডাক্তার বাবু রামেশ্বরের পদতলে পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামেশ্বর প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্রমে বুঝিল। দুই হস্তে সন্তানের মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিল; চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না; তখন সন্তানের মস্তক বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "সত্যই বটে এই আমার আনন্দদুলাল!" ক্ষণেক বিলম্বে পিতার বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া সন্তান বলিলেন, "আপনি এই পাল্কীতে চড়িয়া আমার গৃহে চলুন। কি প্রকারে আমি প্রতিপালিত হইলাম এবং লেখাপড়া শিখিলাম, তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিব।"

রামেশ্বর বুঝিলেন, তিনি এক্ষণে পুত্রের সঙ্গে গেলে পুত্রকে পদব্রজে যাইতে হইবে। অতএব বলিলেন, "তুমি আগে চল। আমাকে তোমার বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া যাও, আমি কাল প্রাতে পৌঁছিব।" আনন্দদুলাল বিশেষ অনুরোধ করাতেও রামেশ্বর শুনিলেন না, সুতরাং পুত্র অগ্রসর হইলেন। রামেশ্বর সেই নদীতটে বসিয়া সাধ্বী পার্ব্বতীর জন্য রোদন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে রামেশ্বর পুত্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া, পুত্রকে পুনরপি আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময়ে অর্দ্ধাবগুণ্ঠাবৃত এক স্ত্রীলোক আসিয়া রামেশ্বরের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই রামেশ্বর চমকিল—এ কার গলা! দুই হস্তে তাহাকে

তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া চিনিল, ভূপতিত পার্ব্বতী!

তখন রামেশ্বর পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয় বলিলেন, "সে কি! তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে তোমার মাতা পদ্মায় ডুবিয়াছিলেন।"

আনন্দদুলাল বলিলেন, "আমি সত্যই বলিয়াছি মা পদ্মায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন, কিন্তু মরেন নাই—জালিয়ারা তুলিয়াছিল। সে সকল কথা পশ্চাৎ শুনিবেন।

তখন তিনজনে, একত্রে আহ্লাদে রোদন করিতে করিতে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পরস্পরকে শুনাইতে লাগিলেন।

দামিনী।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুকাল হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্তবৎসর-বয়স্কা একটী বালিকা ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া, অনিমেষ-লোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পার্শ্ববর্ত্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল, "আয়ি, আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আয়ী উত্তর করিলেন, "তা যাক. এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটীর নাম দামিনী। বৃদ্ধ মাতামহী ব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিল না; সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথমে দীপ ভাসাইল; দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না, অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিয়া আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল না; কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে এক্ষণে আর উপায় নাই; অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া, মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। দামিনী গম্ভীরভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটী কলসে জল ছিল; দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিল। শয়নমাত্রই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন মেঘ অন্ধকারে ভারী হইয়া নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল, এমত সময়ে পতনোন্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহার চারিদিকে ঘেরিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটীর চূড়ার উপর গম্ভীরভাবে একটী বিড়াল বসিয়া আছে। দামিনী চিনিল যে, সেইটী তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল; সেটী তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিত, কখনও পলাইতে পারিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল। বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। দামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতামহী "ভয় কি" বলিয়া নিদ্রিতা দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লই-লেন। দামিনী নিদ্রাভঙ্গে "আমার মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর মা ছিল না; তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

পরদিবস প্রাতে দ্বাদশবর্ষীয় একটী বালক পাঠশালায় যাইতেছিল; দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়া-ইয়া পক্ষীশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। দামিনী একা বসিয়াছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর হইয়াছে কি?" দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলিল, "আয়ীর উপর রাগ করিয়াছ?" দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্তা হইতে কতকগুলি পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

এ বালকটীর নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না; প্রতিবাসী বলিয়া দামিনী তাহাকে রমেশ দাদা বলিয়া ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগত ছিল। যে বিড়ালটীকে দামিনী বড় ভয় করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। অনেক সময় রমেশ স্রোতে সন্তরণ করিয়া দামিনীর নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত; পরা হইলে মাথা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "রমেশ দাদা, দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পরাইয়া দিত। রমেশ জানিত যে, গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে, গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশদাদা তাহার "আপনার জন।" আর কেহ ত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য রমেশ দাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িয়া নিকটে যাইয়া দাঁড়াইত; হাসিমুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিয়া আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশব গম্ভীর হইয়াছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীরপ্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতর। দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ায় সকল ছেলে, মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখপানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীরই কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ী আছে—আয়ী বেশ—মার মত ভালবাসে—তবু মা! মার আদর কেমন! তিন বৎসর বয়সে দামিনী মা হরাইয়াছিল দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত। —একটু একটু—কেবল ছায়াটী—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন, যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে —আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে, প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সাজাইত—সাজাইয়া মনে মনে মা! মা! মা! বলিয়া ডাকিত।

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মার কথা, দীপের কথা, স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা, সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরি ত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর পরে আর একদিবস অপরাহ্নে একটী ক্ষুদ্র শয়নগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া সূর্য্যকিরণ শয্যায় পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া গাত্রমার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই; এক্ষণে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরের গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনার গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। দামিনী স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে।

গাত্রমার্জ্জন সমাধা করিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে একটী স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দামিনী অমনি চঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকাবয়সে যাঁহারে দামিনী রমেশদাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহলোচনে দামিনী চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ দামিনীর স্বামী; দামিনীর সর্ব্বস্ব।

কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় দুই একটী পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া, দামিনীকে বলিলেন, "কোন্ চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে?"

দামিনী বলিল, "খুব করেছে, উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখ্‌তে পারেন, আর লোকে চুরি কর্‌তে পারে না? খুব করেছে—চুরি করেছে।"

রমেশ বলিলেন, "খুব করেছে বই কি? চোরকে একবার ধরিতে পারিলে বুঝিতে পারি।"

চোর আসিয়া ধরা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধরিলেন; দুই করে দামিনীর দুটি কর্ণ আবরণ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী রমেশের দুই বাহু ধরিয়া উর্দ্ধমুখে রমেশকে দেখিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব।" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পুরিয়া আসিল; দামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদর কর কেন?"

এই সময় দ্বারের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ হইয়া উঠিল। যেন আর একজন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন অপরিচিতা অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া, দামিনীর যেন কি মনে পড়িল —কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ দামিনীর গলা ধরিয়া তাহার বক্ষে মাথা দিয়া মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ করিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।—কান্না দেখিলে কান্না পায় বলিয়া, কি কেন—তাহা জানি না।

দামিনী ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী কিছু বলিল না, "মা মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দামিনী বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা আছে?"

দামিনী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন, "বিধাতা জানেন," বলিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

পাগলী বলিল, "দেখ, তোমার মার জন্মেই তুমি কাঁদিতেছ—আমি আজি আমার মা পাইয়াছি—আমি কাঁদিব না?"

একটী কথা সহসা বিদ্যুতের মত দামিনীর মনের চমকিল—"এই আমার মা নয় ত?"

হাঁ, সেই ত মা। দামিনীর মা স্বামীর শোকে পাগল হইয়া পলাইয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কোথায় ছিল, তাহাকে জানে? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধরিয়া বেড়াইয়াছিল। আবার বহুকাল পরে সংসার মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল—লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীর মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমার মা নয় ত?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রমেশের বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিয়া ফিরিলেন। যেখানে পাগলী দাঁড়াইয়াছিল, সে দিকে আবার দেখিলেন; পাগলী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন, তাহার অনুসরণ করি; দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকটী কে?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, "পাগল।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন; দুই একবার অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইয়াছেন, সেই অবধি মা বলিয়া ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামে রমেশ বাস করিতেন, তাহার দক্ষিণ প্রান্তে ভাগীরথীতীরে একটী ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বকালে এক রাজা আপন মাতার গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায় ঐ অট্টালিকায় একটী স্ত্রীহত্যা হওয়ায় রাজার মাতা উহা পরিত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই। অট্টালিকার ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগেও কেহ এ অট্টালিকার নিকট দিয়া গতিবিধি করিতে সাহস করিত না।

পাগলী দেখিল যে, এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহার বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিল। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাগলের অনেক মতিস্থির হইয়াছিল; তথাপি

মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুরি করিয়া এই গোপনীয় স্থলে আনিয়া একা দেখিবে, এই মনে মনে স্থির করিত। আবার পরক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিত। পাছে চাঞ্চল্য প্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক রটায়, এই ভয়ে আর দামিনীর বাটীতে যাইত না। একা ভগ্ন অট্টালিকায় বসিয়া আপনা আপনি উদ্দেশে দামিনীকে আদর করিত, দামিনীকে কিরূপে রমেশ আদর করিতেছিল, আবার তাহাই ভাবিত।

একদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাগলী স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া ভগ্ন অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া অন্ধকারে কেশ শুকাইতেছিল। কেশগুলি নানাদিকে নানাভঙ্গীতে তুলিতেছিল, ফেলিতেছিল। এমন সময়ে পূর্ব্বদিকের অশ্বত্থবৃক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বের চীৎকার শুনিতে পাইল। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল, ক্রমে দুই একটী মসাল জ্বালিত হইল, এবং তদালোকে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বারোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগলী প্রথমে ভাবিল, ইহারা ডাকাইত; পাছে ইহারা আমার দামিনীর ঘরে ডাকাতী করে, এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিয়া ডাকাতদিগের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল। ফিরিয়া ঝটিতি গৃহে আসিয়া ভৈরবীবেশ ধারণ করিয়া, করাল ত্রিশূল হস্তে লইয়া সদর্পে চলিল। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পাল্কী দেখিয়া ভাবিল, ইহারা ডাকাত নহে, ডাকাতের সঙ্গে পাল্কী থাকে না। ইহারা বরযাত্রী হইবে। পাগলী তাহাদের সঙ্গে চলিল। দামিনীর বিবাহ সে দেখিতে পায় নাই, অতএব বিবাহ দেখিব মনে করিয়া পরম আহ্লাদ-পূর্ব্বক পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ধকারে তাহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতদূর গেলে একজন শিবিকাবাহক তাহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে, তুই এমত সময় আমাদের সঙ্গে যাইতেছিস্?" পাগলী উত্তর করিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দেখিতে যাইতেছি তোমাদের সঙ্গে বাদ্যকর নাই কেন?"

বাহক উত্তর করিল, "এ বড় ভয়ানক বিবাহ, এ বিবাহে বাদ্য থাকে না।" পাগলী এ কথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন ইচ্ছানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার বাড়ীর বর, কাহার বাড়ীর কনে?" বাহক কহিল, "হিন্দুর কনে; মুসলমানের বর।" পাগলী উত্তর করিল, "মিছে কথা।" বাহক দেখিল যে, স্ত্রীলোকটী পাগল, অতএব তাহার সঙ্গে রঙ্গ করিতে লাগিল। "কে বর?" এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী দেখিল, অসম্ভব নহে, বয়স অল্প, জরির কাপড় পরিধান। আর কোন শব্দ না করিয়া সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগের পরিচয় দিতে বাহকের প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল, কিন্তু সে নিষেধ তাহার পক্ষে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতেছিল। পাগলীকে পাইয়া বাহক মনে করিয়াছিল যে, সে ভার নামাইবে; কিন্তু পাগলী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় তাহার আশা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যাঘাত জন্মিল। শেষ বাহক পাগলীকে বলিল, 'তুমি স্ত্রীলোক, আমাদের সঙ্গে যাওয়া ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে, অতএব তুমি পালাও।' পাগলী বলিল, "বিবাহ শুভ কর্ম্ম, ইহাতে কাটাকাটি হইবে কেন?" বাহক উত্তর করিল, "এ ব্যাপার বিবাহের নহে। যিনি তাজ পরিয়া তরবারি লইয়া ঘোড়ার উপর যাইতেছেন উনি আমাদের ফৌজদারের পুত্র। এই গ্রামে একটী অদ্ভুত সুন্দরী আছে শুনিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন; তাই বলিতেছিলাম, কাটাকাটি হইবে।"

পাগলী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কন্যা লইয়া যাইবে?" বাহক বলিল, "আমি সবিশেষ জানি না, শুনিয়াছি, কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূ; যুবতীর স্বামী নাকি অল্প কয়েক দিন হইল শিষ্যালয়ে গিয়াছে। সুন্দরীর নাম বুঝি দামিনী।"

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীর ন্যায় বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিল; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাহক ভয়ে বলিল, "আমি দরিদ্র বাহক, পেটের জ্বালায় সকল করি; আমাকে মারিলে কি হইবে? আমি হিন্দু, অতএব হিন্দুর অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয়। এক্ষণে গোলযোগ করিলে এই যবনেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে, অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিয়া দ্রুত যাইয়া গ্রামবাসিদিগকে জাগ্রত কর; সকলে একত্র প্রতিবন্ধক হইলে সক্ষম হইতে পারিবে, নতুবা আর উপায় নাই।"

পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল; গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে

লাগিল, "হিন্দুর হিন্দুত্ব যায়, সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। অদিতি ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বনাশ হয়, একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে, একবার সকলে

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল, "যাউক শত্রু পরে পরে।" কেহ বলিল, "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে?" কেহ বলিল, "অদিতির সর্ব্বনাশ হয় যদি, তাহাতে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপর-দেশীয় সকলে বুঝে। বিপদ অদ্য আমার, কল্য তোমার; অত্যাচার এক ঘরে প্রবেশ করিতে পাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পরের ঘরের অগ্নি যে নিবায়, কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এ বোধ বাঙ্গলা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে; অতএব পাগলীর চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্দ্দান্ত যবনের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিল না; রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ একা, তাহে বৃদ্ধ, দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইয়া গেল।

পাগলী দেখিল, কেহই উঠিল না, কেহই সহায়তা করিল না। রমেশের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, সকল ফুরাইয়াছে; দামিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন পাগলীর কপোলমধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগলী পূর্ব্বতন উন্মত্তা হইয়া সিংহীর ন্যায় অনেক দাঁড়াইল। শেষ ত্রিশূল

যবনেরা এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া দামিনীকে লইয়া যাইতেছিল। পাল্কীর চারিদিকে অস্ত্রধারী পদাতিক। সর্ব্ব পশ্চাতে ফৌজদারপুত্র অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পাগলী বায়ুবেগে তথায় হইয়া ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদারপুত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দেখা দিল। ফৌজদার পুত্রের শরীর প্রথমে দুলিল শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। পাগলী বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল; পদাতিকেরা ফিরিয়া দেখিল।

পাগলী আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আর তাহার স্মরণ হইল না। সেই অবধি পাগলীকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না। পদাতিকেরা দেখিল যে, ফৌজদারপুত্র সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল পাল্কী হইতে দামিনীকে ফেলিয়া দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তরে পড়িয়া রহিলেন। নবপল্লবিত পুষ্পিত লতাবৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে, প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাঁহার অঞ্চল উলটি পালটি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই; দামিনী নাই, সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিয়া রহিলেন; ক্রমে প্রতিবাসিগণ, গ্রামবাসিগণ, আত্মীয়-কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করিতে আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন, "কি বিপদ, কি বিপদ!" কেহ বলিলেন, "কখন্ কাহার কি ঘটে, কে বলিতে পারে?" কেহ বলিলেন, "অদৃষ্টই মূল।" অদিতি বিশারদ ইহার কোন কথাতেই উত্তর করিলেন না দেখিয়া গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশরীর প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে ইহার কোন সূচনা ছিল না? অর্থাৎ পূর্ব্বে কি মহাশয় কিছুই জানিতে পারেন নাই?" অদিতি বিশারদ ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিব, তবে এমন ঘটিবেই বা কেন? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন? এই রাত্রে রমেশ থাকিলে শৃগালের সাধ্য কি যে সিংহের গৃহে প্রবেশ করে?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "রমেশের প্রয়োজন কি? আমরাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন, সকল সময় সাহস হয় না; যবনেরা প্রায় বিশজন, আমরা একা; বিশেষতঃ তখন যদি সদরবাড়ীতে থাকিতাম, তবে যা হয় একখানা করিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য বশতঃ অথবা রমেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি তখন অন্দরে

শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে উঠা যায় না; তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠিলাম, অন্ধকারে কাপড় পরিলাম, সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্য শম্বুক বাহির করিলাম, এক টীপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলাম; এ সকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি, আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এ সকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নহে; কি জানি, পাছে হস্তেরা পিছলে পড়ায়, এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম; সকল বিষয় একবারে স্মরণ হয় না; গাত্রমার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, 'পুতির তক্তা আন।' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তাহার কর্ম্ম নহে।' শেষে একটা শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটা ইট আনিয়া দিল। আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে; আমি অমনি সেই ইট ছুড়িলাম।"

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময় একজন কৃষক আসিয়া বলিল যে, ফৌজদারপুত্র পথে মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে, তাহার স্থির নাই।

গণেশচন্দ্র অহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে. নিশ্চয় বলিতেছি, আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।"

আর একজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ওরূপ কথা মুখে আনা ভাল নহে। যিনি মরিয়াছেন, তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে, তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।"

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি উপহাস করিতেছিলাম; আমি তা বলি নাই; আমি কি বলিতেছি, কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখন সম্ভব নহে। আমি বরং বলিতেছি যে, এত ডাকাডাকি করেছে, তথাপি আমি কথা কই নাই। রমেশ বড় না হাকিম বড়?" এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদারপুত্রের মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল, সে অদিতি বিশারদকে বলিল যে, মহাশয়ের পুত্রবধূ বাড়ী ফিরে আসতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র বিশারদ সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশারদ আপনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না?" সকলে উত্তর করিল যে, মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন। অদিতি বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "সেই বউকে আবার ঘরে? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া সংসার কর?"

কর্ত্তা বলিলেন, "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। দোষ তবে সকল আমার?

ক। না, তোমার দোষ দিই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে?

গৃ। দোষ অনেক। প্রথমে লোকে গালে কালিচুণ দিবে, দ্বিতীয়তঃ শিষ্যেরা ত্যাগ করিবে, তখন আমার এই শিশু সন্তানের কি উপায় হইবে?

ক। কেন লোকেরা দোষ দিবে? আমাদের পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে. ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, যবনগৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃ। কুলত্যাগী নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, এ কথা তোমায় কে বলিল? তুমি সকল সংবাদই প্রায় জান। কয় দিবস পর্য্যন্ত এক মাগী পাগলের বেশ ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিল; সে দিবস সন্ধ্যার সময় বধূকে লইয়া পলাইতেছিল, আমি যাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। ফিরে এসে বালিশ মুখে দিয়া যে আবার মেয়ের কান্না! আমি কি সকল কথা তোমায় বলি। তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে, আমি থাকিতে আর পলাতে পারিবে না, তখন এই পরামর্শ করিয়া লোকজন আনাইয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন দুই একবার বলিলেন, "শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?" শেষে বলিলেন "তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার বিশ্বাস হইল। আমি কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

অদিতি বিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী, এক্ষণে জানিলাম, তাহা নহে। তোমরা আমার আত্মীয়, তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেক দিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর সতর্কতা হেতু সফল-

হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমার এই ঘর দ্বার ভগ্ন হওয়া সে কেবল আমার কুলবধূর পরামর্শ ও কৌশলে হইয়াছে। সে যাহা হউক, যদি তাঁহাকে নির্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার করি, তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসারে তাহারে আর কেমন করিয়া গ্রহণ করি? শাস্ত্রে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে, কিন্তু বধূকে গ্রহণ করিলে আর একটা বিপদ আছে। ফৌজদার মনে করিবেন যে, আমরাই তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়া বধূকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি, যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে, তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মরক্ষা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম; শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির করিয়াছি, পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা পরামর্শে কি বল?"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এ পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব। আমরাও কেহ আপনার পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই? বিশেষতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া উচিত নহে, এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।"

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন গৃহ সাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার দেশ-উজ্জ্বল মুখ-উজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন, এখন কি বলিতে : য : বল।" ইহা শুনিয়া অজিতি বিশারদ খিড়কীদ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীরে ধীরে আসিতে-লেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে ারিলেন না, কাঁদিয়া উ লেন, বড় যন্ত্রণা পাইয়া-ন। অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অজিত ারদ আপনিও কাঁদিতেন, কিন্তু এ সময় তিনি দিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য চাহিয়া তাহা সংবরণ করিলেন। পরে নস্য-শম্বুক বাহির করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি সকল দিক্ ভাবিয়া দেখিলাম, তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যবনস্পৃষ্টা হইয়াছ; ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না; অতএব স্থানান্তরে যাও।" এই বলিয়া অজিতি বিশারদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন; দামিনী প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; ক্রমে শ্বশুরের প্রত্যেক বাক্য স্মরণ করিয়া অর্থ বুঝিলেন, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন, ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থির করিবার নিমিত্ত চারিদিক্ চাহিয়া দেখি-লেন। নিকটে তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তাহার শুষ্ক ডালে একটী চিল বসিয়া আছে; খিড়কি-পুষ্করণীর কাল জলে ডাহুক সাঁতার দিতেছে, ঘাটের নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে রাখিয়া গিয়াছে, তাহার জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট রহিয়াছে। শ্বশুর যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা রুদ্ধ রহিয়াছে। দামিনী একবার সেই দ্বারে হাত দিয়া দেখিলেন পরে আপনার গাত্রে, চক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন, স্বপ্ন নহে—সকলই সত্য! গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীর চক্ষে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সকলই অন্ধকার হইল, দামিনী পড়িয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়ার অনেকগুলিন বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা, যুবতী, বালিকা সকলে আসিয়া দামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী তখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। যেখানে পড়িয়া গিয়াছিলেন সেই-খানে নতমুখে বসিয়া একটী দূর্ব্বাদল, নখদ্বারা অন্যমনস্কে ছিঁড়িতেছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আর সমনস্কে হউক, তাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতেছিল।

প্রতিবাসীদিগের মধ্যে একটী বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল করে ভারতে এসেছিলে! আহা! কি অদৃষ্ট! কি দুর্ভাগ্য!" দামিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপ্রতি ব্যথিত হরিণের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন, "এ মুখ প্রতি পোড়া শ্বশুর একবার ফিরে চাহিল না। ধর্ম্ম বড় হল না, জাত বড় হল, আ রে পোড়া বিধাতা! কপালে মন্দ লিখিতে আর কি লোক পেলে না? এই বয়সে

এই কণ্ঠ! আহা! মরি মরি মরি! মেয়ে ত নয়, যেন স্বর্ণলতা!"

আর একজন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, "আহা! দামিনী আমাদের চিরদুঃখিনী; বুড়া মাতামহী দামিনীর বিবাহ দিয়া বলিয়াছিল যে, 'এতদিনে আমার দামিনীর উপায় হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।' 'আহা! যদি বুড়ি বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁড়াইবার একটা স্থান পাইত। এখন আর দামিনীর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

দামিনীর অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল; শেষে দামিনী মাতামহীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আয়ি! আমায় কার কাছে রেখে আপনি চলে গেলে?" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহার শাশুড়ী রাগভরে সশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন "বলি বউ! তোমার কেমন আক্কেল আচরণ! এই দুই প্রহর বেলা গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া মরা কান্না আরম্ভ করিলে? জ্ঞান না কি যে, এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়?" প্রতিবাসিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদেরই বা কি আচরণ! আপনার আপনার ঝি-বউ ঘরে রেখে পরের বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময় পাইয়াছ, ভাল, পরমেশ্বর আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তর করিল না; সকলেই একে একে চলিয়া গেল। দামিনীও চক্ষের জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসিনীরা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাঁহাদের একজন সমবয়স্কা একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশের বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বার রুদ্ধ করিলে দামিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "একবার উঠ ত।" দামিনী বলিলেন, "আমি আর কোথায়ও যাব না; কোথায়ও যাইবার আর আমার স্থান নাই; কেহ আর আমায় স্থান দিবে না।" সমবয়স্কা বলিল, "তবে কি এইখানে মরিবি?" দামিনী উত্তর করিলেন, "এই খানেই মরিব। আমার স্থান কোথা? তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গেছেন, আমি এইখানেই থাকিব; যতদিন তিনি না আসেন, ততদিন যেমন করে পারি বাঁচিব। আমি তাঁরে না দেখে মরিতে পারিব না।"

এই বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন, "অন্যত্র না যাও, এই বৃক্ষমূলে আসিয়া বস; রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে, আমরা আর দাঁড়াইতে পারিব না।" দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায় না দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড় মানুষ, এই রৌদ্রে তোমায় খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তর ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না; অপরাহ্ন না হইতে হইতেই অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে বসিয়া অন্যমনস্কে একটী পক্ষী দেখিতেছেন। আর চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিয়া দামিনীর নিকটে বসিলেন। পরস্পর কেহই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন, "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয়। যাহা হউক, ভালমন্দ একটা স্থির হইয়া যায়।

দা। তিনি যদি আসিয়া পথ হইতে ফিরে যান?

প্র। সে কি! তা কি হইতে পারে?

দা। পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা শুনায়। তিনিও কি আমায় ত্যাগ করিবেন?

প্র। কি জানি ভাই। পুরুষের মন কখন কেমন থাকে, তা কে বলিতে পারে?

দা। তিনি আমায় কত ভালবাসেন। আমায় দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমায় দেখিবার তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল করে আমার কাছে আসিয়া বসেন, কতবার কতদিকে বসে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন; দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন; ওষ্ঠে হাত দিয়া দেখেন; দেখিয়া আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইয়া থাকি।

এই বলিতে বলিতে দামিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, রাত্রি যাপন কিরূপে হইবে? কোথা থাকিবে?" দামিনী প্রথমে বলিলেন, "কি জানি," পরক্ষণেই বলিলেন, "এইখানেই থাকিব। কে আমায় স্থান দিবে?"

প্রতিবাসিনী শিহরিয়া বলিলেন, "তা কি স্ত্রীলোকের সাধ্য? এই অন্ধকার বনমধ্যে একা পুরুষে

থাকিতে পারে না, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে? রাত্রের নির্দ্দিষ্ট ঘরে না হউক, বাটীর অন্য কোন চালায় শ্বশুর শাশুড়ী কি স্থান দিবেন না? অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে, রাত্রে কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু রাত্রি হইল, প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাঁহার তত্ত্ব করিল না। খিড়কীদ্বার এতক্ষণ মুক্ত ছিল, শেষে তাহাও রুদ্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। দূরে যে দুই একটী দীপালোক দেখা যাইতেছিল, তাহা একে একে নিবিয়া গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীর ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনার ভাবনা আপনি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে দুই একবার ভয় পাইতে লাগিল, অন্ধকারে নানাদিকে নানা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবার সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দামিনী ধূলায় শয়ন করিলেন, শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে ডাকিল, "মা!" স্বপ্নে যেন উত্তর দিলেন, "মা!" স্বপ্নে যেন বোধ হইল, তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা! এ ঘরে আর কাজ কি?"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দশ বারো দিবস পরে রমেশ বাটী আসিয়া সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতার প্রতি দোষারোপ করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ করিলেন, কোথাও দামিনীর সংবাদ পাইলেন না। শেষে এক দিবস রাত্রিশেষে বিষণ্ণভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থাসহিত আপনার সাদৃশ্য দেখি[illegible]। অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; [illegible]নে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ আপন আপন [illegible] বিদ্ধ করিয়া সাহঙ্কারে দুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতেছে। রমেশ অগ্রসর হইলেন, দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা, বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের শব্দ থামিল। ঘর ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই কক্ষান্তরে মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত একটী মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশের শরীর কণ্টকিত হইল। রমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেই দিকে গেলেন, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন, মৃত্যুশয্যায় একটী রুগ্ন মনুষ্য-দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরদেহ একেবারে সংজ্ঞাহীন হয় নাই তাহার কণ্ঠস্বর আবার অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতে লাগিল, "আমি! এলে? বসো, আর বিলম্ব করিব না। কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি।"

রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "দামিনী, দামিনী! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না!"

দামিনী কোন উত্তর দিল না। রমেশ আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আবার কথা কও; অনেক দিন কথা শুনি নাই; আবার কথা কও।" আর কোন উত্তর নাই; সকল নিঃশব্দ। রমেশ কতক বুঝিলেন, রুদ্ধশ্বাসে গ্রাম-মধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন, সেখানে আর একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দামিনী এ জন্মের মত চক্ষু মুদিয়াছেন।

রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিয়া রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন যে, এই পূর্ব্বপরিচিতা পাগলী।

পাগলী একবার ওষ্ঠে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে; ঘুমাইতেছে;" পরক্ষণেই আবার বিকট হাসি হাসিয়া রমেশের উপর পড়িয়া রমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিয়া বলিল, "আমি চিনিয়াছি, তুই রমেশ; তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

রমেশের শ্বাস রুদ্ধ হইল; চক্ষুর শিরা-সকল উঠিল। রমেশ বাক্যরহিত, শক্তিরহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার রমেশের গলদেশ পূর্ব্বমত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।

সম্পূর্ণ।

পালামৌ।

(ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

পালামৌ।

প্রথম প্রবন্ধ।

বহুকাল হইল, একবার আমি পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে. পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেকদিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমন নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে স্থান কোন দিকে কতদূর, অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে এই বিবেচনায় ইনলণ্ড ট্রাঞ্জিট কোম্পানির (Inland Transit Company) ডাকগাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি শেষ প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রভাতে বরাকর নদীর পূর্ব্ব পারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার হইবে, অতএব গাড়োয়ান কুলি ডাকিতে

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী এক-রূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতী মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে, আর হাসিতেছে, আবার অন্যের সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে, তাহাও এক একবার দেখিতেছে. শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বাসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব একটী পয়সা" "সাহেব একটী পয়সা।" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটী বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটী দুইবৎসরবয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার

হস্তে একটী পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড়-পর্ব্বতের পরিচয় অনেক জানা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চুণকাম করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক একটী চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্ব্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত, নানাবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য ফণাটী কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটী বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রীর গুণ নহে, বৈরাগীর দোষ নহে। সর্পটী কালিয়দমনের কালিয়; কাজেই যে পর্ব্বতের উপর কালিয় উঠিয়াছে, সে পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়াই বাল্যকালেই পর্ব্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটী সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বতসম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃ পুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার-সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ হয় নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি; সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না, বঙ্গবাসীমাত্রেই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিপরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষি-পত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিতে

ম্যাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক্। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটীকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজি মতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দুমতে হয় নাই; কেন না, তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মের বড় বিরোধী। তদ্ভিন্ন আহারের আর কোন দোষ ছিল না, সদ্যুত আতপান্ন, আর দেবীপ্রসাদ ছাগমাংস, এই দুইই নির্দ্দোষী।

পাকসম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল; পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ, এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সজ্জনের মুখ পবিত্র রাখিয়াছি; কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ডু এক দ্রব্য কি না,এ বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সন্দেহ আছে। একবার পঞ্জাব অঞ্চলের একজন রাজা শ্রীশ্রী জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই একদিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, তিনি কি প্রধান, কি সামান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন যোড়হস্তে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ হিন্দুচূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাকশালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা "পলাণ্ডু!" এই শব্দ বারবার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙ্গালী পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে, মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোন ফসল হয় না।"

রাজার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না, পশ্চিম প্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে। বিশেষতঃ যে সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশ অঞ্চলে আছেন, বোধ হয়, তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, "চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাষ্টারমহাশয় থাকেন।" এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতুষ্ট হইলাম। দিবারাত্র বালকদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর একঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ক মর্ত্তমানরম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে, পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি ছোটনজর ইত্যাদি বলে, কিন্তু আমি তাহা কোনরূপে ভাবিতে পারিলাম না।

যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে "কলাকাঁদির হিসাব" দেখিয়া বরং আরও চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম, তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প। "কলাকাঁদির ফর্দ্দ" সম্বন্ধে বালকদের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম যে, একদিন একজন চাকর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া দুইটী সুপক্ক রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্তি করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি, এমত সময় গৃহস্থ "কাছারী" হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন; যেস্থান হইতে যে বৃক্ষটী আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে "কলাকাঁদি" সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনও আমার মনে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছিল; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমার ধারণা ছিল, এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে না; কিন্তু আপনার বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।" তিনি উত্তর করিলেন, "এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাহারও বাটীতেও পাওয়া যাইত না, লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলার গাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া দেশ হইতে 'তেড়' আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে 'তেড়' লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় দুইটী স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ বলিলেন, "উহার একটীতে আমার নাপিত থাকে, অপরটীতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটীতে স্থান দিয়া এক প্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি, এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা, নাপিতের কষ্ট পূর্ব্বে আর কোন উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।"

সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষক-সম্মুখে বালকেরা যে টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তথায় একত্র একস্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোকে যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাঁহারা বালকদের নিমিত্ত একটী সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন; "আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিল। শেষ আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অপব্যয় নহে, অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকদের চক্ষু দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা; যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিশের বহু পরে 'চালসা' ধরে।"

উচ্চপদস্থ সাহেবেরা সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালীরা ছোট বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন। যে কুঠিতে তিনি বাস করিতেন, সেরূপ কুঠী সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; কুঠীটী যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের উপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায়, তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন, তিনি বলিতে পারেন যে, যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা এ কথা লইয়া কোন তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই, সেইমত শিখাইয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছি, তাঁহার মন, "কুঠী"র উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠীর ভাড়ায় যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে, সে ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে, তাহা হইলে কি বুঝা কর্ত্তব্য?

রাত্রি দেড়প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোট-

নাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই চারি দিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না, এবার ইচ্ছা রহিল, মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই একটী অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোন একজন মিলিটারী সাহেব, "পেরেড বৃত্তান্ত, "ব্যাণ্ডের" বাদ্যচর্চ্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম, পালামৌ প্রবল সহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ সহর নহে, একটী প্রকাণ্ড পরগণামাত্র। সহর সে অঞ্চলে নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কি অনুভব করেন, বলিতে পারি না। যাঁহারা, "কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার কৃত" পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালভ্রান্তিসংবাহক ভাঁটভেরাণ্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড়-জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। সকলের অনুভবশক্তি ত সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন, মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘ-মধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়-গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটী পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধপাহাড় লাতেহারগ্রামপার্শ্বে একটী আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যে-কটী কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (Poodle) আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্ব-মত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ব-বৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী

জন্য, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটী আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কন্‌ডক্‌টার (conductor); যে পর্য্যন্ত ননকন্‌ডক্‌টেরর সঙ্গে সংস্পর্শ না হয়, সে পর্য্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটী পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটী একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্‌ঝর্ করিতেছে। তাহার একস্থান অনেকদূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটী বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয় অশ্বত্থগাছটী আপন অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাকষ্টে কালযাপন করিবে, এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটীর প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটী বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গোপথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ, "শাল তাল তমাল, হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটীও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ববৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথায়ও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটী মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্পবিলম্বেই অর্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটী মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্ব্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্ব্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখন দেখি নাই; সকলের গলায় পুতির সাতনরী, ধুকধুকীর পরিবর্ত্তে এক একখানি গোল আরসী; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন ব্রজগোপাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাতুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাতর, পশুও পাতুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এই স্থলে বলা আবশ্যক, এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটী গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ,বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুতির সাতনরী,তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন-

লে, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর হাত ধরিয়া বিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল, কেবল পাল্কী আর বেহারা। পাল্কীর ভিতরে কে বা কি, তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামে বালক-বালিকারা প্রায় পাল্কী আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাক্স থাকে, তাহা হইলে, "বরকনে" দেখিবার নিমিত্ত পাল্কীর ভিতর দৃষ্টিপাত করে। যিনি পাল্কী চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগ্য, কিন্তু গ্রাম্যবালক-বালিকারাও অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দ্দয়।

তাহার পর আবার কতকদূর গিয়া দেখিলাম, পথশ্রান্ত যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্য পান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্য-বদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানু স্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধ হয় যেন, সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালায় ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌ পরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার-ব্যবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখন স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্ব্বদা মাতাল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কয়েকবার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিয়াছি, এমন নহে। বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ [illegible] অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে [illegible] অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সী হইলেও [illegible]ই থাকে, অশীতিপরায়ণ না হইলে তাহারা [illegible] চর্ম্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহ-[illegible] কৃষিকার্য্য সকল কার্য্যই তাহারা করে, পুরুষেরা [illegible]লোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা [illegible], কখন কখন চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরু-[illegible] বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া [illegible], স্ত্রীলোকের শ্রমহেতু স্থিরযৌবনা থাকে।

লোকে বলে, পশুপক্ষীর মধ্যে পুংজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উড়িতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয়, কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগণার পর্ব্বতে স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলদের সহিত বা অন্য কোন বন্য জাতির সহিত বাস করে না, শুনিয়াছি অন্য জাতীয় মনুষ্য দেখিলে তাহারা পলায়; পর্ব্বতের অতি নিভৃত স্থানে থাকে বলিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করা কঠিন। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন, তখন অসুরগণ অতি প্রবল ও তাহাদের সংখ্যা অসীম ছিল। অসুরেরা আসিয়া আর্য্যগণের গরু কাড়িয়া লইয়া যাইত, ঘৃত খাইয়া পলাইত, আর্য্যেরা নিরুপায় হইয়া কেবল ইন্দ্রকে ডাকিতেন, কখন কখন দলবল জুটিয়া লাঠালাঠিও করিতেন। শেষে বহুকাল পরে যখন আর্য্যগণ উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেন, তখন অসুরগণকে তাড়াইয়াছিলেন। পরাজিত অসুরগণ ভাল ভাল স্থান আর্য্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বতে গিয়া বাসস্থাপন করে। অদ্য পর্য্যন্ত সেই পাহাড়-পর্ব্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বল-বীর্য্য নাই; আর সে অসীম সংখ্যাও তাহাদের নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাদের অসুরকুল ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না; যে দশ পাঁচ জন এখানে সেখানে বাস করে, আর কিছুদিনের পর তাহারাও থাকিবে না।

জাতিলোপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে; অনেক আদিম জাতির লোপ হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। জাতিলোপের হেতু দর্শনবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পরাজিত জাতিরা বিজয়ী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অতি অযোগ্য স্থানে গিয়া বাস করিলে, পূর্ব্বস্থানে যে সকল সুবিধা ছিল তাহার অভাবে ক্রমে তাহারা অবনত ও অবসন্ন

হইয়া পড়ে। এ কথা অনেক স্থলে সত্য, সন্দেহ নাই, অসুরগণের পক্ষে তাহাই খাটিয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু সাঁওতালেরাও এক সময় আর্য্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দামিনীকোতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অবধি অনেক কাল তথায় বাস করে, অদ্যাপি তথায় সাঁওতালেরা বাস করিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের যে কুলক্ষয় হইয়াছে, এমত শুনা যায় না।

মার্কিন ও অন্যান্য দেশে যেখানে সাহেবেরা গিয়া বাস্তু স্থাপন করিয়াছেন, সেখানকার আদিম-বাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না। রেড ইণ্ডিয়ান, নাটিক ইণ্ডিয়ান, নিউ জিলাণ্ডার, নিউ হলাণ্ডার, তাস্মানীর প্রভৃতি কত জাতি লোপ পাইতেছে। মৌরিনামক আদিম জাতি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সাহেবদের অধিকারে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ১৮৪৮ সালে তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, বিশবৎসর পরে ৩৮ হাজার হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে জাতির অবস্থা কি, তাহা জানি না। বোধ হয়, এতদিনে লোপ পাইয়া থাকিবে; অথবা যদি এতদিন থাকে, তবে অতি সামান্য অবস্থায় আছে। মৌরি দুর্ব্বল নহে, তৎসম্বন্ধে একজন সাহেব লিখিয়াছেন "He is the noblest of savages, not equalled by the best of Red Indians." তথাপি এজাতি লোপ পায় কেন? তুমি বলিবে, সাহেবদের অত্যাচারে? তাহা কদাচ নহে. ক্যানেডার অধিবাসীসম্বন্ধে সাহেবেরা কতই যত্ন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাদের কুলক্ষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার পিকি লিখিয়াছেন যে, "In Canada for the last fifty years Indians have been treated with paternal kindness but the wasting never stops * * * * The government has built them houses, furnished them with ploughs, supplied them constantly with rifles, ammunition, and clothes, paid their medical attendants * * * but the result is merely this that their extinction goes on more slowly than it otherwise would." সমাজোপযোগী ভাল স্থান ত্যাগ করিয়া বিপরীত স্থানে ত এই জাতিদের যাইতে হয় নাই, তবে তাহাদের কুললোপ হইল কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে আসিলে সামান্য জাতিরা অবশ্য কতকটা উদ্যমভঙ্গ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথার প্রত্যুত্তরে একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কতই সামান্য জাতি বাস করে, কিন্তু শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে তাহাদের ত কুলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় না।

আমরা এ কথা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের আদিম জাতিদের কুলক্ষয় অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজদের সমাগমের পর কোন জাতির ক্ষয় ধরিয়াছে, এমত নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে কোলদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহার কারণ আর এক সময় সমালোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এ সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে। কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয়, তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়; লোকের ভাল লাগিবে না, এ কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক, আগামীবারে সতর্ক হইব, কিন্তু যে কথার আলোচনা আরম্ভ করা গিয়াছিল, তাহা শেষ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর কথা কিছু বলি; কিন্তু চারিদিকে বাঙ্গালীর উন্নতি লইয়া বাহবা পড়িয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী ইংরেজি শিখিতেছে, উপাধি পাইতেছে, বিলাত যাইতেছে, বাঙ্গালী সভ্যতার সোপানে উঠিতেছে, বাঙ্গালীর আর ভাবনা কি? এ সকল ত বাহ্যিক ব্যাপার। বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক ব্যাপার কি, একবার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় না? শুনিতেছি, গণনায় বঙ্গবাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বড়ই ভাল!

প্রবন্ধ।

পূর্ব্বে একবার "লাতেহার" নামক পাহাড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই পাহাড়ের কথা আবার লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছে। পুরাতন কথা বলিতে বড় সুখ, আবার বিশেষ সুখ এই যে, আমি শ্রোতা পাইয়াছি। তিন চারিটী নিরীহ ভদ্রলোক, বোধ হয়, তাঁহাদের বয়স হইয়া আসিতেছে, পুরাতন কথা বলিতে শীঘ্র আরম্ভ করিবেন, এমন উমেদ রাখেন, বঙ্গদর্শনে

আমার লিখিত পালামৌ-পর্য্যটন পড়িয়াছেন, আবার ভাল বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত; তুমি প্রশংসা কর আর না কর, বুড়া বনিয়া তোমার পুরাতন কথা শুনিবে, তুমি শুন বা না শুন, সে তোমার কথা শুনাবে; পুরাতন কথা এইরূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহার পুঁজি বাড়িবে না, কেন না, আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি তোমরা শুনিয়া আমায় চিরবাধিত কর।

নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন, তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত, জানি না। এখন দেখি, এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে, উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয়, আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাহাড়ের অতি নির্জ্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয় মৌয়া গাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি করে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই মধ্যে একটীকে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়াছিলাম। কখন তাহার ফল কি ফুল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেইখানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটী গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে মৃদু ও বিষণ্ণভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু যেন একটী শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম; আর ভাবিতাম এই আমার "দুনিয়া।"

একদিন এই স্থানে সুখে বসিয়া চারিদিকে দেখিতেছি, হঠাৎ একটী লতার উপর দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটী ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটী ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা গোপন করিতে পার নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটী বাড়াইয়া দিয়াছিল। একটী কালো কালো বড় গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আর, এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাতে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতেছিলাম, এমত সময়ে আমার পশ্চাতে উচ্চারিত হইল,

"রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম্।"

আমি পশ্চাৎ ফিরিলাম, দেখিলাম কেহই নাই, চারিদিক চাহিলাম, কোথাও কেহ নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি, এমত সময় আবার আর এক দিকে শব্দিত হইল,

"রাধে মন্যুং ইত্যাদি"

আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, আমি সেই দিকে কতক সভয়ে কৌতূহলপরবশে গেলাম। সে দিকে গিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না, কিয়ৎপরেই "কুমারীর" ডাল হইতে সেই শ্লোক আবার উচ্চারিত হইল, কিন্তু তখন শ্লোকের স্পষ্টতা আর পূর্ব্বমত বোধ হইল না, কেবল সুর আর ছন্দ শুনা গেল। "কুমারীর" মূলে আসিয়া দেখি, হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় একটী পক্ষী আর একটীর নিকট মাথা নাড়িয়া এই ছন্দে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষিণী তাহাকে ডানা মারিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখন কখন অন্য ডালে গিয়া বসিতেছে। এবার আমার ভ্রান্তি দূর হইল, আমি মন্দাক্রান্তা ছন্দের একটীমাত্র শ্লোক জানিতাম; ছন্দটী উচ্চারণ মাত্রেই শ্লোকটী আমার মনে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেও তাহার কার্য্য হইয়াছিল, আমি তাহাই শুনিয়াছিলাম "রাধে মন্যুং।" কিন্তু পক্ষী বর্ণ উচ্চারণ করে নাই, কেবল ছন্দ উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহা যাহাই হউক, আমি অবাক্ হইয়া পক্ষীর মুখে

সংস্কৃত ছন্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল, যিনি "উদ্ধব দূত" লিখিয়াছেন, তিনি হয়ত এই জাতি পক্ষীর নিকট ছন্দ পাইয়াছিলেন। শ্লোকটীর সঙ্গে এই "কুঞ্জকীরানুবাদের" বড় সুসঙ্গতি হইয়াছে। শ্লোকটী এই—

রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম্,
জাতং দৈবাদসদৃশমিদং বারমেকং ক্ষমস্ব।
এতান্নাকর্ণয়সি নয়বন কুঞ্জকীরানুবাদান্,
এভিঃ ক্রুদ্ধৈর্ব্রজমবিরতং বঞ্চিতাঃ বঞ্চিতাঃ স্মঃ।

উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলে গোপীগণ আপনাদের দুঃখের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছেন, এমত সময় কুঞ্জের একটা পক্ষী বৃক্ষশাখা হইতে বলিয়া উঠিল, "রাধে আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পাদতলে। দৈবাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে, একবার তাহা ক্ষমা কর।" গোপীরা এতবার এই কথা রাধিকাকে বলিয়াছে যে, কুঞ্জ-পক্ষীরা তাহা শিখিয়াছিল। যাহা শিখিয়াছিল, অর্থ না বুঝিয়া, পক্ষীরা তাহা সর্ব্বদাই বলিত। গোপীরা উদ্ধবকে বলিলেন, "শুনলে —কুঞ্জের ঐ পাখী কি বলিল—শুনলে? একে বিধাতা আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আবার দেখ, পোড়া পক্ষীও কত দগ্ধাচ্ছে।"

পক্ষী আবার বলিল, "রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম্" তাহাই বলিতেছিলাম বিহঙ্গচ্ছন্দে বিহঙ্গের উক্তি বড় সুন্দর হইয়াছিল।

ছন্দ কি গীত শিখাইলে অনেক পক্ষী তাহা শিখিতে পারে, কিন্তু ছন্দ যে কোন পক্ষীর স্বরে স্বাভাবিক আছে, তাহা আমি জানিতাম না, সুতরাং বন্য পক্ষীর মুখে ছন্দ শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষীর সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শুনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম পথে আসিতে আসিতে মনে হইল, যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন, তিনি ভাবিতেন নিশ্চয়ই এ পক্ষীটী রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, বৈজিক কারণে পূর্ব্বপুরুষের অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে আপনি আসিতেছে। বৈষ্ণবদের উচিত, এ বংশকে আপন আপন কুঞ্জে স্থান দেন। রাধাকুঞ্জের সকল গিয়াছে, সকল ফুরাইয়াছে, কেবল এই বংশ আছে। আমার ইচ্ছা আছে, একটী হরিয়াল পালন করি, দেখি "সে রাধে মন্যুং পরিহর" বলে কি, না বলে।

আর একদিনের কথা ... তাহা হইলেই লাতেহার পাহাড়ের কথা আমার শেষ হয়। যেরূপ নিত্য অপরাহ্নে এই পাহাড়ে যাইতাম সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি, একটী যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতক গুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এককালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাহাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

যখন আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জলগ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায় বুট, পরিধানে কোট পেণ্টুলন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবি ধরণে নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে চলিলাম। আমি স্বভাবতঃ বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক সম্বন্ধে আমার কখন ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারীরা কতদিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনও গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম; বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনও আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণ-ক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলী কি তরবার তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে, এ কথা তাহাদের মনে আইসে না। যত দিন তাহাদের মনে এ কথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসিক। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফলজ্ঞান হয় নাই, জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায়, সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাহাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল

কোড যত ভাল হ ;সাহস তত অন্তর্হিত হয়। এখন এ সকল কচকচি থাক।

যুবার সঙ্গে কতদূর গেলে সে আমায় বলিল, "আমি বাঘটী স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হই লাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়া ছিল, যে পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেব বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতদূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহারপর কতকদূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, "আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে।" আমি জুতা খুলিয়া খালি পায় চলিতে লাগিলাম, আবার কতকদূরে গিয়া বলিল, "আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্ল-বদনে বলিল, "হইয়াছে. সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন, বাঘ নিদ্রা যাইতেছে।" আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটী গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী কুটীর, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর-সংযুক্ত একটী থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটী একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল; আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।" তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম; শেষ একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এই খানি ঠেলিয়া ফেলি।" উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা গর্ত্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোররবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা কি জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার [illegible]র পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। পরদিবস বাহকস্কন্ধে ব্যাঘ্রটী আমার তাঁবু পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।

চতুর্থ প্রবন্ধ

আবার পালামৌর কথা লিখিতে বসিয়াছি। কিন্তু ভাবিতেছি, এবার কি লিখি? লিখিবার বিষয় এখন ত কিছুই মনে হয় না, অথচ কিছু না কিছু লিখিতে হইতেছে। বাঘের পরিচয় ত আর ভাল লাগে না; পাহাড়-জঙ্গলের কথাও হইয়া গিয়াছে, তবে আর লিখিবার আছে কি? পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, এই লইয়াই পালামৌ। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় বাস করে তাহারা জঙ্গলী, কুৎসিত, কদাকার জানওয়ার, তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।

কিন্তু আবার মনে হয়, পালামৌ জঙ্গলে কিছুই সুন্দর নাই, এ কথা বলিলে লোকে আমায় কি বিবেচনা করিবে? সুতরাং পালামৌ সম্বন্ধে দুটা কথ বলা আবশ্যক।

একদিন সন্ধ্যার পর চিকপর্দ্দা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবী চঙ্গে কুক্কুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় এক জন কে আসিয়া বাহির হইতে আমায় ডাকিল, "খাঁ সাহেব।" আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও ছিল; কারণ, নম্বর এক এই যে, আমি মান্য ব্যক্তি; আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার? আমি যাহার অধীন, অথবা যিনি আমা অপেক্ষা অতি প্রধান, কিম্বা যিনি আমার বিশেষ আত্মীয়, কেবল তিনিই আমাকে ডাকিতে পারেন। অন্য লোকে "শুনুন" বলিলে সহ্য হয় না।

কারণ নং দুই যে, আমাকে "খাঁ সাহেব" বলিয়াছে। বরং "খাঁ বাহাদুর" বলিলে কতক সহ্য করিতে পারিতাম, ভাবিতাম, হয় ত লোকটা আমাকে মুসলমান বিবেচনা করিয়াছে, কিন্তু পদের অগৌরব করে নাই। "খাঁ সাহেব" অর্থে যাহাই হউক, ব্যবহারে তাহা আমাদের "ঘোষ মশায় বা "দাস মশায়" অপেক্ষা অধিক মান্যের উপাধি নহে। হারমান কোম্পানী যাহার কাপড় সেলাই করে, ফরাসী দেশে যাহার জুতা সেলাই হয়, তাহাকে

"বোস মহাশয়" বা "দাস মহাশয়" বলিলে সহ্য হইবে কেন? বাবু মহাশয় বলিলেও মন উঠে না। অতএব স্থির করিলাম, এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ করিয়াছে, আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্তে তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইত, কিন্তু "হারামজাদ্" "বদ্‌জাত" প্রভৃতি সাহেবস্বভাবসুলভ গালি ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই নাই, এই আমার বাহাদুরী। শেষ হয় সে রাত্রে বড় শীতে পড়িয়াছিলাম, তাহাই তাঁবুর বাহিরে যাইতেই সাহস করি নাই। আগন্তুক গালি পাইয়া আর কোন উত্তর করিল না; বোধ হয়,চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, যে গালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে, নতুবা গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তর্ক করে; তাহা কিছুই না করায়, আমি ভাবিলাম,এ ব্যক্তি "চমৎকার লোক।" সেও হয় ত আমাকে ভাবিল, "চমৎকার লোক।" নাম জানে না, পদ জানে না,কি বলে ডাকিবে, তাহা জানে না; সুতরাং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করিয়া 'খাঁ সাহেব' বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহার উত্তরে যে 'হারামজাদ্' বলিয়া গালি দেয়, তাহাকে "চমৎকার লোক" ব্যতীত আর কি মনে করিবে?

দণ্ডেক পরে আমার 'খানসামা বাবু' তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডুয়নশব্দ দ্বারা আপনার আগমন-বার্ত্তা জানাইল। আমার তখনও রাগ আছে,"খানসামা বাবু"ও তাহা জানিত,এই জন্য কলিকা হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল, কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাড়াইয়া, অতি গম্ভীরভাবে কলিকায় "ফু" দিতে দিতে লাগিল. আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা আলবোলায় বসাইয়া দিবে. এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে কি নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম, সেদিকে কিছুই নাই,কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; তাহার পরেই দেখি, দুইটী অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের অঙ্গে পড়িল। দেখিলাম,একটী বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেতশ্মশ্রুতে পরিপ্লুত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, তাহার পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক, বোধ হয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন, বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার মুখ দ্রু দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষলোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ী, এ কথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে একটী রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল; গেঙ্গোখালি "মোহনায়" যেখানে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবাস স্থাপন করেন, সেইখানে একদিন অপরাহ্নে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শীকার করিতে গিয়াছিলাম, তথায় কোন বৃক্ষের শুষ্ক ডালে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম "জঙ্গলী পাখী হয় ত কখন মানুষ দেখে নাই,দেখিলে বিশ্বাসঘাতককে চিনিত।" চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম; তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমেষলোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম তাহার কি আশ্চর্য্য রূপ! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম,এই যুবতীতে ঠিক্ তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি,এই জন্য আমি যাহা দেখি তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন্ কোন স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ, আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত,তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটী ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত-প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন,অন্যের দেহ আবির্ভূবে বিকাশ

পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ। সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ, লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে, যাঁহারা বলেন, যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন তাঁহাদের মিথ্যাকথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি, এমত সময় আমার খানসামা বাবু বলিল, "এরা বাই, এরাই তখন খাঁ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল।" শুনিবামাত্র আবার রাগ পূর্ব্বমত গর্জ্জিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম; সেই অবধি আর তাহাদের কথা কেহ আমায় বলে নাই। পর দিবস অপরাহ্নে দেখি, এক বটতলায়, ছোট বড় কতকগুলা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, নিকটে দুই একটা "বেতো" ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাহারাও "বাই"; ব্যয়-লাঘব করিবার নিমিত্ত তাহারা পালামৌ দিয়া যাইতেছে, এই সময় পূর্ব্বরাত্রের বাইকে আমার স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, অতি প্রত্যূষে সে চলিয়া গিয়াছে, আমি আর কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া একজন রাজপুত প্রতিবাসী বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে আসিতে তাহার সঙ্গীরা সকলে মরিয়াছে, মাত্র একজন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল, "খরচাও" ফুরাইয়াছে। দুইদিন উপবাস করেছে, আরও কতদিন উপবাস করিতে হয় বলা যায় না। এ জঙ্গল-পাহাড়মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপনার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

এ কথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, তাহার কতক অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কি যন্ত্রণা পাইতাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব, আর অপার নদীতে নৌকাডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাতে নিজের কোন ক্ষতি হইত না; অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল একদিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এইরূপ কথা আমার সর্ব্বদা মনে হইত। দুই চারি দিনের পর একটী সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি দশ-ক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলিলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথেই মরিয়াছে।" এ কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড়ই কষ্ট হইল। আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া "খাঁ সাহেব" কথায় চটিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, একদিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুবতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা "দাড়ি" হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্যলোকেরা এক এক স্থানে "পাতকোয়ার" আকারে ক্ষুদ্র খাদ খনন করে—তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না—সেই খাদে জল চুঁইয়া জমে। আট দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে দাড়ি বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটী লম্বোদরী—সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, "রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন?" আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা

সমুদায়ই আসিয়া একত্রে হইয়াছে। তাহারা "খোপা" বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই তিনখানি কাঠের "চিরুণী" সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময় মঞ্চের উপর বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটী, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশজন, সেই চল্লিশজনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুকধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, পশ্চাতে মৃন্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধে ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল; যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুকধুকি দুলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিতকণ্ঠে একটী গীতের "মহড়া" আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে "ধুয়া" ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন,সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত কখন বা পাহাড়ের বক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা, কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপ বাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটী একটী ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল, নিকটে দুই তিন স্থানে হুত করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে একবার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

নৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলাম না: বড় শীত; অধিকক্ষণ থাকা গেল না।

পঞ্চম প্রবন্ধ।

কোলের নৃত্যসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই,বোধ হয় যেন, উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতক দূর গিয়াছিলাম। বরকর্ত্তা আমার পাল্কী লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না। ভাবিলাম, না করুক, আমি রবাহূত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্নে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাল্কীতে বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ বার জন পুরুষ আর পাঁচ ছয় জন যুবতী, যুবতীরাও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহ ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায়

ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম; কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া, বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল, আমি দুর্বল বাঙ্গালী, আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতকদূর গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ্য করিল না; হয় ত দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তরস্তূপে বসিয়া ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলাম, আর রাগভরে পাতুরে মেয়েগুলাকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সিপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পাক বলিলাম, আর কত কি বলিলাম। আর একবার বহু পূর্ব্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগড়ের বাগান "লসিংটন লজ" হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম—তখন রেলওয়ে ছিল না, সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা টক্ টক্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি, গবর্ণর জেনেরল কাউনসলের অমুক মেম্বারের কুলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, যোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম, স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না, অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয় ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা, সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ মনে আসা সম্ভব। সেই জন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের মত আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন, যেন সেই সঙ্গে একটু "তুয়ো" দিয়া গেলেন,—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ছিল, তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া সুন্দরীদের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে, তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? খোসামুদেরা বলে, তাহাদের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে;—কলাগাছে ঝড়, আর শিমুল গাছে সমীরণ?

সে সকল রাগের কথা এখন থাক্; যে হারে সেই রাগে কোলের কথা হইতেছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে একরূপ বিবাহ নহে। এক জাতি কোল আছে, তাহারা উরাং কি, কি স্মরণ নাই, তাহাদের বিবাহপ্রথা অতি পুরাতন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদয় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রিযাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত, তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয় ত থাকিতে না পারিয়া শেষ ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্য্যন্ত দেয়। গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখবিনির্গত হইলে যুবার কাণে উভয়ই সুধা বর্ষণ করে। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।

এইরূপে প্রতিরাত্রে কুমার-কুমারীর বাক্‌চাতুরী হইতে থাকে। শেষে তাহাদের প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটী ঠিক নহে। কোলেরা প্রেম-প্রীতের বড় সম্বন্ধ রাখে না। মনোনীত কথাটী ঠিক। নৃত্য হাস্য-উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে সঙ্গী-সঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে, কুমারীর আত্মীয়-বন্ধুরা বড় বড় বাঁশ কাটে, তীর-ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে শাণ দেয়, আর অনবরত কুমারের আত্মীয়বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শেষ একদিন অপরাহ্ণে কুমারী হাসি হাসি মুখে বেশবিন্যাস করিতে বসে। সকলে বুঝিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়। হয় ত ছোট ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়। বেশবিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরী লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্য দিনের মত নহে, এ দিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথার গাগরী টলে। বনের ধারে জল যেন কতই দূর! কুমারী যাইতেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে

বনে দুই একটী কল তুলিয়া উঠিল, তাহার পর এক নবযুবা সখা সুবলের মত লাফাইতে লাফাইতে সেই বন হইতে বহির্গত হইল; সঙ্গে সঙ্গে হয় ত দুটা চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল-কুমারীর মাথা হইতে গাগরী পড়িয়া গেল। কুমারীকে বুকে করিয়া যুবা অমনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং অবস্থায় চীৎকার করিতে বাধ্য, চীৎকারও সে করিতে লাগিল, হাত পাও আছড়াইল, এবং চড়টা চাপড়টাও যুবাকে মারিল; নতুবা ভাল দেখায় না। কুমারীর চীৎকারে তাহার আত্মীয়েরা মার মার রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে সেখানে লুকাইয়া ছিল, তাহারা বাহির হইয়া পথরোধ করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণীহরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনিয়াছি, দুই একবার নাকি সত্য সত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধের পর আপোন হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।

এইরূপ কন্যা-হরণ করাই তাহাদের বিবাহ। আর স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসুরিক বিবাহ বলে। এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে স্ত্রী-আচারের সময়ে বরের পৃষ্ঠে বাউটিবেষ্টিত নানা ওজনের করকমল যে সংস্পর্শ হয়, তাহাও এই মারপিট প্রথার অবশেষ। হিন্দুস্থান অঞ্চলে বরকন্যার মাসী পিসী একত্র জুটিয়া নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে, মেছুয়াবাজারের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে, তাহাও এই মারপিট প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বরকন্যা গির্জ্জা হইতে গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতাবৃষ্টি হয়, তাহাও এই পূর্ব্বপ্রথার অস্মৃতি। *

কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখন কখন পনর টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য, কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথায় পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানীরা মহাজন কি মহাপিশাচ, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ্জ করিল, সে সেই দিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাদকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে; মহাজনের গৃহে তাহা আনীত হইবে; তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কি করিবেন, শেষ হিসাব করিয়া বলিবেন যে, আসল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসের কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাদক যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কি? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল, মহাজন তাহা সমুদয় লইল। খাদক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে, ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না; সুতরাং মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকী কর্জ্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাদক জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত হইল। যাহা সে উপার্জ্জন করিবে, তাহা মহাজনের। মহাজন তাহাকে যৎসামান্য খোরাকি দিবে। এই তাহার এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এই উপলক্ষে "সামকনামা" লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিল, সে রীতিমত গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেন, গোলাম বিনা বেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম করে; চাষ করে, মোট বহে, সর্ব্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাহাদের সংসারও অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দ্দশা অতি সাধারণ। তাহাদের কেবল এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায়। যে না পলাইল, সে জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া যে কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয়, এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দুর্দ্দশা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে

* যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম, তাহা নহে। কেন না, ইহা স্বজাতি-বিবাহ।

মনে জানেন, আমি বড় লোক, আমি "খরচবায়" না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন, তাহার পর যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায়, "আমি ধনবান" বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্যদশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গালা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাহাই বাঙ্গালায় বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কি বলেন জানি না। কিন্তু বোধ হয়, হিন্দুস্থানী মহাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্ব্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না, তাহাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল। এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্ব্বমত সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধ হয়।

কোলের সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে দেখা যায়, তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই, যদি হিন্দুস্থানী সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ যে অবস্থা হয় নাই, কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না। আমাদের বাঙ্গালায় এ কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক সময় ইহুদি মহাজনেরা ঋণদানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা কোলদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ। দেখিতে আশ্চর্য্য। বাঙ্গালার দুরন্ত ছুঁড়ীরা খেলাধেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গাল দিতেছে, পাড়ার সখাকীদের সঙ্গে কোন্দল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ী গালি দিয়া পলাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ী নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটী এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার মুখ প্রতি একবার চাহিল। মার চক্ষে জল আসিল। নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্ক দাঁড়াইয়া শিশির সিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল। উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্বরাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল। কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা! নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটা দুর্ব্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি—পেটের জ্বালায় শুষ্কপত্রে ভগ্ন পাত্রে আহার খুঁজিতেছে। নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন। নববধূ আর পূর্ব্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুরভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে, আজ আবার এ কেন মা?" নববধূ কথা কহিল না। কহিলে হয় ত বলিত, "এই কুক্কুরী সংসারী।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুই দিন পূর্ব্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচিসন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন মা, আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা, তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা করে লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হলে? আমায় পর ভাবিলে?" বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল, "না মা! বলি বুঝি কার জন্যে রেখেছ!

নববধূ হয় ত মনে করিল, পূর্ব্বে আমায় "ওই" বলিতে, আজ কেন তবে আমায় 'তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছে ?

নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য। একরাত্রের পরিবর্ত্তন বলিয়া আশ্চর্য্য! নববধূর মুখশ্রী একরাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাস থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল যে, মনের এই পরিবর্ত্তন তাহার এক রাত্রের মধ্যে হইল!

সম্পূর্ণ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

জীবনী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ-কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্য-সভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনি তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথ বাবু এক এক কলম লিখিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্ম্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান সহায় আছে। কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কালসাপেক্ষ কার্য্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরমসুহৃদ্ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ-গুণ উভয় কীর্ত্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষগুণ দুই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ-কীর্ত্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষগুণের কথা কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না, কেন না কিছু কিছু দোষ-গুণের কথা না বলিলে, ঘটনাগুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দোষে, বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করিব।

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটাল-

* ইঁহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।

পাড়াগ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা। বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি।* তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম। যাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহাদের কৌতূহল-নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক যে, তাঁহার জন্মকালে, তিনটী গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কি না।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরুমহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরুমহাশয় যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট-বাজার করা ইত্যাদি কার্য্যে, তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, কেন না, তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর রহিল।

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটী কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরুমহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রোমক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরে ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জনের পথ সুগম হইত; কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর-পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম, সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কালেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজি গুরু মহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর চাকরী করেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্ত্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয়, এবং আত্মসুখের লাঘবস্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে দুই দিকেই বিষমসঙ্কট। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ; এক দিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয়-পরিবর্ত্তনে বিদ্যা শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিকে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকদের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি

---

* জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরমসুহৃদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। বিশেষ তিনি আমারই "দাদা মহাশয়", কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয় পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।

উপলক্ষে বিদেশে ; মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্ত্তা।—

Lord of himself, that heritage of woe!

কাজেই কতকগুলা বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়া-কৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতি পরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই বিদ্যাচর্চ্চার হানি হইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটীতে তাহা কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলীকালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। একদিন হেড মাষ্টার গ্রেব্স সাহেব আসিয়া কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে,তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়া-শুনা করা যাউক, কালেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিনপরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে, তিনি পরীক্ষা দিতে কালেজে যাই-বেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কালেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটী তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীব-চন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর—সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারী ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না,লেখা-পড়া করার ভান করিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোয়েন্দাগিরী করিয়া বানর-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিকলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি কথাটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীব-[illegible] তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে [illegible]লেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে [illegible]ই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। [illegible]তে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানে ডেপুটী কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই; বর্দ্ধমান দূরদেশ, এই সংবাদ যথাকালে তাঁহার কাছে পৌঁছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়া পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে, ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যো-পার্জ্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারিদিক্ আলো করিল। এই সময় আমাদিগের সর্ব্বাগ্রজ ৺শ্যামা-চরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরী করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটী উত্তম ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন যে, সকলেই আশা করিল যে, তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন; কিন্তু বিধিলিপি এই যে, পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভাবলে, অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতি-হাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কালেজে যে ফল ফলিত,ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্দ্ধমান কমিশনরের আপিসে একটী সামান্য কেরাণীগিরী করিয়া দিলেন। কেরাণী-গিরীটী সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরাণীগিরী করিত, সকলেই পরে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটী ক্ষুদ্র কেরাণীগিরী করিতেন, ইহা

আপার অসহ্য হইত। তখন নতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law Class" তখন নতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরাণীগিরীটা পরিত্যাগ করাইয়া ল-ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরী করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়া-শুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইল্‌সন সাহেব নতন ইন্‌কমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটী আসেসারিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান-রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—"Bengal Ryot."

এই পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না, যে এ জিনিসটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেণে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া, সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তকখানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল-বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবামাত্র, বড় বড় সাহেব-মহলে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী চাপ্‌মান্ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকর্দ্দমায় ১৫ জন জজ ফুলবেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে; Hills vs. Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, "ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না; সুতরাং এ চাকরী আমার থাকিবে না।"

পরিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইহাঁদের পরস্পরে আন্তরিক, অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মাব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনে তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছ্বলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ; অভিলষিত পদ প্রয়োজনীয় অর্থাগম,

পিতামাতার অপরিসীমিত স্নেহ ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু ——— অক্ষুণ্ন আনন্দপ্রবাহ। মনুষ্য যাহা চায়, তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ তখন ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসভূমি ; বন্য প্রদেশ মাত্র। বন্ধুপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরী থাকে না। কিন্তু তাঁহার চাকরী রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌয়ে গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্প কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়টী মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ-যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ-কালে তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। "প্রমথনাথ বসু" ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা, তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটিগিরীতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল আফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম ; জানানও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক, তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও, গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরাণী যদি কোন কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক্ রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটীগিরী আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটী চাকরী দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে, তখন প্রথম সেনসস হইল। এ কার্য্যের কর্তৃত্ব Inspector General of Registration এর উপরে অর্পিত। সেনসসের অঙ্ক সকল ঠিকঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরাণী নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, কেন না, তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সবরেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র বড় সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্যরচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোরবয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ শালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল ; কিন্তু ইতাবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটী ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন

ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শনের ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনে দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ সচরাচর করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটী উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে ভালবাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ শালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্ব্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল," "রাজসিংহ," "আনন্দমঠ", "দেবী" তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, "জালপ্রতাপচাঁদ" "পালামৌ" "বৈজিকতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্য্যাধ্যক্ষের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্দ্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরেজিষ্ট্রীর বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই মাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রার। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই করা। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এতদিন তাঁহার ভয়ে, আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটী সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকরী ত্যাগ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্ম্মচারী এমন ছিল যে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা এবং চক্ষুলজ্জা বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা-কড়ি "মুড়রিবাঁটা" হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত-মৃত্যু হইল।

তারপর সঞ্জীবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বরবিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীমধ্যে (১) মাধবীলতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপচাঁদ, (৪) রামেশ্বরের অদৃষ্ট (৫) যাত্রা সমালোচন, (৬) Bengal Ryot,

এই কয়খানি পৃথক্ ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহভুক্ত হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

(পালামৌ, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট)

এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই যতদূর সম্ভব সোজা গিয়া থাকে। যেখানে না দাঁড়াইলে চলে না, কেবল সেই খানে এক এক বার দাঁড়ায়। কিন্তু সঞ্জীব বাবু তেমন করিয়া পথে চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান, একটা গাছ দেখিবার জন্য, একটা লতা দেখিবার জন্য, একটা পাতা দেখিবার জন্য, একটা ফুল দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, একটা ঘাস দেখিবার জন্য, প্রায়ই দাঁড়ান। কখনও বা পথ ছাড়িয়া একটু এদিকে একটু ওদিকেও যান। এইরূপে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এদিক ওদিক করিয়া, এটা সেটা দেখিতে দেখিতে যাইতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে তাঁহাকে এইরূপ চলা ফেরা করিতে দেখিতে পাই। এ প্রণালীর দোষ গুণ দুই আছে। কিন্তু দোষে গুণে এটা যে একটা প্রণালী, বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা একা সঞ্জীব বাবুরই প্রণালী, আর কাহারও নয়। সঞ্জীব বাবুর যথেষ্ট নিজত্ব (Originality) আছে।

এ প্রণালীর দোষ কিছু আছে। যে বেশী থামিয়া থামিয়া এটা সেটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে যায়, সকলের তাহার সঙ্গে যাইতে ভাল লাগে না, অনেকে তাহার সঙ্গে অধিক দূর যাইতে পারেও না। কিন্তু কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে এ দোষের পরিমাণ যতই থাকুক, পালামৌতে ইহা নাই বলিলেই হয়। পালামৌ এই প্রণালীতে লিখিত; কিন্তু উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌর ন্যায় ভ্রমণকাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। আমি জানি উহার সকল কথাই প্রকৃত, কোন কথাই কল্পিত নয়। কিন্তু মিষ্টতা মনোহারিত্বে উহা সুরচিত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।

এ প্রণালীর অর্থ—সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, বা যেরূপে দেখে না, তাহাই দেখা বা সেইরূপ দেখা। সচরাচর লোকে যাহা দেখে না বা যেরূপ দেখে না, সঞ্জীব তাহাই দেখিতে এবং সেইরূপেই দেখিতে ভালবাসিতেন, এবং তাহা সেইরূপ দেখিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্নে লাতেহার পাহাড়ের, "ক্রোড়ে" গিয়া বসিবার জন্য সঞ্জীব বাবু বড় ব্যস্ত হইতেন। সে ব্যস্ততা কেমন? না, এইরূপ—

"যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া আনিতে যাইবে"—

ছোট ছোট সামান্য সামান্য নিত্য ঘটনা বোধ হয় অনেকে এমন করিয়া দেখে না—"জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়"—আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয়জন লক্ষ্য করে? সঞ্জীব বাবু এইরূপ বিষয় সকল এমনি করিয়া লক্ষ্য করিতে ভাল বাসিতেন, লক্ষ্য করিতে পারিতেন, লক্ষ্য করিতে জানিতেন। এইরূপ দর্শন-কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ আসক্তি ও অভিনিবেশ ছিল। পালামৌতে যে নববিবাহিতা মেয়েটীর কথা আছে—যাহার কথা, অতি সামান্য হইলেও, পড়িতে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে—বোধ হয়, সঞ্জীব বাবু না লিখিলে সে মেয়েটীকে আমরা পাইতাম না। এইরূপ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সঞ্জীব বাবু লিখিয়া গিয়াছেন, এমন করিয়া দেখায়, যে ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি সূচিত হয়, সঞ্জীব বাবুতে তাহা যত দেখি অন্য কোন বাঙ্গালা লেখকে তত দেখি না। এইরূপে দেখা সঞ্জীব বাবুর ধাত এবং এই ধাত সঞ্জীব বাবুর নিজত্ব।

আর এমনি করিয়া দেখাও যেমন সঞ্জীব বাবুর ধাত, সঞ্জীব বাবুর ভাষাও সঞ্জীব বাবুর ধাত। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ, সরল, মিষ্ট, কারুকার্য্যহীন। আর এই যে বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীব ইহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন, তাহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব খুব একটা বড় কথা, কিন্তু পালামৌতে তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কেমন সরল ভাষায় সরলভাবে বুঝাইয়াছেন দেখুন :—

"আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন কোন স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বাজে আমাদের বঙ্গ-কবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণন করিতে পারেন; দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমি তাহা পারি না। * * আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নিলর্জ্জ হইয়াও তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারো দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগ শিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

"বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূতপ্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন—অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যেরূপ, লতায় সেইরূপ, নদীতেও সেইরূপ, পক্ষীতেও সেইরূপ, ছাগে ও সেইরূপ। সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না, দেহ দেখিয়া ভুলি না, কেবল রূপে। সেরূপ লতায় থাক্, অথবা যুবতীতে থাক্ আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে।"

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইহা অতি উচ্চ কথা। এমন উচ্চ কথা, এত সহজ সরল ও পরিষ্কার ভাষায় অতি অতি অল্প লোকেই কহিতে পারে, কিন্তু ছোট বড় সকল কথাই এইরূপে বলা সঞ্জীব বাবুর স্বভাব। এই চমৎকার স্বভাব সঞ্জীব বাবুর নিজত্ব। এই স্বভাবের গুণে তাঁহার সকল লেখাই আবেগ্য-শূন্য, আয়াসশূন্য, ধীরগতি, শান্তভাবাপন্ন। তিনি তাঁহার অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী কথাও যেন "অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে" লিখিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধের জ্ঞান শান্তস্বভাব বালকের ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে নিজত্বে তাঁহার সমান অতি অল্পই দেখিতে পাই।

সঞ্জীব বাবুর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না। কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব কেবলমাত্র তত্ত্ব নয়, তাহা সৌন্দর্য্য দেখিবার রীতি বা প্রণালীও বটে। এই জন্যই তিনি পালা-মৌর সেই বাইজীতে গোপেশ্বরের মোহনার সেই পাপিটির রূপরাশি দেখিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি কোলকামিনীদিগের দেহে "কোলাহল" দেখিয়াছিলেন এবং এইজন্যই যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর ভাবিত, তাহার আনন্দ-দুলাল কথা কহিতেছে; এবং যখন সেই সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত একটা তরঙ্গ উচু হইয়া নাচিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর মনে করিত, তাহার আনন্দদুলাল নাচিতেছে। সৌন্দর্য্যের এই সুবিস্তৃত সুপ্রসারিত জাতিভেদশূন্য সর্ব্বসমন্বয়কারী ভাব বড়ই মধুর, বড়ই উ[illegible] এই ভাব সঞ্জীব তাঁহার সেই অতুল-নীয় মৃদু মধুর ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

কণ্ঠমালা ও মাধবীলতা যে প্রণালীতে লিখিত, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট সে প্রণালীতে লিখিত নয়। শেষোক্ত দুইটিই অতি ক্ষুদ্র গল্প, অতএব কোনটিতেই কণ্ঠমালা বা মাধবীলতার প্রণালী খাটিত না। এই ক্ষুদ্র গল্পে সঞ্জীব বাবুর বেশ ত্বরিতগতি দেখা যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভা-বিক মৃদুতার পরিবর্ত্তে বিলক্ষণ আবেগ ও উদ্দাম-ভাবও পরিলক্ষিত হয়। রামেশ্বরের ও দামিনী পাগ্-লীতে এই খর উদ্দামভাব বেশ পরিস্ফুট। সঞ্জীব বাবু পাগল পাগ্লী গড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। মাধবীলতায় পিতম পাগলা আছে, কিন্তু পিতমের পাগলামী দেখিতে দেখিতে কিছু শ্রান্তি বোধ হয়। রামেশ্বরের অদৃষ্টে স্বয়ং রামেশ্বরকে একবার পাগল প্রায় দেখি। সে পাগলামী ক্ষণকালের নিমিত্ত এবং

দেখিতেও অতি উত্তম, কারণ উহা উৎকট দাম্পত্য-প্রেমের বিকট প্রতিধ্বনি। দামিনীতেও এক পাগলী দেখিতে পাই। সে বড় বিষম পাগলী। পতিশোকে সে আপনি পাগলিনী। তাই যে পতিপ্রাণ। পতির জন্য মরে তাহার পতিকে সে গলা টিপিয়া মারিয়া তাহারই সঙ্গে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়!

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।